
রহস্যভেদী
নীল ব্যানার্জি
গৌতম রায়

রহস্যভেদী নীল ব্যানার্জী

২

গৌতম রায়

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড □ কলকাতা - ৭০০ ০০৯

RAHASSYABHEDI NEEL BANERJEE VOL 2.

By

Goutam Ra y

Published by
Samir Kumar Nath
Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 009

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্যসেন স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০০৯

ISBN : 81-8093-038-X

সূচীপত্র



সেদিন চৈত্র মাস

গাড়ি চালাতে চালাতে নীল বলল,—সামনের গাড়িটাকে ভাল করে লক্ষ করেছিস দীপু!

দীপু তখন জানলার বাইরে তাকিয়ে কিছু দেখছিল। নীলের কথায় ও সামনের দিকে তাকাল। একটা লরি নিজের স্পীড্ মেইনটেইন করে এগিয়ে চলেছে।

—জায়গা ছাড়ছে না বলছ?

—জায়গা না দিয়ে যাবে কোথায়? কিন্তু লরিটার একটা বিশেষত্ব আছে। মন দিয়ে দেখ।

নীল যখন বলছে তখন নিশ্চয় দেখার মতো কিছু আছে। পেছনে পেল্লায় ডাবল চাকা। লাল রঙের মাডগার্ড। গাড়ির রঙটাও লাল সাদা। লরি বোঝাই কাগজের রীল নিয়ে চলেছে।

—ভেরি কমন দৃশ্য। তবে তুমি বলতে পার এই সময় লরি কী এ রাস্তায় চলে? ঘুষ টুষ খাওয়ালে চলে, মুখ বাঁকিয়ে মন্তব্য করে দীপু আবার জানলার বাইরে চোখ রাখল।

—তোর দ্বারা হবে না।

—কী?

—ভালো ইনভেস্টিগেটর হওয়া।

—গুরু, তুমি আমাকে একটা মোটামুটি চাকরি জোগাড় করে দাও। ব্যস। তারপর নিজের ক্যালিতে যতটা পারব এগিয়ে যাব। তার থেকে বেশি কিছু দরকার নেই। জানোই তো একটা মেয়ের সঙ্গে ফেঁসে গেছি।

—কথাগুলো ঠিক করে বল। ফেঁসে গেছি আবার কী? তুই কি কোথাও দাঁও মারতে গিয়েছিলি? যে ফস্কে গিয়ে ফেঁসে গেছিস?

—নাহ্, তা বলিনি। আসলে আপনি পায়না শঙ্করাকে ডাকা বলে না? আমার হয়েছে সেই দশা। নিজের শালা রোজগারের ঠিক নেই। হঠাৎ হাজারিবাগ গিয়ে অঙ্গনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। মনটা চনমনিয়ে উঠল। মেয়েটা ভাল। চাকরি করে। এখন, গুরু চাকরিটা করে দাও।

—এটা কী হচ্ছে দীপু?

—কেন গুরু?

—চাকরি দেবার মতো আমার কোন ক্যালি আছে?

—বাব্বা, বলো কী গো? স্বয়ং ডি আই জি তোমায় খাতির করে। আর, তুমি বললে তোমার চ্যালাকে একটা চাকরি দেবে না, এ কখনও হয়?

—তুই খুব ভালো করেই জানিস, চাকরির বাজার এখন কী, এখন ভি. আর দিয়ে লোক

কমিয়ে যাচ্ছে। তারপর আছে ইউনিয়ন। গিয়ে হুট বললেই কারো চাকরি, ফুট্ করে হয়ে যায় না।

—আরে বাবা আমি হট্ লাইনের কথা বলছি। হাজার লাইন এনগেজড্ হোক, তোমার হট্‌লাইন কানেকশন থাকলে তুমি ঠিক লাইন পেয়ে যাবে। এও তেমনি। জাঁদরেল বাবুদের কোটা থাকে। সব লাইনেই থাকে। মনে কর তোমায় কালই মুম্বাই যেতে হবে। লোকে দুমাস আগে রাত জেগে লাইন দিয়ে টিকিট কাটে। কিন্তু তুমি তো দুদিন আগেও লাইন মারোনি। তবু যাবার আগে তোমার হাতে টিকিট এসে যাবে। কী করে আসে?

—তুই এত বকিস কেন রে?

—জ্বালায়। পেটের এবং ফুটো ট্যাঁকের জ্বালায়।

—তুই কিন্তু আমায় অপমান করছিস।

—না গুরু, আমার পেটে এক মুখে এক বাক্যি পাবে না। আমার দরকার মতো টাকা তুমি আমায় দাও। না চাইলেও দাও। আমি হয়তো চাইতে পারছি না , সংকোচে। তোমার প্রখর ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে দিল, দীপু ছোকরার এখন টাকার দরকার। ব্যস, টাকা চলে এলো পকেটে, হাবিজাবি ছুঁতোয়।

—তবে?

—এই তো? আসল 'তবে' তে এসেই থেমে গেলে। মোক্ষম 'তবে'। তুমি আমায় ছোট ভাইয়ের মতো দাও। হাত পেতে আমি নিই। তুমি হয়তো বলবে ভিক্ষে নয়, দান নয়, কাজের পারিশ্রমিক। কোন কাজের কত পারিশ্রমিক হয় সেটা আমি বুঝি। তোমার চামচা হয়ে এত টাকা পাবার যোগ্যতা আমার নেই। প্র্যাকটিক্যালি বল, যা করার তুমিই কর, আমার অবদান কী? বল?

—বলে যা। তোর কথার দিকে বেশি মন রাখলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।

—নাহ্, আর কিছু বলার নেই। চাকরিটা হলে নিজের দিক থেকে একটা সিকিওর্ড পজিশন হয়। আশা করি, এর থেকে আর বেশি বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না। তাছাড়া অঙ্গনার কাছেও তো মুখ তুলে দাঁড়াতে পারব।

নীল ওর পিঠে আলতো করে একটা চাপড় দিয়ে বলল, —অনেকদিন থেকে আমি একটা কথা ভাবছি। আমার সাইকেল হাউসটা আমি ভালো করে দেখতে পারি না। অন্যের ভরসায় চলে। ম্যানেজারের দায়িত্বে যিনি আছেন তিনি আর পারছেন না। পঁয়ষট্টি বছর বয়েস হয়ে গেছে। বাবার আমলের লোক। ভাবছি ওকে ছুটি দোব। পারবি কাজটা করতে?

—মাইরি বলছ গুরু?

—পারবি কিনা বল?

—কিন্তু তোমার এদিকে?

—ইচ্ছে থাকলে দুদিকেই করা যায়। যেদিন তোর দাদা শুভঙ্করের কাছ থেকে তোকে

নিয়ে এলাম সেদিন থেকেই তোর জন্যে কিছু একটা না করা পর্যন্ত আমি নিজের কাছে সহজ হতে পারছি না। তুই রাজি থাকলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এখন ওসব ব্যাপার ভুলে যা। সামনের লরিটা কিন্তু এখনও আমায় রাস্তা দিচ্ছে না। এমন ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে যেন, হাইওয়েটা ওর পৈত্রিক সম্পত্তি। ওকে আমি ওভারটেক করছি। তুই কেবল নাম্বার প্লেটটা দেখে নে।

—আরে তাই তো...! এটা তো নজরে পড়েনি। ডাবলু বি ০৩, ২২২২, দু নম্বর গাড়ি নাকি?

অ্যাকসিলেটরে জোরে চাপ দিয়ে নীল স্পীড তুলে সামান্য একটু রিস্‌ক্‌ নিয়েই ২২২২কে ওভারটেক করে বলল,—এসব বিশেষ নাম্বারগুলো বিশেষ করে টেলিফোন সার্ভিসে চট্‌ করে সাধারণ লোককে দিতে চায় না। এরিয়াওয়াইজ একটা কমন নাম্বার থাকে, প্রথম চারটে সংখ্যা। যেমন ধর কারো একস্‌চেঞ্জ নাম্বার হল ২২১৫। পরের চারটে সংখ্যা যদি থাকে ৫০০০। মনে রাখার পক্ষে খুব সুবিধা। তাই না? মনে রাখিস এটা হল লালবাজারের নাম্বার।

—তা এ দিয়ে কী প্রমাণ হল? ২২২২ নাম্বারের কোন লরি কী তাহলে কোন মাফিয়া ডনের?

—মনে হয় না। আন্ডারওয়ার্ল্ডের কিং বা বাদশারা চট্‌ করে নাম্বার মনে থাকবে এমন নাম্বার অ্যাভয়েড করতেই চাইবে। অতি সাধারণ নাম্বারই তারা প্রেফার করবে।

—বুঝলাম। তাহলে বলছ যে লরিটাকে তুমি ওভারটেক করলে ওটা কোন ভুষিওয়ালার লরি?

—ভুষিওয়ালা? ভুষি কেলেঙ্কারীর পরও তুই বলবি ভুষিওয়ালারা খুব অবজ্ঞার পাত্র?

—না, তা বলিনি। তবে ভাড়ার গাড়িও হতে পারে। দেখছ না এক লরি বোঝাই কাগজের রীল নিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোন খবরের কাগজের গাড়ি। এনিওয়ে তোমার শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ি আর কদ্দূর?

—শিবনাথ শাস্ত্রী একজন বিখ্যাত লোক। ইনি শিবনাথ নন। শিবাজী শাস্ত্রী। আজ তাঁর পঁয়ত্রিশতম বিবাহবার্ষিকী।

—বল কী গুরু? একটা লোক পঁয়ত্রিশ বছর একটা মেয়েকে সহ্য করে যাচ্ছে?

—একটা মেয়ে নয়। একজন ভদ্রমহিলা। শিবাজী শাস্ত্রীর বিবাহিতা স্ত্রী মহারাণী দেবী কোনমতেই এলিতেলি মহিলা নন।

—মাইট বি। কিন্তু আমি ভাবছি, পঁয়ত্রিশ বছর? বাপরে!

—বাপরে বলার কী হল? সুখী বিবাহিত জীবন যত দীর্ঘ হয় তত প্রেম গভীর হয়। বয়স্ক প্রেম তোদের ছেলে ছোকরাদের প্রেমের থেকে অনেক মজবুত।

—আমি এখনও ও ব্যাপারে নভিস। অঙ্গনার সঙ্গে আমার প্রেমের বয়স তিনমাস ন দিন।

—তুই কী রোজ সকালে উঠে দেওয়ালে খড়ি দিয়ে দাড়ি কাটিস? অবশ্য প্রেমের বয়েস যখন মাস তিনেক তার মধ্যে দেড়মাসের বিরহ, দেখিস শেষে আবার এক দুজে কে লিয়ে না হয়ে যায়। ছবিটা দেখেছিস?

—হ্যাঁ। তবে দেওয়ালের গায়ে দাগ কাটার মতো নাবালক প্রেম নয়। আমার বাবা কাঠখোট্টা মার্কা চাঁছাছোলা প্রেম। গেলাম বড় পিসির বাড়ি বেড়াতে। তিনদিন পর অঙ্গনা এল পিসির বাড়ি। শনি রবি ওদের স্কুলে ছুটি। মিশনারি স্কুল তো! শনিবার পিসি আলাপ করিয়ে দিল সইয়ের মেয়ের সঙ্গে। রবিবার দুজনেই আনমনা। এবং বিষণ্ণ। কারণ সোমবার থেকে ওর স্কুল খুলে যাবে। তবে তুমি তো গুরু আমাকে জানো। অলওয়েজ ডেসপ্যারেট। রোববারেই কায়দা করে ওর স্কুলের আর বাড়ির ঠিকানা জেনে নিলাম। ব্যস্ পরের সোম থেকে শুক্র, ডিমে তা দেওয়া। অ্যাণ্ড নেকস্ট শনিবার ইলু ইলু। ও পক্ষেরও তখন ঘিলু পাতলা হয়ে গেছে। তবে মেয়ে ছেলে তো। ভাঙবে, তবু দেখাবে আমি মচকাইনি। রোববারই স্যাটগিল।

—প্রথমত, এই একই গপ্পো তুই আমায় অনেকবার শুনিয়ে আমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছিস। আজ রাস্তা ভুল করিয়ে দিলি। আমি ভুল রাস্তায় বেঁকে গেছি। দ্বিতীয়ত স্যাটগিল মানে কী?

—ওটা ওই গ্যাটগিল থেকে এসেছে। দু পক্ষেরই সৈনিকরা পড়ছে আর মরছে। এখানেও তাই। দুজনেই প্রেমে পড়া এবং প্রেমে মরা। গ্যাটগিলে মরলে শহীদ। আর স্যাটগিলে মরলে জীবিত শহীদ।

ঘ্যাঁচ করে গাড়ি ব্রেক কষল। তবে যেহেতু মারুতি, আওয়াজটা ছ্যাকরার মতো নয়। ঘ্যাঁচ শব্দটাও বেশ সফিসটিকেটেড।

—কী হল গুরু? এমন মোলায়েম এবং নিঃশব্দ থামা কেন?

—একটি কারণ, তোর মাথা ধরিয়ে দেওয়া বকবকানি। আর দ্বিতীয় কারণ, সামনেই তাকিয়ে দেখ। কী দেখতে পাচ্ছিস?

দীপু সামনে তাকাল, —ওহ্ ব্বাবা, এ তো প্যালেসিয়াল বিল্ডিং। শ্বেতপাথরে মোড়া। শ্বেতপাথর কী এখন খুব সস্তা হয়ে গেছে গুরু?

—বলতে পারব না। যদিও আমার বাড়ির রঙ সাদা তবে শ্বেতপাথরের নয়।

—যাকগে ছেড়ে দাও ওসব। রহিস আদমি বোঝাই যাচ্ছে। আচ্ছা গুরু, বলেই শ্বেতপাথরের গায়ে খোদিত নাম শিবাজী শাস্ত্রী দেখেই ও বলল, যাক বাবা, তাহলে এসে গেছি। আচ্ছা নীলদা, এই শাস্ত্রী কী বাঙালি 'বামুন'?

—ব্রাহ্মণ তো বটেই। তবে অরিজিনটা বাংলা কিনা সেটা শিবাজীদার কাছ থেকে জানা হয়নি। আদবকায়দা কথাবার্তায় কোন ননবেঙ্গলি টাচ্ নেই।

—ব্রাহ্মণ? কোন শ্রেণী?

—বোঝ! শ্রেণীতে কি দরকার? ওনার আজ পঁয়ত্রিশতম বিবাহবার্ষিকী। নিশ্চয়ই এখন উনি কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্তান তা জানার দরকার নেই। কারণ উনি আর বিয়ে করছেন না এটা গ্যারান্টেড সত্য।

—চৈত্রমাসে বিবাহবার্ষিকী? চৈত্রমাসে বিয়ে হয়?

—তা কারো যদি ফাল্গুনের শেষদিনে বিয়ে হয় তার ফুলশয্যা কী বৈশাখ মাসে হবে? আর বিবাহবার্ষিকী ইচ্ছেমতো দিন দেখেও করা যায়। তা তুই কবে থেকে পাঁজি ঘাঁটা গুরুঠাকুর হয়ে গেলি?

—ভদ্রলোকের এখন বয়স কত হতে পারে? অ্যাপ্রক্স্ পঁয়ত্রিশ প্লাস তিরিশ। মানে পঁয়ষট্টির মধ্যে। এবং ব্রাহ্মণ। আগে দু'একটা বিয়ে করেননি এটা কী গ্যারান্টেড সত্য?

—বাজে বকিস না তো। নে, এখন গাড়ি থেকে নাম।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে দীপুর হুঁশিয়ারি বার্তা,—তবে গুরু, গল্পে মেতে যেও না। তোমার অল্পে চলে যায়। আমি কিন্তু একটু ভোজনরসিক। খেতে পারি রসিয়ে রসিয়ে। পদ মিলিয়ে। নট গোগ্রাসে, অতএব—

কিছু না বলে গাড়ি লক করে নীল গিয়ে দাঁড়াল কালো রঙের মেহগিনি কাঠের ওর পেতলের ফুল তোলা দরজার সামনে। দরজা আজ খোলাই আছে। সামনেই উর্দিপরা দরওয়ান বাদল সিং।

নীলকে কিছু বলতে হল না। বাদল সিং ওকে চেনে। এর আগে অনেকবারই নীল এ বাড়িতে এসেছে। শিবাজী শাস্ত্রী ওর থেকে বেশ কিছুটা বড়। কিন্তু বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ওটা কোন সমস্যা নয়। শিবাজী শাস্ত্রীর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল একটা অ্যান্টিকের দোকানে। একটা বহু পুরনো কালো পাথরের স্ল্যাপ। দুফুট বাই দু ফুট। ভদ্রলোক খুব তন্ময় হয়ে পাথরটার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। ওইভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নীলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেও গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে পাথরটার মধ্যে তেমন কোন দর্শনীয় কিছু ছিল না। আলাপটা শুরু করেছিলেন শিবাজী শাস্ত্রীই—

—পাথরটার বিশেষত্বটা লক্ষ করেছেন?

—তেমন বিশেষ কিছু আছে নাকি এর মধ্যে?

—আছে? ভালো করে দেখুন। খুব রেয়ার জিনিস।

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেছিল,—আই সি, এর মধ্যে তো অর্ধনারীশ্বর শিবের মূর্তি খোদাই করা আছে।

শিবাজী বাবু উত্তরে বলেছিলেন, —হ্যাঁ, আপনি তাহলে ধরতে পেরেছেন। তবে খোদাই করা নয়। কোন মানুষের হাতের তৈরিও নয়। কালো পাথরের বুকে নানান পাথরের কম্বিনেশনে প্রকৃতিই যেন অর্ধনারীশ্বর শিবকে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। আরও ভালো করে লক্ষ করে দেখুন পাথরটার একটা দিক এবড়োখেবড়ো ভাঙা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। এর

অর্থ, এই পাথরের বাকি অংশ পাওয়া যায়নি। হয়তো সেখানেও একইভাবে অন্য কিছু ছিল। পাথরটা পাওয়া গিয়েছিল আজ থেকে দুশো বছর আগে। নেপালের তরাই অঞ্চলে। তারপর কেমনভাবে সেটা ভারতে এল কেউ জানে না। অনেক হাত ঘোরার পর আসে খোন্দকার আলির এই কিউরিও শপে। তাও বেশিদিন নয়। মাসখানেক আগে।

সেদিন শিবাজীবাবুর কথায় নীল বেশ উৎসাহিত হয়। একসময়ে সে জিজ্ঞাসা করে, —আপনি এই পাথরটার সম্বন্ধে এতো কিছু জানলেন কীভাবে? যদি অবশ্য বলতে আপত্তি না থাকে।

শিবাজীবাবু হাল্কা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন,—আলি সাহেব আমার বিশেষ বন্ধু। নতুন কিছু এলেই উনি আমাকে খবর দেন। আমার একটু কিউরিওর ব্যাপারে বিশেষ শখ আছে। আমার কাছে কতো রকমের গণেশমূর্তি আছে জানেন? প্রায় আড়াইশো রকমের। সবই আলি সাহেবের কালেকশন থেকে পাওয়া। এই রেয়ার মূর্তি ওঁর হাতে আসার পরই আমাকে ফোনে জানান। এও জানান মাস খানেকের মধ্যেই ওর দোকানে দুবার চুরির অ্যাটেম্প্ট্ নেওয়া হয়। ওই মূর্তির জন্যে।

—সেটা যে এই বিশেষ পাথরটার জন্যে তা জানলেন কী ভাবে আলিসাহেব?

—ওঁর তাই ধারণা। আর সেই জন্যেই উনি চাইছেন চুরি হবার আগেই ওটা কোন সমঝদার কারো ব্যক্তিগত কালেকশনে চলে যাক।

—আপনি কিনছেন?

—ইচ্ছে তো ছিল। আপনার কী ইন্টারেস্ট আছে?

—কতো দাম চাইছে?

—বেশি নয়। হাজার পঁচিশ।

নীল সামান্য হেসে উত্তর দিয়েছিল—নাহ্ মশাই। পঁচিশ হাজার টাকা আমার কাছে নিতান্ত সামান্য টাকা নয়। আপনিই কিনুন। তবে আমার সামান্য উৎসাহ রয়ে গেল। পাথরটার আরও কোন ইতিহাস আছে কিনা সেটা জানার।

কোন রকম দোনামোনা না করেই শিবাজীবাবু বলেছিলেন,— বেশ তো, আমার বাড়িতে আপনার নেমন্তন্ন রইল। এই নিন আমার কার্ড। একটু ফোন করে চলে আসবেন। কিন্তু আপনার পরিচয়টা?

নীল নিজের কার্ডটা ধরিয়ে দিতেই ভদ্রলোক সেদিনই হাঁইহাঁই করে উঠেছিলেন,

—আরে, আপনিই সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি? আমার গিন্নি তো আপনাকে নিয়ে লেখা অনেক রহস্যকাহিনী পড়ে আপনার ফ্যান হয়ে গেছেন। চলে আসুন মশাই। ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।

সেই শুরু শিল্পরসিক শিবাজীর বাড়িতে যাতায়াত। তাঁর ব্যক্তিগত কিউরিও কালেকশন দেখে নীল চমকে গিয়েছিল। কত কীই না সে ঘরে আছে। আসরফি মোহর থেকে শুরু

করে পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত ভাঙা তলোয়ার, নবাব আলিবর্দির অব্যবহৃত মণিমুক্তোখচিত আলবোলা, বহু পুরনো হস্তলিখিত কোরান, বল্লভসেনের দুষ্প্রাপ্য মোতির মালা, ছত্রপতির তাম্রফলক, এমনকি রানী ভিক্টোরিয়ার আমলের রূপোর কয়েন। কী নেই সেখানে? এছাড়া আছে বিখ্যাত গণেশমূর্তির সার। কত রকমের যে গণেশ, কতো ভাবে কতো শিল্পীর মনের বিকাশ ঘটেছে সেই সব গণেশ মূর্তির মধ্যে ভাবতে অবাক লাগে।

তবে শিবাজীবাবু কিন্তু অর্ধনারীশ্বরকে সেই সংগ্রহশালায় রাখেননি। ওটি ওনার স্ত্রী মহারানী দেবীর ঠাকুরঘরে শোভা পাচ্ছে।

অর্ধনারীশ্বরকে ঠাকুরঘরে রাখার একটা বিশেষ কারণ আছে। মহারানী দেবীর ধারণা এই পাথরটি শাস্ত্রীভিলায় আসার পর দিনই শিবাজীবাবু বিশাল টাকার সাপ্লাইয়ের অর্ডার পান। তারপর থেকে ব্যবসা দিনদিন ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

বাদলসিং আহ্বান জানানোর পরে নীল স্থানুবৎ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ওর মন হারিয়ে গিয়েছিল পুরনো সেইসব দিনে। নীল তারপর বহুবার এসেছে। মহারানীর সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তারপর মাত্র চারদিন আগে সে একই সঙ্গে দুটো চিঠি পায় শিবাজী শাস্ত্রীর কাছ থেকে।

শিবাজী লিখেছিলেন—ব্যানার্জিবাবু, তুমি তো এখন আমার ঘরের লোক। তার ওপর রহস্যের পোকা। তাই তোমাকে বিশেষভাবে আসতে বলছি আসছে রবিবার। একটা লোকদেখানো উপলক্ষ্য আছে। সেটি হচ্ছে আমার আর মহারানীর পঁয়ত্রিশতম বিবাহবার্ষিকী। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য অন্য। আমার কাছে অপরিচিত হাতের লেখায় একটা হুমকি পত্র এসেছে। কে লিখেছে তা জানিনা। লিখেছে, ওই অর্ধনারীশ্বর পাথরটি তার চাই। ওটি নাকি তার বংশগত সম্পত্তি। সেটি তার বাড়ি থেকে চুরি যায়। খোঁজ নিয়ে সে জানতে পেরেছে সেটি এখন আমার কাছে আছে। যে কোন মূল্যেই সে সেটি ফেরৎ পেতে উদ্‌গ্রীব। ফেরত পাওয়া যাবে কিনা সেটি জানাতে হবে এক সপ্তাহের মধ্যে। আমারই বাড়ির পোস্টবক্সে আমার হ্যাঁ বা না উত্তর সেখানেই ফেলে দিতে হবে। হ্যাঁ হলে পত্রপ্রেরক দাম সমেত এসে প্রস্তরখণ্ডটি নিয়ে যাবে। আর যদি না হয় তাহলে তার পরিণাম হবে ভয়ংকর। সেটা শিবাজী শাস্ত্রীর মৃত্যুও হতে পারে। লোকটি কোন নাম দেয়নি। নামের জায়গায় আছে একটি খরগোসের ছবি।

চিঠিটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নীল শিবাজী শাস্ত্রীকে ফোন করেছিল। নীলের গলা পেয়ে শিবাজী জিগ্যেস করেছিলেন,—আমার চিঠি পড়ে তোমার কী মনে হল? তুমি তো পাকা গোয়েন্দা। তোমার কী মত? আমি কিন্তু উড়ো চিঠির ভয়ে অর্ধনারীশ্বর ফেরৎ দিতে পারব না। কোটি টাকার বিনিময়েও না।

ফোনেই নীল জানিয়েছিল, —শিবাজীদা, তোমায় কিছু করতে হবে না। কালো পাথর

যেমন আছে তেমনই থাকবে। বউঠানকেও চিন্তা করতে বারণ কর। বিবাহবার্ষিকীর দিনে তো দেখা হচ্ছেই। তখন ভাবা যাবে। তবে একটু নজর রাখবে। বাড়ির কাউকেই কোন ভাবেই বিশ্বাস করবে না।

নীল শাস্ত্রীভিলায় ঢোকার আগে একবার পকেটে হাত দিল। হ্যাঁ, শিবাজী শাস্ত্রীর চিঠিটা সে সঙ্গে করেই এনেছে। আজই কোন এক ফাঁকে শিবাজী শাস্ত্রীকে নিয়ে বসতে হবে। শিবাজী শাস্ত্রী বাজে কথা বলার লোক নন। অযথা ভয়টয়ও পান না। কিন্তু অরিজিন্যাল চিঠিটা দেখার খুবই দরকার।

এই সব কিছু নীলের কয়েক মিনিটের ভাবনা। তবে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল অন্য একটা কারণে। কারণটা তখনই বোঝা গেল, —আচ্ছা বাদলসিং তোমাদের এ বাড়ির লেটার রিসিভিং বক্সটা কোথায়?

—জীসাব, উহো তো হ্যায় মেইন দরওয়াজাকা পাস।

—একবার দেখা যাবে?

—কিঁউ নেহি। আপ আইয়ে।

হ্যাঁ তাই। মেইন গেটের পাশে একটা সুদৃশ্য কাঠের লেটার বক্স। বাইরে থেকে তালার কোন সিস্টেম নেই। কোন পাল্লাও নেই। নিশ্চয়ই খোলার কোন কায়দাকানুন আছে। যেটা বাড়ির বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে আর কোন কৌতূহল না দেখিয়ে দীপুকে বলল, —চল্, দীপু এবার যাওয়া যাক।

—এতক্ষণ তুমি কোন জগতে ছিলে বলতো?

—ছিলাম একটা জগতে। তোকে পরে বলব।

—আর লেটার বক্স? কী আছে ওখানে?

—ওটাও ইন্টারেস্টিং। পরে বলব।

এর আগে দীপু কোনদিন শাস্ত্রীভিলায় আসেনি। চাকচিক্য আর প্রাসাদ টাইপের বাড়ি দেখে ও একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য দর্শকমনে পুলকসঞ্চারের যাবতীয় মালমশলা ছড়িয়ে আছে বাড়িটাকে ঘিরে।

আগাগোড়াই শ্বেতপাথরে মোড়া। বিশাল মহল নয়। আবার আড়াই কামরার ফোতো কাপ্তেনি ফ্ল্যাটও নয়। মোটামুটি একটি রহিস পরিবারে স্ত্রীপুত্র কন্যা পুত্রবধূ জামাই সমেত হাত পা ছড়িয়ে বাস করার মতো বাড়ি। বাড়ির চারদিকে নজরদারি করা বাগান। সামনের দিকে ঢুকেই ডানদিকে বাঁদিকে গাড়ি পার্ক করার জায়গা। ইতিমধ্যেই অনেক গাড়ি সেখানে জায়গা করে নিয়েছে। নীল নিজের গাড়ি ঢোকায়নি। বাইরেই পার্ক করে রেখেছে।

প্রধান ফটকের পর কিছুটা মোরামের পথ হেঁটে দ্বিতীয় দরজা। এটাও আগের মতোই। কালো মেহগিনি কাঠের ওপর পেতলের বুটি লাগান। দরজা পার হতেই বিশাল হলঘর।

বিশাল সোফার সার। অতিথি অভ্যাগতে ভরভরন্ত। নীল গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু দেখতে থাকল। আজ সব কিছুই অন্যরকমভাবে সাজানো হয়েছে।

—তুমি বলছ এটাই তাহলে তোমার বন্ধুদার প্যালেস?

—নাহ্ প্যালেস বলিনি। বলেছি বাড়ি।

—ঝুপড়ি, পর্ণকুটির, মাটির একচালা, দোচালা, বাড়ি, গৃহ, আলয়, অট্টালিকা, মহল, আর ইমারতের পার্থক্য আমি বুঝি। তুমি তো আরও ভাল বোঝ। সাদা প্যালেস, শ্বেতপাথরের প্যাকিং, শ্শালা। চল, একটু বসি। নরম গদির ওপর পাছা ঠেকানোর রাজকীয় আরাম থেকে কেন আর বঞ্চিত হই। চল।

একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে ওরা দুজনে বসে পড়ল। দীপু চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। বিশাল হলঘরটা সম্পূর্ণ সাদা। এমনকি সিলিংটাও সাদার ওপর সাদা অজন্তার কারুকার্যের নকল। একটা প্রায় হাজার বাতির ঝাড় ঝুলছে। সেটাও স্ফটিকস্বচ্ছ।

দীপু কানের কাছে মুখ এনে জিগ্যেস করল, —ঝাড়টা কিসের বলতো? যা আলো মারছে।

—স্ফটিকের। ওটা শিবাজীদা বেলজিয়াম থেকে আনিয়েছিলেন। চল ওদিকটায় চল। ওখানে একটা কাচঘর আছে। বোধহয় ওখানেই ভীড়টা বেশি হয়েছে। হইচই ভেসে আসছে।

পর্দা ঠেলে ওরা কাচ ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। আরও উজ্জ্বল আলো। এবং তারও চেয়ে উজ্জ্বল রঙের নরনারীর সমাবেশ।

দীপু তখনও ঝাড়টার কথা ভোলেনি। জিগ্যেস করল, —তুমি বললে ঝাড়টা বেলজিয়াম থেকে আনা হয়েছে?

—না আনার কী আছে। ট্যাকে কড়ি থাকলে এ বাড়ির হুলোর সঙ্গে পাশের বাড়ির মিনির ধূমধাম করে বিয়ে দেওয়া যায়। সানাই বাজিয়ে, লোক খাইয়ে।

পরিচিত কোন মুখ দেখতে না পেয়ে ওরা এককোণে জায়গা করে দাঁড়িয়েছিল। অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষের হাতে ড্রিংকসের গ্লাস। একটু পরে নীল রঙ শার্ট, ট্রাউজার এবং নীলটাই পরা ক্যাটারারের ছেলেরা সরবতের গ্লাস ধরিয়ে দিল।

গ্লাস হাতে নিতে নিতে নীল ভাবছিল শিবাজীদা এখন কোথায়? এদিক ওদিক চোখ ঘোরাতে ঘোরাতেই মহারাণী দেবীর সঙ্গে চোখাচোখি। মুখখানা নিমেষে ঝলমল করে উঠল। সুন্দর মুখে ঝলসে উঠল সারসার ধবধবে দাঁতের নিয়ন বাতি। মহারানীর সদ্য পঞ্চশোত্তীর্ণ বয়সেও গায়ের রঙটা জমাট মাখনের মতো। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা কালো কোঁকড়া চুলের মাঝে মাঝে রূপোর হাল্কা ঝিলিক। চোখে সোনার ফ্রেম মুখে এনেছে একটা অন্য রকমের আভিজাত্য। শরীরে খুব কম করেও হাজার পঞ্চাশ ষাটের গহনার সাজানো র‍্যাক। সেখান থেকে হীরা মণি মানিক্যের দ্যুতি ছড়াচ্ছে। অবশ্য অতিথি অভ্যাগতরাও ভল্ট উজাড়

করে পরিবেশে সমতা রাখার চেষ্টা করেছেন। হাল্কা মিষ্টি রুমফ্রেশনার সারা ঘরে ম ম করছে।

নীলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মহারানী ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন।

—দাদা, এতো দেরি করলেন কেন? এদিকে দেখুন তো কী ঝামেলা।

—কেন? কীসের ঝামেলা?

—আর বলেন কেন, কাল সন্ধে বেলা আপনার দাদা হঠাৎ বুকে ব্যথা নিয়ে শুয়ে পড়েছেন। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ ওপর থেকে নীচে নামা চলবে না। এখন চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে। নইলে সেকেণ্ড অ্যাটাকের সম্ভাবনা আছে।

নীল বলল, —বউঠান, বয়েসটাকে তো আমরা কেউ পেছোতে পারিনা। আর বয়েস তার ধর্ম পালন করবেই। তা শিবাজীদা এখন কেমন আছেন?

—প্রথম ধাক্কাটা সামলেছেন। তবে একটা কথা আপনি ঠিকই বলেছেন। ইনএভিটেবল ইজ অলওয়েজ অ্যান ইনএভিটেবল। কে আর তাকে এড়াতে পারে? সে যাক। দাদার সঙ্গে আপনার দেখা হবেই। জানেনই তো উনি কী রকম মানুষজন ভালোবাসেন। আমাদের নীচের এই হলঘরের প্যারালাল দোতলায় আর একটা ঘর আছে। ওখানেই আজ ডিনারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। উনি চান ওনার সামনেই সবাই খাওয়া দাওয়া করুন। উনি ঘরের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা ডিভানে আধশোয়া অবস্থায় আছেন আপনাদের আপ্যায়ন করার জন্যে। ডাক্তার বলেছেন, কোন উত্তেজক কথাবার্তা না বলে নীরবে সব কিছু দেখতে পারেন। তাতে কোন বাধা নেই। এমন কি অনুত্তেজক হাসিঠাট্টাতেও যোগ দিতে পারেন। ওঠা কিন্তু একেবারেই বারণ।

কথা বলতে বলতেই, 'হাই মিসেস ভাটিয়া' বলেই মহারানী দেবী, 'এক্সকিউজ মি ব্যানার্জিদা' বলেই কেটে যাওয়া ঘুড়ির মতো গোঁৎ খেয়ে অন্য প্রান্তে চলে গেলেন।

নীল আর দীপু দুটো খালি আসন পেয়ে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একজন উর্দিপরা বেয়াড়া হার্ড ড্রিঙ্কসের ট্রে এনে সামনে ধরল। এসব ব্যাপারে দীপু খুবই তৎপর। প্রায় ছোঁ মারা ভঙ্গীতে একটা গ্লাস তুলে নিল। নীল একটা গ্লাস হাতে নিতে নিতে চাপা গলায় বলল, —তুই এত হাঘরেপনা করিস কেন বলত?

—যাহ্ ব্বাবা, তুমি আবার হাঘরেপনা দেখলে কোথায়? তৃষিত চাতককে কী তুমি হাঘরে বলবে না কাঙাল বলবে? কিছুই বলবে না। বরং বলবে প্রকৃতির কী অনবদ্য মহিমা।

—আবার?

—কী?

—বকবকানি শুরু করলি?

—ঠিক আছে। আর বকবো না। কিন্তু তুমিও আর আমার দিকে তাকাবে না। বিশেষ করে অমৃতপাত্রের দিকে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নীল চুপ করে গেল। কারণ ও জানে দীপুকে এখন ঘাঁটানো মানে ছোটখাটো মহাভারত তৈরি হয়ে যাওয়া। হঠাৎ ওর নিজের পাঞ্জাবির পকেটে রাখা ভারি বস্তুটির কথা মনে পড়ল। মহারাণীর জন্যে ছোট্ট একটা উপহার। স্ফটিকের গণেশ। শিবাজীদা এবং মহারানীর প্রিয় শখের একটি।

—দেখলি, তোর জন্যে কী রকম ভুল হয়ে গেল।

—যত দোষ নন্দ ঘোষ। আমি আবার কী করলাম? আর তো আমি একটাও কথা বলিনি।

—মিসেস শাস্ত্রী এলেন আর গণেশজিকে দেওয়া হল না।

—পালিয়ে তো যাচ্ছ না। আবার দেখা হবে, দিয়ে দিও।

দীপু কোন কথা না বাড়িয়ে বেয়ারাকে ডেকে আর একটা গ্লাস নিয়ে নিল। আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে নীল বলল, —আজ যদি ফ্ল্যাট হয়ে যাস, ফেরার পথে ভি আই পি রোডের ধারে এখনও অনেক ছোটখাটো জঙ্গল আছে। সেখানেই ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে ফেলে দিয়ে আসব।

—না গুরু, অতটা হৃদয়হীন হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তোমার নাড়ি দেখে বোঝা যায়।

—নাড়ি না ধাত?

—ওই হল একটা। মাল খাবার সময় ভুলটুল ধরতে নেই। এটা হল অ্যালকোহলিক অ্যাডভানটেজ।

কথা না বাড়িয়ে নীল নিজের গ্লাস থেকে সিপ্ করতে করতে একবার হলঘরটায় দৃষ্টি বুলিয়ে আনল। নীচের হলঘরটায় কেবলমাত্র হার্ড অ্যাণ্ড সফ্‌ট্ ড্রিঙ্কসের। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে যে যার অভ্যাস মতো ড্রিংক্‌স্ তুলে নিচ্ছে। কম করেও পঞ্চাশ জোড়া নরনারী নানান কথায় মশগুল। তার মধ্যে ক্রিকেট আছে, রাজনীতি আছে, গাইসেল ট্রেন দুর্ঘটনা আছে, গোধরা আছে। অল্পের জন্যে রাজধানী বেঁচে যাবার গল্প আছে। মুক্তিযোদ্ধা আছে, সন্ত্রাসবাদ আছে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস আছে, শেয়ার মার্কেট আছে। দলমার হাতি আছে। কী নেই? ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন মত। মদের ফোয়ারা এবং নরক গুলজার।

একসময় হাত ঘড়ির দিকে তাকাল নীল। পৌনে নটা। দীপুও ওর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, —দিস ইজ দ্য হাইটাইম টু টেক ফুড। এরপর মাল খেলে আর ফুড খাওয়া যাবে না। গাড়িতেই বমি করে ফেলব।

—আমার গাড়িতে বমি করে দেখ, তোর কী হাল করি।

—করতে হবে না। সেই জন্যেই তো বলছি, চল নাদা ভরে নিই, আর তুমি মিসেস শাস্ত্রীকে তোমার প্রেজেন্ট পৌঁছে দাও গিয়ে। আমি ততক্ষণে মুরগির ঠ্যাঙের বংশ লোপাট করি। ধ্যান করতে হবে না। উঠে পড়।

—কিন্তু—

—আবার কিসের কিন্তু? তুমি বড় বাগড়া দাও।

—আসল কাজটাই তো হলনা। শিবাজীদার সঙ্গে একবার নিরালায় বসার দরকার ছিল।

—আজ আর নিরালা পাবে না। চল খ্যাটনটা সেরে ফেলি। অনেকেই ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে।

খিদেটা নীলেরও পেয়েছিল। তার ওপর গাড়ি ড্রাইভ করে অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। নাগের বাজার থেকে নিউ আলিপুর।

—হ্যাঁ তাই চল, বলে নিজের খালি গ্লাসটা নামিয়ে রেখে সবে ও দোতলার সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে হঠাৎই বিকট আর্তনাদে সারা শাস্ত্রীভিলা যেন কেঁপে উঠল। এক আওয়াজেই যাঁরা সিঁড়ির মাঝধাপে পৌছেছিলেন তারাও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে থম্‌কে গেলেন।

মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে 'আয় দীপু' বলেই ত্বড়িত লাফে নীল দোতলায় উঠে গেল। ঠিক নীচের মতোই বিশাল হলঘর। বিশাল লম্বা একটা টেবিল। থরে থরে সাজানো খাদ্যরাশি। বুফে সিসটেম। ক্যাটারারের লোকেরা পরিবেশনের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু ওই চিৎকারে সব কিছু যেন নিমেষে নিশ্চল হয়ে গেছে। অধিকাংশ লোকই জড়ো হয়েছে বিশাল হলঘরটার একেবারে শেষ প্রান্তে যেখানে একটি সূক্ষ্ম নেটের পর্দার ওপাশে এতক্ষণ শিবাজী শাস্ত্রী আধশোয়া অবস্থায় বসেছিলেন। একটা হাল্কা নীলচে আলো ওইটুকু জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পর্দার ওপাশে কাউকে দেখা গেল না। ভীড়টা পর্দার এপাশে।

নীল দ্রুত পদক্ষেপে সেখানে গিয়ে ভিড় সরিয়ে নেটের ওপাশে যেতে যাবে হঠাৎ একজন মিলিটারি পোশাক পরা সুন্দর স্বাস্থ্যের ভদ্রলোক এসে সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললেন,—সরি মিস্টার, আমরা কিন্তু একমাত্র ওঁর স্ত্রী ছাড়া আর কাউকেই ভেতরে যেতে দিইনি।

নীল মুখ তুলে দেখল মহারানী দেবী শিবাজীবাবুর পিঠের ওপর আছড়ে পড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে 'না না' করে চলেছেন।

মিলিটারি পোশাক পরা লোকটিকে কিন্তু নীল এ বাড়িতে আগে কোনদিনও দেখেনি। পকেট থেকে নিজের আইডেন্টিটি কার্ড তুলে ধরল লোকটির সামনে। সেটা পড়ে ভদ্রলোক ভুরু নাচালেন। অদ্ভুত ধরনের নাসিকাধ্বনি করলেন। তারপর ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে বললেন, —প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। গুড, ব্যাড অ্যাণ্ড আগলি। কিন্তু আপনি কী করবেন? নাউ ইন দিস মোমেন্ট আ ডক্টর ইজ এসেনসিয়াল।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে নীল বলল—কী হয়েছে?

—মিস্টার শিবাজী শাস্ত্রী, খুব সম্ভবত মারা গেছেন।

—হোয়াট?

—ইয়েস। একজ্যাক্টলি সো। আই থিঙ্ক আই অ্যাম রাইট।

—অথচ আপনি কোন ডাক্তার নন। হাউ কুড ইউ গেইস ইট?

—সামনে গেলেই বুঝতে পারবেন। ঘাড়ে একটা চপারের দাগ। রক্তে গোটা ডিভানটা ভিজে গেছে।

এবার কিন্তু নীলকে আটকানো গেল না, —সরি মিস্টার, আমাকে ভেতরে যেতেই হবে। পুলিসকে যা কৈফিয়ত দেবার সেটা আমিই দোব।

নীল আর দীপু পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে ও মৃত শিবাজী শাস্ত্রীকে দেখতে থাকল। টকটকে উজ্জ্বল গৌরবর্ণের শিবাজী শাস্ত্রী তাঁর মাথা সমেত সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।

নীল দীপুকে বলল, —ঘরের সব আলো জ্বেলে দে। তারপর পর্দা সরিয়ে উপস্থিত আমন্ত্রিতের দিকে তাকিয়ে বলল,—একটা অত্যন্ত মর্মান্তিক দুঃসংবাদ আপনাদের দিতে হচ্ছে। আমাদের মাননীয় হোস্ট শিবাজী শাস্ত্রী আর নেই। এটা বোধহয় একটা খুন। আমরা এখনই পুলিসে খবর দিচ্ছি। অন্তত পুলিস না আসা পর্যন্ত আপনারা কেউই এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। অযথা শোরগোল না করে আপনারা শান্ত হয়ে যে যার জায়গায় গিয়ে বসুন।

দু একজন আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু সেটা ধোপে টিকল না। ওরই মধ্যে একজন প্রশ্ন তুলেছিলেন, —কিন্তু আপনি কে? আপনি তো পুলিস নন।

নীল কিছু বলার আগেই দীপু বলল, —আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। পুলিস এলেই বুঝতে পারবেন উনি কে?

ব্যস, ওই একটা কথাতেই কাজ। বেজার মুখে যে যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়লেন। সামনে অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার দেখেও চোখের মাথা খেয়ে কেউ আর ওদিকে ঘেঁষলেন না। দীপুর মতো ছেলেরও খাবার উৎসাহ এবং খিদে দুটোই চলে গেছে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজের পছন্দমতো খাবার তুলে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু হাঁড়িচাছা মুখে চেয়ারে বসতে বসতে মন্তব্য করলেন,—গিন্নি অনেক করে আসার বায়না ধরেছিল। আনিনি। এবার সারারাত জেগে বসে থাক। একা একা ভালোমন্দ খাওয়ার ষষ্ঠিপুজো হয়ে গেল। দেখি, বাড়িতে একটা ফোন করে দিই। বলেই মোবাইল টিপতে শুরু করে দিলেন। দেখাদেখি আরও অনেকেই তাই করলেন। নীল ওর মোবাইল খুলে সোজা লালবাজারে ফোন করে জানিয়ে দিল নাগেরবাজার অঞ্চলের শাস্ত্রীভিলায় একটা খুন হয়েছে। এখানকার থানার নাম্বার জানা নেই। যা ব্যবস্থা করার এখনি করা দরকার।

আকস্মিক বিপদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া গুলোকে পাশ কাটিয়ে নীল গিয়ে দাঁড়াল শিবাজী শাস্ত্রীর সামনে। নিথর দেহ। বোঝাই যায় উনি মৃত। অত্যন্ত কোমল স্বরে ও ডাকল, —বউঠান, একটু পরেই পুলিস আসবে। এভাবে পড়ে থাকলে তো—, বলেই নীল থেমে

গেল। দীপু পাশে ছিল। ওকে বলল,—মিসেস শাস্ত্রী সম্ভবত সেন্স হারিয়েছেন। তুই একটু জলের ব্যবস্থা কর।

দীপু এগোবার আগেই পূর্বের সেই মিলিটারি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন,—এই যে, জল আমি নিয়েই এসেছি। ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল ও বোধহয় আনকনসাস হয়ে গেছে।

—কী করে বুঝলেন?

—নৃশংসভাবে মৃত স্বামীকে চোখের সামনে পড়ে থাকতে দেখলে কোন স্ত্রীই বেশিক্ষণ সেন্স ধরে রাখতে পারেন না। কিন্তু আমরা মাত্র একবারই ওর আর্তনাদ শুনেছিলাম। এবং সেটা রানীরই। আমি ওর গলাটা চিনি।

—মানে, মহারাণীদেবীর কান্নার আওয়াজটা আপনার পরিচিত?

—হ্যাঁ। পরিচিত। কারণ এ পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা। আর রানীতো আমার ছোটবেলার বন্ধু।

—ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড। আপনার নামটা জানতে পারি?

—হ্যাঁ। জানতে নিশ্চয়ই পারেন। আমার নাম অম্বরীশ ঠাকুর। আমি মিলিটারি পার্সন।

—হুঁ, বলে নীল মহারানীদেবীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল জলের গ্লাসটা নিয়ে। এমন সময় প্রায় হন্তদন্ত অবস্থায় বছর তিরিশের এক যুবক এসে বলল, —এসব কী শুনছি নীলকাকু, বাবা—.

নীলকে কোন উত্তর দিতে হল না। শিবাজীবাবুর দিকে তাকিয়েই, 'ওহ্ মাই গড' —বলেই যুবকটি ওখানেই মাথায় হাত চেপে বসে পড়ল।

এরই মধ্যে বাড়ির এবং নিমন্ত্রিত কিছু মহিলা এগিয়ে এসেছিলেন। ওদের উদ্দেশে নীল বলল, —আপনারা বরং মিসেস শাস্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে ওঁর ঘরে শুইয়ে দিন। আর এখানে কেউ ডাক্তার আছেন কী?

বছর পঞ্চাশের কাছে বয়েস হবে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন,—হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার অসীম চৌধুরী। মিস্টার শাস্ত্রীকে তো আর দেখার কিছু নেই। উনি তো—

নীল বলল,—আমি ওনার কথা বলিনি। মিসেস শাস্ত্রীকে আপনি একটু পরীক্ষা করে দেখুন। আমার ধারণা উনি খুবই শক্‌ড্‌।

—ঠিক আছে। আমি দেখছি।

তারপর মেয়েদের উদ্দেশে ডাক্তার চৌধুরী বললেন,—আপনারা কয়েকজন ওঁকে বেডরুমে নিয়ে [illegible] ওখানেই আছি।

ইতিমধ্যে অন্দরমহলে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। অতিথি অভ্যাগতরা বেশ বিমূঢ়। একদিকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। অন্যদিকে গৃহকর্ত্রীকে নিয়ে বিপর্যয়।

পুলিসে তো আগেই ফোন করা হয়ে গিয়েছিল। মহারানীদেবীকে ধরাধরি করে বেশিরভাগ

মহিলাই চলে গেলেন। পুরুষেরা অনেকেই চাইছিলেন শিবাজীবাবুকে অন্তত একবার চোখের দেখা দেখতে। মানুষ মাত্রই হরর্ লাভার। বীভৎস দৃশ্য অনেকেই সহ্য করতে পারেন না। আবার সে দৃশ্য দেখতেও ছাড়েন না। এ যেন একটা ইনসটিংক্ট্। ভয়ের বস্তুকে অন্তত এক পলকের জন্যে দেখে নেওয়া।

এর সঙ্গে চলছিল গুঞ্জন। নানান অস্ফুট আলোচনা। কেন হল, কীভাবে হল? কে করল ইত্যাদির সঙ্গে আহা উহু তো ছিলই।

মহারানীদেবীকে নিয়ে যাবার পর জায়গাটা খালি হয়ে যেতেই নীল গভীর মনোযোগ দিয়ে শিবাজীবাবুকে পরীক্ষা করতে যাচ্ছিল। ওর সঙ্গে সর্বদাই একটা ছোট টর্চ থাকে। সংক্ষিপ্ত আলোতেও গোটা দেহটা দেখতে গিয়ে ও চমকে উঠল।

ডিভানটায় শোয়া এবং বসা দুটোরই সিস্টেম ছিল। মৃত্যুর আগে উনি সম্ভবত বসেই ছিলেন। এখনও সেই বসা অবস্থাতেই ঘাড় ঝুলে পড়েছে। দুটো হাত দুপাশে এলোনো। পা দুটো ডিভানের ওপর লম্বমান। পরনে চন্দন রঙের সিল্কের লুঙ্গি। ওই একই রঙ গরদ পাঞ্জাবি। দুটোই রক্তে ভিজে গেছে। সাদা ধবধবে ডিভানের চাদর রক্তাপ্লুত।

দেহটা দেখতে দেখতে কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করে নীলের কপালের ভাঁজটা আরও বেড়ে গেল। দীপু পাশেই ছিল। তারও মুখে বিস্ময়। ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, —গুরু, মার্ডারটা কিন্তু বেশ গড়বড়ে কেস বলে মনে হচ্ছে।

—হুঁ। এখন আর কোন ডিসকাশনের দরকার নেই। আগে পুলিসকে আসতে দে। তুই কেবল অ্যাবনরমাল ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করে যা।

ইতিমধ্যে আরাধ্য নামধারী যুবকটি আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। নিজেকে কিঞ্চিৎ সামলে নিয়ে ও বলল, —নীল কাকু, তুমি বাড়িতে উপস্থিত থাকতে, এ আমাদের কী সর্বনাশ হয়ে গেল? বাবাকে কে এমনভাবে খুন করল?

এই মুহূর্তে কোন যুক্তি দেখিয়েই ওর শোক নিবারণ কবা যাবে না। সম্ভবও নয়। ইতিমধ্যে আরাধ্যর ছোট ভাই আভাস শাস্ত্রী আর তার স্ত্রী কল্পিতা এসে প্রায় ঝুঁকে পড়েছে শিবাজীবাবুর ওপর। বাধ্য হয়েই নীলকে বলতে হল—আভাস, কিছু মনে কোর না। এখন কোন মতেই তোমার বাবাকে ছোঁয়া যাবে না। বুঝতেই পারছ ওঁর মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। এবং এই অস্বাভাবিকতা আরও বাড়বে যখন জানতে পারবে ওঁর মৃত্যুটা আসলে কীভাবে ঘটেছে।

গত সাত বছরে নীল এ বাড়ির সকলের কাছেই বেশ পরিচিত। বয়সে শিবাজীবাবু বড় হওয়া সত্ত্বেও গুণীমানুষ হিসেবে শিবাজীবাবু মাঝে মাঝে রসিকতা করে নীলকে 'এসো দাদা এসো' বলে সম্ভাষণ করতেন। সেই মানুষটাকে একই ছাদের নীচে থাকা সত্ত্বেও তাকে এই অবস্থায় আবিষ্কার করবে, নীল ভাবতেও পারেনি। একটা অজানা লোক মৃত্যুভয় দেখিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা যে এত নৃশংস হবে নীলের কল্পনার বাইরে। ওর খুব খারাপ

লাগছিল। ওই মানুষটার সুন্দর হাসি। আন্তরিক আহ্বান কোনটাই আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

নীলের শেষ কথাটা শুনে আভাস একটু চমকে উঠে জিগ্যেস করল, —নীলকাকু তোমার এ কথার মানে বুঝলাম না। মৃত্যুটা আসলে কীভাবে ঘটেছে কথাটা কেন বলতে চাইছ? মৃত্যুর কী আবার রকমফের আছে?

—আছে আভাস, আছে। এক্ষেত্রে তো আছেই। পরে সব বলব।

কল্পিতা আভাসের পাশেই ঘেঁষঘেঁষ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ এখনও বেশ রক্তিম আর ফোলাফোলা। ধরা ধরা গলায় ও জিগ্যেস করল,

—কাকু, আপনি আমাদের কাছে কিছু লুকোবেন না। উনি আমার শ্বশুরমশাই হলেও, নিজের বাবাকে কোনদিনও পাইনি। তাই ওঁকেই সে জায়গাটা দিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন আমাদের মনের অবস্থা। প্লীজ, আমাদের কাছে কিছু লুকোবেন না।

নীল ম্লান হাসল। অনুচ্চস্বরে বলল, —কল্পিতা, তোমাদের কাছে কোন কিছুই লুকোন থাকবে না। অন্তত আমি থাকতে নয়। তাছাড়া শিবাজীদাকে আমি অন্য চোখে দেখতাম। ও হ্যাঁ, বউদির জ্ঞান ফিরেছে কিনা জান?

—জানি না কাকু। এত আনন্দের দিনে এ কী হল বলুন তো? বাবার মৃত্যু মা সামলাতে পারবেন কিনা বুঝতে পারছি না।

—হ্যাঁ, আমি জানি। ওরা দুজন দুজনকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। আভাস, তুমি একবার দেখ তোমার মায়ের পজিশন কী? দরকার পড়লে ইমিডিয়েট কোন নার্সিংহোমের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমাদের হাউস ফিজিশিয়ান কী—

—হ্যাঁ। ওই অসীম চৌধুরীই।

—গুড। ভালই হল। দেখ উনি কী করতে বলেন।

তারপর আরাধ্যর দিকে চোখ পড়তেই নীল বলল, —আরাধ্য তুমি তখন থেকে এটা কী করছ? তুমি না বাড়ির বড় ছেলে। জানি বাবার এই মর্মান্তিক মৃত্যু সব ছেলেকেই আপসেট করে দেয়। কিন্তু বিপদে এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। সব থেকে বড় কথা গেস্টরা সব আটকে আছেন। প্রত্যেকেই সম্ভাব্য বিপদের চিন্তায় ম্লান। ওদের অন্তত একটু বোঝাও যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তোমার বর্তমান মানসিকতা বুঝেই বলছি তুমি ওদের সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াও। প্রভাতী বউমা কোথায় গেল? দেখছি না তো?

—মায়ের কাছে বসে আছে।

—ভালো। মনে জোর আনো। প্লীজ। আমি এদিকটায় আছি। পুলিস এলেই এখানে নিয়ে আসবে।

আরাধ্য চলে যেতেই নীল চুপি চুপি কল্পিতাকে ডাকল, —কল্পিতা,

—কিছু বলছেন কাকু?

—একটা সাদা চাদর পাওয়া যাবে? তোমাদের এখানে আসতে পুলিস কতক্ষণ সময় নেবে কে জানে। শিবাজীদার বডিটা চাপা দেওয়া দরকার।

কল্লিতা চলে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা সাদা চাদর এনে শিবাজীবাবুর দেহটা ঢেকে দিল। ও চলে যাচ্ছিল। নীল আবার ডাকল,

—কল্লিতা তোমাকে একটু খাটাচ্ছি।

—সে কী কাকু! আনন্দের বাড়িতে এসে আপনার এইভাবে জড়িয়ে যাওয়াতে আমরাই লজ্জিত।

—বোকা বোকা কথা বোল না। ভুলে যেওনা আমার শখের প্রফেশনটা কী? শোন, তোমাকে যে জন্যে ডাকা। তোমার মায়ের ঘরের লাগোয়া যে ঠাকুরঘর আছে, সেখানে তোমার যাতায়াত আছে?

—হ্যাঁ। কেন থাকবে না?

—এখুনি গিয়ে দেখে এসো সেই অর্ধনারীশ্বর শিবমূর্তিটা ঠিক আছে কিনা?

—কেন,আছে তো।

—কখন দেখেছ?

—কেন সকালে। মা তো পুজো করছিলেন।

—না, সকালের কথা জিগ্যেস করছি না। এখন আছে কিনা সেটাই জানার দরকার। কুইক, দেরি করবে না।

কল্লিতা আর দাঁড়ালো না। দীপু এসে ফের ফিসফাস করল,

—মনে হয় নেই। এই মার্ডারটাতো সেই অর্ধনারীশ্বরের জন্যেই। খরগোসের হুমকি। যুগপৎ, কল্লিতা তার সুন্দর মুখে বিষাদ আর ভয়ের ছায়া মিশিয়ে নীলের সামনে এসে বোকা বোকা মুখে দাঁড়াল।

—নেই? তাই তো?

—হ্যাঁ কাকু। সিংহাসন ফাঁকা। একে বাবা চলে যেতেই মায়ের ওই অবস্থা। এরপর জ্ঞান ফিরলে যখন শুনবেন তাঁর প্রাণের পয়াদেবতা মিসিং, নাহ্ আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।

অতি বিষণ্ণ ভঙ্গীতে নীল বলল, —এই বিপদের পূর্বাভাস শিবাজীদা আমাকে দিয়েছিলেন। আজ আমার সেই কারণেই বিশেষ করে আসা। কিন্তু সেটা যে এত দ্রুত কাছে এসে গেছে বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ পরিবেশের প্যাটার্নটা পাল্টে গেল। এতক্ষণ বেশ বিরক্তি, উষ্মা, অনুচ্চস্বরে অধৈর্যপ্রকাশ, সবই চলছিল। হঠাৎ সব চুপচাপ। এবং একটা ফিসফিস শব্দ মুখ থেকে মুখে ভেসে চলে এল, —পুলিস। পুলিস এসে গেছে।

লোকাল থানার ওসির বুক পকেটে সরু পেতলের প্লেটে নাম লেখা আছে চন্দ্রনাথ বশিষ্ঠ। চেহারাটা বেশ গাট্টাগোট্টা। শরীরে কষ আছে দেখলেই বোঝা যায়। একা পাঁচজনের মহড়া নেবার ক্ষমতা রাখেন। গাট্টাগোট্টা হলেও বেশ স্মার্ট। জুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে এলেন। পিছনে জনা তিনেক কনস্টেবল। এবং একজন ফোটোগ্রাফার। ফোটোগ্রাফার এসে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। চন্দ্রকান্তের নির্দেশে ফোটোগ্রাফার অতিথি অভ্যাগতের বেশ কিছু স্ন্যাপ নিয়ে নিলেন। কেউ কেউ অবশ্য আপত্তি করেছিলেন। একেই তো তাঁরা ভীত। পুলিসি গাড্ডায় পড়তে কেই বা রাজি হবে? সমবেদনা থাকলেও মানুষ আগে নিজেকে বাঁচাতে চায়। তাই সবাই মোটামুটি অসন্তুষ্ট। পুলিসকে আসতে দেখে অম্বরীশ ঠাকুর এগিয়ে এসে বললেন, —অফিসার, গেস্টরা বেশ অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন। ওদের কী যেতে দেওয়া যেতে পারে?

পুলিসি গোঁফের আচ্ছাদনে মুখটা আরও কঠিন করে মিস্টার বশিষ্ঠ জিগ্যেস করলেন, —নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন তো সবাই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সবাইকে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিতে বলুন আজকের নেমন্তন্ন বাড়ির সব রান্না এখনও শেষ হয়নি। ভোর হয়ে যাবে সবার বাড়ি ফিরতে।

—কিন্তু—

—আমি শুনে এসেছি এটা মার্ডার কেস। লালবাজার সেটাই জানাল। আপনি কী হলফ করে বলতে পারেন এদের মধ্যে মার্ডারার নেই?

—ওটা বলার দায়িত্ব আমার নয়।

—তাহলে ওদের হয়ে সাফাই করার কাজটাও আপনার নয়। যান আপনার বয়স হয়েছে, গিয়ে একধারে বসুন। দেখছি কত তাড়তাড়ি সবাইকে ছাড়া যায়।

আর কোন বাক্য ব্যয় না করে বশিষ্ঠ সাহেব এগিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ নীলের দিকে নজর চলে গেল।

—মিস্টার ব্যানার্জি না? এক্স্ ডি.এস.পি সত্যেন মুখার্জির শ্যালক। শুনেছি আপনিও নাকি গোয়েন্দা হয়েছেন? লালবাজারে ফোন করেছিলেন? আপনি? গুড।

বশিষ্ঠের কথায় চিড়বিড়িনি আছে। গা জ্বালা করে। দীপু একবার আড়চোখে চন্দ্রনাথ বশিষ্ঠকে দেখে নিল। ইচ্ছে করছিল ট্যাকটেকিয়ে কিছু কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু নীল তখন তার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। অতএব নির্বিকার শুনে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কিল খেয়ে কিল হজম করা।

বশিষ্ঠবাবুর কণ্ঠস্বরে হুঙ্কার আছে। প্রায় হুঙ্কার দেবার ভঙ্গিতে বললেন,

—তা গোয়েন্দাবাবু, কিছু বুঝতে পারলেন?

—নাহ্। খুব শক্ত কেস। আর এগুলো ঘটে তো আপনাদের জন্যে।

—এ কথার অর্থ?

—শক্ত কেস উপযুক্ত লোকের হাতেই তো যাবার কথা।

—তাই বলুন। সর্বজ্ঞ, লাশকা কাপড়া হটাও।

সর্বজ্ঞ নামের কনস্টেবলটি পুরো চাদরটাই খুলে দিল। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক ফটাফট বেশ কয়েকটা ছবি নিতে শুরু করলেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে।

লাশ দেখতে দেখতে মিস্টার বশিষ্ঠ ফোটোগ্রাফারকে বললেন, —তোমার হয়েছে সুকুমার?

—হ্যাঁ স্যার। আপনি আপনার কাজ করুন। সে রকম বুঝলে আরও দু'একটা নিয়ে নোব।

বশিষ্ঠবাবু মৃতদেহের আগাপাছতলা দেখলেন। তারপর ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন,

—হুঁ, মনে হচ্ছে চপার বা কাঠারি জাতীয় কিছু দিয়ে মারা হয়েছে। ঠিক মেডুলার জয়েন্টে। এক কোপেই শেষ। গোয়েন্দাবাবু আপনি কী বলেন?

—ঠিক কত ওয়েটের চপার বা কাটারি ইউজ করা হয়েছে সেটা ফোরেনসিকই বলতে পারে। তবে ডেপ্‌থ্ অব্ উণ্ড দেখে মনে হয় চপার বা কাটারির আঘাতে মৃত্যু হলেও হতে পারে। আবার নাও হতে পারে।

ক্যামেরার সামনে অভিনেতারা যেমন ধীর গতিতে ঘাড় ঘোরায় ঠিক তেমনি ভাবেই ঘাড় বেঁকিয়ে বশিষ্ঠবাবু জিগ্যেস করলেন, —গোয়েন্দাবাবু কী চপার বা কাটারি ছাড়া অন্য কোন রহস্যময় অস্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন?

—আপনিও পাবেন। আরও একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন।

নীলের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করে বশিষ্ঠবাবু অনুসন্ধানে নেমে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক টর্চ ছড়াতে ছড়াতে এক জায়গায় এসে থেমে গিয়ে বললেন, —আ মোলো যা। তাহলে দাঁড়ালোটা কী? কী গোয়েন্দামশাই, আপনি কী বলেন?

খুব উদাসীন ভঙ্গীতে নীল বলল, —আমি আর কী বলব? আপনি যেখানে আমিও সেখানে।

—আহা, সে কথা হচ্ছে না। বশিষ্ঠবাবুর কণ্ঠস্বর এখন একটু নরম—একটা লোককে পেছন থেকে মারার পক্ষে চপার বা রামদা বা ধারালো কাটারি ইজ ইনাফ। বাট হোয়াই দ্য বুলেট রিং? রগের পাশে বুলেট ঢোকার চিহ্ন। এবং বেরিয়ে যাবার নো সাইন। তার মানে বুলেট মগজে আটকে আছে। আপনার কী মনে হয় মিস্টার ব্যানার্জি?

বিনয়ের অবতার হয়ে নীল বলল, —আমার স্যার খুব একটা কিছু মনে হয় না।

—হোয়াট ডু ইউ মিন?

—হয়তো খুনি একটা হিটে সন্তুষ্ট হয়নি, তাই দুবার হিট করেছে।

—আমি বুঝতে পারিনা, অ্যাতো শ্যালো বুদ্ধি নিয়ে আপনারা কী করে গোয়েন্দা হবার

স্বপ্ন দেখেন। শুনেছি আপনি নাকি অনেক কমপ্লিকেটেড কেস সল্‌ভ্‌ করেছেন।

নীল তারিয়ে তারিয়ে কথা ছুঁড়ল, — কেন স্যার কিছু ভুল বললাম?

—দুটো আঘাতই মোক্ষম। বুলেট অ্যাণ্ড চপার বা ওই জাতীয় কিছু। এর যে কোন একটাই মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট। তাহলে দুটো আঘাত করার কী প্রয়োজন? রগের পাশে গুলি ঢুকলে কেউ বাঁচে না। আবার পাঁঠা বলি দেবার মতো ঘাড়ে কোপ বসালে কারো বাবার সাধ্য নেই আক্রান্তকে বাঁচাতে পারে।

—তাহলে আপনার ডিসিশনটা কী স্যার?

—সম্ভবত দুজন আততায়ী এসেছিল।

—হতে পারে।

—হতে পারে না নয়, সেটাই হয়েছে। একজন চপার মেরেছে। আর একজন মৃত্যুটাকে নিশ্চিত করার জন্যে রগের পাশে বুলেট চালিয়েছে।

—তার মানে খুব ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছিল।

—একশোবার।

—এত কাছ থেকে গুলি করলে কী গুলি মগজে ঢুকে থাকবে?

—থাকতে পারে। সেটা খুলি খুললেই বোঝা যাবে।

—তা হতে পারে। আচ্ছা অফিসার, দুজন কী একই সঙ্গে একই সময়ে হত্যা করেছে?

—হতে পারে। আবার না'ও হতে পারে। ধরুন দুজনেই মিস্টার শাস্ত্রীকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা একই সঙ্গে এসে পড়েছিল। দুজনেরই হয়তো জাতক্রোধ ছিল। তাই দুজনেই যে যার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। কিংবা এমনও হতে পারে দুজনে একই দলের লোক। ডাকাত ফাকাত হতে পারে। ডাকাতরা তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তাই করে। হয় না কী?

বিনয়ের অবতার হয়ে নীল বলল, —সিওর স্যার। কোন ডাকাত দলকে আমি কখনো মার্ডার করতে দেখিনি। যদি না তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য রেপিস্টরা রেপ করার পর মার্ডার করে। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে। এটা অবশ্য রেপ কেস নয়। তবে আপনি যখন বলছেন দেন ইউ আর সেন্ট পার্সেন্ট কারেক্ট। কিন্তু—

—এর মধ্যে আবার 'কিন্তু' ঢুকছে কেন? এ তো জলের মতো সোজা কেস।

—আমার মনে হয় মৃতের মুখটা নীচের দিকে নামানো বলে ওদিকটা আপনি ভালো করে নজর দেননি?

—কেন? কী অভাবনীয় দৃশ্য ওখানে লুকিয়ে আছে?

—দয়া করে যদি দেখেন স্যার—

বশিষ্ঠবাবু আরও একবার কটমটিয়ে নীলের দিকে তাকিয়ে সরাসরি উবু হয়ে বসলেন। তারপর টর্চ ফেলে ফেলে শিবাজীবাবু মুখটা দেখলেন খুঁটিয়ে। তারপর সটান খাড়া হয়ে বললেন,—নাথিং ইজ অ্যাবনরমাল। কোন বিশেষ কিছু আমার নজরে পড়ল না।

—ইয়েস স্যার। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। দুটো মোক্ষম আঘাতের পর, এবং দুটোই যন্ত্রণাদায়ক আঘাত, অথচ মৃতের মুখ নরম্যাল। কোন যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। কোন রকম ডিস্‌টরশন নেই। হয় এরকম?

সরাসরি নীলের মুখের দিকে মিনিটখানেক বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বশিষ্ঠবাবু বললেন, —মাই গড! ইউ আর কারেক্ট্। আমি এদিকটা ভাবিনি। নিদেন পক্ষে কষ্ট পাওয়ার একটা চিহ্ন তো থাকবেই।

—সেটা কোথায়?

—সত্যিই তো। সেটা কোথায়? তাহলে? আপনার ধারণাটা কী?

—আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি যা বলে, যে দুটো আঘাতকে আমরা মৃত্যুর কারণ বলে ধরে নিচ্ছি তার অনেক আগেই শিবাজী শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে অন্য কোন অস্ত্র প্রয়োগে। যার ফলে মৃতের মুখে কোন যন্ত্রণার অভিব্যক্তিই নেই।

ঘাড় নাড়তে নাড়তে চন্দ্রনাথ বশিষ্ঠ বললেন,—ইয়েস মিস্টার ব্যানার্জি, আই ডু এগ্রি অন ইওর পয়েন্ট। আসল মৃত্যু ঘটেছে অনেক আগেই। বাট, সেটা কী?

—অনুমতি করলে আমার অনুমানটা বলতে পারি। যদি অবশ্য পুলিসের আপত্তি না থাকে।

—আপত্তি করবে কে? আপনি বলুন।

—পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কী বলবে জানিনা। তবে বুলেট রিং এবং চপার আঘাতের অন্তত আধঘন্টা আগে মিস্টার শাস্ত্রীর মৃত্যু ঘটেছে। সম্ভবত কোন বিষপ্রয়োগে।

—বিষ প্রয়োগ কেন বলছেন? গলা টিপেও তো খুন করা যেতে পারতো।

—তা হলেও মৃতের মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন থাকত। আপনি বরং আরও একবার মৃতের কষের পাশ দুটো দেখুন।

বশিষ্ঠ বাবু তাই করেন। তারপর ঘাড় দোলাতে দোলাতে বললেন, —কষের দুপাশে রক্তাক্ত ফেনা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কী প্রমাণ হবে তা দিয়ে?

—বিষ প্রয়োগেই সেটা বেশি সম্ভব।

—না মিস্টার ব্যানার্জি। মানতে পারছি না। শুধু মাত্র বিষ প্রয়োগেই যে মুখ দিয়ে রক্ত ফেনা ছড়াবে তা নয়। ঘাড় বা রগ থেকে রক্তস্রোত, আই মিন ইন্টারন্যাল কিছু হেমারেজ ভায়া বোন এ্যাণ্ড থ্রোট কষের গায়ে এসে জমতে পারে।

—অস্বীকার করছি না। আর এর সদুত্তর একমাত্র পোস্টমর্টেমই দিতে পারে।

—ইয়েস ইউ আর রাইট। তা আমরা এখন বডি পোস্টমর্টেমের জন্য ছেড়ে দিতে পারি তো?

—আপনারা আইনের রক্ষক। আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।

—অলরাইট। আমি বডি পাঠিয়ে দিই। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এক্ষেত্রে খুবই জরুরি।

—ওকে স্যার।

দুই

অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও একেবারে কম নয়। নিকটতম আত্মীয় বাদ দিলে বন্ধুবান্ধব বা পরিজনদের নিয়ে শ দেড়েক লোক তো হবেই। এদের মধ্যে অনেকেই পড়শি। ছোট ছোট জিজ্ঞাসাবাদ এবং সকলেরই নাম ঠিকানা রাখতে রাখতেই ঘন্টা দেড়েক সময় কেটে গেল। ইতিমধ্যে বশিষ্ঠবাবু শিবাজী শাস্ত্রীর মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জেরা করার জন্যে তিনি একাই থেকে গেলেন। অবশ্য একজন এ এস আইকে নোট নেবার জন্যে সঙ্গে রাখলেন। তবে মজার ব্যাপার জেরার সময় উনি কিন্তু নীলকে উপস্থিত থাকতে কোন বাধা দেননি।

পাড়াতুতো কাকাবাবু কী তিন চারটে বাড়ির পাশে থাকা মাসিমা পিসিমাদের কিছু রুটিন কোশ্চেন করার পর ছেড়ে দিলেন। অবশ্য তাদের মধ্যে চপার বা গুলি করে মারার মতো কাউকেই পাওয়া গেল না। আমন্ত্রিতরা অধিকাংশই বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলা।

দেখতে দেখতে একসময় গোটা বাড়িই ফাঁকা হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যাঁরা রয়ে গেলেন তাদের সামান্য পরিচয় দেওয়া দরকার। প্রথম জন হলেন অম্বরীশ ঠাকুর। এঁর উল্লেখ আমরা আগেই পেয়েছি। শিবাজী বাবুর শ্যালক অর্থাৎ মহারানীদেবীর ভাই সর্বময় পাঠক এবং তার স্ত্রী দীপালি পাঠক। রইলেন আরাধ্যর শ্বশুর শাশুড়ি যথাক্রমে রণবীর ভদ্র আর মল্লিকা ভদ্র। আভাসের শ্বশুর শাশুড়ি শারীরিক কারণে আসেননি। এসেছে আভাসের শ্যালক। ইন্দ্রনীল ঘোষাল। তার স্ত্রী মালবিকা ঘোষাল। আর আছেন আরাধ্য আর আভাসের ছোট বোন রচয়িত্রী এবং তার স্বামী পঞ্চদীপ সেন। আর রইল বাড়ির ঝি চাকর আর দরওয়ান। শাস্ত্রী ভবনে কাজের লোক বলতে দুজন। মহেশ আর বাবলু। কাজের মেয়ে দুজন। একজন রান্নার বউ শেফালী আর একজন ফাইফরমাস খাটা মেয়ে। প্রায় সবকিছুই সামলায় সে। রমা। আর দরওয়ান বাদল সিং। আর একজন আছে। ড্রাইভার সফি খান। সে কেবল শিবাজীবাবুর গাড়িই চালায়। বাকি দু ভাইয়ের দুটি গাড়ি। তারা নিজেরাই চালায়। সফি খান সাধারণত সকালে আসে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি চলে যায়। অবশ্য প্রয়োজনে থাকতে হয়। যেমন আজ থাকতে হয়েছে।

আটকে যাওয়া মানুষগুলোর মধ্যে আরও একজনের কথা বলতে হয়। তার নাম ঋষি দেবনাথ। শিবাজী পেপার হাউসের ম্যানেজার। বছর চল্লিশের মধ্যে বয়েস। দেখতে শুনতে ভালই। চালচলনে পোশাকে আশাকে বেশ ফিটফাট। চৈত্রের এই গরমেও শ্যুট টাই পড়েছেন। ডাক্তার অসীম চৌধুরী চলে গেছেন। সকালেই ওঁর চেম্বার। রাতে একটু বিশ্রাম না নিলে ওঁর চলবে না। অবশ্য থাকেন খান কয়েক বাড়ির পরেই। বলে গেছেন তাঁকে দরকার থাকলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসবেন।

এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা ক্লান্ত বশিষ্ঠবাবু জমিয়ে বসলেন ইন্ট্যারোগেট

করার জন্যে। বশিষ্ঠবাবু ডাকাডাকি শুরু করতে যাচ্ছেন এমন সময় নীল বলল, —মিস্টার বশিষ্ঠ, আপনি এদিককার কাজটা চালাতে থাকুন আমি একটু অন্দর মহলটা দেখে আসি।

—কেন মশাই? চলে যাবার বাহানা কেন? ইন্ট্যারোগেটই তো আসল ব্যাপার। গোয়েন্দাগিরি শিখতে গেলে ইন্টারোগেশনের পদ্ধতিটা ভালো করে জানতে হয়। অনেক ক্লু পাওয়া যায়। এগুলো তো শিখতে হবে।

—আপনি স্যার ঠিকই বলেছেন। তবে যেখানে আপনি ইন্টারোগেট করছেন সেখানে সেটাই যথেষ্ট। যদি সন্দেহজনক কিছু পান, তা নয় আপনার কাছে জেনে নোব।

—ঠিক আছে যান। তবে মশাই ফাঁকিবাজি করে গোয়েন্দা হওয়া যায় না।

কথা না বাড়িয়ে দীপুকে সঙ্গে নিয়ে নীল হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে দীপু জিগ্যেস করল,—ইন্ট্যারোগেশনের সময় তুমি থাকলে না? অনেক কিছু পয়েন্টস্ হাতছাড়া হয়ে যাবে কিন্তু।

—কিছু হাতছাড়া হবে না। আর এই সমস্ত অফিসারদের বাঁধাধরা রুটিনমাপা কোয়েশ্চেন মাথা ধরিয়ে দেবে। তার চেয়ে যেটা কাজের কাজ সেটা করি চল।

—কী?

—চল দেখতেই পাবি। কিন্তু কল্পিতাকে কোথায় পাব? মনে হয় মহারানী বউদির কাছে থাকতে পারে। চল ওনার ঘরেই যাই।

মহারানী দেবীর ঘরে স্রেফ মহিলাদের ভিড়। তারই মধ্যে মহারানীর মাথার কাছে বসে আছে কল্পিতা আর প্রভাতী। ইশারায় ও কল্পিতাকে কাছে ডাকল। কল্পিতা আসতেই জিজ্ঞাসা করল, —তোমার শাশুড়ি এখন কেমন আছেন? জ্ঞান ফিরেছে?

—হ্যাঁ জ্ঞান ফিরেছে। তারপরই উনি আবার কান্নাকাটি শুরু করেন। ডাক্তার চৌধুরী ওঁকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে গেছেন। বলেছেন আজ সারারাত ঘুমবেন। এটা দেখতে যাতে আজ কোন কারণে ওর যেন ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।

—হ্যাঁ, সেটাই ভাল। উনি ঠিকই করেছেন। তা বউমা, তোমাকে যে আমার সঙ্গে একবার ঠাকুরঘরে যেতে হবে।

—এখনই?

—হ্যাঁ এখনই।

—কিন্তু এই কাপড় পড়ে ঠাকুর ঘরে যাওয়া কী উচিত হবে? মা জানতে পারলে,

মৃদু ধমক দিয়ে নীল বলল, —ডোন্ট বি সিলি কল্পিতা। ইংলিশে এম.এ করেছ। এখনও এই সব সংস্কার অন্তত তোমায় মানায় না। মৃতের কোন জাত থাকে না। এসো।

কল্পিতার আর কিছু বলার ছিল না। অবশ্য সে নিজেও এসব মানে না। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির রীতিনীতি তো মানতেই হয়। অবশ্য বিপদে নিয়ম নাস্তি প্রবাদ মেনেই ও নীলের সঙ্গে চলে এল ঠাকুরঘরে।

নীল এর আগে কোনদিনও মহারানীর ব্যক্তিগত এই ধর্মকুটিরে ঢোকেনি। এখানেও এলাহি ব্যাপার। প্রায় তেত্রিশ কোটির অবস্থান। প্রত্যেকেরই গা ভরা মণিমুক্তো আর সোনার সাজ। শুধু এই একটা ঘরই যদি কেউ লুটপাট করে সে কিছুদিনের জন্যে বড়লোকের জীবন কাটাতে পারে। রূপোর বাসনপত্র। রূপোর সিংহাসন। তারই দাম মেলাই।

দীপুর তো হকচকিয়ে যাবার পালা। ও ভাবতেই পারে না যে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ সারাদিনে আধপেটও ভরাতে পারে না সেখানে কয়েকটা পাথরের মূর্তির গায়ে লক্ষ লক্ষ টাকার মণিকাঞ্চনের ভার চাপিয়ে দেবতার কতটা কৃপালাভ করা যায়। অবশ্য মুখে রা না কেটে চুপচাপ দেখে যেতে লাগল।

ঘরের ঠিক মধ্যিখানে একটা বড় আকারের সিংহাসন। রূপোর সিংহাসন। সোনার লতাপাতায় মোড়া। কিন্তু সিংহাসন ফাঁকা। নীল সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, —এই তাহলে তোমার অর্ধনারীশ্বর মহাদেবের সিংহাসন?

—হ্যাঁ কাকু, কল্পিতার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

নীল চারদিক তাকিয়ে দেখল। এ ঘরে একটিই মাত্র দরজা। দুটো জানলা। সেই প্রশ্নটাই ও করল কল্পিতাকে। —যাতায়াতের এই একটাই দরজা?

—না কাকু, আমরা যেখান থেকে এলাম সাধারণত ওটাই ঢোকা বেরনোর রাস্তা। তবে শুনেছি এ ঘরে একটা অ্যান্টি চেম্বার আছে।

বিস্মিত নীল ওর দিকে তাকিয়ে বলল, —অ্যান্টিচেম্বার? ঠাকুরঘরে?

ম্লান হেসে কল্পিতা বলল—জানেনই তো কাকু, বড়লোকদের বাড়িতে আরও কত অ্যান্টিচেম্বার থাকে। যেগুলো বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আর সেই সব গুপ্তঘরের মধ্যে সব থেকে সেফেস্ট জায়গা হচ্ছে এই ঠাকুর ঘর। পুলিসও চট্ করে ঠাকুরঘরে ঢুকতে ইতস্তত করে।

—অ্যান্টিচেম্বারে তুমি গেছ কোনদিন?

—আমি কেন, একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ জানেনা এ ঘরের কোথায় অ্যান্টিচেম্বার আছে?

—সেটাও কী এই ঘরের মতো?

—তা হতে পারে। আমি ঠিক জানি না।

নীল অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যেকটা দেয়াল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু সব দেওয়াল নিরেট পাথরে তৈরি। কোথাও আলগা জোড় বা ফাঁকের চিহ্ন পর্যন্ত পেল না। হঠাৎ ও জিগ্যেস করল, —তুমি শেষবারের মতো কখন মূর্তিটা দেখেছ?

—সকালে দেখেছি। মা তখন পুজো করছিলেন।

—তারপর তো আর আসোনি?

—না। আসা তো বারণ।

—বারণ?

—হ্যাঁ, মা বলে দিয়েছিলেন, উনি না থাকলে আমরা কেউ যেন এ ঘরে না ঢুকি। এ বাড়ির সবাই সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন।

—তোমার ননদ, কী যেন নাম?

—রচয়িত্রী। রচয়িত্রী সেন।

—সেন? তোমরা তো ব্রাহ্মণ। হোয়াই সেন?

—ঠাকুরঝি প্রেম করে বিয়ে করেছিল। তাই।

—কেউ আপত্তি করেন নি? মানে তোমার শ্বশুর শাশুড়ি, এঁদের তো কিছু গোঁড়ামি ছিল।

—মা করেছিলেন। তবে বাবা বা অন্যরা সবাই রাজি থাকায় বিয়েটা হয়ে যায়।

—কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে?

—বেশি নয়। বছর দুয়েক।

—আশ্চর্য।

—কেন?

—গত সাত বছরে এ বাড়ির সব অনুষ্ঠানে আমার নিমন্ত্রণ, অথচ—

—বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে হয়েছিল। আর একটা ছোট্ট গেট টুগেদার। ব্যস।

—এই নিয়ে রচয়িত্রীর মনে কোন ক্ষোভ নেই?

—ঠিক বলতে পারব না। ব্যবহারে তো কিছু প্রকাশ পায় না।

—আর তোমার ননদাই?

—কে? পঞ্চদীপদা? উনি শিল্পী মানুষ। ছবি আঁকেন। একটু অন্য ধরনের মানুষ। এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি। কিছুদিন হল কলকাতায় আছেন। তাই আজকের অনুষ্ঠানে পাওয়া গেল। নইলে—

—উনি থাকেন কোথায়?

—বালিগঞ্জে। নিজেদের বাড়ি। তবে বেশির ভাগ সময়ে ভারতের বাইরেই যা কিছু। লণ্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা এ সব তো ওর কাছে জলভাত। আর দেশে ফিরলে দিল্লী, লখনউ, হায়দ্রাবাদ ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়ান। আজ সেমিনার। কাল আর্টফোরামের কনফারেন্স, এছাড়াও সভাসমিতি। মিডিয়া অ্যাটেন্ড করা। সর্বদাই হেভি বিজি। ওর নামটা আপনার শোনা উচিত ছিল।

—আমার দুর্ভাগ্য। তা তিনি অর্ধনারীশ্বর দেখেছেন? রেয়ার পীস।

—হ্যাঁ দেখেছেন। একবারই। আপনার মতোই বলেছেন, রেয়ার পীস। চট্ করে দেখা যায় না। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল। তবে পঞ্চদীপদা আর একটা কথা বলেছিলেন।

—কী?

—এর বাকি অর্ধেক অংশ কোথায়? সেটা না পাওয়া গেলে তো ইনকমপ্লিট থেকে যাচ্ছে। মাকে বলেছিলেন বাবাকে বলতে বাকি অর্ধেকটা যেন উনি খুঁজে বার করেন। এটা একটা বিখ্যাত শিল্প বস্তু হতে পারে।

—হুঁ। তারপর?

—তারপর পঞ্চদীপদার স্বভাবমতো উনি বোধহয় ভুলেই মেরে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আর কোনদিনও কোন প্রশ্ন করেননি। এমন কী এই ঘরেও আসেননি।

—আচ্ছা কল্পিতা, শশ দিয়ে কোন নামের লোককে কী তুমি চেনো?

—শশ? মানে খরগোস? এরকম নাম হয় নাকি?

—কেন হবে না? শশ' সঙ্গে কিছু যোগ করলেই নাম হতে পারে। শশাঙ্ক হতে পারে, শশধর হতে পারে। শশরাজ হতে পারে। শশবিন্দু হতে পারে।

—কই নাতো। এরকম নাম তো পাইনি। ও হ্যাঁ, একজন শশনাথের নাম মনে পড়ল। অন্ধ্রেআমাদের একটা পেপার ডিস্ট্রিবিউশন অফিস আছে। সেখানকার ম্যানেজারের নাম শশনাথ ত্রিবেদী। তবে লোকটা ইউপির লোক।

—অন্ধ্রের ম্যানেজারের নাম তুমি জানলে কী করে?

—বাবার মুখেই শুনেছি। লোকটা ম্যানেজরিয়াল স্টাফ হলেও, ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

—মানে মালিকেও আছে শ্রমিকেও আছে। এ লোকগুলো কিন্তু ডেঞ্জারাস।

—জানিতো। বাবাও জানেন। কিন্তু ঘাটাতেন না। লোকটার ওখানে হোল্ড ভাল।

—ভদ্রলোক কী কলকাতায় আসেন?

—বোনাসের আগে আসেন। আর আসেন ইয়ারলি ইনক্রিমেন্টের আগে। মানে চার্টার অব ডিমান্ডস্ নিয়ে।

—এবার বোধহয় একবার আসতে পারেন। মালিকের মৃত্যু হয়েছে বলে কথা।

—হতে পারে।

—ঠিক আছে। তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসার নেই। আমি একবার মিস্টার বশিষ্ঠের সঙ্গে দেখা করে চলে যাব।

— সেকী? কিছু না খেয়ে?

—কল্পিতা আমি অমানুষ নই। অন্তত আজ আর কোন কিছু গলাধঃকরণ করতে পারব না। চল আমরা নীচে যাই।

নীচে তখন শেষ পর্যায় চলছে। বশিষ্ঠবাবু তখন অম্বরীশবাবুকে নিয়ে পড়েছেন। আর সব ফাঁকা। ঘরে কেউ নেই। নীল আর দীপু পৌছতেই ইশারায় ওদের বসে যেতে বললেন।

—মিস্টার ঠাকুর, আপনি তো আর্মিতে ছিলেন?

—আমার পোশাকটাতো তাই বলে। এতে আপনার অসুবিধা কোথায়?

—এটা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়।

—আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি। এর থেকে ক্লীয়ার করতে আমি বাধ্য নই।

—মিস্টার ঠাকুর, আপনি ভুলে যাবেন না, কিছুক্ষণ আগে এ বাড়ির মালিক খুন হয়েছেন এবং কী অবস্থায় ছিলেন সেটাও আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

—হ্যাঁ দেখেছি। ইট্‌স্ আ ব্রুটাল কেস অব মার্ডার।

—সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে। আশা করি আপনি তার উত্তর দেবেন।

—আমার জানার মধ্যে থাকলে নিশ্চয়ই দোব।

—মৃত শিবাজী শাস্ত্রী তো আপনার বন্ধু ছিলেন। তা—

—সরি, এটা ভুল তথ্য। শিবাজী ওয়াজ মাই গার্লফ্রেণ্ডস্ হাজব্যাণ্ড। হি ওয়াজ নট মাই ফ্রেণ্ড অ্যাটল।

আড়চোখে নীল একবার অম্বরীশের দিকে তাকাল। কারণ ঠিক এই মুহূর্তে এই ধরনের কনফেশন কেউ করে না। অম্বরীশবাবুর স্বীকারোক্তি অকপট। এবং গার্লফ্রেণ্ড থাকাটা কোন বিশেষ সংবাদ নয় তাঁর ব্যবহারে সেটারই প্রকাশ।

বশিষ্ঠ বাবু শুনে বললেন,—আই সি। তা শিবাজীবাবু আপনার বান্ধবীর হাজব্যাণ্ড বলে কী আপনি চাননা তাঁর মৃত্যুরহস্যের কোন কিনারা হোক?

অম্বরীশবাবু বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন,—আমার কোন প্রশ্নের উত্তরে বা আমার হাবেভাবে কী একবারও প্রকাশ পেয়েছে যে এই মৃত্যুরহস্য ধামাচাপা পড়ুক?

—বেশ, তাহলে বলুন শিবাজীবাবুকে এসে আপনি কী অবস্থায় দেখেছেন?

—আমার সঙ্গে ওনার দেখা হয়নি। আমি বরাবর নীচেই ছিলাম। ড্রিংকসে আমার হ্যাবিট আছে। আমি ওখানেই ব্যস্ত ছিলাম।

—আপনি আসেন কখন?

—জাস্ট অ্যাবাউট সিক্স ও ক্লক।

—এত তাড়াতাড়ি কেন? উনি যে কার্ড পাঠিয়েছিলেন তাতে সময় ছিল সেভেন টু টেন।

—আপনার যদি মনে হয় বিফোর দ্য টাইম আসাটা অপরাধ, দেন আই কান্ট হেল্প।

—ছটায় আসার পর কী আপনার মহারাণীদেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ সেইরকম একটা ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দেখা হয়নি। প্রোব্যাবলি সি ওয়াজ বিজি উইথ হার মেকাপ।

—তা ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত কী করলেন?

—বেয়ারাকে ডেকে একটা হুইস্কি নিয়ে এককোণে বসেছিলাম।

—এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই, যদিও ব্যাক্তিগত, ইচ্ছে না হলে উত্তর নাও দিতে পারেন।

—প্রশ্ন করুন।

—মহারানী দেবীর সঙ্গে যে আপনার এই ফ্রেণ্ডশিপ, তা কী শিবাজীবাবু জানতেন?

—না জানানোর মতো কোন ঘটনাই নয়। আপনাদেরও জানাতে কোন আপত্তি নেই। মহারানীর সঙ্গে শিবাজীর বিয়ে না হলে সম্ভবত বিয়েটা ওর আমার সঙ্গেই হত।

—হোল না কেন?

—লেফটেন্যান্ট হিসেবে ক্রাইসিস পিরিয়ডে আমাকে একবার ফ্রন্টে যেতে হয়েছিল। শত্রুপক্ষের ট্র্যাপে আমি আটকে গিয়েছিলাম। আমার ডান পায়ে গুলি লেগেছিল। সেখানে চিকিৎসা না হবার জন্যে আমার ডান পা অ্যামপিউটেড। তারপর সৈন্য বিনিময়ের সময় আমি দেশে ফিরে আসি। জাস্ট সি মাই লেগ।

প্যান্ট ভাঁজ করে দেখালেন। সত্যিই ফল্স্ পা লাগানো।

—আর আপনার চাকরিটা?

—আমাকে মোটা টাকা কমপেনসেট করে রিটায়ার করানো হয়। এটাই মিলিটারি রুল।

—কিন্তু এখনো আপনি উর্দি ছাড়েনি।

—এটা সরকারি উর্দি নয়। তার থেকে অনেক তফাত। নিজেকে ভুলতে পারি না বলেই ঐ রকম একটা ড্রেস করিয়ে রেখেছি। তাও স্পেশাল পারমিশন নিয়ে। আমার ড্রেসে কোথাও কোন সরকারি তক্‌মা লাগানো নেই। এনিথিং মোর?

—আর একটু। সম্ভবত আপনি ফিরে এসে দেখলেন মহারানী দেবীব বিয়ে হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ তাই?

—আর ইউ জেলাস?

— হোয়াই? মহারানী আমার সঙ্গে তো দুর্ব্যবহার করেনি। প্রতারণাও করেনি। সুতরাং যেটা হবার সেটাই হয়েছে। দীর্ঘদিন তো কেউ কারো স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। সেটা জীবনের অপব্যয়।

—আর ইউ ম্যারেড?

—নো।

অনেকক্ষণ পর নীল একটা প্রশ্ন করল,—মিস্টার অম্বরীশ ঠাকুর, এ বাড়িতে একটা বহুমূল্যবান অ্যান্টিক ছিল। একটা কালো পাথরের স্ল্যাপ। প্রকৃতির খেয়ালে সেখানে একটা অর্ধনারীশ্বর শিবের মূর্তি তৈরি হয়ে ছিল। যেটা মহারানী বিশেষভাবে পূজো করতেন। জানেন কিছু সে সম্বন্ধে?

—মহারানীর মুখে একবার শুনেছিলাম। তবে এই সব দেবদেবীতে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। বিশ্বাসও নেই।

—মূর্তিটা বোধহয় চোখেও দেখেননি?

—না। ইচ্ছে হয়নি।

—খরগোস নামধারী কাউকে চেনেন?

—খরগোস, একটা লোকের নাম? হতে পারে, হাতি, বাগ, সিংহ, নাগ আর খরগোস হতে দোষ কী? তবে আমি শুনিনি।

—শিবাজীবাবুর কোন ব্যক্তিগত শত্রু কেউ কী ছিল, যার পক্ষে এ ধরনের মার্ডার করা সম্ভব?

দু মিনিট সময় নিলেন অম্বরীশ। তারপর বললেন, —ব্যবসাদার মানুষ। ব্যবসায়ীদের কিছু শত্রু থাকতেই পারে। হয়তো শিবাজীরও ছিল। হতে পারে আমার জানা নেই।

—মহারানী দেবীও কিছু বলেননি?

—না।

নীল আর অম্বরীশবাবুর কথোপকথনে বশিষ্ঠ বাবু একটু ভ্যাবাচাকা খেলেন। অ্যান্টিকের ব্যাপারটা ওনার জানা ছিল না। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে নীল বলল, বশিষ্ঠ সাহেব, আপনার যদি কিছু জানার থাকে জানতে পারেন। আমার প্রশ্ন শেষ।

বশিষ্ঠবাবু বললেন, —নাহ্, আর কিছু জিগ্যেস করার নেই। তবে মিস্টার ঠাকুর, আমাদের রেজিস্ট্রারে আপনার নাম ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাবেন। আর দুম্ করে কলকাতা ছাড়ার কোন ডিসিশন নেবেন না।

—রাইট। বলে অম্বরীশ চলে যাচ্ছিলেন।

—মিস্টার ঠাকুর, শিবাজীবাবুর বড় ছেলেকে একটু পাঠিয়ে দেবেন।

অম্বরীশ চলে গেলে বশিষ্ঠবাবু নীলকে জিগ্যেস করলেন, —আচ্ছা মিস্টার ব্যানার্জি, এই অর্ধনারীশ্বরের ব্যাপারটা কি? আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে শিবাজীবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে এই দেবতাটির কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে।

নীল কয়েক মিনিট নীরবে কিছু ভাবল, তারপর বলল,—আপনি যখন এই কেসটা সরাসরি ভাবে তদন্ত করছেন, তখন অর্ধনারীশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

এরপর সংক্ষেপে অর্ধনারীশ্বর প্রাপ্তি থেকে আজ সেটা চুরি হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবিস্তারে সব জানিয়ে বলল, —এবার আপনি নিজেই চিন্তা করুন দুটো ঘটনার মধ্যে কোন লিঙ্ক থাকা সম্ভব কিনা।

—হুঁ, বলে বশিষ্ঠবাবু খানিকক্ষণ কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন,—সম্পর্ক থাকাটা স্বাভাবিক। তার থেকেও বড় কথা খরগোস নামধারী কেউ এর জন্যে জীবননাশের হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন, সে মূর্তিতো চুরি হয়েই গেছে। তাহলে কেন এই মার্ডার?

—থাউজ্যাণ্ড ডলার কোশ্চেন। সেটাই আমি ভাবছি অনেকক্ষণ থেকে।

—উনি কী কোন রকম বাধা দিতে গিয়েছিলেন?

—প্রথমত ওটা থাকে মহারানী দেবীর নিজস্ব ঠাকুরঘরে। দ্বিতীয়ত, ডাক্তারের নির্দেশে ওনার বিছানা থেকে ওঠাই বারণ ছিল।

—তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?

কী দাঁড়াচ্ছে সেটা ভাবার আগেই আরাধ্য এসে দাঁড়াল। সে বেশ বিধ্বস্ত। এলোমেলো চুল। বাবার মৃত্যুতে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করেছে। চোখ দুটো বেশ ফোলাফোলা। সৌম্যদর্শন যুবক। মাঝারি হাইট। মায়ের মতো ভাসা ভাসা দুটো চোখ এখন রক্তাভ। এই গরমেও গায়ে ফুলহাতা শার্ট আর ট্রাউজার। ডান হাতটা ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো।

—আমায় ডেকেছেন কাকু, বেশ ধরা ধরা গলা।

—উনি নন, আমি ডেকেছি, বলে বশিষ্ঠবাবু বললেন,—আপনার নাম?

—আরাধ্য শাস্ত্রী। আমিই আমার বাবার বড় ছেলে।

—বেশ। সময়টা অড্ হলেও কয়েকটা প্রশ্ন করতেই হচ্ছে।

—ঠিক আছে বলুন।

—আপনার বাবার তো অনেক বড় বিজনেস। বিজনেসটা কিসের?

—মেইনলি কাগজের। টিটাগড়ের দিকে আমাদের একটা মিলও আছে।

—পেপার মার্চেন্ট। ভেরি গুড। আপনার বাবাই কী সর্বময় কর্তা? নাকি অন্য কারো সঙ্গে কোম্পানির শেয়ার আছে?

—না। বাবাই সব। অন্য কারো সঙ্গে কোন পার্টনারশিপ নেই।

—এরপর কী হবে?

—বাবা যদি উইল করে থাকেন ভাল। নইলে আইন যা বলবে।

—কিন্তু আমি শুনেছি আপনার এক বোন আছে।

—হ্যাঁ রচয়িত্রী সেন।

—অসবর্ণ বিয়ে?

—হ্যাঁ লাভ ম্যারেজ।

—কোন গণ্ডগোল হয়নি বিয়ে নিয়ে?

—না। বাবা খুব লিবার‍্যাল এই ব্যাপারে। জাত নিয়ে উনি কখনও মাথা ঘামাননি।

—আপনার ভগ্নীপতির নাম?

—পঞ্চদীপ সেন। না উনি ব্যবসা করেন না। উনি একজন শিল্পী। ছবি আঁকেন। দেশ বিদেশে ওনার অনেক না।

—আপনি এখন কী করেন?

—বাবার ব্যবসা দেখি। ব্যবসাটা খুব একটা ছোট নয়। শাস্ত্রী পেপার মিলের নাম সম্ভবত শুনেছেন। আমাদের কাগজ বাইরে সাপ্লাই হয়। আমার ছোটভাই আভাসও একই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

হঠাৎ নীল জিজ্ঞাসা করল, —তোমার বোনেরও বোধহয় কিছু শেয়ার আছে?

—না, বাবা ওই কাজটি করেননি। উনি চাননি পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে কোন আত্মীয়কে

যুক্ত করতে। পঞ্চদীপ আর রচয়িত্রীকে বিয়ের সময় বাবা অনেক টাকা দিয়েছেন। পঞ্চদীপকে বিলেত পাঠাতে বাবার অবদান প্রচুর।

আবার বশিষ্ঠ বাবু ফিরে এলেন—আপনার বাবার কোন শত্রু ছিলেন?

—এখন তো মনে হচ্ছে ছিল। নইলে বাবার এ ভাবে মৃত্যু হয়?

—সে কে, কিছু আন্দাজ করা যায়?

—সেভাবে আন্দাজ করতে পারছি না। তবে ব্যবসা করতে গেলে, বিশেষ করে এই রকম কমপিটিটিভ যুগে বাবার রাইভাল থাকা বিচিত্র নয়। আসলে কে কোথায় কী প্ল্যান করছে তা তো জানা সম্ভব নয়।

—কাউকে সন্দেহ হয়?

—এই মুহূর্তে আমি কিছু ভাবতে পারছি না। এমন একটা আনন্দের দিনে, এত বড় সর্বনাশ কে করতে পারে, নাহ্ সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

শেষের দিকে আরাধ্যর গলাটা ধরে এসেছিল। নীল একগ্লাস জল ধরিয়ে দিয়ে বলল, —আচ্ছা আরাধ্য, তোমার মায়ের ঠাকুরঘরে একটা অদ্ভুত দর্শন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ছিল। কিছু জান সে সম্বন্ধে? তুমি কী শুনেছ সেটা পাবার জন্যে কোন একজন খরগোস, প্রায় এককোটি টাকা অফার করেছিল। জিনিসটা তাকে ফেরৎ দিতে হবে। নইলে মৃত্যুদণ্ড।

—মাই গড। এসব কথা তো আমি জানি না।

—মিস্টার খরগোস বলে কাউকে জান?

—না। তবে আমার ছোট মামার নাম শশধর পাঠক। কিন্তু শশধর আর খরগোস দুটো আলাদা ব্যাপার।

—মামাবাবু এসেছেন?

—হ্যাঁ মায়ের কাছে বসে আছেন। ডেকে দোব?

—নাহ্, তার আগে তুমি বরং আভাসকে পাঠিয়ে দাও।

মিনিট দু তিনেক মধ্যেই আভাস এল। আরাধ্যর চেহারার মধ্যে বাবার থেকে মায়ের আদলটাই বেশি। ফলে সে আভাসের থেকেও হ্যাণ্ডসাম। আরও স্মার্ট। কিন্তু আভাসের চেহারা বেশ রাফ অ্যান্ড টাফ। টানটান ছিপছিপে চেহারা। বয়েস সাতাশ আটাশ। ব্যবহারটাও আরাধ্যর থেকে রুক্ষ। হয়ত সেটা বয়েস কম হওয়ার জন্যে। মুখের মধ্যে রুক্ষ ভাবটাই এখন বেশি। এসেই বলল, —আমার নাম আভাস শাস্ত্রী। আমার বাবা কিছুক্ষণ আগে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। এই খুন হবার ব্যাপারে আমার কোন আইডিয়া নেই। আমি কিছু জানিও না। কারণ বিকেল তিনটে থেকে আমি বাড়ি ছিলাম না।

—সরি মিস্টার, বশিষ্ঠ প্রশ্ন করলেন, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

—মিল থেকে এক লরি পেপার নিয়ে আসতে হয়েছিল। কালকেই ডেলিভারি।

ফস্ করে দীপু বলে উঠল—গাড়ির নাম্বার কী ডবলিউ বি থ্রি টুটুটুটু?

—হ্যাঁ আপনি জানলেন কী করে?

—ওই গাড়িটা কিছুতেই আমাদের গাড়িটাকে রাস্তা দিচ্ছিল না।

—ড্রাইভারটা একটু একগুঁয়ে আছে। আমিও ওই গাড়িতেই ছিলাম।

আভাস চুপ করে যায়। ক্ষণকাল পরেই বলে, —তবে—

নীল ভাবার সময় দিল না। —হ্যাঁ, বল, তবেটা কী?

আভাস সম্পূর্ণ অন্য স্বরে বলল, —বোধহয় এই মৃত্যুটা বাবার পাওনা ছিল?

যে এ এস আই শর্ট হ্যাণ্ডে নোট নিচ্ছিলেন, তিনিও সবার মতো চুপ করে আভাসের দিকে তাকালেন।

নীল নীরবতা ভেঙে বলল, —পাওনা ছিল কথাটার মানে কিন্তু ভয়াবহ।

—হ্যাঁ, মৃত্যুটাতো বেশ ভয়াবহভাবেই ঘটেছে। তাই না?

—আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছি পাওনা বলতে তুমি কী বলতে চাইছ?

—আমি কিছুই বোঝাতে চাইছি না। ওসব বোঝাবুঝির কাণ্ডকারখানা, আপনাদের জন্যে। একজন লোকাল থানার ওসি, আর একজন নামজাদা গোয়েন্দা। আপনারাই তো গুপ্তরহস্য খুঁজে পাবার জন্যে সশরীরে হাজির। এর মধ্যে আমার নোজ পোকিংয়ের কোন ইচ্ছে নেই।

—ওয়েল, নীল বলল, তুমি তাহলে অনেক কিছু জেনেও কিছু বলতে চাইছ না।

—নীলকাকু, আপনি যদি কোনদিন কিছু জানতে বা বুঝতে পারেন, খুব ভালো কথা, দ্যাট ইজ ইওর ক্যালি। অ্যাণ্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম, মিস্টার ওসিকেও ওই একই কথা বলব। অ্যাট প্রেজেন্ট আই মাস্ট সে, আই নো নাথিং অ্যাবাউট দিস্ মিসহ্যাপ অ্যাণ্ড ইটস্ মোটিভ।

—কিন্তু, বশিষ্ঠ চটেছেন, রুক্ষ স্বরে বললেন, —আইন বোধহয় এত ছেলেখেলার বস্তু নয়। মুখ আপনি কোনদিন বন্ধ রাখতে পারবেন না। ওটা আমরা ঠিকই খুলে নেবো।

—হ্যাঁ, সেটাই ভাল। আপনারা খুঁজুন। এবং খুলুন। ওপন্ ইট। অ্যাণ্ড দ্যাট উইল বি দ্য রাইট ওয়ে। সরি, আমি কিন্তু আর থাকতে পারছি না। আমি মেন্টালি খুব আপসেট। যেতে পারি?

—আসুন। ওই খরগোস বাবুকে একটু পাঠিয়ে দিন তো?

—হোয়াট?

—আপনার মামা, শ্রী শশধর পাঠক। উনি আজ আছেন। কিছু কথা বলব।

—রাসকেল। ঠিক আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আভাস চলে গেল। বশিষ্ঠবাবু বললেন, —বহুত ত্যাঁদড় ছেলে তো। ভেতরে অনেক ব্যাপার আছে, বুঝলেন মিস্টার ব্যানার্জি। একদিন পিসি তে রাখলে বাপ বাপ বলে মুখ খুলে যাবে।

নীল কোন উত্তর না দিয়ে কেবল একটা সিগারেট ধরাল।

মিনিট দু তিন পর ডিগডিগে রোগা প্যাকাটির মতো একজন প্রায় ক্রন্দনরত অবস্থায় ঘরে এসে হাজির। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। দুটো গাল চুপসে হনু দুটো ঠেলে উঠেছে। ঈষৎ ময়লা। অবশ্য পরনের শার্ট ট্রাউজার বেশ দামি। জুতোটাও মানানসই। হাতে একটা রুমাল ধরা। দেখে কোনমতেই মহারানীদেবীর ভাই বলে মনে হয় না। বয়সটাও আন্দাজ করা যায় না।

—স্যার, আমাকে ডেকেছিলেন?

নীল তাকাল বশিষ্ঠবাবুর দিকে। খুব ভারিক্কি গলায় বশিষ্ঠ বললেন,

—আপনার নাম?

—আজ্ঞে শশধর পাঠক। অবশ্য ওই নামে সবাই ডাকে না। সবাই শশ বলে ডাকে।

—শশ? মানে খরগোস?

—লোকের মুখ তো আর বন্ধ করতে পারি না। সব থেকে বিচ্চু হচ্ছে আমার ছোটভাগ্নেটা। ওই আভাস ছোকরাটা। বলে আমায় নাকি একদিন কেটে খেয়ে নেবে। খরগোসের মাংস নাকি খেতে সুস্বাদু। কী খারাপ কথা বলুন তো?

—সব শুনেছেন তো?

—শুনব না? ভাবা যায়? জলজ্যান্ত মানুষটা। জানেন এই হচ্ছে জীবন। এই আছে এই নেই। সাধে কী বলে মানুষ মরণশীল। উঃ। ডেঞ্জারাস।

—আপনি আজ কোথায় ছিলেন?

—আমি তো ছিলুম না।

—তার মানে?

—আমি তো ক্যাটারারের দোকানে গিয়েছিলাম। তারপর ওখান থেকে গেলাম বাড়ি। বউ ছেলেকে আনতে। বউয়ের কথা আর বলবেন না। সাজন গোজনেই—

—তাঁরা এসেছেন?

—নাহ্ এলোনা। পাশের বাড়িতে সইয়ের ছেলের জন্মদিন। সাজছিল সেখানেই যাবে বলে। এদিকে আমি ভাবছি এখানে আসবে বলে মাঞ্জা দিচ্ছে।

—নিজের আত্মীয়ের বাড়ি ছেড়ে সইয়ের বাড়ি?

—আর বলবেন না মশাই। বউ আমার ঠিকই করেছে। কে কার আত্মীয়? সব লোক দেখানো। এ বাড়িতে আমাকে কেউ পোছেই না।

—কেন, আপনি তো মহারানীদেবীর ছোট ভাই।

—আমাদের তো ভরা তালপুকুর নেই। এখন শুকিয়ে গেছে। পুছবে কেন? নেহাত নেমন্তন্ন করেছিল তাই। আচ্ছা, আপনারাই বলুন, যাকে নেমন্তন্ন করলি তাকেই কিনা ক্যাটারারের খোঁজে পাঠাচ্ছিস। তাও এই চড়বড়িয়াল রোদে? সারা দুপুর মশাই এই খ্যাড়খ্যাড়ে রোদে চড়কি খাওয়া? চেহারাটা কী হয়েছে দেখছেন?

—হ্যাঁ, খুবই অন্যায়। মাথা নাড়তে নাড়তে বশিষ্ঠবাবু বললেন, —আপনি যেন কোথায় থাকেন?

—উল্টোডাঙায়।

—নিজেদের বাড়ি?

—কোথায় পাব? এই যে আমার দিদি, জামাইবাবু শখ করে নাম রেখেছেন মহারানী। তা সেটা তো ওর নাম নয়। ওর নাম পুঁটু।

—এরকম একজন সুন্দর মহিলার নাম পুঁটু? ডাকনাম?

—না না স্কুলের নাম। পুঁটুরানী পাঠক। এখন হয়েছেন মহারানী শাস্ত্রী। পয়সা হয়েছে। পয়সাঅলা লোকেরা একবার কেন চোদ্দবার নাম পাল্টাতে পারে। তা আমায় কী জন্যে ডেকেছেন স্যার?

—আপনি কোন চিঠি দিয়েছিলেন?

—কাকে স্যার? কী জন্যে?

—আপনার জামাইবাবুকে। ভয় দেখিয়ে?

—ওমা, বলে কী, আমি ভয় দেখাবো? আমি নিজেই শালা দুনিয়ার লোককে ভয় পাই। সর্বদাই আড়ষ্ঠ হয়ে থাকি।

—কেন ভয় পান কেন? কোন ইললীগ্যাল কাজটাজ করেন নাকি?

—ইললীগ্যাল কাজ করতে গেলে যে স্ট্যামিনার দরকার, সেটি আমার নেই। আমি এর ওর মাথায় টুপি পরিয়ে সংসার চালাই।

—টুপি? কী রকম টুপি?

—টুপি অনেক রকম আছে। হ্যাট, ফেজ, গান্ধী, গাধার টুপি। সে স্যার এক কথায় বলা যাবে না। যেমন মাথা তেমন টুপি। পরে একদিন বলব।

—এ বাড়ি থেকে একটা মূল্যবান বস্তু চুরি হয়েছে। জানেন সে বিষয়ে কিছু?

—এ বাড়িতে তো সবই মূল্যবান জিনিস। শালা দুনম্বরী মাল এলে ও রকম অনেক মূল্যবান জিনিস দিয়ে ঘর সাজানো যায়। বাড়িটা দেখছেন তো কেমন? একি আর সোজা পথের টাকায় হয়?

—আপনার কাউকে সন্দেহ হয়? এই খুনের ব্যাপারে?

—আদার ব্যাপারি স্যার। জাহাজের খোঁজ রেখে কী লাভ?

—কিন্তু খুব কান্নাকাটি করেছেন। চোখ দেখলে বোঝা যায়।

—কাঁদব না? এই বয়েসে দিদিটা বিধবা হল। ওই দিদিটার জন্যেই আসা।

—আর জামাইবাবু?

—ধোস্, কিসের জামাইবাবু? এলে কথাই বলতো না। যেন চাকর বাকর।

—তাহলে বলছেন জামাইবাবু মারা যেতে আপনার তেমন কিছু মনে লাগেনি।

—না স্যার, সেটাও বলা যাচ্ছে না। জলজ্যান্ত ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেছে। একটু দুঃখ তো হবেই। আসলে কী জানেন অতি বড় নিষ্ঠুর লোকও যদি বেকায়দায় খুন হয়ে যায়, তার জন্যেও দুঃখ হয়। পোষা কুকুর বেড়াল মরলেও তো কান্না পায়। তারওপর সবাই কাঁদছে। জানেন তো কান্না বড় ছোঁয়াচে রোগ।

—তার মানে আপনার জামাইবাবু খুব নিষ্ঠুর লোক ছিলেন, এটাই বলতে চাইছেন?

হঠাৎ শশধর পাঠক কেমন যেন সচকিত হয়ে গেলেন, তারপর বললেন,

—না না, আমি সেকথা বলিনি। আমি এবার যাব স্যার? মাইরি বলছি, বিশ্বাস করুন এর থেকে বেশি কিছু আমি জানি না। বড় লোকের ব্যাপারে বেশি কিছু জানতেও চাই না। আচ্ছা স্যার, কখন এখান থেকে ছাড়া পাব?

—বাড়ি তো উল্টোডাঙ্গায় বললেন। এত রাত্রে ফিরতেও পারবেন না। নিজের গাড়ি তো নেই।

—গাড়ি? ওরে বাবা। ঠিক আছে স্যার কাল সকালেই চলে যাব। তালে যাই।

—নিজের নাম আর ঠিকানা এই ভদ্রলোকের কাছে লিখে দিয়ে যান।

হঠাৎ নীল উঠে পড়ল। বশিষ্ঠবাবু জিগ্যেস করলেন,—আপনি কিন্তু কোন প্রশ্নই করলেন না?

—থাক। দরকার পড়লে পরে করে নোব। বশিষ্ঠবাবু আজ আমি চলি। আপনারা বাকি কাজগুলো সেরে ফেলুন। আমাকে গাড়ি চালিয়ে অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। গুডনাইট।

আর না দাঁড়িয়ে নীল দীপুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গাড়িতে উঠতে উঠতে দীপু জিগ্যেস করল,—কাউকে কিছু বলে এলে না?

—আজ আর কেউ ঠিক কথা বলার জায়গায় নেই। পরে দেখা যাবেখন।

—কিন্তু —

—জানি। শিবাজী শাস্ত্রী একটা চিঠিতে তাঁর ভয়ের কথাটা উল্লেখ করেছিলেন। সম্ভবত উনি আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। তার ওপর ফ্যামিলির প্রায় সবার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা। এড়াতে চাইলেই কী এড়ানো যাবে?

কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর দীপু বলল, —দুজন লোক খুব বেখাপ্পা স্টেটমেন্ট দিল। খেয়াল করেছ।

—হ্যাঁ। আভাস শাস্ত্রী আর শশধর পাঠক। আমার মনে আছে। এখন আর মাথায় কিছু নেই। পেটে একটা ছুঁচো লাফালাফি করছে।

—ঠিক বলেছ। আমার পেটের ছুঁচোগুলো আবার ইনটেসটাইনে লুকোচুরি খেলছে। একটু স্পীড দাও গাড়িতে।

তিন

ঠিক চারদিন পর বশিষ্ঠবাবুর ফোন এল নীলের কাছে।

—পি এম রিপোর্ট এসে গেছে। আপনার ধারণাই ঠিক। আগে বিষ দেওয়া হয়েছিল। তারপর গুলি। তারপর চপার জাতীয় কিছু।

—হুঁ। বিষটা কী?

—অ্যাট্রোপিন সালফেট। ওভারডোজ। মদের সঙ্গে।

—মদ? সেকী? ওনার তো সেদিন মদ্যপানের ব্যাপার ছিল না।

—উনি কী মদ্যপান করতেন?

—করতেন। তবে সেদিন তো মাইল্ড অ্যাটাক হয়েছিল। নিশ্চয়ই ডাক্তারের বারণ

—তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? একই লোক তিনবার অ্যাটেম্পট্ নিয়েছে, নাকি তিন শত্রু তিনবার এসেছে?

—সেদিনের পর থেকে আমি আর ও বাড়িতে যাইনি। মানুষগুলো একটু নরম্যাল হোক।

—ততদিনে তো অনেক কিছু হারিয়ে যাবে।

—এর রুট অনেক গভীরে। হঠাৎ রাগের মাথায় কেউ কিছু করেনি। জমানো রাগ। রাগের উৎসটা খুঁজতে হবে। ঠিক আছে আপনি আপনার মতো এগোন। পরে দেখা হবে।

—বড় বাড়ির বড় কেচ্ছা নয়তো?

—তা কী করে বলি। একটু ভেতরে ঢুকি। তবে মনে রাখবেন অর্ধনারীশ্বর চুরি গেছে। এবং সেই চোরই মৃত্যুভয় দেখিয়েছিল।

—এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কারণ যে চোর চুরিতে সাকসেকফুল হল সে কেন অযথা খুনের রিস্ক নেবে?

—ওই জন্যেই তো বললাম লক্ষ আমাদের একটাই। এবার যে যার মতো এগনো যাক।

—ওয়েল, বলে বশিষ্ঠবাবু লাইন কেটে দিলেন। দীপু একমনে নেলকাটার দিয়ে নখ কাটছিল। নীল ফোন নামিয়ে রাখতে দীপু বলল, —মালকে ফুটিয়ে দিলে?

একটু রাগ রাগ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে নীল বলল, —তোর ঠিক এই ধরনের ডায়লগ আমার পছন্দ হয় না। মাল, ফুটিয়ে দেওয়া, এগুলো তো ভদ্রসমাজের কথা নয়। রকের ডায়লগ এখনও গেল না।

—সরি গুরু। মাঝে মাঝে রকের ডায়লগগুলো হুসহাস করে বেরিয়ে আসে। সেদিন যখন তোমায় ঠেস দিয়ে কথা বলছিল, তখনও অনেক রক ডায়লগ গিটকিরি দিচ্ছিল। বলতে পারিনি। যাকগে কী বলল বল?

—স্টমাকে বিষ পাওয়া গেছে। অ্যাট্রোপিন সালফেট। খুব সম্ভবত মদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল।

—কিন্তু উনি আবার সেদিন ড্রিংক করতে গেলেন কেন? একে হার্টের প্রবলেম।

—আসলে এটা ওঁর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। হয়তো ভেবেছিলেন তেমন কোন অসুবিধা হবে না।

—কিন্তু নীলদা অ্যাট্রোপিন সালফেট্ তো চোখের ওষুধ। এটা খেলে লোকে মারা যাবে?

—অ্যাট্রোপিনের লিথাল ডোজ। একজন হার্ট পেশেন্টকে মারার পক্ষে দু গ্রেণই যথেষ্ট।

—তার মানে যে এই কম্মোটি করেছে তার ডাক্তারি শাস্ত্রে নিশ্চয়ই বিশেষ জ্ঞান আছে।

—তা নাও হতে পারে। তাকে যে ডাক্তার হতেই হবে তার কোন মানে নেই। হয়তো সে কোন ভাবে জেনেছে ঠিকঠাক ওই ওষুধ প্রয়োগে একজন মারা যেতে পারে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে একজন নয়। তিনজন। তিনজনের মগজে খুনের টেন্ডেন্সি জেগেছিল। কিন্তু কেন? শিবাজী শাস্ত্রীর তিন হত্যাকারী ওই বিশেষ দিনটাই বা বেছে নিল কেন? সেদিন তো ওনার হার্ট অ্যাটাকের ব্যাপারটা হঠাৎই ঘটেছিল। এটা তো আগেভাগে কারও জানার কথা নয়।

হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমন ভাবে দীপু বলল, —নীলদা, ওই দুজনের কথাটা তুমি কিন্তু মাথা থেকে সরিয়ে দিও না।

কুঞ্চিত নেত্রে নীল মুখ ফেরাল, —কার কথা বলছিস?

—আভাস শাস্ত্রী।

—হ্যাঁ মনে আছে। ছেলেটাকে বরাবরই একটু অন্যরকম লাগল। একটু রাফ আর কাটা কাটা কথা। সম্ভবত এটা ওর বাবাও ঠিক মতো পছন্দ করতেন না। এই নিয়ে সামান্য অসন্তোষ ছিল শিবাজীদার মনে। কিন্তু এ কথাটা বলল কেন, এমনটা হবে সেটা নাকি ও জানতো।

—তার মানে শিবাজীবাবু খুন হবেন বা যে কোনভাবেই ওনার অপঘাত মৃত্যু হবে এটা সে জানতো? কেন? তার ওপর তোমার ঐ খরগোস, সরি, শশধরবাবুর মধ্যেও কিছু একটা ক্ষোভ আছে শিবাজীবাবুর বিরুদ্ধে। তুমি কী বল?

গভীর চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে আনতে নীল বলল, —কিছু না হোক শিবাজীদার বাড়িতে আমার সারাবছরের যাতায়াত। এই ভাবে যে লোকটা খুন হবে, সেটা তার অমায়িক ব্যবহারে কোনদিনের জন্যেও মনে হয়নি। তবে কী সর্ষের মধ্যেই কিছু ভূত লুকিয়ে ছিল? বশিষ্ঠবাবুর কথায় বড় বাড়ির কিছু বড় কেচ্ছা আছে নাকি?

—তার মানে, দীপু এখন বেশ সিরিয়াস, সে বলল, তোমার অর্ধনারীশ্বর মেইন ফ্যাক্টর নাকি অন্য কিছু? মোটিভটা কী?

হঠাৎ নীল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, —দীপু, চল আজ শাস্ত্রীদের বাড়ি যাই। এখানে বসে সব উত্তর পাওয়া যাবে না।

—এখনই যাবে?

—যেতেই হবে। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে শাস্ত্রীবাড়ির কাউকেই বোধহয় আমার চেনা হয়নি।

—ঠিক আছে চল।

শাস্ত্রীভিলায় ওরা যখন পৌঁছল তখন প্রায় বিকেল। শোকের বাড়ি। সব যেন কেমন চুপচাপ। অপঘাত মৃত্যু। তিনদিনে কাজ হয়ে গেছে। না এবার আর শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারে লোকজন খাওয়ানোর ব্যাপার ছিল না। কোন রকমে শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন মেনে কাজ শেষ করা।

গেটের মুখে মলিন মুখ দাঁড়িয়ে ছিল বাদল সিং।

—কী খবর বাদল সিং?

কাঁদো কাঁদো মুখে বাদল সিং বলল,—সব শেষ হইয়ে গেলো বাবুজি।

—বাইরে থেকে যারা এসেছিল সব চলে গেছে?

—জি। শ্রেফ সাহাবকা লেড়কি আভিতক রহা গিয়া।

—তোমাদের মাইজি কেমন আছেন?

—অ্যায়সাই। আভি তক বিস্তারাপেই শুয়া হুয়া হ্যায়। আপ যাইয়ে না। অন্দরমে যাইয়ে।

—আচ্ছা বাদল সিং, সেদিন তো তুমি প্রায় সারাক্ষণ গেটেই ছিলে?

—জি হাঁ।

—কোন সন্দেহজনক কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলে?

—বাবুজি, উস দিন তো বহুত আদমি আনাগোনা করছিল। নেহি বাবুজি অ্যায়সা তো কিসিকো দেখা নেহি।

—তা বটে। সেটা সম্ভবও নয়। তোমার দুই দাদাবাবু বাড়ি আছে?

—ছোটা সাহাব তো সুবেই নিকাল গিয়া। বড়া সাহেব আছে।

—হুঁ। একটা জিনিস কী তুমি খেয়াল করেছ বাদল সিং?

—কেয়া বাবু?

—ওই যে তোমাদের লেটারবক্স। ওটার তো কোন চাবি নেই? তাই না?

—লিকিন বাবুজি খুলনা ইতনা আসান নেই। উসমে থোড়াসা ট্রিকস্ আছে।

—তুমি জান খুলতে?

—জী সাব।

—আর কে কে জানে?

—বড়া সাব। উস্‌কা দুই লেড়কা। অউর মাইজি।

—বাইরের লোক আর কেউ জানে না?

—সেটা আমি ঠিক বলতে পারবে না বাবুজি।

—নিশ্চয় আরও কেউ খুলতে জানে। এবং সে লোকটা বাড়ির অনেক খবরই জানে।

বাদল সিং বোকা বোকা মুখে তাকাল। তারপর বলল,—অ্যায়সা কুছ হুয়া নাকি?

—হয়েছে। হতেই হবে। শিবাজীদার লেখা একটা চিঠি যেটা ওই বাক্স থেকে উধাও হয়ে গেছে। তাতে খুব ইমপর্টান্ট কিছু লেখা ছিল। কিন্তু কে সে লোক? ঠিক আছে। আমি ভেতরে যাচ্ছি। হ্যাঁ তোমাকে আরও একটা কথা বলি। তুমি চেননা অথচ তোমার যদি তাকে সন্দেহজনক মনে হয়, তুমি আমাকে নয়তো লোকাল থানার মিস্টার বশিষ্ঠকে খবরটা দিও। কিন্তু সেটা যেন কেউ জানতে না পারে।

নীল চলে আসছিল। আবার ফিরে গেল, জিগ্যেস করল,

—তোমার কী কাউকে সন্দেহ হয় বাদল সিং?

—এমোন কথা কেন পুছছেন বাবুজি? সবই তো মেহমান আদমি আনাগোনা কিয়া থা। লেকিন—

—সেই লেকিনটাই তো জানতে চাইছি।

—এক আদমি, মেরেকো আচ্ছা নেহি লাগা। করীব সাত সাড়ে সাত হোগা বহুত হড়বড়াকে কোঠিসে নিকাল গিয়া।

—তাড়াতাড়ি করে চলে গিয়েছিল। তারপর আর আসেনি?

—মালুম নেহি। উস্‌কি বাদ সাহাবকা অ্যাক্সিডেন্ট হো গিয়া। হাম্‌ভি অন্দর চলা গিয়া।

—লোকটা কেমন দেখতে মনে আছে? এখানে তো সেদিন যথেষ্ট আলো ছিল।

—থোড়া থোড়া মালুম হ্যায়। কালাবালা কোট আর পেন্ট্ পড়েছিল। আউর হাতমে একটা কালাবালা পলিব্যাগ ভি ছিল।

—এই গরমে কোট? তা চেহারার আর কিছু মনে আছে?

—থোড়া সা লম্বা। রংভি কালা। আউর মাথেপে যায়দা ঝাঁকড়া বাল ছিল।

—লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

—ক্যায়সে করু। উস্ টাইমমে বহুৎ সারে আদমি আউর জেনানা লোগ আ গিয়া।

—ঠিক আছে। বাদল সিং, আমি ভেতরে যাচ্ছি।

নীল আর দীপু ভেতরে চলে এল। সেদিনের নীচের ড্রইংরুম।

প্রতিমা বিসর্জনের পর ফাঁকা মঞ্চ যেমন পড়ে থাকে। ডেকরেটরের লোক ডেকরেশনের সাজসজ্জা সব খুলে নিচ্ছে। এতদিন হয়তো সময় পায়নি বা সময় দেওয়া হয়নি। পাঁচদিন আগে কত হইহল্লা। নারীপুরুষের সমবেত আনন্দোচ্ছ্বাস।

নীল আর দাঁড়ালো না। নীচে চেনামুখের কাউকেই পাওয়া গেল না। ওরা যখন দোতলায় উঠছে মহেশ নামের চাকরটিকে নীচে নামতে দেখা গেল। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। নীল ডাকল, —তুমি মহেশ না?

—হ্যাঁ বাবু।

—আমায় চিনতে পারনি?

—হ্যাঁ বাবু।

—তোমাদের মা কোথায় আছেন?

—আজ্ঞে বাবু, তেনার ঘরেই আছেন। কারো সঙ্গে কোন কথা বলছেন না। একা একা জানলার দিকে চেয়ে বসে আছেন।

—আর কেউ আছে ওঘরে?

—তেনার মেয়ে আছেন।

—আর বউদিরা?

—তেনারা বাড়ির কাজ কম্ম দেখাশুনো করছেন।

—আর দাদাবাবুরা।

— ছোটদাদাবাবু সকালেই কোথাও বেইরেছেন। বড়দাদাবাবু তেনার ঘরে আছেন।

—ঠিক আছে তোমার মাকে একটু খবর দাও। গিয়ে আমার কথা বল।

মহেশ ওপরে উঠে গেল। পিছন পিছন নীল আর দীপুও উঠে এল। ঘরে ঢোকার আগে নীল দীপুকে বলল, —স্পট্‌টা সেদিন খুব মন দিয়ে দেখা হয়নি। একটু চোখ বুলিয়ে আয়।

দীপু চলে গেল। মহারানীর ঘরটা তিনতলায়। নীলের জানা থাকায় ও সটান তিনতলায় এসে মহারানীর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। সামান্য সময়ের মধ্যেই বেরিয়ে এল রচয়িত্রী। মহারানীর মেয়ে। পিতৃমুখী মেয়ে। বাবার মতোই গায়ের রঙ। খাড়া নাক। উজ্জ্বল ভাসা ভাসা দুটো চোখ। মাথায় সামান্য কোঁকড়া চুল। এটা অনেকটা মায়ের ধাত। বিষণ্ণ মুখে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, —আসুন নীলকাকু। মা কিন্তু—

—ডোন্ট হেজিটেট বেবি। আমি পরিস্থিতি বুঝি। চল ভেতরে চল।

নীল ঘরে ঢুকল। তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ধনী পরিবারের স্বাচ্ছল্য যেমন সবখানে লেগে থাকে, এখানেও তাই। মহারানী তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় আছেন। মহারানীর মুখের সেই হাসি আজ আর নেই। বেশ বোঝা যায় গত কদিনে একটা পাগলা ঝড় এই সংসারে ঢুকে সব তছনছ করে দিয়ে গেছে। নীলকে দেখে মহারানী হাত তুলে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। নীল চেয়ারটা টেনে ওনার সামনে গিয়ে বসল।

কোথা থেকে কথা শুরু করবে নীল ভেবেই পাচ্ছিল না। মহারানীই কথা শুরু করলেন, —এ সব কী হয়ে গেল নীলাঞ্জন দা?

উত্তর দেবার কিছুই ছিল না। নীল চুপ করেই রইল।

মহারানীই আবার বললেন, —একলা আমায় কোথাও যেতে দিত না। এক বিন্দু অসুখ করলে ডাক্তারের লাইন পড়ে যেত। আর আজ! কে দেখবে আমায়? নিজের ব্যক্তিগত কাজ ছাড়া যেখানেই যেতো আমাকে সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যেতো না। বলতে পারেন

দাদা, আজ আমায় কে সেটা দেবে? কে দিনরাত বলবে এটা কোরনা, ওটা করা উচিত হবে না। আমার যে সব ফাঁকা হয়ে গেল।

এ কথারও কোন এক কথার উত্তর হয় না। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে নীল বলল, —এখন কেমন আছেন বউঠান?

পাশ থেকে রচয়িত্রী বলল, —মা তো, কিছু খাওয়া দাওয়াই করছেন না। ওনার লো প্রেশার। এই অবস্থায় যদি খাওয়া দাওয়া না করেন—

—কিন্তু বউঠান, খাওয়া দাওয়া না করলে যে আপনিও অসুখে পড়ে যাবেন। ডাক্তারের কিছু নির্দেশ তো আপনাকে মানতেই হবে।

মহারানী ম্লান হাসলেন। অস্ফুটে বললেন,—আর খাওয়া দাওয়া! সব সময়েই যে ওঁর কথা মনে পড়ছে। কার জন্যে আর খাওয়া দাওয়া? কার জন্যেই বা বেঁচে থাকা?

—জানি বউঠান। জানি। কিন্তু কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও বলতে হচ্ছে, শিবাজীদার তো বয়স হয়েছিল। একদিন তো তাঁকে যেতেই হত।

—তাই বলে এইভাবে?

—না। এভাবে যাওয়াটা নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়। তাই জন্যেই তো আমায় বিরক্ত করতে হচ্ছে আপনাকে। এই নৃশংস হত্যার কোন প্রতিবাদ, কোন প্রতিকার, চাইবেন না?

—তাতে মানুষটা কী ফিরে আসবে?

—না। যে যায় সে আর ফেরে না। কিন্তু যে বা যারা তাঁকে হঠাৎ চলে যেতে বাধ্য করেছে তাদের কি আপনি চিনতে চান না?

—হ্যাঁ, এক একবার তাই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু—

—ইয়েস, কিন্তু,—চুপ করে থাকলে তো চলবে না। সেই লোকগুলোকে যে খুঁজে বার করতেই হবে।

—লোকগুলো?

—আমার যতদূর মনে হয়, একজন নয় আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী তিনজন।

বিস্মিত মুখে মহারাণী বললেন, —তার মানে?

—অন্তত সেই সন্ধ্যায় তিনজন লোক চেয়েছিল আপনার স্বামীকে খুন করতে। আর তার সাক্ষ্যও তারা রেখে গেছে।

—এমনও হয়?

—সেটাই হয়েছে। আর সেই কারণেই সব থেকে বেশি প্রয়োজন আপনার সাহায্য।

—আমি? আমি আপনাকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারি?

—পারেন। আপনার কিছু জানা কথা, কোন কিছু গোপন না করে, আমাকে খুলে বলতে হবে।

—আমার তো কিছু গোপন কথা নেই।

নীল হাসল। তারপর বলল, —আমি একটা বড় ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব।

মহারানী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, —বেশ বলুন। আমার যা জানা আছে, নিশ্চয়ই জানাব।

—আমি কিন্তু আপনাকে একলাই প্রশ্ন করব।

রচয়িত্রী বুদ্ধিমতী মেয়ে। ও বলল, —ঠিক আছে কাকু, আপনি প্রশ্ন করুন। আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি। চা খাবেন তো?

—হ্যাঁ শুধুই চা। আর আমার এক বন্ধু আছে। আপনাদের ওপরের হলঘরে। ওকেও যদি—

—নিশ্চয়। আমি আপনার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রচয়িত্রী বেরিয়ে গেল।

—হ্যাঁ নীলাঞ্জনদা, এবার বলুন আপনার কী প্রশ্ন আছে?

—বউঠান, এমন একটা বিপদের আভাস তো শিবাজীদা পেয়েছিলেন। এবং খরগোসের লেখা চিঠিটার সারমর্ম উনি আমার কাছে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। ইট ওয়াজ র‍্যাদার আ হুমকি লেটার। শিবাজীদা কী ব্যাপারটাকে খুব সিরিয়াসলি নেননি?

—আপনার কী তেমন মনে হয়? এবং তাই যদি মনে হবে তাহলে উনি আপনাকে সে চিঠি পাঠাবেন কেন?

—তার মানে উনি সিরিয়াস ছিলেন। কিন্তু সেই উৎসবের দিনে ওনার কী উচিত ছিল না, এক্সট্রা কোন প্রিকশন নেওয়া?

—আসলে ঠিক ওই দিনই যে—

—হ্যাঁ, এই ক্যালকুলেশনটা আমারও ভুল হয়েছিল। কিন্তু উনি সেদিন মদ্যপান করলেন কেন?

—মদ্যপান?

—হ্যাঁ মদ্যপান। আর মদের সঙ্গে বিষ পাওয়া গেছে ওনার স্টমাকে। এবং মৃত্যুটা তখনই হয়। আচ্ছা বলুন তো, একজন হার্ট পেশেন্টকে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করার মতো প্রবৃত্তি এ বাড়িতে কী কারো আছে?

—বাড়ির লোক? আর ইউ সিরিয়াস?

—ঠিক বাড়ির লোক কিনা সে ব্যাপারে আমি এখনও ডেফিনিট নই। তবে এই বিষাক্ত মদের পেয়ালাটা যে শিবাজীদার হাতে তুলে দিয়েছিল, সে অত্যন্ত কাছের লোক। এমনই কাছের লোক যার কাছ থেকে কোন অনিষ্ট হতে পারে সেটা তিনি আশংকাই করেননি।

—কে সে?

—সেটাই তো আমার প্রশ্ন। ফোরেনসিক রিপোর্ট জানাচ্ছে সন্ধে সাড়ে ছটা থেকে

সাতটা বাজতে দশের মধ্যে বিষক্রিয়ায় ওনার মৃত্যু হয়েছে।

—তাহলে গুলি বা চপার এসব?

—ওগুলোর হিসেব পরে। এখন বলুন তো, মোটামুটি ওপরের হলঘরের একেবারে শেষ প্রান্ত একটা ফোল্ডিং ডিভানের ওপর শিবাজীদা বসে বা আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। সে সময় কেউ তাঁর কাছে ছিল না। সামনে একটা নেটের পর্দা। আবছা নীলচে আলো। যাতে ওনার চোখে কোন কষ্ট না হয়। ওহ্ বাই দ্য বাই। ওনার চোখের কী কোন ট্রাবল ছিল?

—তেমন কিছু শুনিনি। তবে শট সাইটটা একটু গণ্ডগোল করছিল। উনি ভেবেছিলেন এই ব্যাপারটা মিটে গেলে চোখের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবেন।

—তার মানে তখনও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাহলে অ্যাট্রোপিনটা এল কীভাবে?

—অ্যাট্রোপিন আবার আসবে কোত্থেকে?

—বাড়িতে আর কারো কী তেমন কোন চোখজাতীয় ব্যাধির কথা শুনেছেন?

—না তো।

—ওয়েল। এবার বলুন তো, ঠিক ওই টাইমটুকুর মধ্যে বা তার কিছু আগে কার পক্ষে শিবাজীদার কাছে যাওয়া সম্ভব?

—ডাক্তারের কড়া নির্দেশ ছিল উনি কারও সঙ্গেই কোন কথাবার্তা বলবেন না। কেউই ওকে বিরক্ত করবেন না। একমাত্র আমি বা রচয়িত্রী ছাড়া তো—

—আপনি বা আপনার মেয়ে তখন কোথায় ছিলেন?

—সাজঘরে।

—খুব ভালো করে মনে করে দেখুন তো ওই সময়ে আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউ কী ওঁর খবর নিতে গিয়েছিলেন?

—আমার কথা আমি বলতে পারি। আমি যাইনি। তাছাড়া রচয়িত্রী তো বরাবর আমার সঙ্গেই ছিল।

—বেশ, আপনার অর্ধনারীশ্বর কখন চুরি যেতে পারে বলে আপনার অনুমান।

মহারানী প্রশ্নটা শুনে সামান্য সময় চুপ করে রইলেন। তারপর খুব নিম্নস্বরে বললেন, —এ বাড়ির আর কেউ জানে না। একমাত্র উনি জানতেন।

—কী?

—ওনারই পরামর্শে সেদিন দুপুরেই অর্ধনারীশ্বরকে আমি অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছি।

—গুড গড। সত্যি?

—প্রিকশনের কথা বলছিলেন না? সেদিনই উনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমায় বলেছিলেন, সেদিন উৎসবের দিন, সবাই নানান কাজে ব্যস্ত থাকবে। খরগোস সেই সুযোগ নিয়ে স্টোন প্লেটটা চুরি করতে পারে। তাই—

—আই সি। তার মানে মূল্যবান বস্তুটি চুরি যায়নি। আমি নিশ্চয়ই ভাবতে পারি এ খবরটা বাইরে আর কারো কাছে যায়নি। কোথায় রেখেছেন আমার জানবার দরকার নেই। কেবল একসময় দেখে নেবেন। জিনিসটা সেখানে অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা?

—থাকবে। ও জায়গাটা আমি আর উনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

—এত ডেফিনিট হচ্ছেন কেন? গোপন জায়গাটা আই মিন অ্যান্টি চেম্বারটা নিশ্চয়ই কোন রাজমিস্ত্রী তৈরি করেছিল, তাই না?

—সে মিস্ত্রি মারা গেছে।

—তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি অর্ধনারীশ্বর ঠিক জায়গাতেই আছে।

মহারানী দেবী হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, —তার মানে কী অর্ধনারীশ্বর শিবকে ঠিক জায়গায় না পেয়ে রাগের মাথায় ওনাকে খুন করে গেল। চিঠির হুমকিতেও কিন্তু সেই কথা লেখা ছিল।

নার্থক মাথা নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —বিষ প্রয়োগের ব্যাপারটা ঘটেছে খুব ঠাণ্ডা মাথায়। যে চোর চুরি করতে এসে চোরাই মাল ঠিক জায়গায় খুঁজে না পায় তার মাথা কিন্তু অত ঠাণ্ডা থাকে না। অন্তত ধীরেসুস্থে মদে বিষ মিশিয়ে নিঃশব্দে মৃত্যু সে চাইবে না। বরং সে রাগের মাথায় একটা ভয়ানক ধরনের হত্যাকাণ্ড করার চেষ্টা করবে। আমি কী বলছি বুঝতে পারছেন?

—পারছি। পরের যে কোন দুটো ভায়োলেন্ট ব্যাপারের যে কোন একটা সেই করেছে?

—তাই মনে হচ্ছে। তার মানে, সাড়ে ছটা থেকে পৌনে সাতটার পরে সেই লোকটি সেখানে গিয়েছিল।

—এ ক্ষেত্রে আপনার ফোরেনসিক কী বলছে?

—গুলি এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাত ঘটেছিল সাতটা থেকে সাতটা পাঁচ কী দশের মধ্যে। লোকজন কখন উঠতে আরম্ভ করেছিল আপনার কী খেয়াল আছে বউঠান?

—ঠিক সেইভাবে তো খেয়াল করিনি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মিসেস ভাটিয়ার সঙ্গে দেখা। দুচারটে কথা বলার পর আমি একবার দোতলায় আসি। নিজের ঘরে যাবার জন্যে। তখন কিন্তু কাউকে দেখিনি।

—শিবাজীদার দিকে একবারও লক্ষ্য করেননি?

—হ্যাঁ, ওনার চিরাচরিত অভ্যাসমতো মাথা হেঁট করে বসেছিলেন।

—কেন? এভাবে বসার কারণ?

—রাত্রে ওনার ঘুম হয় না। ইনসমনিয়া পেশেন্ট। ঘুমের ওষুধ খেয়ে বিছানায় উঠে বসে ওই ভাবে মাথা হেঁট করে ঘুম আনানোর চেষ্টা করতেন। তারপর একসময় শুয়ে পড়তেন।

—তখন কটা হবে?

—প্রায় সাতটা।

—প্রায় নয়। ঠিক করে বলুন। একটু মনে করে বলুন।

—সাতটা হবেই। মেয়েরা সব আমার ঘরে নয়তো ছোট বউমার ঘরে সাজছিল। আমার ওপরে ওঠার কারণ, ওদের তাগাদা দেবার জন্যে।

—ঠিক আছে। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। শুধু একটা প্রশ্ন, এই মৃত্যুর গতি প্রকৃতি দেখে যেটা মনে হচ্ছে—তিনজন মানুষ আপনার স্বামীকে খুন করতে চেয়েছিলেন। আপনার স্বামীর কোন বিশেষ শত্রুর কথা কি আপনার মনে পড়ে? বা কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?

মাথা নাড়তে নাড়তে মহারানী বললেন, —আমার মাথায় আর কিছু আসছে না।

নীল উঠে দাঁড়াল, বলল—আমি একবার পাশের ঘরে যাব। সবাইকে একটু আলাদাভাবে কিছু প্রশ্ন করব। আপনার তাতে কোন আপত্তি নেই তো?

—এটা আপনি কী বলছেন দাদা? আপনিতো আমাদের ঘরের লোক। আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের জায়গায় বসিয়েছি।

—ওয়েল, বলে নীল এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে, ঘুরে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, এমন কাউকে কী আপনি চেনেন, যার একটা হাত নেই, সেদিন সে আপনার বাড়িতে এসেছিল এবং সন্দেহজনক ভাবে চলে গেছে। ফাংশন আরম্ভ হবার আগেই।

অদ্ভুত ফ্যাকাশে চাহনি সমেত নীলের মুখের দিকে তাকিয়ে মহারানী বললেন, —একটা হাত নেই এরকম কাউকে আমার জানা নেই। ডেকরেটর বা ক্যাটারারের কেউ হবে না তো?

—তা হতে পারে। বলে নীল পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে রচয়িত্রী একা বসে ছিল গালে হাত রেখে। নীল যেতেই ও বলল, —আসুন নীলকাকু। মাকে প্রশ্ন করা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ, মোটামুটি। তোমাকে দু একটা প্রশ্ন করব।

—আমার বিয়ে হয়ে গেছে প্রায় বছর চারেক। এ বাড়িতে আসা যাওয়াও কমে গেছে। আমি কী তেমন ভাবে কিছু বলতে পারব?

—যেটুকু জান সেটাই বলবে।

—বেশ প্রশ্ন করুন।

—তোমার স্বামী পঞ্চদীপবাবুকে তো প্রায়ই বিদেশ যেতে হয়, তাই না?

—হ্যাঁ, ছবি আর স্কাল্পচার নিয়ে ওকে তো বেশিরভাগ সময়েই ওখানে কাটাতে হয়।

—উনি স্কাল্পচারও করেন?

—হ্যাঁ। উনি স্কাল্পচারে তো গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ওনার বিখ্যাত একটি কাজ এখনও গেলে দেখতে পাবেন। ডান্সিং নটরাজ।

—বাহ্, এটা তো আমার জানা ছিল না। তা উনি কী ওঁর শ্বশুরমশায়ের অ্যান্টিক কালেকশনের ব্যাপারটা জানতেন?

—কলকাতায় এলেই শ্বশুর জামাইয়ে কত আলোচনা। সব থেকে মজার কথা যে পঞ্চদীপকে উনি বিয়ের আগে পাত্র হিসেবে নাকচ করে দিয়েছিলেন, পরে তাকেই বেশি আপন করে নিয়েছিলেন।

—নাকচ করেছিলেন কেন?

—বাবা একটু উন্নাসিক ছিলেন। পঞ্চদীপ তখন চালচুলোহীন বেকার আর্টিস্ট। নিরোজগেরে। তারওপর আমরা পিতৃকূলে ব্রাহ্মণ। কিন্তু পঞ্চদীপ হচ্ছে সেন। মানে সোনার বেনে।

—কিন্তু সেদিন আরাধ্য বলল শিবাজীদা জাত মানতেন না। বরং তোমার মা-ই আপত্তি করেছিলেন।

—না। ভুল কথা। মা ছিল বলেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

—আই সি। তা সেদিন কী শিবাজীদার সঙ্গে তোমার স্বামীর দেখা হয়েছিল?

—মনে হয় না। বাড়ি এসেই তো আমরা শুনলাম বাবা অসুস্থ। আর তারপরেই পঞ্চদীপ বেরিয়ে গেল। ওর সেদিন জার্মান কনস্যুলেটে কারো সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল।

—কদিন আছেন উনি?

—আর দিন পনেরো।

—তুমি ওর সঙ্গে কখনো বাইরে যাওনি?

—একবার গিয়েছিলাম। বিয়ের পর। প্যারিস।

—তোমার বাবা কী কোন উইল করে গেছেন?

—বলতে পারব না। তবে আমরা কিছু পাচ্ছি না সেটা জানি। কারণ বিয়ের পর আমার স্বামীকে উনি নানাভাবে প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তারপর বিদেশ যাবার খরচও মাঝে মাঝে দিতেন। বাবা আমার স্বামীর জন্যে যা করেছেন, এরপর আর কিছু আশা করা উচিত নয়।

—ঠিক আছে। আভাস তো বাড়ি নেই শুনলাম। তুমি কী একবার তোমার বড়দাকে ডেকে দেবে?

—হ্যাঁ দিচ্ছি। বলে রচয়িত্রী বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীপু এসে ঘরে ঢুকল।

নীল বলল—তুই হঠাৎ এলি কেন? তোকে যেটা বললাম—

—ব্যাপার আছে গুরু। জানিনা, এটা তোমার কোন কাজে লাগবে কিনা। তবে পেলাম। দেখ কোন কাজে আসে কিনা।

দীপু পকেট থেকে দোমড়ানো একটা কাগজ নীলের হাতে তুলে দিল। নীল খুলে পড়ল,—অর্ধনারীশ্বর লুকিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। ওটা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিও। নইলে তোমার স্বামীর কাছেই তোমাকে পাঠিয়ে দোব।

নীলের মুখ উদ্ভাসিত হল, বলল—বলিস কিরে? কোথায় পেলি এটা?

—বাসি ফুলের গাদায়। আজকেই চলে যেত। কারণ ঘরদোর আজ পরিষ্কার হচ্ছে।

—গুড। খুব ভালো কাজ করেছিস। জায়গাটা আরো ভালো করে খুঁজে দেখ। আরও কিছু পেতে পারিস। বিশেষ করে অ্যাট্রোপিন সালফেটের কোন শিশি। পাবিনা। তবু খোঁজ।

বলতে বলতেই আরাধ্য ঘরে ঢুকল। দীপু বেরিয়ে গেল। এই কদিনে আরাধ্যকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে।

—আমায় ডেকেছেন কাকু?

—হ্যাঁ, বোস। তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে। সেদিন আর বিরক্ত করিনি।

অপ্রতিভ সলজ্জ হাসি হেসে আরাধ্য বলল, —হ্যাঁ, সেদিন পরিবেশটাই অন্যরকম ছিল। ঠিক আছে আপনি প্রশ্ন করুন।

- -আজ তুমি কর্মস্থলে যাওনি?

—যাব। পরের সপ্তাহ থেকে।

—এখন কে দেখাশুনো করছে?

—ঋষি। ওইতো ম্যানেজার।

—তোমার বাবার এই বিশ্রী হত্যাকাণ্ডের জন্যে তোমার কী কাউকে সন্দেহ হয়?

—আমি তো বুঝতেই পারছি না, বাবার কোন শত্রু ছিল কিনা?

—কেন, কোন এক 'খরগোস' তোমার বাবার একটা কালেকশনের জন্যে এক কোটি টাকার অফার দিয়েছিল।

—আপনি ওই অর্ধনারীশ্বরের কথা বলছেন।

—হ্যাঁ। এবং ওটা না পেলে খুনের হুমকিও দিয়েছিল।

—কিন্তু সেটাতো সে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাহলে আর খুন করা কেন?

—তাহলে কী অন্য কোন শত্রু ছিল?

—কি জানি আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

—পারিবারিক কোন শত্রু?

—আমাদের পরিবারে তো গণ্ডগোল কিছু নেই।

—উইল সংক্রান্ত কোন ডিস্‌পিউট?

—উইলে কী আছে জানি না। আদপেই উইল হয়েছে কিনা সেটা আমাদের সলিসিটার মিস্টার মজুমদারই বলতে পারবেন। মা হয়তো জানতে পারেন। তবে আশা করা যায় মার আর আমাদের দুভায়ের মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ থাকবে।

—তোমার বোন? আইনত সেও তো একজন অংশীদার।

—না সে ব্যাপারে বাবা তাঁর ডিসিশন জানিয়েও গেছেন। পঞ্চদীপকে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে। শর্ত একটাই। ভবিষ্যতে আমাদের ব্যবসায় বা সম্পত্তিতে কোন দাবি জানাবে না।

হঠাৎ নীল প্রসঙ্গ পাল্টে একটা অন্য প্রশ্ন করল, —আরাধ্য, একটা কথা তোমাকে অনেকদিন জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম। করা হয়নি।

—কী প্রশ্ন কাকু?

—এখন তো কলকাতায় প্রচণ্ড গরম। আমরা সুতির টি শার্ট বা হাত কাটা পাঞ্জাবি পড়ে কাটাই। কিন্তু আমি বরাবরই দেখছি তুমি ফুলস্লিভস পরো সর্বদাই এবং হাত না গুটিয়ে। তারওপর ডানহাতে সুতির দস্তানা। এটা কী তোমার অভ্যেস?

—তাই বলতে পারেন। ছোটবেলা থেকেই এটা আমার একটা ফ্যাশনও বলতে পারেন। প্রথমত হাত গুটিয়ে পড়লে আমার নিজেকে কেমন যেন আনস্মার্ট মনে হয়। আর কালো দস্তানার অন্য কারণ আছে। ছোটবেলায় রঙমশাল জ্বালাতে গিয়ে ডান হাতটা পুড়ে গিয়েছিল। পোড়ার জ্বালাটা গেছে। কিন্তু বিশ্রী দাগটা ভয়ানকভাবে রয়ে গেছে। তাই দস্তানার আড়াল।

—তুমি বোধহয় তোমার মায়ের ধাঁচে চুলটা পেয়েছ—তাই না?

—এই কোঁচকানো চুলের কথা বলছেন? হ্যাঁ, কোঁচকানো ব্যাপারটা আমার মায়ের থেকেও বেশি। হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—রচয়িত্রীকেও দেখলাম। আভাসকেও দেখেছি। ওদের দুজনেরই প্লেন চুল। তোমারটা অনেকটা নিগ্রোহেয়ার বলেই জিজ্ঞাসা করলাম। এটা জাস্ট একটা কৌতূহল। নাথিং মোর। অবশ্য জিনেটিক হতে পারে। ঠিক আছে তোমাকে আর কিছু জিগ্যেস করার নেই। তুমি বরং প্রভাতীকে একবার পাঠিয়ে দাও।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে প্রভাতী চলে এল। প্রভাতীর সঙ্গে তার খুব একটা তেমন কথাবার্তা হত না। শিবাজীবাবু বেঁচে থাকাকালীনই ও লক্ষ করেছে প্রভাতী বরাবরই একটু ইনট্রোভার্ট টাইপ। কারো সঙ্গে খুব একটা হইচই করা স্বভাবটা ওর মধ্যে ছিল না। আরও একটা ব্যাপার ও লক্ষ্য করেছিল মেয়েটা খুব একটা নিজের ঘর থেকে বেরতো না। অন্য সবাই যখন খোশমেজাজে গল্পটল্প করছে প্রভাতী নিজের ঘরে বসে হয় বই পড়ছে নয়তো কোন উলটুল বুনছে। ও বরাবরই একটা অহংকারী দূরত্ব নিজের চারপাশে ঘনিয়ে রাখত। নীল অবশ্য এনিয়ে কোনদিনও তেমন করে কিছু ভাবেনি। এক একজনের স্বভাব ওই রকমই। তবে মেয়েটার মধ্যে কোথাও যেন একটা আলগা বিষাদ লুকিয়ে ছিল। বরাবরই।

—আমায় ডেকেছেন?

—হ্যাঁ প্রভাতী। বোস। তোমাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করার ছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কী কারণে?

—হ্যাঁ পারছি। তবে আমার শ্বশুরমশাই সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু তো জানা নেই।

—না। তোমার শ্বশুরমশাই সম্বন্ধে কিছুই জিগ্যেস করব না। এটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।

—বেশ বলুন।

—তুমি কতদূর লেখাপড়া করেছ?

—হিস্ট্রি নিয়ে এম এ পাশ করেছি।

—রণবীর ভদ্রই তো তোমার বাবা?

—হ্যাঁ।

—ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড, তোমাদের কী লাভ ম্যারেজ?

—না।

—এ বাড়িতে একটা অর্ধনারীশ্বরের স্টোন স্ল্যাপ ছিল। একটা কিউরিওশপ থেকে ওটা কেনা হয়েছিল। খুব দামি জিনিস।

—জানি।

—কেউ একজন ওটার দাম অফার করেছিল প্রায় কোটি টাকা।

—তা হবে।

—লোকটা কে হতে পারে?

—বলতে পারব না।

—কোন খোঁজ টোঁজ করনি?

—আমার নিজের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই।

—তোমার শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে তোমার শাশুড়ি মায়ের সম্পর্ক কেমন ছিল?

—খুব ভালো।

—আমার উপায় নেই তবু জিগ্যেস করছি, তোমার শ্বশুরমশাইয়ের কোন ব্যক্তিগত শত্রু সম্বন্ধে কী তোমার কোন ধারণা আছে?

—আমার সঙ্গে আমার শ্বশুরমশায়ের খুব কম কথা হত। তাও সব মামুলি কথা। এসব ব্যাপারে তো নয়ই।

—যেদিন উনি মার্ডার হন, আই মিন সেদিন সন্ধে সাড়ে ছটা থেকে সাতটা পনেরো এই সময়টা তুমি কোথায় ছিলে?

—আমার ঘরে।

—শাশুড়ির ঘরে বা দোতলার হলঘরে যেখানে তোমার শ্বশুরমশাই ডিভানে শুয়ে ছিলেন, সেখানে একবারের জন্যেও কী তুমি যাওনি?

—না।

—এ বাড়িতে সেদিন কোন অবাঞ্ছিত লোককে কী তুমি দেখেছিলে? মানে যে লোকটার আসার কথা নয়, তবু এসেছিল।

—এ বাড়িতে কে যে নিমন্ত্রিত আর কে নয় সেটাই আমি জানতাম না।

—কিন্তু তোমার বাবা মা এসেছিলেন।

—তাঁরা তো অবাঞ্ছিত নন।

—রাইট। এবার দুটো ব্যক্তিগত কথা জিগ্যেস করি। তোমার ছেলেমেয়ে কটি?

—একটি মেয়ে। ঝুম্পা।

—তোমার সঙ্গে তোমার শাশুড়ির সম্পর্ক কেমন?

প্রভাতী সামান্য চুপ করে থেকে বলল, —আমরা দুই মেরুর লোক। আমি সাধারণ সাজপোশাক পড়তেই ভালবাসি। কিন্তু আমার শাশুড়ি উগ্র সাজে বিশ্বাসী। উনি এখনও বিউটি পারলারে যান। মুখে ব্লীচ করান। চুলে কলপ করেন। ওনার এখনও অনেক বয়ফ্রেণ্ড আছেন। পার্টিতে যান। মদ্যপানও করেন। তাদের সঙ্গে হইচই করেন। যেগুলো আমি একেবারেই পছন্দ করি না।

—এ নিয়ে তুমি কিছু বলনি?

—না। সেটা আমার স্বভাবের বাইরে। তাই ওনাকে আমি অ্যাভয়েড করে চলি। আসলে আমার বাবা এদের স্ট্যাণ্ডারের লোক নন। আমি সেইভাবে মানুষও হইনি। ফলে একটা দূরত্ব রয়েই গেছে। তবে এ নিয়ে কোনদিনও কোন তিক্ততা হয়নি।

—তুমি কী শাশুড়ির ঠাকুর ঘরে যেতে?

—আমার এই সব পুতুল পূজোয় কোন বিশ্বাস নেই। বোধহয় সেই কারণেই মা কোনদিনও আমাকে ওনার পূজোর ঘরে যেতে দেননি।

—আর একটা প্রশ্ন!

—হ্যাঁ বলুন।

—তোমার স্বামী, আই মিন আরাধ্য, ওকে সর্বদাই ফুলহাতা শার্ট পরতে দেখি। এটা কেন জানতে ইচ্ছে করছে।

—ওনার ডান হাতে একটা বিশাল কালো জরুল আছে। প্রায় পুরো হাতজুড়েই। যেটা ওর শরীরের রঙের সঙ্গে একেবারে বেমানান। তাই উনি হাত ঢেকে রাখেন। এবং দস্তানাও পড়েন।

—এটা কী ওর জন্ম থেকেই?

—হ্যাঁ। উনি তাই বলেন।

—কিন্তু আরাধ্য বলল ছোটবেলায় রং মশালের আগুনে —

—আমাকেও তাই বলেছিলেন। ব্যাপারটা খুবই নেগ্‌লিজিব্‌ল্। তাই আর—

—ঠিক আছে প্রভাতী, আর তোমায় কিছু জিগ্যেস করব না। তুমি বাড়ির কাজের ছেলেমেয়েদের একটু পাঠিয়ে দাও।

প্রভাতী ঘর ছেড়ে চলে যায়। প্রথমেই আসে শেফালি। রান্নার বউ। বছর চল্লিশ বেয়াল্লিশের মতো বয়েস। কালাকুলো দেখতে।

—তোমার নাম তো শেফালি?

—হ্যাঁ বাবু।

—কদ্দিন কাজ করছ?

—বছর ছ সাত তো হবে।

—শুধুই রান্নারই কাজ কর।

—হ্যাঁ বাবু।

—যেদিন তোমার বাবু মারা যান, সেই সময়টা তুমি কী করছিলে?

—সেদিন অনেক চা সরবৎ করতে হয়েছিল। তাই করছিলুম।

—তার মানে রান্নাঘর থেকে তুমি বেরোতেই পারনি?

—না বাবু।

—এই সময় তোমার কাছে কেউ জলটল খেতে চেয়েছিল?

—না। যারা খাবার দেবার জন্যে এসেছিল তারাই তো জল দিচ্ছিল। না কেউ আসেনি।

—তোমার কী কাউকে সন্দেহ হয়? তোমার বাবু এই ভাবে খুন হলেন।

—না বাবু। কাকে সন্দেহ করব? সবাই তো নিজেদের লোক।

—আভাস ছেলেটা কেমন?

—বড় মুখরা। আমাদের সঙ্গে কথাই বলত না। বড়লোকের ছেলে। তাই দেমাকী?

—আর আরাধ্য?

—ভালো ছেলে বাবু। ওর মধ্যে তেমন দেমাক টেমাক নেই। আমাদের সঙ্গে দরকার হলে কথা বলেন।

—আর শিবাজীদার মেয়ে?

—মেয়েটা ভাল। তবে ওর বরটা বাপু কেমন? এখানে এলে বেশিরভাগ সময় বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলত। মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হত। সেদিন তো বেশ ঝগড়াই হয়েছিল।

—ঝগড়া হয়েছিল কেন? কী নিয়ে?

—এ বাড়িতে একটা অশান্তির জিনিস ঢুকেছে। ওই যে শিবের মূর্তি না কী একটা পাথর ওই নিয়েই তো অশান্তি।

—কী রকম?

—কে একজন নাকি এক কোটি টাকা দর দিয়েছিল। বড়বাবু বেচবেন না। আর ওনার জামাই বারবারই বেচার কথা বলতেন। এই নিয়েই শ্বশুর জামাইয়ে ঝগড়া। বচসা।

—শেষ ঝগড়াটা কবে হয়েছিল?

—শনিবার রাতে। ওই আপনার কাজের আগের দিন। জামাই দাদা চলে গেলে তারপরেই বাবুর বুকের ব্যথা শুরু হল। সেদিন রাত থেকেই তো উনি শয্যাশায়ী।

—কাজের দিনে কোন নতুন লোকজনকে আসতে দেখেছিলে?

—আমি আর কজনকে চিনি? আমার কাছে সবাই নতুন।

—ঠিক আছে। তুমি এখন এসো। আর কাউকে পাঠিয়ে দাও।

এল বাবলু। অল্পবয়েসি ছেলে। খুব চনমনে। পোশাক পরিচ্ছদে বাড়ির চাকর বলা যাবে না।

—কদিন কাজ করছ?

—তা স্যার বছর চারেক।

—যা মাইনে পাও তাতে চলে যায়?

—না গেলেও যায়।

—সিনেমা টিনেমা দেখার অভ্যেস আছে তাই না?

—কি করব? টিভি থাকে বড়বাবুর ঘরে। চাকরবাকরদের দেখা বারণ। তাই।

—এখন তো সিনেমার টিকিটের বেশ চড়া দাম। ম্যানেজ হয়ে যায়?

—হয়ে যায়।

—কোত্থেকে ম্যানেজ হয়? যা রোজকার কর তাই দিয়েই হয়?

—না না, তা হবে কোত্থেকে? মাস শেষ হলেই বাবা এসে বারোআনা টাকাই নিয়ে যায়।

—তাহলে?

—বড় বাড়িতে অনেক কিছু ছড়ানো থাকে। হিসেবের বালাই থাকে না। ম্যানেজ করতে হয়।

—অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিটা কে সরালো? তুমি নাকি?

—দূর, ও পাথরটা নিয়ে আমি কী করব?

—সেদিন একটা উট্‌কো লোক বাড়িতে এসেছিল। দেখেছিলে?

—কালো মতন?

—হতে পারে।

—হাত নুলো?

—হ্যাঁ তাও হতে পারে।

—তাহলে দেখেছি। বড় বাবুর কাছে একবার গিয়েওছিল।

—তারপর?

—আমার কী আর সেদিন কোথাও দুদণ্ড বসার উপায় ছিল। তাঁতের মাকুর মতো একবার এখানে একবার ওখানে।

—অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সে কোথায় গেল তাও দেখনি?

—নাহ্‌।

—তোমার কোন গার্লফ্রেণ্ড আছে?

—সেটা কী?

—কোন মেয়ে বন্ধু?

—পাশের বাড়ির শিপ্রা। বেশ মেয়ে বুঝলেন। মেয়েটা আমায় বিয়ে করতে চায়। তাই বাবুর অফিসে বেয়ারার চাকরি চেয়েছিলুম। তা বাবু এমন দূরদূর করে তাড়িয়ে দিল। তবে এ বাড়ির জামাই মানুষটা বেশ ভাল। হাত পাতলেই কিছু না কিছু দিয়ে দেন।

—কত করে দেন?

—মিথ্যে বলব না। তা দেন। যখন যেমন হাতের কাছে থাকে। এই তো এই ঘড়িটা। চাইলুম, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

—এর বদলে তোমায় কিছু করে দিতে বলেননি?

—না। তেমন কিছু তো বলেন না। তবে একবার বলেছিলেন?

—কী?

—বলা যাবে না। বাবুর কাছে 'কিরে' আছে। সে অধম্মো আমি করতে পারব না। তবে বাবু আমায় একটা চাকরি দেবে বলেছে। চাকরিটা পেলেই শিপ্রাকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাব। এই রে অনেক কিছু বলে ফেললুম। দেখবেন আপনি আবার কাউকে যেন এসব বলবেন না। তবে বাবু—

বাবলু হঠাৎ চুপ করে গেল। নীলও ছাড়ার পাত্র নয়। ও বলল, —আরে বাবা, আমি কি আর কাউকে বলতে যাচ্ছি। না সেটা আমার স্বভাব?

—ঠিক আছে বললে বলবেন। আমি তো এ বাড়িতে আর বেশিদিন নেই। চাকরিটা পেলেই—

—কী যেন বলছিলে?

—এ বাড়িতে কিছু একটা গণ্ডগোলের কেস আছে। ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আছে। বড়দাদা আর বৌদিমণির মধ্যে এই নিয়ে বেশ কথা কাটাকাটি হয়।

—বউদি মানে প্রভাতী কি?

—তবে আর বলছি কী? উনি তো আবার ভাজা মাছ উল্টোতে জানেন না।

—তার মানে কথাটা কী জানতে পারনি?

—না। তবে তালে আছি।

—ঠিক আছে তোমায় আমি হাজার টাকা বকশিশ দোব। কথাটা জানতে পারলে আগে আমায় খবর দেবে। নইলে কিন্তু—

—হাজার টাকা? সত্যি বলছেন? ঠিক আছে স্যার। সে সব দিকে বাবলু সাহা খুব সান্টিং জানে। তালে আমি যাই।

—হ্যাঁ এসো। তুমি রমাকে পাঠিয়ে দিও।

—রমা? বহুৎ খলিফা মেয়ে। ও অনেক হাঁড়ির খবর রাখে। ও অবশ্য আরও খবর দিতে পারবে। তবে বাবু, ওই হাজার টাকা—

—পাবে। তুমি এখন রমাকে পাঠিয়ে দিও।

বাবলু নমস্কার করে চলে গেল। খানিকক্ষণ বাদে রমা এল। এই মেয়েটাকে এর আগেও দেখেছে। এক একটা মেয়ে আছে যারা খুব চটুল ধরনের। সাজ পোশাকের চটক ছাড়াও যৌবনের ঔদ্ধত্যের জন্যে একটা আদেখলা হ্যাংলামিও চালিয়ে যায়। বয়েস বছর কুড়ি বাইশের মধ্যে। এর সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা শোনা গেলেও নীল এতদিন ও নিয়ে কিছু ভাবেওনি। কিন্তু আজ ভাববার সময় এসেছে।

রমা এসে ওর অভ্যেস মতো শরীর দুলিয়ে দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। চোখে মুখে এবং শরীরে একটা উদগ্র কামনা ছড়ানো।

নীল মনে মনে ভাবল শিবাজীদা কিভাবে এই মেয়েটিকে কাজে বহাল রেখেছিলেন? বাড়িতে দুজন যুবক ছেলে উপস্থিত থাকতে।

নীল সামান্য ভুরু কুঁচকে বলল,—ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সামনে এসে বস।

ঠেস দেওয়া অবস্থাতেই রমা বলল, —কেন? সামনে যাব কেন? কী আনতে হবে বলুন না। এনে দিচ্ছি।

স্বরটাকে সামান্য রূঢ় করে নীল বলল, — কোন কিছুই আনতে হবেনা, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। তুমি বোধহয় জানোনা পুলিসের অনেক মাথাঅলা লোকের সঙ্গে আমার ওঠাবসা।

পুলিসের নামে সামান্য থমকালেও, ভাঙা চুড়োর কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

—ক্যানো, সে বাবুটা এসে তো অনেক প্রেশ্ন টেশ্ন করে গেছে।

—পুলিস কী প্রশ্ন করেছে সেটা পুলিসের ব্যাপার, আমারটা কিছু অন্য প্রশ্ন।

—বাবা, মরল একজন, ঝি চাকরদের নিয়ে টানাটানি। তা বল কী বলবে?

—রোজ রাতেই শিবাজীদা মদ খেতেন, তাই না?

—বড়লোকেরা ওসব খেয়েই থাকে।

—তোমায় যা জিগ্যেস করছি হ্যাঁ বা না উত্তর দাও। আর একটা কথা শুনে রাখ, কোন মিথ্যে কথা বললে তুমি কিন্তু ফেঁসে যাবে।

—এ তোমাদের কেমন ধারা বিচার?

—সভ্যসমাজের এটাই বিচার। যা জিগ্যেস করলাম তার উত্তর দাও।

—হ্যাঁ খেত।

—কে মদটা এগিয়ে দিত?

—কে আবাব দেবে? এই পোড়ারমুখি।

—জল দিয়ে না সোডা দিয়ে।

—ফ্রীজের জল দিয়ে।

—সেদিন, মানে যেদিন উনি মারা যান, সেদিন কে দিয়েছিল?

—তা বলতে পারবনি।

—তোমার তো মেইনডিউটি ছিল বড়বাবুকে দেখাশুনো করার।

—করতুম তো।

—তাহলে সেদিন মদের পেয়ালাটা তুমি না দিয়ে অন্য লোক দিয়েছিল কেন?

—সেদিনে চারদিকে সব ডামাডোল। কে কোথায় কখন কি খাচ্ছে, কি করছে তার হিসেব কে রেখেছে।

—উনি কোন সময় ড্রিংক্ষ করতেন?

—রাত নটার পরে।

—তোমার মা কোন আপত্তি করতেন না?

—এ বাড়িতে বড়দাদাবাবু আর বড়বউদি ছাড়া আর সবাই মদ খায়।

—তোমার মাও খান।

—খায়না আবার! না খেলে তেনার রাতে ঘুমই হবে না।

—আভাস?

—ওব্ বাবা। তিনি তো সকালবিকেল যখন খুশি খান।

প্রশ্ন পান্টাল নীল, —অর্ধনারীশ্বরের যে দামি পাথরটা চুরি হয়ে যায়, সেটা কে নিয়েছে?

—ওসব আমি জানিনা।

—তুমি জানো। এ বাড়ির কোথায় কী হচ্ছে সব তুমি জান।

—ওই ঢ্যামনাটা বলেছে বুঝি?

—কার কথা বলছ?

—বাবলু গো বাবলু। আমার পেছনে ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকে।

—বাবলু কী মিথ্যে কথা বলেছে?

—এটা মিথ্যে কথা। ও শিবটিবের কথা আমি কী করে জানব?

—বড়দাদাবাবু আর বড়বউদির মধ্যে কী নিয়ে ঝগড়া হয়?

—কারো ঘরে আড়ি পাতা আমার অভ্যেস নয়। সোয়ামী স্ত্রীর ঝগড়ায় আমার নাক গলানোর কী আছে?

—কিন্তু তুমি আড়ি পাতো। এবং নাকটাও গলাও। এখন বলো কী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল?

—এতো ভারী জ্বালাতন। বললুম তো জানিনা। আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজে কী দরকার?

—অম্বরীশবাবু বলে একজন লোক এ বাড়িতে প্রায়ই আসে। কার সঙ্গে তিনি গল্প করেন?

—সে কথা সবাই জানে। মায়ের সঙ্গে।

—বাবু থাকতে আসতেন?

—তিনি তো দুপুরে আসেন। বাবু তখন কোথায়?

—আভাস ছেলেটা কেমন?

রমা যেন হেসে গড়িয়ে গেল।

—হাসছ কেন?

—মাতালরা কেমন হয় জানোনা?

—তোমার সঙ্গে তার দোস্তি কেমন?

—ঝি চাকরদের সঙ্গে বাবুদের দোস্তি হয় নাকি? তবে আমাকে সবাই ভালবাসে। বড় বাবু থেকে আরম্ভ করে ছোটবাবু, সবাই।

—এ বাড়িতে কে কে তোমায় আলাদা করে টাকাকড়ি দেয়? সত্যি কথা বলবে।

—অ্যাতো সব প্রশ্ন করছ কেন বলতো?

খুব কঠিন গলায় নীল বলল, —দরকার আছে তাই। তুমি জানো তোমার বড়বাবু অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। এবং সে সময় তোমরা সবাই বাড়িতে ছিলে?

—তার মানে আমরা সবাই মিলে খুন করেছি, তাই বলছ?

—সবাই মিলে করেছ কিনা জানি না, তবে তিনজন করেছে। আলাদা আলাদা ভাবে। তা সে তিনজন কে হতে পারে? তোমার বড়বাবুর ওপর কার সব থেকে বেশি রাগ?

—বড়বাবুর ওপর সবারই রাগ।

—কেন? উনি কী তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন?

— তেনাকে দেখলে বেশ শান্তশিষ্ঠ মনে হয়। তবে রাগলে কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না।

—সব থেকে বেশি বকাঝকা কাকে করতেন?

—মেজোবাবু আর জামাইবাবুকে।

—কেন?

—দুজনেরই টাকার খুব দরকার। যখন তখন টাকা চাইতেন। বাবুর সেটা ইচ্ছে নয়। তাই।

—তোমার ওপর রাগ করতেন না?

আবার খিলখিল করে হাসি।

—হেসো না যা জিগ্যেস করছি উত্তর দাও।

—আমাকে না হলে বড়বাবুর চলতই না।

—তোমার দেশ কোথায়?

—বর্ধমান।

—কে আছে সেখানে?

—বাপ মা ছিল। মরে গেছে। আর কেউ নেই।

—এখানে কে এনেছে তোমায়?

—সর্ববাবু।

—শিবাজীদার বড়শালা সর্বময় পাঠক?

—হ্যাঁ।

—এই শালাবাবুটির সঙ্গে শিবাজীদার খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না তাই না?

—থাকবে কোত্থেকে?

বলেই রমা আচমকা চুপ করে গেল। নীল তাগাদা দিল, —কী হল চুপ করে গেলে কেন?

—না পুলিসবাবু, আমি সে সব কথা বলতে পারবনি। তালে সর্ববাবু আমাকে কেটে ফেলবে।

—তার মানে কোন শালাবাবুর সঙ্গেই তোমার বড়বাবুর সম্পর্ক ভাল ছিল না?

—নাহ্।

—সর্বময়বাবুর অবস্থা কী রকম?

—মায়ের বাপের কূলের কারোরই অবস্থা তেমন ভালো নয়। গরীবদের বাবু খুব একটা পছন্দ করতেন না।

—অথচ তোমায় তিনি খুব পছন্দ করতেন। ঠিক আছে তুমি এখন এসো। ও হ্যাঁ আর একটা কথা, তুমি কোনদিনও কী আরাধ্যকে খালি গায়ে দেখেছ?

—কই নাতো?

—স্নানটান করার সময়?

--ওনার তো ঘরের মধ্যেই কলঘর আছে। সবার ঘরেই আছে।

—যদি কোনদিন সুযোগ পাও, কায়দা করে দেখে নিও। আর কী দেখলে সেটা আমায় জানাবে। তুমি কিন্তু অনেক কথা লুকিয়ে গেলে।

—সর্ববাবুর কথা ছাড়া আর সবই তো বলেছি।

—না বলনি। এ বাড়িতে গোপনে একটি লম্বা চওড়া, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, একটা হাত নুলো, আসতো। সেটা তুমি জান।

—বাবুর কাছে তো অনেক লোকই আসে। সবাইকে কী মনে রাখা যায়?

—কিন্তু এই লোকটাকে তোমারও মনে আছে। শোন, এই বিশেষ লোকটাকে আমার বিশেষ দরকার। আবার যদি কখনো আসে আমায় সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে। টেলিফোন করতে পার?

—পারি। যখন বাড়িতে কেউ থাকবে না। নইলে আমাদের ঝি চাকরদের টেলিফোন ছোঁয়া বারণ।

—ঠিক আছে। তুমি টেলিফোন করবে। এই আমার নাম্বার। জবাব যা দেবার আমিই দোব। এখন তুমি যেতে পার। আর ভেবে দেখো সর্ববাবুর কথা যা তুমি এখন বললে না, সেটা বলতে পার কিনা।

মাথা নেড়ে রমা চলে গেল। নীলও উঠে পড়ল। মোটামুটি একটা ছবি পাওয়া গেল শাস্ত্রীভিলার। ও দোতলার হলঘরে এসে দেখল দীপু একটা সোফায় শুয়ে ঘুমচ্ছে।

ওকে একটু ঠ্যালা দিয়ে তুলে বলল, —ভালো লোককেই ভালো কাজ দিয়েছি।

—একা একা আর কতক্ষণ কড়িকাঠ গোনা যায়?

—এ বাড়িতে কড়িকাঠ নেই।

—ওই হোল আর কী? তোমার কাজ শেষ?

—আপাতত। চল বেরনো যাক।

—কিছু হদিশ পেলে?

—না। তবে তিনটি রহস্য লুকিয়ে আছে এ বাড়িতে। অর্ধনারীশ্বর চুরি—

—কিন্তু চুরি তো যায়নি?

—তুই জানলি কি করে?

—তুমি যখন মহারানীদেবীর সঙ্গে কথা বলছিলে, তখন একবার ওপরে গিয়েছিলাম।

—আড়াল থেকে শুনেছিস?

—না। আড়াল থেকে আর একজন শুনছিল। তাকে চাপ দিতেই বলে ফেলল।

—কে সে?

—মহেশ বলে এ বাড়িতে একটা লোক কাজ করে।

—হুঁ। মহেশকে তো বারণ করে দিতে হবে।

—করতে হবে ন। আমিই বারণ করে দিয়েছি। আর দুটো রহস্য কী?

—অম্বরীশ পাঠক এ বাড়িতে প্রায়ই আসে। কেন?

—পুরনো প্রেমের তাগিদে।

—এবং সেটা এন্টারটেইন করেন মহারানী দেবী। অথচ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নাকি প্রগাঢ় প্রেম ছিল।

—স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম। সবটাই হয়তো লোক দেখানো। এনিয়ে পরে ভাবা যাবে।

—আর কী রহস্য?

—একটা কালো ঢ্যাঙা, কোঁকড়ানো চুল, যার একটা হাত নেই, লোকটা প্রায়ই আসতো শিবাজীবাবুর কাছে। কেন? কী সম্পর্ক তার এ বাড়িতে? একবার পার্ক স্ট্রীট যেতে হবে।

—পার্ক স্ট্রীটে? কেন?

—সেই কিউরিও শপে।

—কবে যাবে?

—কাল হলে পরশু নয়।

—ওকে বস। চল বাড়ি যাই।

বেরবার মুখে কল্পিতার সঙ্গে দেখা, —কী কাকু চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, আমি যাই।

—বাবার মৃত্যুর কোন কিনারা হবে?

—হতেই হবে। তোমার বরতো বেরিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। আর তার ফেরারও কোন ঠিক নেই।

—দোকানে গেলে পাব?

—দেখতে পার।

—তোমার শাশুড়ি মাকে বলে দিও আমি চলে গেছি।

আর কোন কথা হল না। ওরা বেরিয়ে এল শাস্ত্রী ভিলা থেকে।

চার

পার্ক স্ট্রীটে খোন্দকার আলী খানের কিউরিও শপের দোকান খুঁজে পেতে বেশি বেগ পেতে হল না। ক্যামাক স্ট্রীটের মুখে বেশ বড়সড় দোকান। আলী সাহেব দোকানেই ছিলেন। সাধারণ ক্রেতা হিসবে গিয়ে খুব একটা বিশেষ লাভ হত না। আসল জায়গায় পৌছতে পৌছতে অনেক ভনিতা করতে হয়। আলি সাহেবকে ও প্রথমেই ওর আইডি কার্ডটা এগিয়ে দিল। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। প্রায় সত্তরের কাছে। কিন্তু এখনও বেশ তরতাজা চেহারা। গোঁফ কামানো। সাদা নূর। মাথার চুলও পাকা। তবে ফেজ ঢাকা। মলমলের একটা সাদা পাঞ্জাবী পরেছেন।

কার্ডটা দেখে সামান্য একটু ভুরু কুঁচকে বললেন, —আপ জাসুস হ্যায়? লেকিন বাবুজি, আমার এখানে তো কোই বুঢ়া কাম হয় না। তো, জাসুস কিস্ লিয়ে?

—আমি একটা ইনফরমেশন নিতে এসেছি।

—হাঁ হাঁ বাতাইয়ে। আগর হামসে আপকা কোই উপকার হোগা তো জরুর ম্যায় আপকো হেল্প করুঙ্গা।

—থ্যাঙ্কু আলি সাহেব। মিস্টার শিবাজী শাস্ত্রীকে নিশ্চয়ই আপনি চিনতেন?

—বিলকুল। বহত রহিস আদমি। আমার দোকান থেকে উনি বহত অ্যান্টিক পারচেজ করেছেন। বাবুজি ক্যায়সা হ্যায়? বহুত দিন বাবুজি আর দোকানে আসছেন না।

—বাবুজিকা কুছ দিন পহেলে দেহান্ত হো গিয়া।

—কেয়া বোলা?

—হ্যাঁ আলী সাহেব। হি ওয়াজ ব্রুটালি মার্ডারড্।

দীপু ভেবেছিল কথাটা শোনার পর আলি সাহেব হয়তো চমকে উঠবেন। কিন্তু না। উনি কাউন্টারের ওপর দুটো হাত ছড়িয়ে মাথাটা নীচু করে রাখলেন। দু তিন মিনিট ওই অবস্থায় রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে মাথা তুলে বললেন

—সাহাব, মেরা ভি অ্যায়সাই মালুম থা।

—আপনি জানতেন ঐ রকম একটা ঘটনা ঘটবে?

হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন আলি সাহেব, তারপর বললেন, —ওনার কাছে বহুত প্রেসাস এনটিক আছে। লেকিন, উসমেসে এক চীজ হ্যায় যো কিনা বহুত খতরনাক চীজ।

—কী বলুন তো সেটা?

—কোই আমজনতা কা পাস উস্‌কা কোই কিমৎ নেহি। লেকিন সমঝদার আদমির

কাছে উয়ো এক প্রেসাস চীজ হ্যায়।

—আপনি কী অর্ধনারীশ্বর প্লেটের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ বাবুজি। আমি উটার কথাই বলছি। সিটা দেখলে আপ বিলকুল কুছ সমঝ না পাউঙ্গি। লেকিন—

নীল ওঁকে বাধা দিয়ে বলল, —শিবাজী বাবু যেদিন ওই মূর্তিটা কেনেন সেদিন আমি ওর পাশেই ছিলাম।

আলিসাহেব এইবার নীলকে অন্য চোখে দেখলেন। তারপর বললেন—হাঁ বাবুজি। আভি ইয়াদ আয়া। হামি বুড়া হইছি তো, ঠিক মতো নজর লাগে না। হাঁ, আপনি তো উস্‌দিন থা। শাস্ত্রীসাহেব এই চীজটা দেখেই কিনতে চান। লেকিন আমি উনাকে বারণ করেছিলাম। যেন উনি সেটা পারচেজ না করেন।

—কেন বলুন তো?

—উসকা এক হিস্ট্রি আছে। উস্‌কা অরিজিন কিধার উও ম্যায় জানতা নেহি। লেকিন কোই আদমি, মালুম হোতা হ্যায় জঙ্গলকা কোই ডাকু, নেপালসে উয়ো চীজ লে আয়া ইণ্ডিয়ামে। ইসকি বাদ, হাত সে হাত ঘুমতে ঘুমতে ইণ্ডিয়াকা বাহার চলা গিয়া। আজ সে এক সাল পহেলে এক আদমি মেরা পাস আয়া বিকানেকে লিয়ে। অ্যাট আ গ্লান্স আমি উটাকে রিজেক্ট করেছিলাম। লেকিন উহো আদমি বোলা থা মেরা চোখ মুহুরি কা চোখ। হামাকে আউর মাইনুডলি দেখতে বোলেন। অ্যান্ড দেন আই ফাউণ্ড সামথিং প্রেসাস ইন ইট। উয়ো এক নেচারাল চীজ হ্যায়। অ্যাণ্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ভেরি আনকমন, বাট—

বাধা দিয়ে নীল বলল, —হ্যাঁ আমি জানি আপনি কী বলবেন। প্লেটটাতো গোটা ছিল না। ওটা অর্ধেক অংশ। বাকি অংশটা কোথায় কেউ জানে না।

—লেকিন আমি জানি, উসকা দুসরা পার্ট হ্যায় এক আদমি কা পাস।

—আইসি। বাকি অর্ধেকটা তাহলে পাওয়া গেছে?

—বিলকুল সাব। কিন্তু বাবু, যো আদমির কাছে উসকা হাফ পোরশন হ্যায়, উয়ো লোক দুসরা পার্ট খরিদ করনে চাতা। কেইসে নিউজ মিলা জানতা নেহি, লেকিন মেরা দোকান মে আয়া থা।

—তারপর?

—লেকিন হামি সেটা পাব কেমন করে? আমি সেটাই সেই বাবুকে বলেছিল। বাট হি ডিডনট বিলিভ মি। উসকা মালু হুয়া কি হাম যায়দা দাম কে লিয়ে উস্‌কা সাথ নটি গেম খেলছে। তো সেই বাবু হামাকে হিউজ অ্যামাউন্ট অফার দিয়েছে।

—কত?

—ওয়ান ক্রোড়। শোচিয়ে, এক ক্রোড়। নট আ ম্যাটার অফ জোক। তো আমি সে বাবুকে বলেছিলাম দু চার রোজ ওয়েট করতে।

—হুঁ। তারপর আপনি নিশ্চয় শিবাজীবাবুর কাছে কনট্যাক্ট করেন জিনিসটা ফেরৎ পাবার জন্যে?

—কোয়াইট ন্যাচারাল। আমি বিজনেস ম্যান আছি। তো হামি শিবাজীসাহেবকে উনকা পুরানা রূপয়া প্লাস অ্যানাদার ফিফটি থাউজ্যাণ্ড অফার করেছিলাম।

—কিন্তু শিবাজীবাবু দেননি।

—হাঁ সাব। উয়ো চীজ নাকি বহুত পয়মন্ত আছে। উনি ছাড়তে চান না।

—তারপর?

—তারপর অ্যাট দ্য পয়েন্ট অব রিভলভার, দ্যাট ম্যান আসক্‌ড্ মি দ্য অ্যাড্রেস অব মিস্টার শাস্ত্রী। অ্যাণ্ড আই ওয়াজ বাউণ্ড টু গিভ হিজ অ্যাড্রেস।

—লোকটি তারপর আর এসেছিল?

—নেহি সাব।

—লোকটার নাম কিছু জানিয়েছিল?

—নাম একটা বলেছিল। লেকিন ঝুটা নাম।

—তবু বলুন।

—মিস্টার ওয়াটসন হেয়ার।

—কী বললেন, হেয়ার? মানে খরগোস?

—কেয়া বোলতা?

—না কিছু না। লোকটাকে কেমন দেখতে বলুন তো?

—লাল বালা জ্যাকেট আউর ডেনিমকা প্যান্ট। পাও মে নর্থস্টার শ্যু। গোরা আদমি। ফিগারটা লম্বা চওড়া আছে। কোয়ায়েট হ্যাণ্ডসাম।

—আর কোন বিশেষত্ব?

—উ লোক পাইপ পিতা।

—কোন ঠিকানা বা ফোন নাম্বার দেয়নি?

—এক মোবাইলকা নাম্বার দিয়া।

—আছে আপনার কাছে?

—হা হা, বলেই ড্রয়ার থেকে এক বাঞ্চ কার্ড বার করে তার থেকে একটা কার্ড নীলের হাতে তুলে দিল।

—থ্যাঙ্কু আলিসাহেব। আপনাকে একটা কথা বলি, আমি যে এই ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছি এটা কাউকে জানাবার দরকার নেই। আর লৌকটি যদি ফের কোনদিন আসে, আমার কার্ডটা রেখে দিন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মোবাইলে রিঙ্ করবেন।

—এতে আমি কোন মুসিবতমে পড়ব নাতো?

—না তা পরবেন না। তবে আরও একটা জিনিস মনে রাখবেন। ওই প্লেটটার জন্যে

একজন প্রাণ দিয়েছেন। এ লোকগুলো ইন্টার ন্যাশনাল মাফিয়া। দেশের সম্পত্তি বাইরে চলে যাবে এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না।

—বিলকুল নেহি।

—তাহলে তো একটু রিশ্‌ক্‌ নিতেই হবে। তবে আমার ধারণা আপনার কাছে লোকটি আর আসবে না। সে আসল জায়গার সন্ধান পেয়ে গেছে।

—প্লেটটা কী এখনও শিবাজী সাহেবের বাড়ি আছে?

—না। ওটা চুরি হয়ে গেছে।

—তব তো কাম ফতে।

—না আলিসাহেব, এত সহজে তো সব শেষ হয়ে যায় না। ঠিক আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা এবার উঠব।

—একটু ঠাণ্ডা খেয়ে যাবেন না। বাহার মে বহুত ধুপ আছে।

—আজ থাক। আবার যদি কোনদিন আসি তখন।

রাস্তায় নেমে দীপু বলল, —তুমি ভাঙতে চাওনা যে প্লেটটা এখনও ও বাড়িতেই আছে?

—কী হবে জানিয়ে। আসল লোকতো জানে প্লেটটা এখনও ওবাড়িতেই আছে। তোর কুড়িয়ে পাওয়া মহারানী দেবীকে লেখা চিঠি তো সেটাই প্রমাণ করে এবং আমাদের সেই সুযোগটাই নিতে হবে।

—বুঝলাম। তা এবার কোথায় যাচ্ছ?

সে কথার জবাব না দিয়ে নীল বলল, —আমি মানছি, এটা একটা বড় র‍্যাকেট। কোন একজন খরগোসের কাজ নয়।খরগোসকে সাহায্য করছে ভেতরের কোন লোক। নইলে চট্‌ করে একজন বিদেশীর পক্ষে শাস্ত্রীভিলার ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

—তোমার কাকে সন্দেহ?

—মহারানী দেবী নিজেও হতে পারেন। হয়তো আদপেই প্লেটটা বাড়িতে নেই। টাকার লোভে উনিই হয়তো সেটি খরগোসের হাতে তুলে দিয়েছেন।

—তাহলে মহারানী দেবীকে হুমকি দেওয়া ওই চিঠিটা?

—নিশ্চয়ই চিঠিটা মহারানীর হাতে পৌঁছে ছিল। কিন্তু চিঠিটা তো ভয়ানক চিঠি। সেটা হেলাফেলায় পড়ে থাকার কারণ?

—হয়তো—আচ্ছা বেশ ধরো তোমার কথাই ঠিক, মহারানী দেবী নিজেই প্লেটটা তুলে দিয়েছিলেন, তাই যদি হয়, দেন হোয়াই দ্য মার্ডার?

—মার্ডার, মানে অরিজিন্যাল মার্ডার হয়েছে অন্য কারণে। বাকি দুটো আঘাত মরার ওপর খাঁড়ার ঘা।

—তার মানে তোমার এখন কাজই শুরু হয়নি।

—যতক্ষণ না অরিজিন্যাল হত্যাকারীর মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি, ততক্ষণ তো আণ্ডার ডগ হয়ে থাকতেই হবে ব্রাদার।

—তার মানে প্রথম প্রশ্ন বিষটা কে দিয়েছিল এবং কেন?

—ও বাড়িতে একটা ঝিকে আমার কিন্তু খুব একটা ভাল লাগল না। রমা।

—রমা শ্যামার কথা নয়। মনে হচ্ছে মেয়েটা খুব একটা সহজ নয়।

—আমার তো তার থেকেও আরও কয়েকজনকে বেশি খতরনাক মনে হচ্ছে।

—কে কে?

—কে নয়? মহারানী শাস্ত্রী, আরাধ্য শাস্ত্রী, তার বউ, আভাস শাস্ত্রী, অম্বরীশ ঠাকুর, সর্বময় পাঠক, শশধর পাঠক এবং একটা অবাঞ্ছিত কালো নুলো লোক, সবাই সবাই, সবাইকেই আমার সন্দেহ। তবে একটা কথা কী জানিস, আসলে গাছটাতেই যে অনেক ঘুণ ধরেছিল।

—তুমি শিবাজী শাস্ত্রীর কথা বলছ?

কিছু না বলে নীল মাথা নাড়ল। তারপর বলল, —একবার চন্দ্রনাথ বশিষ্ঠের ওখানে গেলে হত।

—সেই হামবাগ ওসি।

—হামবাগ আছে তার নিজের কাছে আছে। আমার কী? আপাতত ওর কিছু সাহায্য আমার দরকার। যেটা সবসময় আমাদের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব নয়।

—ঠিক আছে চল। কিন্তু গুরু একটা নাম তুমি বাদ দিয়ে গেছ।

—তুই পঞ্চদীপের কথা বলছিস? না বাদ দেব কেন? একজন মানুষের ওপর এই যে তিন তিনবার অ্যাটেম্পট্ নেওয়া হল, তাতে ও বাড়ির কাউকেই বাদ দেওয়া যায় না। চাকরগুলোকেও নয়। কিন্তু দেখতে হবে মোটিভ। কার কী স্বার্থ লুকিয়ে আছে।

দীপু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল: —হ্যাঁ, নীলদা, ওটাই তো আসল। মোটিভ ছাড়া তো খুন হয় না। যেটা হয় সেটা পাগলের কাণ্ড। এবং ও বাড়িতে কেউ পাগল নেই।

আজ নীলের সঙ্গে গাড়ি ছিল। মাঝে মাঝে ও গাড়িটা বার করে নিজে চালায়। অবশ্য ইদানীং নন্দিনীও ব্যবহার করছে। সেটা নীলের পীড়াপীড়িতে। আসলে নন্দিনী ওর দুর্বল জায়গা। ওর একান্ত বান্ধবী। ওর কোন জিনিস নন্দিনী ব্যবহার করলে ওর মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে ওঠে। এ নিয়ে দীপু আগে খুবই খোঁটা দিত। সামাজিক কোন বাধা নেই। নন্দিনীর দিক থেকেও কোন অনীহা নেই। দুজনের সখ্যতার মধ্যেও কোন গোঁজামিল নেই। তবু কোথায় কিসের একটা সঙ্কোচে নীলই বারবার পিছিয়ে পড়েছে।

যাক, সে অন্য আর এক উপাখ্যান। কিন্তু দীপু সুযোগ পেলেই নীলের সঙ্গে একটু রসিকতার লোভ সামলাতে পারে না। আজও গাড়িতে উঠতে উঠতে দীপু বলল, —ভাগ্যিস নীলদা আজ নন্দিনীদিকে গাড়িটা দিয়ে দাওনি। নইলে এতদূর থেকে বাস ঠেঙিয়ে এই গরমে।

—গাড়ির ভেতরের গরমটা কী খুব কম?

—অন্তত বাসের থেকে তো বটেই। বাসে ভিড় আছে। নানান লোকের গায়ের ঘাম আছে। নানান ক্যাঁচর ম্যাচর আছে। আর একঘন্টার পথে দেড় ঘন্টার অপব্যয় আছে। তারওপর বাসে উঠলেই তো তুমি আর বসার জায়গা পাচ্ছ না। তীর্থের কাকের মতো লোলুপ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চোখ ঘোরাতে হয়। কোথায় কে জায়গা ছাড়ছে, তারওপর—

—ছোটবেলায় একজন আমার হাত দেখে বলেছিল, কোন একদিন আমি পাগল হয়ে যেতে পারি। ঠিক বলেছিল। তোর বকবকানিতে—

কথা বলতে বলতেই ওরা চলে এল থানায়। বৈশাখের নিদারুণ গরমেও থানার কাজে বিরাম নেই। ওরা যেতেই দেখল মিস্টার চন্দ্রনাথ বশিষ্ঠ কোন একটা সমাজবিরোধীকে ধমকধামক দিচ্ছিলেন। চোখের ইশারায় নীল আর দীপুকে বসতে বলে, ওনার কথার জের টেনে চললেন, —হেবো, তোর বর্তমান অ্যাকটিভিটিজ আমি জানি। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তোর কোন জোড়াতালি নেই। প্র্যাকটিক্যালি তুই এখন দলছুট। তোকে বাঁচাবার মতো কেউ নেই। এখনও সত্যি কথা বল যে রাতে মিস্টার শাস্ত্রী খুন হলেন সে রাতে, আটটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে কেন তুই ওখানে ঘোরাঘুরি করছিলি?

মিস্টার শাস্ত্রী নামটা শুনেই নীল সজাগ হল। লোকটাকে ও ভালো করে দেখল। খুব একটা বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। ঝাঁকড়া মাথায় চুল। দাড়ি আছে। গায়ে ডোরাকাটা একটা লালহলুদ গেঞ্জি আর কালোপ্যান্ট। দোহারা গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারা। বোধহয় মদ্যপান করেছে। চোখদুটো করমচা। স্বভাবে একটু উগ্র।

—চুপ করে থাকিস নে হেবো। তোর কোন বাবা কিন্তু তোকে বাঁচাতে পারবে না।

—এটা স্যার আপনি কী বলছেন? কোথায় কবে, কার বাড়ির সামনে একটু ঘোরাঘুরি করেছি, সেখানে তো স্যার একশো চুয়াল্লিশ ধারা ছিল না। একবার খাতায় নাম উঠেছে বলে মর্জিমাফিক চলাফেরাও করতে পারব না?

—চপ, শুয়োরের বাচ্চা। তুই কী আমাদের গাড়োল ভেবে নিয়েছিস? শুধু একদিন নয়, পরপর তিনদিন শাস্ত্রীভিলার সামনে বড় গাছটার নীচে আধঘন্টা ধরে অপেক্ষা করেছিস। আধঘন্টায় তুই চারটে সিগারেট খেয়েছিস। বল কী জন্যে?

—বিশ্বাস করুন ইন্সপেক্টরবাবু, আমার কোন খারাপ মতলব ছিল না।

—তাহলে ঠিক ওই বাড়ির সামনেই তোর যাবার কী দরকার?

—একজনের আসার কথা ছিল।

—ইয়েস, সেটাই জানতে চাইছি। কার আসার কথা ছিল?

—সে আপনি চিনবেন না।

—চিনব। বল।

—আজ্ঞে স্যার, একটা লেড়কির।

হ্যাঁ লেড়কি? তোর বউ নাকি?

—না স্যার। আমাদের কোন বউ থাকে না। নিজেদেরই লাইফের কোন ঠিক নেই।

—লেড়কি থাকে কোথায়?

—এক বাড়িতে কাজ করে।

—তোর কাছে আসবে কেন?

—সে তো স্যার বুঝতেই পারছেন।

—ফের মিথ্যে কথা বলছিস। চপারটা ঝেড়েছিল কে?

—চপার? কিসের চপার?

—বুঝতে পারছিস না? বুঝবি?

তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—ভক্তিপ্রসাদ!

কনস্টেবল ভক্তিপ্রসাদ আসতেই বশিষ্ঠবাবু বললেন, —এটাকে নিয়ে যাও। আমি আসছি। এই বাবুদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।

—আপনি কিন্তু স্যার বেমালুম আমায় হ্যারাস করছেন। পিটোবেন তো? চামড়া গণ্ডারের হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার আর কোন খুনখারাপির মধ্যে আমি নেই।

—পিসির আপ্যায়ন তোর ভালোই জানা আছে। গণ্ডারও কথা বলতে শুরু করবে। ভক্তিপ্রসাদ এটাকে নিয়ে যাও। তারপর দেখবি ওর পেট থেকে কোন কথা বের হয় কিনা!

ভক্তিপ্রসাদ হেবোকে নিয়ে চলে গেল।

—লোকটাকে কী সাসপিশাস বলে মনে হচ্ছে? ওকে পাকড়াও করলেন কোথা থেকে?

—আপনি তো জানেন, আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। তার ওপর শিবাজী শাস্ত্রী বিগ্‌গাই। একজন ইন্ড্রাস্টিয়ালিস্ট। ন্যাচারালি আমার কিছু আই বি কে বাড়ির চারপাশে পোস্টিং করেছিলাম। হেবো একটা নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল। ওর এগেনস্টে অনেকগুলো মার্ডার চার্জ আছে। আগে একটা পলিটিক্যাল ব্যানারের আণ্ডারে ছিল। তখন হ্যানোত্যানো করে পার হয়ে গেছে। এখন পার্টিই ওকে তাড়িয়েছে। কোন দলেই নেই। কেউ ওর হয়ে উকিল দেবে না। আমরা অনেকদিন থেকেই লোকটাকে খুঁজছিলাম। হয়তো শাস্ত্রীজীর ব্যাপারে ও কিছু জানে না, অথবা জানে। কিন্তু পরপর তিন দিন শাস্ত্রীবাড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকাটা আমার ভালো লাগেনি। দেখা যাকনা ধূলো উড়িয়ে কিছু সত্যি উঠে আসে কিনা। হ্যাঁ, বলুন মিস্টার ব্যানার্জি, এনি নিউজ?

সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল, —সেদিন আচমকা আপনি একটা কথা বলেছিলেন। তখন আমি অতোটা গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আপনার অ্যাসামসান রাইট হলেও হতে পারে।

—কী কথা বলেছিলাম বলুন তো?

—বড় বাড়ির বড় কেচ্ছা।

—ইয়েস, ইয়েস আই টোল্ড ইট। সে রকম কিছু পেলেন নাকি?

—ঠিক এই মুহূর্তে আন্দাজে কিছু বলতে চাইছিনা। আমাকে আরও ভেতরে যেতে হবেই। তবে কয়েকটা সাসপিশাসের ওপর একটু নজরদারি করতে হচ্ছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন।

নীল পকেট থেকে একটা সা-া কাগজ বার করে মিস্টার বশিষ্ঠের হাতে দিয়ে বললেন, প্রত্যেকের ডিটেলস্ এমন কী চেহারার ডেসক্রিপশন এর মধ্যে আছে। এরা কোথায় যায়? কি করে? এগুলো জানার খুবই দরকার। একজনের ব্যাপারে আমার অন্য কারণে সন্দেহটা খুব গভীর। বাদল সিংয়ের বর্ণনা মতো লোকটার গায়ের রঙ কালো। লম্বা দোহারা চেহারা। মাথায় নিগ্রো হেয়ার। একটা হাত কাটা। লোকটা সম্ভবত এর আগেও ও বাড়িতে আসা যাওয়া করেছে। কিন্তু বাদল সিংয়ের চোখকে এড়িয়ে জানিনা লোকটা আর আসবে কিনা। যদি আসে বিনা ওয়ারেন্টে তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে। সম্ভবত অনেক মূল্যবান কিছু তথ্য ওর কাছে আছে।

—ঠিক আছে ব্যানার্জি সাহেব। আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এনিথিং মোর?

—ওদের বাড়িতে রমা বলে একটা কাজের মেয়ে আছে। ওটার কাছে অনেক খবর আছে।

—তুলে আনব?

—কাজটা সহজ হবে না। মেয়েছেলে বলে কথা। তবু দেখুন।

—লিস্টটা আমি রাখছি?

—লিস্টটাতো ওই জন্যেই দিলাম।

—ওকে। কিন্তু আপনি?

—আমি আছি আপনার সঙ্গে। যাই করিনা কেন, এটা তো আপনার এলাকার কেস। যদি আমি সাকসেসফুল হই, ক্রেডিটটাতো আপনারই হবে।

—না ঠিক তা নয়। আসলে আপনি ওই বাড়ির সঙ্গে খুব অ্যাটাচ্ড্। আপনার পক্ষে সুযোগটা তো স্বাভাবিক ভাবেই একটু বেশি। বাট আই নীড ইয়োর হেল্প স্যার।

—আই শ্যাল ট্রাই টু ডু মাই বেস্ট। কোন ইনফরমেশন থাকলে—

—সে আর বলতে।

—হেবো ছেলেটাকে একটু বাজান।

—শুধু বাজাবো না। ঢাক পেটাবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

পাঁচ

সব শুনে নন্দিনী বলল, —তুমি, যাই বলনা কেন নীল, তোমার শাস্ত্রীদা লোকটা কিন্তু খুব সুবিধের নয়। অ্যাদ্দিন লোকটার সঙ্গে মেলামেশা করছ। তোমার কোনদিন লোকটা সম্বন্ধে কিছু মনে হয়নি?

—হাসিখুশি ভরা সহজ স্বাভাবিক মানুষ, বাড়িতে থেকেই অ্যানটিক আর ওনার ব্যক্তিগত কালেকশান নিয়ে কতো পাণ্ডিত্য পূর্ণ কথাবার্তা। চট্ করে কী কাউকে সন্দেহ করা উচিত? নাকি কোন ঘটনা ঘটেছে যে সন্দেহ করতে হবে?

—এখন তো বুঝতে পারছ?

—আচ্ছা নন্দিনী, তোমার কী মনে হয়? লোকটার তিনজন প্রাণঘাতী শত্রু। তার মানে অপরাধটাও সেই রকম গুরুতর। সেই গুরুতর অপরাধটা কী হতে পারে?

নন্দিনী স্কচের বোতল থেকে মাপমতো এক পেগ করে তিনজনের ফাঁকা গ্লাসে ঢেলে দিল। পাশেই ছিল আইসক্যান। যে যার মতো কিউব ঢেলে নিল। দীপু বলল, —নন্দিনীদি, আমি এখনও কিউব ঢালিনি। বুঝতেই তো পারছ। ওই টেব্‌ল্-স্পুনের মাপে মাল খেয়ে আমার কিছু হয় না। প্লীজ আর একটু।

—আর অঙ্গনা যখন জানতে পারবে?

—অঙ্গনা এখন খঞ্জনানদীর তীরে বসে আছে। ও জানতেও পারবে না। প্লীজ দিদি।

নীল বলল, —তুই এত হ্যাংলা কেন রে? এসব জিনিস আস্তে আস্তে খেতে হয়। কিক্‌টা পরে দেয়।

—বাংলা মাল খাওয়া পেট। বিলাইতি আমার কী করবে? ঢালো ঢালো।

ঢালা হল। নীল আলতো করে শিপ্ করতে করতে বলল, —কী, তুমি বললে না তো কিছু?

নন্দিনী বোধহয় কিছু ভাবছিল। ভাবনা থেকে সরে এসে বলল, —তোমার ওই মহারানী ভিক্টোরিয়াকে আমার খুব একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমার যতদূর ধারণা অম্বরীশ ঠাকুরের সঙ্গে ওর এখনও মেন্টাল ইনফ্যাচুয়েশন রয়ে গেছে।

—এই বয়সেও?

নন্দিনী হাসল। বলল,— সেই কবে আমাদের প্রথম যৌবনে তোমাকে ভালবেসেছিলাম। আজও আমি তোমায় ভুলিনি। ইনফ্যাচুয়েশন নয়। এটা অন্য কিছু। কিন্তু সবাই তো আর নীল আর নন্দিনী নয়। ওই মহারানী অ্যাণ্ড অম্বরীশ ইজ আ ফ্যাক্টর টু শাস্ত্রী ফ্যামিলি।

—কিন্তু, দীপু বলল, শিবাজীবাবুর বডির ওপর পড়ে কী কাঁদাই না কাঁদল। তারপরই সেন্সলেস। তুমি বলছ এসব ঢপিং?

—ঢপিং মানে?

—মানে অ্যাকটিং?

—সময় সময় মেয়েরা কাঁদতে খুব ভালো জানে। আরও একটা কথা, অম্বরীশবাবুর সঙ্গে মহারানীদেবীর একটা প্রিলাভ এপিসোড ছিল। যেটা শিবাজীবাবুর জন্যে ডিসমিস্‌ড্ হয়ে যায়। অম্বরীশবাবুর দিকে এটা একটা মোটিভ হতে পারে।

—একটা মেয়ের জন্যে বুড়ো বয়েসে এসে, দীপুই প্রশ্নটা করল।

—ভুলে যেও না দীপু। অম্বরীশ ওয়াজ আ মিলিটারি ম্যান। সুকোমলবৃত্তি গুলোকে ওরা লড়াইয়ের ময়দান থেকেই বিসর্জন দিয়ে দেয়।

—কিন্তু লাভও তো একটা সুকুমার বৃত্তি।

—অম্বরীশ বিয়ে করেনি। প্রেম কতটা গভীর জানিনা কিন্তু না পাওয়ার জন্যে প্রতিহিংসা স্পৃহাটাতো মরে যায়নি। তাছাড়া আমার ধারণা, এটা লাভ নয় ইনফ্যাচুয়েশন। মোহ। আমি বলি কী নীল, অম্বরীশ আর মহারানী সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজ নাও।

—আর কেউ?

—বলতে পার, কেন আভাস বলে ছেলেটা ওই কথা বলে, 'এমন একটা কিছু হবে সেটা সে জানতো'? কী জানত? শিবাজী শাস্ত্রী একদিন খুন হবেন?

—বেশ তারপর?

—খোঁজ নাও কেন বড় ছেলে আর বড়বউদির মতো রিজার্ভড মেয়ের মধ্যে মনোমালিন্য? কিসের জন্যে?

গ্লাস শিপ্ করতে করতে নীল বলল—এগুলো আমার ভাবনায় আছে। এনিথিং মোর?

—একটা কালো নুলো ছেলের কথা বলছিলে না? খুব সম্ভবত সে শিবাজীবাবু মার্ডার হবার পরই বাড়ি থেকে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেছে। সেটা দেখেছে একমাত্র বাদল সিং। লোকটাকে খুঁজে যদি নাও পাও, তবে বাদল সিংকেই ধরো। ওই বলতে পারবে ওই ছেলেটির ডিটেল্‌স্।

—আর ইউ সিওর?

—সিওর কিনা জানি না। তবে মন বলছে। তুমি কী ভাবছ?

—থ্যাঙ্ক ইউ নন্দিনী। তোমার ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনার অনেকটাই মিল আছে। ওয়েল, আমি আরও ভাবি।

হঠাৎ নীলের মোবাইল বেজে উঠল। 'অ্যাকসেপ্ট' টিপতেই দেখল মহারানী।

— বোঝ। মেঘ না চাইতেই জল। মহারানী শাস্ত্রী। দেখি কী বলে,—হ্যালো, নীল বলছি। বলুন বউঠান। হ্যাঁ কি বললেন? আবার খরগোসের হুমকি? এর আগের দিনও তো এইরকম একটা কথা বলেছিলেন না? আচ্ছা। এবার কী চিঠিতে? না? মোবাইলে? নাম্বারটা দেখেছেন? ও আইসী। পাবলিক বুথ থেকে। ঠিক আছে। বাইরের কোন লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। আমি স্পেশাল পুলিস পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করছি। ঠিক আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে আমি কালই যাচ্ছি আপনার কাছে। রাইট। ছাড়ছি।

মোবাইল অফ্ করে নীল কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল, তারপর বলল,

—আচ্ছা নন্দিনী, তোমাকে যদি কেউ ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেয়, তোমার কণ্ঠস্বরে কী কোন পরিবর্তন ঘটবে না?

—সেটাই তো স্বাভাবিক।

—হুঁ। চল দীপু, আজ উঠি।

—ওমা, সে কী গো। আমার তো সবে অর্ধেক নেশা হয়েছে।

—মারব লাথি। এটা কী তাড়ি খানা পেয়েছিস? নন্দিনী এটাকে আর কোনদিনও এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। চল, ওঠ।

নন্দিনীর বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ওরা যখন বেরিয়ে এল, রাত তখন নটা। ময়রা স্ট্রীট থেকে নিউ আলিপুর। পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। বাড়ি ফিরেই দীপু ফ্ল্যাট। ওকে বিরক্ত না করে ও পুরনো রিডার্স ডাইজেস্টের বিশেষ একটা সংখ্যা খুঁজতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে একটা বিশেষ তথ্য সমৃদ্ধ রচনা নিয়ে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল। তারপর নিজের মনে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, কারেক্ট। আমিও এটাই সন্দেহ করছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও নন্দিনীকে ফোন করল। নন্দিনী জেগেই ছিল। ওকে ঘটনাটা বলতেই ও বলল, —বিদেশে এই নিয়ে এখনও বেশ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আমাদের দেশে কী, অবশ্য কেসের গুরুত্বর পর বাঁচামরা নির্ভর করে। অবশ্য তোমার সন্দেহটা অমূলক বলছি না। তবে কী ওই কারণেই—

—ঠিক বলতে পারছি না।

—কাল তাহলে যাচ্ছ শাস্ত্রীভিলায়?

—যেতেই হবে। আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে। বেশ কয়েকদিন দেখা হবে না।

—এভাবে আর কদিন চলবে? এই দেহের বাইরে আর কোন জীবনের সন্ধান কী তোমার কাছে আছে?

—অনেক বড় কথা বলে ফেললে নন্দিনী! বেশ, উত্তরটা দোব ঠিক সময়ে।

—সাজিয়ে গুছিয়ে আর বানিয়ে বানিয়ে নয়। যা বলবে মন থেকে। মন যা বলে সেটাই বলবে।

যথা আজ্ঞা দেবী।

মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। নীল শুয়ে পড়ল।

ছয়

সকালে নীলের ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। প্রায় নটা। নতুন কাজের মেয়েটা চা নিয়ে

ডাকাডাকি করছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ও জিগ্যেস করল, —হ্যাঁরে নয়না, দীপুকে ডেকে দেতো। পাজীটা গেল কোথায়?

কিছু না বলে নয়না একটা চিঠি নীলের হাতে গুঁজে দিল। দীপুর চিঠি। দীপু লিখেছে, যখন ডাকবে রাধা তখন কেষ্টা যাবেই যমুনায়। নীলদা ফেঁসে গেছি। তিনদিন চিঠির বাক্স দেখিনি। আজ ভোরে উঠে দেখি দুদিন আগের চিঠি। এসেছে অঙ্গনার কাছ থেকে। ও এখন বেলেঘাটায় ওর মামার বাড়ি। থাকবে রোববার পর্যন্ত। গুরু বুঝতেই পারছ তৃষিত চাতকের হৃদয় বেদনা। পকেটে কোন মালকড়ি ছিলনা। তুমি ঘুমচ্ছিলে তাই ডাকিনি। তোমার ড্রয়ার থেকে শপাঁচেক টাকা নিয়ে গেলাম। আর যেটা পেলাম না সেটা তোমার আশীর্বাদ। আশা করি এসে পেয়ে যাব। তোমার দীপু।

চিঠিটা পড়ে নীল খানিকক্ষণ নিজের মনেই হাসল। মনে মনে বলল, শয়তান একটা।

আজ প্রথমেই ওর মহারানীর বাড়ি যাবার কথা। গতকাল উনি ফোন করেছিলেন। গেলে সেই একই কথা শুনতে হবে। তবু যাওয়া দরকার। গাড়িটা শাস্ত্রীভিলার দরজায় পার্ক করে ও ভেতরে ঢুকে গেল। বাদল সিং ওকে দেখে একবার স্যালুট ঠুকে মৃদু হাসল।

ধীর পায়ে ও বাদল সিংয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, —এর মধ্যে আর কোন চিঠিপত্র এসেছে কিনা। বাদল ঘাড় নেড়ে জানাল, কিছু চিঠি এসেছিল। সেগুলো সব ছোটবাবু নিয়ে গেছে।

অতঃপর অন্দর মহল। প্রথমেই দেখা কল্লিতার সঙ্গে। মনে মনে ও এটাই চাইছিল। এই একটা মেয়ে যাকে টোকা দিলে ভেতরের কিছু খবর আসতে পারে। কল্লিতা ওকে দেখে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। —নীলকাকু, এত সকালে? কোন জরুরী খবর আছে নিশ্চয়ই।

—কল্লিতা, আমি কিন্তু মনে মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম।

একটু বিস্মিত হয়ে কল্লিতা বলল, —আমাকে? কেন কাকু?

—কোথাও একটু বসতে পারলে ভাল হত।

—তাহলে একটু চা বলি?

—না তার দরকার হবে না। এখন বল কোথায় বসা যায়?

—চলুন। বাবার অফিস ঘরে। বাবা মারা যাবার পর সাধারণত ও ঘরটায় আর কেউ ঢোকে না।

—বেশ তাই চল।

কিন্তু ঘরে ঢুকে দুজনেই সামান্য চমকে উঠল। ঘরের সমস্ত জিনিস এলোমেলো হয়ে আছে। বিশেষ করে বইয়ের র‍্যাকটা। এছাড়াও ওঁর গনেশ কালেকশনের গ্লাস আলমারির কিছু গণেশ ওল্টানো। কিছু এদিক ওদিক।

দেখে শুনে নীল বলল,—কিন্তু কল্লিতা, তুমি বললে এ ঘরে তোমার বাবার মৃত্যুর পর আর কেউ আসেনি।

—হ্যাঁ কাকু আমি সেটাই জানতাম।

—কে আসতে পারে বলে তোমার মনে হয়।

—একমাত্র মা আর ওই রমা বলে মেয়েটা।

—রমা? তার এত সাহস হবে?

কল্পিতা অবজ্ঞাসূচক ম্লান হাসল। তারপর নীলকে একটা চেয়ারে বসতে বলে ও নিজে সামনের চেয়ারে বসল।

নীল সিগারেট ধরাল। গোটাকতক টান দেবার পর বলল,

—কল্পিতা, তুমি নিশ্চয়ই চাও তোমার শ্বশুরমশায়ের এই রহস্যজনক মৃত্যুর একটা কিনারা হোক।

—হ্যাঁ, আমি তাই চাই।

—আর এই ঘাঁটাঘাঁটিতে যদি তোমাদের সংসারে কোন দাগ লাগে?

—আপনি কী বলছেন কাকু?

—হ্যাঁ গো মামনি, খুব ক্রুড অর্থে বলতে গেলে সম্ভবত ব্যাপারটা সেই দিকেই গড়াবে। শিবাজীদার তিনজন ঘাতক, বেছে নিয়েছিল ওই একটা দিনই। যেদিন সবাই ব্যস্ত থাকবে উৎসবের আনন্দে। তারপর তোমার শ্বশুরমশায়ের হার্ট অ্যাটাকের খবরটা কোন ভাবে আগের রাত্রেই ছড়িয়ে গিয়েছিল। এমন অসতর্ক মুহূর্ত আর আসতো কিনা সন্দেহ। তাই তিন খুনি ওই দিনটাই মোক্ষম দিন হিসাবে বেছে নিয়েছিল।

—তারা কারা কাকু?

—তারা, তিনজনই শিবাজীদার খুব কাছের লোক। যাদের এ বাড়িতে গতি সর্বত্র। কেউ তাদের সন্দেহ করবেনা। অবশ্য একজন বাদে।

—কে সে?

—তার আগে আমি তোমায় কয়েকটা প্রশ্ন করি। যা জান সব ঠিকঠাক বলবে। নইলে আমার হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

—আমার জানা কিছুই আমি লুকোব না এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারেন।

—খুব খারাপ লাগছে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে, কিন্তু উপায় নেই। মহারানীদেবীর একটা অতীত অ্যাফেয়ার্স সম্ভবত এখনও চলছে, তাই না?

কল্পিতা আরক্ত মুখে মাথা নীচু করে।

নীল বলল, —তোমার সব লজ্জা ঝেড়ে ফেল কল্পিতা। এটা জানা খুবই দরকার।

কল্পিতা আঁচলের খুঁটটা জড়াচ্ছিল আবার খুলছিল।

—আমি যা বলছি, সেটা ঠিক, তাই না?

কল্পিতা মাথা নেড়ে বলল, — সেই জন্যেই তো আভাসের সঙ্গে একটা মনোমালিন্য চলছিল অনেকদিন থেকেই। এটা ছিল না। কিন্তু—

—হ্যাঁ বল।

—অম্বরীশ কাকু আসার পর থেকেই। প্রথম প্রথম আমরা কিছু ভাবিনি। তারওপর আমাদের ফ্যামিলি একটু সোকল্ড্ সফিসটিকেটেড। চট্ করে কেউ কারো ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। কিন্তু—

—কিন্তু?

—একদিন রাত্রে বাবার সঙ্গে শাশুড়িমায়ের একটা ঝগড়া হয়। ওই অম্বরীশকাকুকে নিয়ে। বাবা সোজা জানিয়ে দেন, বিয়ের আগে যা হয়েছে তা নিয়ে তিনি আর কিছু বলতে চান না। কিন্তু তিনি চান অম্বরীশকাকু যেন এ বাড়িতে আর না আসেন।

—উত্তরে তোমর শাশুড়িমা কী বলেছিলেন?

— সেটা খুব নোংরা কথা।

—তবুও যে বলতে হবে মামনি।

শাশুড়ি মা বলেন, আমি মায়ের কথাতেই বলছি, মা সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিলেন, আগে নিজের নোংরা চরিত্রটাকে সংশোধন কর, তারপর আমার ব্যাপারে কথা বলতে এসো।

—শুনে উনি কী বলেছিলেন?

—উনি বলেছিলেন, সারাজীবনে তুমি আমায় কী দিয়েছ যা দিয়ে একটা পুরুষ মানুষকে বেঁধে রাখা যায়?

—তারপর?

—তারপর মা বলেন, কী তোমায় দিইনি? তিন তিনটে সন্তান দিয়েছি। বউমাদের দিয়েছি, জামাইকে দিয়েছি। একটা ভরা সংসার দিয়েছি। আর কী চাই? আসলে তুমি নোংরা। তুমি দুশ্চরিত্র। তুমি প্রবঞ্চক। তোমার মুখ দেখেও আমার ঘেন্না হয়।

—উত্তরে শিবাজীদা কি বলেন?

—কিছুই তেমন বলেননি। কেবল বলেছিলেন, আস্তাকুঁড়ের ইঁদুরকে পুনর্মুষিক করতে তাঁর নাকি বেশি সময় লাগবে না। ব্যস।

—এই ঝগড়ার ব্যাপারটা এ বাড়ির আর কে কে জানে?

— বোধহয় সবাই।

—তোমার স্বামী এ নিয়ে কাউকে কিছু বলেন নি?

—না। কেবল আমায় একদিন বলেছিনে, এ সংসারে একটা মহাদুর্দিন নেমে আসবে একদিন। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। আর সেটাই তো ঘটল কাকু।

—অম্বরীশ ঠাকুর কিন্তু উৎসবের দিন এসেছিলেন। এবং সবার আগে।

—একদিন কেন, উনি কাউকে পরোয়া না করে প্রায় দিনই আসতেন। বাবা বাড়ি না থাকলে।

—হ্যাঁ এটা আমি জানি। আর একটা খবর দাও।

—কী?

—তোমার ভাসুর, আই মিন আরাধ্য সর্বদা ফুলশার্ট পড়ে থাকে কেন? হাতে কালো দস্তানা। আরাধ্য একটা উত্তর দিয়েছিল। আমার মনঃপুত হয়নি। তুমি কিছু জান?

—নাহ্, এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কেউ কোনদিন কিছু মাথা ঘামাইনি

—তোমার হাজব্যাণ্ড? মানে আভাস?

—উনি জানলেও জানতে পারেন। কিন্তু আমাকে কোনদিনও কিছু বলেননি।

—কিন্তু আমি জানি কেন?

—জানেন? কেন?

—সে কথা থাক। সর্বময় পাঠকের ঠিকানাটা জান?

—সর্বময় পাঠক, মানে মামাশ্বশুর?

—হ্যাঁ।

—উনি বোধহয় খড়গপুরের ওদিকে কোথাও থাকেন। ঠিকানাটা ঠিক জানি না।

—কী করেন? চাকরি না ব্যবসা?

—আগে উনি বেশ ভালোই ব্যবসা করতেন। বেশ রমরমা ব্যবসা। হঠাৎ কোথা দিয়ে কী হল। এখন তো খুবই রেচেড কণ্ডিশন।

—এর কারণ কিছু জান?

—না। তবে ব্যবসায় উত্থান পতন তো কিছু আছেই।

—হ্যাঁ তা আছে।

—তোমার ননদাই মানে পঞ্চদীপবাবু লোক কেমন?

—এমনিতে ভাল। শিল্পী মানুষ। নানান দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান। এখন তো প্রচুর টাকা রোজগার করেন। কলকাতায় ফিরলে অনেক টাকা খরচও করেন। এ ছাড়া তো—

— উনি তো আবার ফিরে যাচ্ছেন—তাই না?

—হ্যাঁ।

—সঙ্গে কি রচয়িত্রী যাচ্ছে?

—তা তা বলতে পারব না।

—তোমাদের বাড়িতে কারো চোখের অসুখ হয়েছে?

—চোখের অসুখ? চোখের অসুখ—হ্যাঁ রমা মাঝে মাঝে বলে ওর নাকি চশমা দরকার। তা সেটা স্টাইলের জন্যে না সত্যি দরকার তাতো বলতে পারব না।

—ঠিক আছে কল্পিতা। থ্যাঙ্কস্ ফর ইওর ইনফরমেশন। অম্বরীশ ঠাকুরের ঠিকানাটা জান?

—সম্ভবত গুরুসদয় দত্ত রোডের ওখানে থাকেন। বিয়ে থা তো করেননি। একাই থাকেন।

—ঠিক আছে। তোমাকে একটা অনুরোধ তোমার আমার কোন কথাই কেউ কোনদিন জানবেনা। রাইট?

—ঠিক আছে কাকু।

মহারানী দেবীর সঙ্গে কিছু মামুলি কথাবার্তা সেরে ওঠার মুখে নীল একটা আজগুবি প্রশ্ন করল,—আচ্ছা বউঠান, আপনার কটি ছেলেমেয়ে?

মহারানী বেশ অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, —দাদা, আপনি তো আজ না, অনেকদিন থেকেই এ বাড়িতে আসছেন। আমার কটি ছেলেমেয়ে সেটা আবার নতুন করে জিগ্যেস করছেন?

—হ্যাঁ ম্যাডাম। একান্ত দায় পড়েই করতে হচ্ছে।

সামান্য একটু বিরক্ত হয়ে মহারানী বললেন,—আমার দুই ছেলে এক মেয়ে।

—আর ইউ সিওর?

—এ আবার আপনার কী কথা নীলাঞ্জনদা? এতদিন পরে এটা কী অবান্তর প্রশ্ন নয়?

—অবান্তর প্রশ্ন বলছেন? তাহলে আমি ভুল শুনেছিলাম। ঠিক আছে আজ উঠি।

মহারানীকে হতবাক করে নীল ফিরে এল। সঙ্গে ওর গাড়ি ছিল। দীপু এখন নেই। দীপু থাকলে ফক্কুড়িতে অনেকটা সময় কেটে যায়। বাধ্য হয়েই একা একা ভাবনা মাথায় নিয়ে ও গাড়ি চালাচ্ছিল।

আরাধ্য শাস্ত্রীর ব্যাপারটা ওর কাছে অনেকটা ক্লীয়ার। কিন্তু এই ধরনের ব্যাপারগুলো, মানে ওর অনুমানটা যদি ঠিক ঠিক ফলে যায়, তাহলেও একটা ঝুঁকির দিক আছে। পৃথিবীতে এ ধরনের ব্যাপার বেশ কিছু ঘটেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো ছিল খুবই জটিল। ফলে সাকসেসের সংখ্যা খুবই কম। তবে সত্যিই ও যেটা ভাবছে সেটাই যদি হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সেটা সাকসেসফুল হয়েছে। কিন্তু এটা এস্ট্যাবলিশ করতে গেলে আরও ডেফিনিট প্রমাণের দরকার। অন্তত সেই লোকটাকে দরকার। সেই কালো কোঁচকানো চুলের লম্বা চওড়া ছেলেটাকে। কিন্তু তাকে সে পাবে কোথায়?

মাঝ বৈশাখের দুপুর। মাঝে একদিন কালবৈশাখীও হয়ে গেছে। ওই একদিনই। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব এসেছিল। কিন্তু তারপর যে কে সেই।

নজরুল ইসলাম সরণী এখন ফাঁকা। গাড়ির স্পীডের মিটার বাড়িয়ে দিয়ে ও ই এম বাইপাস ধরল। এ রাস্তাও ফাঁকা। ওকে যেতে হবে গুরুসদয় দত্ত রোডে। পার্ক স্ট্রীট দিয়ে ডানদিকে ঢুকলেই চলবে। ও যখন গুরুসদয় দত্ত রোডে পৌঁছল তখন নেহাত কাজ না থাকলে কেউ বের হয় না। নীল অবশ্য কাজ পাগল লোক। বিশেষত কোন রহস্য যখন ওকে ফাঁপড়ে ফেলে তখন নাওয়া খাওয়া প্রায় ভুলেই যায়।

ঠিকানাটা জানতো না। রাস্তাও ফাঁকা। একটা বড়সড় বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে দেখল দরজায় বসে একজন দরওয়ান খইনি মুখে ঢুলছে। ও গিয়ে কর্ণেল অম্বরীশের নামটা বলল।

নিদ্‌ছুট চোখে একবার 'নীলের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কিছু ভাবল। তারপর দু তিনটে বাড়ির পরের একটা ঠিকানা দিয়ে খোঁজ নিতে বলল। সেটা একটা ফ্ল্যাটবাড়ি। এদিকটায় সাধারণত ফ্ল্যাট বাড়ির সংখ্যা তত বেশি নয়। অধিকাংশই পুরনো স্টাইলের বাড়ি। দু একজন তেমন কোন সন্ধান দিতে না পারলেও, এক বৃদ্ধ সম্ভবত ওই বাড়িরই বাসিন্দা হবেন, তিনি অম্বরীশের নামটা শুনে বললেন, —ওই যিনি মিলিটারিতে কাজ করতেন! মানে যাঁর একটা পা নেই? মানে খুঁড়িয়ে চলেন?

—হ্যাঁ। আপনি ঠিকই ধরেছেন। তাঁকে পাব কোথায়?

—কোথায় এখন পাবেন জানিনা। তিনি বাড়িতে কম থাকেন। তবে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তিনতলায়। ডানদিকের ফ্ল্যাট।

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে নীল সোজা ওপরে উঠে গেল। দরজায় লেখা এক্স্ মিলিটারি সার্ভিস ম্যান।

নীল বেল টিপল। একবার, দুবার, তিনবার। অতঃপর চতুর্থ বারের বেলায় আরক্ত নেত্রে দরজা খুলে দাঁড়ালেন স্বয়ং অম্বরীশ ঠাকুর।

সেদিন রাতে ভালো করে লোকটাকে দেখা হয়নি। মানে মন দিয়ে দেখা হয়নি। রীতিমত স্বাস্থ্যবান এবং সুপুরষ ব্যক্তি। মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। ঠোঁটের ওপর পুরুষ্টু পাকানো গোঁফ। তাতে সাদার ছোঁয়া। জুলপিও তাই। ভদ্রলোক সম্ভবত নীলকে চিনতে পারেনি। হতেই পারে। হয়তো উনিও ঠিকমতো দেখেননি। যদিও সেদিন দুচারটে কথা হয়েছিল। এখন বেশ বাজখাঁই গলায় জিগ্যেস করলেন,—হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার? এই অসময়ে? হু আর ইউ?

নীল বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল—আমায় সম্ভবত চিনতে পারছেন না। মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল মিস্টার শিবাজী শাস্ত্রীর বাড়ি। মানে যেদিন উনি খুন হন।

—আই সি, অম্বরীশ চিনেছেন, সো ইউ আর দ্যাট ইনভেস্টিগেটর?

—যাক তাহলে আর কার্ড বার করতে হল না। ঠিকই চিনেছেন?

—হ্যাঁ, ওয়ানস্ আপঅন আ টাইম, আই ওয়াজ ইন দ্য ডিফেন্স সার্ভিস। একবার কাউকে দেখলে চট্ করে আমি ভুলিনা। আসলে এখন একটু বিয়ারে ভাসছি। তাই—এনিওয়ে, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

—তার আগে একটু বসার অনুমতি কী পাওয়া যেতে পারে?

ভদ্রলোক মিনিট খানেক কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, —অলরাইট, ইউমে কাম। ব্যাচেলার্স ডেইন। অসুবিধা মানিয়ে নিতে হবে। কোন কিছুই সাজানো গোছানো নেই।

—নো প্রবলেম।

ওরা গিয়ে বসল ড্রইং রুমে। বেশ প্রশস্ত ঘর। সোফাসেট রয়েছে। দেয়ালে নানান যুদ্ধের ছবি। তার মধ্যে অম্বরীশের বিশাল আকারের ফুল মিলিটারি পোশাকের মাথা থেকে

—হ্যাঁ বলুন?

—শিল্পীদের সম্বন্ধে আমার একটা অন্য রেসপেক্ট ছিল। আসলে কী জানেন সব সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নয়। অধিকাংশই বকধার্মিক। অ্যাণ্ড দ্যাট পঞ্চদীপ ইজ আ ম্যান অব সেম টাইপ। একটু ভালো করে খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, ওর নজর ছিল বা আছে ওই অর্ধনারীশ্বরের ভাঙাচোরা ফলকটার ওপরে। ওটার নাকি ইন্টার ন্যাশনাল ভ্যালু প্রচুর।

—এ ব্যাপারটা মহারানী দেবী জানেন?

—জানেন বইকি। ও শয়তানটাই তো শ্বশুরকে ব্ল্যাকমেল করে ওটা হাতাবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। সাম্ মিস্টার মাইকেল হেয়ার-এর সঙ্গে ওর অর্থকরী লেনদেনও হয়ে গেছে। সেটাও মোটা টাকার। কিন্তু মালটাতো আর পায়নি। তার আগেই মহারানী ওটা সরিয়ে নিয়েছে।

—অর্থাৎ মহারানী দেবী তার জামাই সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল।

—কিন্তু রানীর কিছু করার নেই। যতই হোক জামাই তো!

—আপনি জানেন মূর্তিটা এখন কোথায়?

—জানলেও বলব না।

—আর শিবাজীবাবুকে মদের সঙ্গে অ্যাট্রোপিন সালফেট্ কে দিয়েছিল সেটাও নিশ্চয়ই জেনেও বলবেন না।

—না।

—মানে, আপনি জানেন ওকে বিষ দেওয়া হয়েছিল।

—জানি।

—আর বাকি দুটো অ্যাটেম্পট্— সেটাও নিশ্চয় জানেন।

—একটা জানি। অন্যটা জানিনা।

—কোনটা জানেন?

—গুলি। রিভলভারটা কে চালিয়েছিল সেটাও জানি।

—নিশ্চয়ই বলবেন না।

—সরি। আপনি আছেন কী করতে? খুঁজে বার করুন। তাহলে আর কিসের গোয়েন্দা?

—হ্যাঁ। বার করব। একটা কথা কথার মধ্যে ঢুকে গেছে। সেই উত্তরটা দিতে পারবেন?

—কী?

—মদের সঙ্গে অ্যাট্রোপিন কে দিয়েছিল?

—অত্যন্ত বিশ্বাসী কেউ একজন, যার সব থেকে বেশি সুযোগ। যে অনেক টাকা খেয়েছিল।

—তাকে চেনেন?

—বললাম তো, রহস্য আপনি সল্ভ্ করবেন। আমি নই।

নীল হাসল। তারপর বলল, —ওয়েল মিস্টার ঠাকুর, আমার সব প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। আপনার কথার মধ্যে দিয়ে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আজ উঠি।

—কিন্তু আপনার ড্রিংকস্‌?

—আমি বেশি খাইনা। তার ওপর অনেকটা রাস্তা গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে।

নীল উঠে পড়ল। বেরবার মুখে অম্বরীশ জিগ্যেস করলেন,—আপনার সব উত্তর পেয়ে গেছেন? আমার কথায়?

—ইয়েস স্যার।

—দেন ইউ আর রিয়েলি অ্যান ইনটেলিজেন্ট ওয়ান।

—থ্যাঙ্কু।

সাত

ইউরেকা নার্সিং হোমের মেটারনিটি ওয়ার্ডের মেট্রন সুচেতা দাস আজ অফিসিয়ালি অবসর নিলেন। অবসর নেবার বয়স অবশ্য হয়নি। মাত্র পঞ্চান্ন বছর। আরও বেশ কয়েক বছর চাকরি করতে পারতেন। কিন্তু শারীরিক এবং মানসিকভাবে তিনি এতই বিপর্যস্ত যে মাস খানেক আগেই তিনি তাঁর ঐচ্ছিক ছাড়পত্র তুলে দিয়েছিলেন নার্সিংহোমের কর্ণধার ডাক্তার ভবেশ সেনের হাতে। ডাক্তার সেনের অনুরোধে আরও একটা মাস থাকার পর আজ তাঁর ছুটি। একটানা চৌত্রিশ বছর তিনি সেবাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। ডাক্তার সেনের উদ্যোগেই বিদায় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যান্য ডাক্তাররা আর সহসেবিকারা যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। বিদায়পর্ব শেষ হতে হতে প্রায় বিকেল পাঁচটা। তারপরও ঘন্টা খানেক কেটে গেছে সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে। এমন কী তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য বহু রোগী আর রোগিনীও কাঁদো কাঁদো মুখে তাঁকে বিদায় জানালেন।

এবার ছুটি। কর্মক্ষেত্রের সব দায়িত্ব শেষ। কিন্তু এখনও একটা দায়িত্ব কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধে চলেছে। দেখতে দেখতে বিশটা বছর কোথা দিয়ে গেল। আজও ভুলতে পারেননি একত্রিশ বছর আগে নৈনিতালের সেই শৈতিক রাতের কথা।

কুড়ি বছর বয়সে নার্সিং ট্রেনিং শেষ করে চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছিলেন নৈনিতাল। না, কোন সরকারি হাসপাতাল নয়। একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে। ছোটখাটো মিষ্টি চেহারার সুচেতা জড়িয়ে পড়েছিলেন সেই নার্সিং হোমেরই তরুণ ডাক্তার মনোজ প্যাটেলের সঙ্গে। ভাব থেকে ভালবাসা তার পর বিয়ে। সুচেতার এই পঞ্চান্ন বছরের জীবনে সেটাই বোধহয় সবথেকে মধুর সময়। সুচেতারও জীবনে কোন পিছুটান ছিল না। ছোটবেলাতেই হারিয়েছিলেন বাবা মাকে। এক মাসির কাছে মানুষ। নার্সিং শেষ করে অচেনা শহরে। মনোজও ছিলেন একা। এলাহাবাদের ছেলে। ডাক্তারি পাশ করার পর সংসারের একমাত্র বন্ধন বাবা তাঁরও

অকালমৃত্যু। মনোজও নৈনিতালের নার্সিংহোমে জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে নিজের জীবন শুরু করেন। তারপরই প্রেম আর বিয়ে। কিন্তু সুচেতার বরাতটাই মন্দ। বাইশে বিয়ে আর চব্বিশে মনোজের গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু। জীবনের সব রঙ সেদিনই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মনোজের মৃত্যুর পর আর কাউকেই সেই জায়গাটা দিতে পারেননি। মানুষের সেবাতেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

তারপর মাত্র ছটা মাস কেটেছিল নৈনিতালে। এক অদ্ভুত রাত তাঁর জীবনের গতিটাকেই পাল্টে দিল। ভেবেছিলেন মনোজের স্মৃতি নিয়েই নৈনিতালে জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা হল না।

জানুয়ারির কনকনে শীতের রাত। সারাদিন নার্সিং হোমের দম ফেলার অবসর না থাকা কাজ। তারওপর দুদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল একটা কী জটিল অপারেশনে নার্সিং হোমের ডাক্তারেরা বেশ ব্যস্ত। ফলে সুচেতার ওপর ভার পড়েছিল অন্য সব রোগীদের তদারকির। ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরে কোনরকমে সামান্য কিছু খেয়ে এলিয়ে গিয়েছিলেন উষ্ণ কম্বলের একাকী শূন্য শয্যায়। স্বামীর স্বপ্ন নিয়েই একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। প্রকট শব্দ নয়। বরং সতর্ক খুটখুট আওয়াজ। প্রথমটা সুচেতা কিছু বোঝেননি। সাধারণত এমনটা হয় না। তাঁর ছোট বাসাবাড়িটা ছিল নার্সিংহোম সংলগ্ন একটা ভাড়াবাড়ি। এর আগে মাত্র একবারই রাতদুপুরে কড়া নাড়িয়ে তাকে জাগানো হয়েছিল। সেও এক বীভৎস রাত। মনোজের মৃত্যু সংবাদ দিতে পুলিস্ এসে কড়া নেড়েছিল। কিন্তু সে কড়া নাড়ার সঙ্গে এ কড়া নাড়ার তফাৎ ছিল। এমনিতে ভয়ের কোন ব্যাপার ছিল না। সুচেতা গায়ে শালটা বেশ ভালো করে মুড়ে নিয়ে দরজা খুলেই চমকে উঠেছিলেন। স্বয়ং নার্সিংহোমের কর্ণধার ডাক্তার শ্রদ্ধানন্দ ভরদ্বাজ। এবং আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। যাকে তিনি এর আগে কোনদিনও দেখেননি।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন তুলতেই ডাক্তার ভরদ্বাজ যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেটি একদিকে যেমন আশ্চর্যজনক অন্যদিকে বেশ ভয়াবহ। ডাক্তার ভরদ্বাজের হাতে ছিল একটি সদ্যজাত শিশু। দুদিনের শিশু। ডাক্তার ভরদ্বাজের বক্তব্য ছিল শিশুটি অনাথ। এবং বিকলাঙ্গ। জন্মের পর শিশুটিকে বিকলাঙ্গ অবস্থায় দেখার পর শিশুটির মা তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। কিছুতেই তিনি এ সন্তানকে নিজের সন্তান বলে মেনে নিতে চাইছেন না। সঙ্গের মানুষটি ছিলেন শিশুটির বাবা। তিনি নাকি এক ধনী ব্যবসাদার। তিনিও বিকলাঙ্গ শিশুটির দায়ভার নিতে সঙ্কোচ বোধ করছেন। এখন ডাক্তার ভরদ্বাজ এবং শিশুটির বাবা চাইছেন সুচেতা যেন শিশুটির ভার নেন। ডাক্তার ভরদ্বাজ আরও বলেন, সুচেতা আজ সর্ব অর্থে স্বামী এবং পুত্রহীন। এই প্রায় অনাথ শিশুটিকে যদি মাতৃস্নেহে বুকে তুলে নেন, তাহলে সবদিক রক্ষা পায় এবং সুচেতাও তার বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন খুঁজে পায়। এর জন্যে শিশুটির বাবা নগদ এক লাখ টাকা দেবেন শিশুটির ভরণপোষণের জন্য। তবে শর্ত থাকবে একটি, কোনদিনই শিশুটির কাছে প্রকাশ করা যাবে না তার জন্ম বৃত্তান্ত।

সুচেতা সব শুনে সেই মুহূর্তে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। এমন একটা ঘটনা যে তার জীবনে ঘটতে পারে তাও ছিল তার কাছে অবিশ্বাস্য।

হয়তো তার এই মানসিক দোলাচলের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন দুজনেই। শিশুর পিতা নগদ লাখ টাকার একটা বাণ্ডিল এবং নবজাতককে সুচেতার কোলে তুলে দিয়ে তার দুটি হাত ধরে করুণ আকুতি জানিয়েছিলেন সুচেতার যেন তার অতৃপ্ত মাতৃবাসনা নিয়ে শিশুটিকে নিজের পুত্রের মতো মানুষ করে। এর জন্যে প্রয়োজন হলে পরে আরও অর্থ সাহায্যও তিনি করবেন।

হতভম্ব সুচেতা কী করবেন না করবেন ভাবার আগেই তিনি দেখলেন ডাক্তার ভরদ্বাজ এবং পুত্রের পিতা ঘর ছেড়ে চলে গেছেন।

সে রাত সুচেতার কেটেছিল সম্পূর্ণ নিদ্রাহীন। শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন প্রায় সারারাত। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙলে তিনি দেখলেন শিশুটি পরম নিশ্চিন্তে তার কোলের ঘেঁষ ঘেঁষ শুয়ে আছে।

সুচেতা পারেননি শিশুটিকে ভাসিয়ে দিতে। পরের দিন শিশুটিকে দেখতে গিয়ে তিনি চমকে ওঠেন। এক অর্থে শিশুটি সত্যই কদাকার। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। মাথায় নিগ্রোদের মতো কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুল। সব থেকে বড় কথা শিশুটির একটি হাত নেই। জন্মের পর নবজাতকের একটি হাত না থাকা কি একটি পা না থাকা কি শরীরের কোন অংশ অপূর্ণ থাকা এগুলো কোন নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু এ শিশুর হাত প্রায় বগলের কাছ থেকে অ্যামপিউট করা। এমন তো হবার কথা নয়। এভাবে কোন প্রাণীরই জন্ম হতে পারে না। এবং অ্যামপিউটেড অংশটি বেশ ভালো করেই ড্রেসিং করা।

সেই মুহূর্তে সুচেতার মনে হাজার প্রশ্নের ঝড় ওঠে। এবং ডাক্তার ভরদ্বাজের কাছে এই নিয়ে তিনি প্রশ্নও করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিনের ডাক্তার ভরদ্বাজ যেন অন্য মানুষ। যেন গত রাতে কোন অস্বাভাবিক ঘটনাই ঘটেনি। নার্সিং হোমের তৎপরতা প্রতিদিনের মতো রুটিন মেনেই চলেছে। এমনকী কোন কর্মীর মুখেই কোন অস্বাভাবিকতার লেশমাত্র নেই। তবু তিনি মরিয়া হয়ে ঢুকেছিলেন ডাক্তার ভরদ্বাজের চেম্বারে। ভরদ্বাজ একাই ছিলেন। সুচেতাকে বসতে বলে ভরদ্বাজ বলেছিলেন, —মিসেস প্যাটেল, তুমি যে গুরুদায়িত্ব নিয়েছ তার জন্যে নার্সিং হোমের পক্ষ থেকে তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই চাওনা ওই অনাথ শিশুটি এই বিশাল পৃথিবীতে খড়কুটোর মতো ভেসে যাক। তাছাড়া তোমার নিজের সন্তান থাকলেও তাকে তো তোমাকেই মানুষ করতে হত। ধরে নাও না, এটাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

সুচেতা বলেছিলেন—কিন্তু স্যার, এ শিশুর পরিচয়?

—তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়। ও হ্যাঁ, বুঝতেই তো পারছ, তোমার স্বামী মারা গেছেন বছর পেরিয়ে গেছে। এখন যদি এখানকার মানুষ দেখে তোমার কোলে সন্তান,

তাহলে অনেক বিসদৃশ সমালোচনার সামনে দাঁড়াতে হতে পারে। অনেক কৈফিয়তের মুখোমুখি। আমি তার অলটারনেটিভ ব্যবস্থা করেছি। তুমি এখান থেকে কলকাতা চলে যাবে। ওখানে আমার এক বন্ধুর একটা বেশ বড় মাপের নার্সিং হোম আছে। আমি চিঠি লিখে রেখেছি। আমার চিঠি দেখালেই তোমার চাকরি হয়ে যাবে। এ ছাড়াও আমি ফোনে কথা বলে নোব। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে সারাজীবন, এ শিশু তোমার। এর প্রকৃত পরিচয় কেউ জানবে না। আর একটা কথা। বাচ্চাটি জন্মের সময় হাতে পচন নিয়ে জন্মেছিল। ওই জন্যে পুরো হাতটা অ্যামপিউট করতে হয়েছে। নইলে পুরো শরীরেই গ্যাংগ্রিন হয়ে যেত। নিশ্চয়ই আর তোমার কোন কৌতূহল রইল না। একত্রিশ বছর আগে সেই দিনই রাতের ট্রেনে কলকাতা চলে এসেছিলেন সুচেতা। নবজাতককে নিয়ে।

সুচেতা আর বিয়ে করেননি। হয়তো করতেনও না। কিন্তু এর পর থেকে সঞ্জয়ই তার জীবনের ধ্যানজ্ঞান। নিজেকে নিঃসাড়ে উজাড় করে দিয়ে একটু একটু করে বড়ো করে তুলেছেন সঞ্জয়কে।

বড়ো করেছেন। লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছেন। ছোটবেলায় সঞ্জয় সত্যিই তার মায়ের একান্ত বাধ্য সন্তান হয়েই বেঁচে ছিল। কিন্তু বাইশ বছর বয়েসের পর থেকে ছেলেটা কেমন যেন পাল্টে যেতে শুরু করল। একে তার ওই অসুন্দর চেহারা। তায় জন্মাবধি একটা হাত না থাকায় ওর মধ্যে একটা কমপ্লেক্স শুরু হয়ে যায়। মনোজ প্যাটেলের ছবির সামনে তাকে অনেক অনেকদিন একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। সুচেতাই একদিন ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরে ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন—হ্যাঁরে, সঞ্জু, তোর বাবার ছবিটার দিকে দাঁড়িয়ে থেকে কী দেখিস অত?

প্রথম প্রথম কোন উত্তর দিত না সঞ্জয়। তারপর একদিন থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল, —আচ্ছা মা, আমায় একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

সুচেতা চমকে উঠেছিলেন ছেলের রাগ রাগ চোখ আর কথা বলার ভঙ্গি দেখে। সামান্য একটু উৎকণ্ঠা নিয়ে বলেছিলেন, —তোর একটা কেন, সব প্রশ্নের উত্তর দোব। তোকে কী আমার না দেওয়ার কিছু আছে? বল, তুই কী জানতে চাস?

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে সঞ্জয় সরাসরি প্রশ্ন করেছিল, —সত্যি করে বলত আমি কার ছেলে?

—ওমা, সেকী কথা? তুই আমার ছেলে।

ঘর ফাটানো চিৎকার করে সঞ্জয় বলেছিল, —মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে?

—তার মানে?

—প্রথমত একটি ছেলের মধ্যে তার বাবা বা মায়ের কিছু নমুনা থাকবেই। তোমাকে দেখতে সুন্দর, মনোজ প্যাটেলকেও দেখতে সুন্দর, তাহলে কেন আমি দেখতে কদাকার?

যেন কিছু নয় এইভাবে সঞ্জয়ের কথা উড়িয়ে দিয়ে সুচেতা বলেছিলেন,

—জগতে এমন কী হয় না? বাবা মা দুজনেই কালো। তার ছেলেটি হল টুকটুকে ফরসা। এমন হয়। হয়েওছে। বাবা মা দুজনেই নিটোল স্বাস্থ্যবান, দেখা গেল ছেলেটি জন্মেছে কিছু খুঁত নিয়ে। এ সবই প্রকৃতির বিপর্যয় বলতে পারিস। হয়তো খোঁজ নিলে দেখা যাবে আমার বা তোর বাবার পূর্বপুরুষ কেউ হয়তো তোর মতো দেখতে ছিলেন।

—একদম বাজে কথা বলবে না। ওসব আমি অনেকদিন আগেই ভেবেছি। কিন্তু বাবার এই ডায়েরি? এটাও কি মিথ্যে?

চমকে ওঠে সুচেতা। —ওই ডায়েরি, ওটা তুই কোথায় পেলি?

—সারাদিন তুমি নার্সিং হোমে ডিউটি কর। বাড়িতে থাকি আমি একলাই। আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে দেখতে যখন আমি লজ্জায় ঘৃণায় এতোটুকু হয়ে যাই, তখনই মনে হয় আমি যেন তোমাদের কেউ নয়। কী একটা খেয়াল হতে তোমার আলমারি খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পাই এই ডায়েরিটা। নিশ্চয়ই পড়েছ?

কী উত্তর দেবেন সুচেতা? নীরবে তাকিয়ে থাকেন সঞ্জয়ের দিকে। সঞ্জয় তখনও বলতে থাকে, —মনোজ প্যাটেল একজায়গায় লিখছেন, সুচেতা চাইছে না এখনই আমাদের কোন সন্তান হোক। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছে একটি ছোট্ট শিশুর দামাল রাজত্ব। কেন যে ও রাজি হচ্ছে না। দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। একটা ভয় আমাকে মাঝে মাঝে ভীষণ তাড়া করে চলে। জানি খুবই অমূলক। ছোটবেলায় এক জ্যোতিষি আমার কোষ্ঠি বিচার করে বলেছিলেন জাতক বড়ই স্বল্পায়ূ। যদিও জ্যোতিষে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু সত্যিই যদি তেমন কোন অঘটন ঘটে যায়, সুচেতার সন্তান হয়ে সুচেতার কাছে আমি বেঁচে থাকতে পারব। আমার সন্তান মানে সেও তো আর একটা আমি।

ডায়েরি পড়া শেষ করে সঞ্জয় বলে, —এর পরে মনোজ প্যাটেল আর কিছু লেখেননি। কারণ তার পরেই তাঁর কার অ্যাকসিডেন্ট হয়। তখন তোমার বয়স কত ছিল? তোমার কথা মতো চব্বিশ। আমার এখন বয়স বাইশ। কিন্তু চব্বিশ বছর বয়সে তোমার কোন সন্তান হয়নি। অর্থাৎ তোমার চব্বিশের পর আমার জন্ম হয়েছে। কিন্তু আজ তোমার বয়েস ছেচল্লিশ। তাহলে আমার বয়েস কীভাবে বাইশ হয়? তবে কী আমায় ধরে নিতে হবে তুমি কোন লুকোচুরি খেলেছ? তুমি কিছু গোপন করে যাচ্ছ আমার কাছে? নাকি আমি তোমার অবৈধ সন্তান?

সুচেতা বলেছিলেন— খোকা, তুই আমাকে একথা বলতে পারলি? আমার জীবনে অন্য পুরুষ?

—না। সেটা আমি বিশ্বাস করি না। মনোজ প্যাটেল ছাড়া তোমার জীবনে আর কোন পুরুষ নেই। আসেওনি। তোমার মাতৃত্বের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।

—তাহলে এ সব জটিল হিসেব কেন? ও সব কথা বাদ দে।

আরও বেশি দুর্ধর্ষ হয়ে সঞ্জয় বলেছিল, —আমি আর ছোট নই। আমাকে এড়িয়ে

যেওনা। আমার জন্ম বৃত্তান্ত আমায় খুলে বল। আমি নিশ্চয়ই হাওয়ায় ভেসে আসিনি। নাকি আমায় কোন আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলে? তাও যদি না হয় তাহলে আমায় জানতে দাও কে আমার সত্যিকারের বাবা মা? ভয় নেই। তুমি আমার মা আছ। আমার মা হয়েই থাকবে। তবু এর মধ্যে যে রহস্য আছে সেটা আমার জানা দরকার।

কলে পড়া জন্তুর মতো অসহায় চোখে সুচেতা বলেছিলেন, —আজ আর সে রহস্য জেনে কী লাভ খোকা? তবে, এটুকু বিশ্বাস করতে পারিস তুই কোন অবৈধ জারজ নস। কোন এক উচ্চবংশের সন্তান। কিন্তু আমি জানিনা তিনি কে? কোথায় থাকেন? কেবল এটাই জানি, তোর এই চেহারার জন্যে তোর বাবা মা তোকে গ্রহণ করতে চায়নি। তোর জন্মের পরেই তোকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই তুই আমার সন্তান। আমি তোর মা।

—কোথায় আমি জন্মেছিলাম?

—নৈনিতালে। এক নার্সিং হোমে।

—আমার এই হাতটা কাটা কেন? জন্ম বিকলাঙ্গ তো এমন হয় না।

—জন্ম বিকলাঙ্গ তো নস। কোন এক কারণে হাতটা সেপটিক হয়ে যায়। পরে গ্যাংগ্রিন হবার ভয়ে অপারেশন করে হাতটা বাদ দিতে হয়েছিল। এটুকু আমাকে জানানো হয়।

—অপারেশন কে করেছিলেন?

—ওখানকারই এক বড় সার্জন ডাক্তার শ্রদ্ধানন্দ ভরদ্বাজ। কিন্তু এত বছর পর জানিনা তিনি এখনও বেঁচে আছেন কিনা।

—বেঁচে থাকুক আর মরেই যাক, নিশ্চয়ই আরও কোন ডাক্তার অতটুকু শিশুর দেহে অপারেশনের জন্যে তার সঙ্গী হয়েছিলেন। নিশ্চয় চব্বিশ পঁচিশ বছর আগের রেকর্ড বুক নষ্ট করে দেওয়া হয়নি। সেটা উচিতও নয়। আমি নৈনিতাল যাব।

—খোকা। যা অন্ধকারে ঢাকা আছে আবার কেন তাকে বাইরে আনা?

—কারণ অন্ধকারে যারা থাকে তারা সর্বদাই চেষ্টা করে আলোয় আসতে।

হঠাৎ একটা গাড়ির তীব্র ব্রেক কষার আওয়াজে চমকে ওঠেন সুচেতা। মাত্র আধ হাত ব্যবধানে মারুতি থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এক যুবক মুখ বাড়িয়ে বলছে, —মাসিমা মরার ইচ্ছে হলে আমার গাড়ির সামনে কেন? মেট্রোরেল খোলা আছে এখনও।

লজ্জায় পিছু সরে আসেন সুচেতা। কোন উত্তর দিতে পারেননি। আসলে সঞ্জুর ভাবনাটা তাকে বড়ো বেশি আনমনা করে তুলেছিল। নাহ্ এখনই বাড়ি ফেরা দরকার। আজ থেকে ন বছর আগে নিজের জন্ম রহস্য জানার জন্যে সঞ্জয় নৈনিতালে যায়। ফিরে আসে মাসখানেক পর। আর তারপর থেকে ও যেন আরও ভয়ংকর আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এই ন বছরে সঞ্জয় তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

ইদানীং সর্বদাই জানলার ধারে চুপচাপ বসে থাকে। নইলে সারাদিনই থাকে বাইরে বাইরে। কিছু নোংরা ছেলের সঙ্গে সঙ্গতও করেছে। মদও খাচ্ছে। আর ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কিছু বকছে। তার এক বর্ণ তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু কিছু একটা চূড়ান্ত ডিসিশন যে নিয়েছে সেটা বেশ বোঝা যায়। সুচেতা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনেক প্রশ্নও করেছিলেন। কিন্তু কোন জবাবই পাননি।

সুচেতা একটা ট্যাক্সি নিলেন। এ সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু পেয়ে গেলেন। এক্ষুনি তাঁর ছেলের কাছে যাওয়া দরকার। অ্যাডভান্স রিটায়ারমেন্ট নেবার এটাও একটা বড কারণ। সঞ্জুকে সর্বদা চোখে চোখে রাখা।

বাড়ি এসে যখন পৌঁছলেন তখন প্রায় সাতটা। দরজা খোলাই ছিল। কড়া নাড়তেই সঞ্জু এসে দরজা খুলে দিল। একটু অবাক লাগল সেই মুহূর্তে সঞ্জুকে দেখে। সেই উদ্দাম উন্মত্ত চাহনিটা এখন আর নেই। এখন এক ভাবলেশহীন মুখ। দিন কুড়ি পঁচিশ হবে সঞ্জুর মধ্যে এই ভাবান্তরটা দেখা যাচ্ছে। এরও কোন কারণ খুঁজে পান না সুচেতা।

তবে কী সঞ্জু ডাক্তার ভরদ্বাজকে খুঁজে পেয়েছে? খুঁজে পেয়েছে তার আসল পিতৃপরিচয়? তা পাক। কিন্তু তাকে তো জানানো উচিত ছিল।

পরক্ষণেই আর একটা দুশ্চিন্তা মাথায় ঢোকে। সঞ্জু কী তাকে ছেড়ে চলে যাবে তার আসল বাবা মায়ের কাছে? তার এতদিনের সব ভালোবাসা, বুক উজাড় করা মায়া মমতা দরদ দুপায়ে ঠেলে চলে যাবে? যেমন একদিন মনোজ চলে গিয়েছিল?

সুচেতা আর ভাবতেও পারেন না। জীবনটাই তো তাঁর সব হারানোর জীবন। বাবা মা থেকে শুরু করে স্বামী। একটু সুখের স্বপ্ন দেখেছিলেন সঞ্জুকে বড় করে। সেও তবে চলে যাবে?

চায়ের কথা বলতে সাহস পেলেন না। সঞ্জু মদ খেয়ে এসেছে। মদ খেলে ওর মধ্যে দুটো প্রতিক্রিয়া হয়। হয় একেবারে চুপ। নয়তো উদ্দাম বেপরোয়া। আজ কিন্তু কিছুই করছে না। জানলার ধারে টেবিলের ওপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছে।

—চাকরি শেষ করে দিয়ে এলে?

—হ্যাঁরে। আর ভালো লাগে না। কুড়ি বছর বয়স থেকে শুরু করেছিলাম। আজ পঞ্চান্ন। তার ওপর কত রোগ ধরেছে বল। সুগার, প্রেসার, চোখে কম দেখি। এবার তুই আমার ভার নে। আর আমি পেরে উঠছি না।

মাথা ঝাঁকিয়ে সঞ্জয় হাসে। তারপর বলে—তোমার কপালটাই মন্দ মা। কে আমায় চাকরি দেবে? একটা হাতই নেই। আমার চেহারা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে দূর দূর করে লোকে খেদিয়ে দেয়। ভাবে আমি হয়তো গুণ্ডা, মাস্তান, নয়তো অসুর, দানব। একটা কাজ করলে টাকা আসে। অনেক টাকা।

—কী?

—মস্তানি আর গুণ্ডামি। সেদিন হেবো বলছিল।

—তোকে মানুষ করার কী এটাই ফল?

—মানুষ? আমি তো মানুষ নই। আমি একটা গোটা অমানুষ। না-মানব।

—কেন? দিনটা অনেক পাল্টে গেছে খোকা। বেশ্যার ছেলেরাও আজ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তুই তো আর তা নস।

—বেশ্যার ছেলেরাও বুকে হাত ঠুকে বলতে পারে সে বেশ্যার ছেলে—সে বলতে পারে কোন এক শূয়োরের বাচ্চা তাকে জন্ম দিয়ে পালিয়ে গেছে। আমার সেটাও বলার উপায় নেই। আমি না ঘরকা না ঘাট্কা। তবে—

—কী তবে?

—থাক সে কথা। আচ্ছা মা আমি যেদিন থাকব না সেদিন তুমি খুব কষ্টের মধ্যে পড়বে? তাই না?

—লজ্জা করে না এ কথা জিগ্যেস করতে?

—নির্লজ্জের মতো যে পৃথিবীতে আসে তার আবার লজ্জা কী? তবে শেষ দেখাটা আমার বাকি। সেটা দেখেই তবে আমি যাব।

—সেটা কী?

—বলব মা, বলব। সব কিছু বলেই তবে আমি যাব। এখন আমায় কিছু খেতে দাও। বড় খিদে পেয়েছে।

—বোস। আমি এখুনি করে আনছি।

আজকের পাওয়া উপহারগুলো বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে যে মুহূর্তে উনি রান্নাঘরের দিকে যেতে যাবেন দরজায় করাঘাত।

চমকে ওঠেন সুচেতা। জীবনে দুটো করাঘাত এসেছে তাঁর দরজায়। দুভাবে। দুবারই চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু এবারের আওয়াজে কোন মাধুর্য নেই। বরং একটা অধৈর্য দামাল ধমকানি।

—কে? সুচেতা তড়িঘড়ি দরজার এপাশ থেকে সাড়া তুললেন।

—লোকাল থানা থেকে আসছি। এখুনি দরজা খুলুন।

বুকের মধ্যে রক্ত চলকে উঠল। তবু দরজা খুললেন। সামনেই পুলিস অফিসার চন্দ্রনাথ বশিষ্ঠ। পিছনে কয়েকজন কনস্টেবল।

আড়ষ্ট গলায় সুচেতা জিজ্ঞাসা করেন, —হ্যাঁ বলুন, কাকে চাইছেন?

—সঞ্জয় প্যাটেল বলে এ বাড়িতে কেউ থাকে?

—হ্যাঁ আমার ছেলে।

—বাড়িতে আছে?

—হ্যাঁ।

—ডাকুন তাকে।

—কিন্তু, কেন? তাকে আপনাদের কী দরকার?

—তার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আছে। ইনড্রাস্টিয়ালিস্ট শিবাজী শাস্ত্রীকে খুন করার জন্যে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে এসেছি।

আর কিছু শোনার জায়গায় ছিলেন না সুচেতা। সেইখানেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন।

আট

একটানা গরমের জেরে সারা শহরবাসী যখন চাতকের মতো হা বৃষ্টি হা বৃষ্টি করছে ঠিক তখনই কালবৈশাখীর ঝড় উঠল। অথচ আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ছিল জলভরা মেঘ আটকে আছে উড়িষ্যা উপকূলে। পশ্চিমবঙ্গে আসতে তার দেরি আবার নাও আসতে পারে। মর্জি না হলে অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারে। প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠতেই দীপু সোজা চলে গেল নীলের ঝুলবারান্দায়। হাওয়া খেতে খেতে ও বেসুরো গলায় গান ধরল 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে /পাগল আমার মন জেগে ওঠে....'

নীল সোফায় বসে চা খাচ্ছিল। দীপুর উচ্ছ্বাস আর গানের বহর দেখে বলল, —এই গানটা কী অঙ্গনাকে শুনিয়েছিলি?

বারান্দা থেকেই দীপু চেঁচিয়ে বলল—পাগল? আমার গলার গান? শোনাবো অঙ্গনাকে? প্রেমটা যাওবা এখনও টিকে আছে, গান শুনলে সেটাও চট্‌কে যাবে।

—ঠিক আছে। শুধু হাওয়া খা। আপাতত গানটা থামা।

বারান্দা থেকে ফিরে এসে সোফায় বসতে বসতে বলল,—ঠিক আছে, গানেও যখন তোমার এলার্জি, গাইলাম না, কিন্তু এদিকের কী খবর বল।

—এদিকের কথা তোর মনে ছিল?

—বাবা, মনে থাকবে না? কী যে বল তুমি? অঙ্গনার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম, খালি ভাবছিলাম, আহারে, গুরু বেচারি একা একা কেসটা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। জান নীলদা, তোমায় কী বলব, আমার তখন এত খারাপ লাগছিল।

—তখন মনে হচ্ছিল প্রেম ট্রেম ছেড়ে দিয়ে গুরুর কাছে ছুটে যাই। তাই না?

—আহ্, একেবারে মনের কথা টেনে বলেছ। তা কদ্দূর এগুলে বল। শুনলাম যে একটা লোককে নাকি তোমাদের হামবাগ ইন্সপেক্টর, ওই যে কী নাম, চন্দ্রনাথ বশিষ্ঠ অ্যারেস্ট করেছে খুনি বলে? তা ওই লোকটাই যে খুন করেছে সেটা বশিষ্ঠ বাবু বুঝল কীভাবে?

—সন্দেহজনক মনে হলে যে কাউকেই পুলিস অ্যারেস্ট করতে পারে। অন্তত

জিজ্ঞাসাবাদের জন্যেও ডেকে পাঠাতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লোকটা সাসপেক্টেটেড তো বটেই।

—কেন?

—হেবো বলে একটা মস্তানকে শিবাজীদার বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাকে পুলিস তুলে নিয়ে যায়, সেটা তো জানিস?

—হ্যাঁ।

—ওর কাছ থেকেই সঞ্জয় প্যাটেলের নাম ধাম পাওয়া যায়।

—সঞ্জয় প্যাটেল মানে যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু হেবোর সঙ্গে সঞ্জয়ের কানেকশনটা কী?

—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। হেবোর বক্তব্য শিবাজী শাস্ত্রীকে খুন করার জন্যে সঞ্জয় প্রথমে হেবোর সঙ্গে যোগাযোগ করে। হেবো হচ্ছে প্রফেশনাল খুনি। এর আগেও এরকম অনেক খুনই ও করেছে। কিন্তু হেবো যে টাকা ক্লেইম করে সেটা সঞ্জয় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দিতে পারেনি। তাই সে মার্ডারটা করেনি। তার ধারণা মার্ডারটা শেষমেষ সঞ্জয় নিজেই নাকি করেছে।

—তা এরকম একটা লোকের 'নাকি'র ওপর বিশ্বাস করে কাউকে অ্যারেস্ট করা যায়?

—কিন্তু আরও একটা ব্যাপার আছে। আমি বাদল সিংকে নিয়ে গিয়ে সঞ্জয়কে দেখাই। আইডেন্টিফাই করার জন্যে। বাদল সিং স্বীকার করেছে, সঞ্জয় লোকটা বিবাহবার্ষিকীর দিন ছাড়াও আরও কয়েকবার শিবাজীদার সঙ্গে একান্তে দেখা করেছিল।

—কেন?

—সেটাতো বলবে সঞ্জয় প্যাটেল। কিন্তু সঞ্জয় মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। একটাও কথা তার কাছ থেকে বেরোয়নি।

—সঞ্জয় প্যাটেল লোকটা কে? তার সঙ্গে শিবাজী শাস্ত্রীর কী সম্পর্ক? সে সব কিছু জানতে পেরেছে?

—বললাম না, লোকটা কোন কথাই বলছে না। ওর মা আছে। মহিলার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে হবে।

—হুঁ। কিন্তু আমার একটা জায়গায় কেমন বেসুরো ঠেকছে। ধরে নিলাম হেবো মার্ডার করেনি। যারা এই ধরনের প্রফেশনাল মার্ডারার হয়, তাদের সঙ্গে অর্থকরী লেনদেন না হলে তারা সে রাস্তা মাড়ায় না। তাহলে হেবো কেন দিন তিনেক শাস্ত্রীভবনের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। তার উদ্দেশ্যটা কী?

—প্রশ্নটা ভালই করেছিস। আমিও সে প্রশ্নটা হেবোকে করেছিলাম। ও এখন ধানাই পানাই বাহানা খাড়া করছে।

—কী রকম?

—আদপেই খুনটা হয়েছে কিনা সেটা জানার জন্যেই নাকি বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। যদি সত্যিই খুনটা হয়ে থাকে তাহলে সে নাকি নিজে থেকে থানায় গিয়ে সঞ্জয় প্যাটেলের দূরভিসন্ধির কথা জানিয়ে আসত।

দীপু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল—হুঁ, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। আমার যদ্দূর মনে হচ্ছে ওই হেবো ব্যাটাই খুনটা করেছে টাকা খেয়ে।

মাথা নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —মনে হয় না। হেবোর মতো লফেঙ্গা চেহাবার কোন লোক সেদিন ঐ বাড়িতে ঢোকেনি। অবশ্য এটা বাদল সিংয়ের বক্তব্য।

—বাদল সিং যে সত্যি বলছে তার কোন গ্যারান্টি আছে? বাদল সিং-ও তো টাকা খেয়ে ওই রকম একটা লোককে সবার অলক্ষ্যে বাড়িতে এন্ট্রি করিয়ে দিতে পারে।

—তা পারে। এক্ষেত্রে সবই সম্ভব।

বাইরে ততক্ষণে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বেশ মুষলধারেই শুরু হয়েছে। নিউ আলিপুরের এ পাড়াটা বেশ নির্জন। উত্তর বা মধ্য কলকাতা হলে এতক্ষণে পাড়ার মধ্যে হইহই করে আনন্দ উৎসব শুরু হয়ে যেত।

এই বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যেও নীচে কলিংবেল বেজে উঠল। নীল তাকাল দীপুর দিকে। দীপু বলে উঠল, —লাও, এমন আনন্দ সন্ধ্যায় কার কিসের ঠ্যাকা পড়ল বাবা।

—যা দেখ। নয়না বোধহয় রান্নাঘরে। সেরকম বুঝলে ওপরে আনবি। নইলে নীচে বসাস।

—বিকাশদা নয়তো?

—হতে পারে। পাগল লোক। প্রথম বৃষ্টি উপভোগ করতে ডিউটিতে গুলি মেরে চলে আসতেও পারেন। যা দেখ।

নীচে থেকে ঘুরে এসে দীপু বলল, —ঋষি দেবনাথ বলে কাউকে চেনো?

নীল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মনে করার চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, —ছিপছিপে চেহারার একটা লোক। বছর চল্লিশের মধ্যে বয়েস। সেদিন স্যুট টাই পড়েছিল। আজ কী পড়েছে?

—অর্ডিনারি শার্ট আর ট্রাউজার। টাই ফাই নেই। লোকটা ভিজে গেছে। নীচে বসিয়েছি। কিন্তু মালটি কে?

—মাল নয়। একজন ভদ্রলোক। কথাবার্তায় লাগাম দে। উনি হচ্ছেন শিবাজীদার কোম্পানির ম্যানেজার।

—গুরু, একটু পায়ের ধুলো দাও।

—হঠাৎ?

—তোমার যা স্মরণশক্তি। উৎসবের বাড়িতে মাত্র একবার দেখেছ, তাতেই,

—না একবার নয়। জেরার সময় ওকেও কিছু প্রশ্ন করেছিলেন বশিষ্ঠ বাবু। তখন আমি সেখানে ছিলাম। তুইও ছিলি। মদ খেয়ে বিভোর। খেয়াল করিসনি। কিন্তু তার আমাকে কী দরকার? চল তো দেখি।

নীল ঘরে ঢুকে দেখল, সোফার এককোণে জবুথবু অবস্থায় বসে চশমার কাচ মুছছিলেন। নীলকে ঢুকতে দেখেই ভদ্রলোক দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন। নীল হাতের ভঙ্গিমায় ওকে বসতে বলে নিজে ওর সামনের সোফায় বসল। তারপরই বলল, —নিশ্চয়ই চায়ে অরুচি নেই?

ভদ্রলোক সম্ভবত একটু সপ্রতিভ ধরনের, বললেন,—তাহলে তো খুবই ভলো হয়। বুঝতেই পারিনি হঠাৎ কালবৈশাখী এসে যাবে। কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করব। বুঝতেই পারছেন, একেবারে রেরুট। তার ওপর যা গরম। আজ হঠাৎ আমাদের লরিটা এদিকে আসছিল।

—লরি? মানে ডাবলিউ বি জিরো থ্রি টু টু টু টু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি সে খবরও রাখেন?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নীল বলল,—যা দীপু, চা টা নিয়ে আয়। ভদ্রলোক অফিস থেকে আসছেন। তায় ভিজেছেন। একটু ফ্রেঞ্চ টোস্টের ব্যবস্থা কর।

অন্য কেউ হলে 'না না আবার ওসব কেন' এই সব বলত। কিন্তু ঋষি দেবনাথ সে রাস্তাতেই গেল না। পেটে খিদে মুখে লাজের ব্যাপারটাই সম্ভবত ভদ্রলোকের নেই। দীপু চলে যেতেই নীল সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, —এবার বলুন তো, এত কষ্ট করে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে আসার জরুরি প্রয়োজনটা কী?

—আমি কী একটা স্মোক করতে পারি?

নীল হেসে ফেলে বলল, —আপনি কী নাবালক? নাকি আমি কোন গুরু ঠাকুর? পারমিশন নিয়ে সিগারেট খেতে হবে? আছে না দোব?

—নাহ্ আছে।

ঋষি সিগারেট ধরিয়ে বলল, —আপনার কাছে আসার কারণ একটাই। আপনিই তো স্যারের মার্ডার কেসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন?

—নাহ্, আরও একজন আছেন। আপনাদের লোকাল থানার ওসি চন্দ্রনাথবাবু।

—দূর মশাই। ওর কথা ছাড়ুন। এই ধরনের কমপ্লিকেটেড মার্ডারের হিল্লে ও ভদ্রলোকের দ্বারা হবে বলে আমার মনে হয় না।

হঠাৎ নীল জিগ্যেস করল—মার্ডারটা যে কমপ্লিকেটেড সেটা আপনি বুঝলেন কী করে?

—কমনসেন্স। একটা অসুস্থ মানুষকে খুন করার জন্যে একজন মানুষই যথেষ্ট। তার জন্যে তিনজনের দরকার হয় না। এবং একই মানুষের ওপর যখন তিনজন অ্যাটেম্পট্ নিয়েছিল, সেক্ষেত্রে ধরে নিতেই হবে ব্যাপারটা গণ্ডগোলের।

—বেশ। বুঝলাম। এবার বলুন আপনি কী বলতে চান?

—একটা খবর পেলাম কে একজন সঞ্জয় প্যাটেল নাকি স্যারকে খুন করেছে এবং তাকে নাকি অ্যারেস্টও করা হয়েছে।

—আপনি কী ভাবে খবর পেলেন?

—পঞ্চদীপ বাবু বলছিলেন। মানে ওনাদের জামাই।

—অর্থাৎ তিনিও এ ব্যাপারে বেশ ইন্টারেস্টেড। কিন্তু উনি তো অন্যজগতের লোক। ছবিটবি নিয়ে থাকেন। তারওপর খুব শিগগিরই ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ সেই রকমই শুনেছি। হয়তো নিজের শ্বশুরমশাইয়ের এই ধরনের মৃত্যুটা তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।

—ঠিক আছে, এবার আপনার কথা বলুন।

ইতিমধ্যে দীপু আর নয়না ফিরে এল। নয়নার হাতে ফ্রেঞ্চটোস্টের ট্রে আর দীপুর হাতে চায়ের সরঞ্জাম। জলখাবার পরিবেশন করে নয়না চলে গেল।

টোস্টে কামড় দিতে দিতে ঋষি দেবনাথ শুরু করলেন, —মিস্টার ব্যানার্জি, আমি জানিনা এই সঞ্জয় প্যাটেল লোকটা কে? তার সঙ্গে স্যারের কী সম্পর্ক? সে কেন খুন করতে যাবে এসব আপনাদের ভাবনার বিষয়। কিন্তু—

—বলুন—

—কয়েকটা বিসদৃশ ব্যাপার আমার চোখে ঠিক ভালো লাগছে না।

—কী রকম?

—প্রথমত বাবার মৃত্যু হলে তারওপর অ্যাবনরমাল ডেথ, ছেলের কাছে সেটা খুবই মর্মান্তিক হয়। যে কোন ছেলেই অন্তত কিছুদিনের জন্যে একটু আপসেট হয়ে পড়ে। যেটা আমি আরাধ্যবাবুর মধ্যে লক্ষ করেছি। বাট, ওনার মেজো ছেলে আভাসবাবু, সরি টু সে, মনে হচ্ছে উনি যেন একটু খুশিই হয়েছেন।

—আপনার এ রকম মনে হবার কারণ?

—না। ঠিক সে ভাবে ব্যাখ্যা করে আমি বলতে পারব না। তবে, পরদিন থেকেই উনি টোট্যাল ব্যবসাটা সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলে নিলেন। এমন কী আমার অনেক দায়িত্ব নিজে নিয়ে নিলেন। সেটা হতে পারে। এখন তো ওনারাই মালিক। কিন্তু ছোটবাবুর মধ্যে কোন রিঅ্যাকশন নেই। দিব্যি হাসছেন। পাঁচজনের সঙ্গে হইহই করছেন। ইভন, রাত্রে ড্রিংকও করছেন। ওনার আবার কিছু ভাইসেস আছে। সেগুলোও চলছে।

—ভাইসেস মানে?

—খুবই লজ্জার কথা। আপনি কতটা খবর রাখেন জানিনা। এবং আমার বলাটাও ঠিক হচ্ছে কিনা জানিনা। হি ইজ ইনভলভড্ উইথ দেয়ার মেইড সারভেন্ট।

—রমা?

—ইয়েস স্যার। বড় বাড়ির বড় কেচ্ছা বলে একটা কথা আছে। আমরা এদ্দিন জানতাম স্যারের সঙ্গেই নাকি মেয়েটির ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাবা ছেলে একই মেয়ের সঙ্গে? ভাবা যায় না। তারপর এই তো দেখুন না বাবা মারা গেল, উনি কাছা গলায় নিলেন না। মাথাও মুড়লেন না।

—এসব আজকের দিনে কোন ব্যাপার নয়। ওগুলো একটা সংস্কার মাত্র। ধরা চুড়ো না পড়লেও শোকের তারতম্য ঘটে না। আপনি ব্যাপারটা বলুন।

—হ্যাঁ ব্যাপার? আমার কেমন যেন মনে হয় স্যারের ওপর আভাসবাবুর তেমন কোন ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না। মানে ভেতরে ভেতরে একটা আক্রোশ—

—তা আপনার কী মনে হচ্ছে আভাসবাবুই আউট অব এনি গ্রাজ, ওর বাবাকে খুন করেছেন?

—না, অতোটা ভাবিনি। তবে আমার সন্দেহ অন্য দুজনকে।

—যেমন?

—যেমন শশধর পাঠক আর রমা দাস।

—শশধর পাঠক মানে শিবাজীদার ছোট শ্যালক।

এবার একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল ঋষি দেবনাথের মুখে।

নীল জিগ্যেস করল, —হাসছেন কেন?

—ওই শ্যালক বললেন তো তাই। শশধরবাবু বা তার দাদা সর্বময়বাবুকে স্যার কোনদিনও শ্যালক বলে সম্মান দেননি। সর্বময়বাবুকে অতি সামান্য কর্মচারি হিসেবে পাঠক পেপার হাউসে চাকরি দিয়েছিলেন। সর্বময়বাবু একটু টিমিড টাইপ। কিন্তু শশধর পাঠক লোকটা ডেইনজারাস।

—উনি কী করেন?

—কিছু করার স্কোপ কেড়ে নিলে সে আর কী করতে পারে? এই কথাগুলিই আপনাকে জানানোর জন্যে আমার আসা। তবে তার আগে অনুরোধ করব আপনি যে আমার মুখ থেকে কিছু শুনেছেন এটা জানলে আমার চাকরিটা চলে যাবে। এমন কী আমার অবস্থাটা স্যারের মতোও হতে পারে।

সিগারেটের শেষ অংশটা অ্যাশট্রেতে ভরতে ভরতে নীল বলল,—নাহ, কেউ বিশ্বাস করে কিছু তথ্য জানালে এবং সেগুলো যদি সত্য হয়, আপনার নাম কোনমতেই আমি প্রকাশ করব না। আপনি বলুন।

—আসলে, ওই যে দেখছেন পাঠক পেপার হাউস, নামেই বুঝতে পারছেন, এটা পাঠকদের আদি দোকান। শিবাজী স্যার হয়তো ঠিক করেননি। কিছু একটা ব্যাপার ট্যাপার ঘটিয়ে পুরো পেপার হাউসটাই নিজেদের নামে করে নিয়েছিলেন।

—কিন্তু, এতক্ষণে দীপু জিগ্যেস করল,—তাহলে এখনও পাঠক পেপার হাউস নামটা

রয়েছে কেন? কেন শাস্ত্রী পেপার হাউস নয়?

—দুটো কারণ। এক নম্বর গুড উইল। বড়বাজারে পাঠক পেপার হাউসের বেশ নাম আছে। দু নম্বর ওটা এখনও মহারানী দেবীর নামেই আছে। পৈত্রিক দান হিসেবে। অবশ্য এটা দান না অন্য কিছু সেটা মহারানী দেবীই বলতে পারবেন।

—এটুকু খবর আমার কাছে ছিল। তারপর?

—পাঠকরা সব কিছু হারাবার পর, সর্বময়বাবুর বাবা স্ট্রোকে মারা যান। আর সর্বময়দা একটা চাকরি পান ওই দোকানে। উপায় নেই, তিনি সংসারী মানুষ। রোজগার না করতে পারলে তার চলবে না। কিন্তু শশধর পাঠক। মাতাল এবং বেপরোয়া। অবশ্য ওনারও সংসার আছে। তবে, বোধহয় আত্মসম্মান জ্ঞানটাও একটু বেশি। উনি কারো তোয়াক্কা না করে স্যারের সঙ্গে দোকানে দেখা করতেন। জুলুম করতেন। চ্যাঁচামেচি করতেন। শাসাতেন। টাকাব ক্লেইম করতেন। ভাবুন, ওই রোগাপট্‌কা লোকটার কত তেজ!

—শিবাজীদা টাকা দিতেন?

—বোধহয় দিতেন। তবে টাকাটা লেখা হত স্যারের নামে। সেখানে শশধরদার কোন উল্লেখই থাকতো না।

—আপনি যেন সন্দেহের কথা কী বলছিলেন?

—হ্যাঁ, এবার সেইটাই বলি। স্যারের পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহবার্ষিকীর ঠিক দুদিন আগে, স্যার সবে মিল থেকে ফিরেছেন—

—উনি কী রোজই মিলে যেতেন? মিলটা কোথায়?

—হ্যাঁ। মিলটাতো টিটাগড়ে। নিজের গাড়ি, অসুবিধা হত না। সেদিন পেপার হাউসে ফিরেই উনি দেখেন ওনার চেম্বারে হাত পা ছড়িয়ে শশধর পাঠক বসে বসে বিড়ি ফুঁকছেন। দেখেই স্যারের মেজাজ গরম হয়ে গেল। আমার তখনও ডিউটি ছিল। স্যার না আসা পর্যন্ত আমায় ডিউটিতে থাকতে হয়। পাশের ঘর থেকে আমি শুনলাম তুমুল চিৎকার চেঁচামেচি।

—দোকানের অন্য স্টাফেরা?

—আটটায় বন্ধ। তখন বাজে নটা। কেই বা থাকবে? আর দুই ছেলেই সেদিন ফ্যাক্টরিতে।

—তারপর? গণ্ডগোলটা কী নিয়ে?

—পাঁচলাখ টাকা নিয়ে।

—পাঁচলাখ মানে?

—শশধরবাবুর কেন জানিনা, কী বিশেষ দরকার, সেই রাতেই ওনার ক্যাশ পাঁচ লাখ টাকা দরকার। এবং শশধরদা এটাও জানান এটা কোন ভিক্ষে নয়। এটা তাঁর ক্লেইম।

—শিবাজীদা কী বলেছিলেন?

—প্রথমে উনি দেবেন না বলেন। তারপর শশধরদা যখন বলেন টাকা না দিলে পরদিন সকালে হাজার পুলিস পোস্টিং করেও ঠেকাতে পারবে না। স্যারের সব ব্যক্তিগত কেচ্ছা

হ্যাটের মাঝে ফাঁস করে দেবেন।

—শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?

—হঠাৎ গলার সুর একেবারে নরম করে স্যার বলেছিলেন, —কিছু চাইতে গেলে অত চড়া মেজাজে চাইলে সেটা পাওয়া যায় না। সুরটা নরম কর।

উত্তরে শশধরদা মেজাজ সপ্তমে রেখেই বলেছিলেন,— তোমার অ্যাকটিং আমার অনেক দেখা আছে, কাল সকালে আসব, টাকা রেডি রাখবে। নইলে—

—নইলে?

—শশধরদা বলেছিলেন, আমি সব কিছু করতে পারি এটা মনে রেখো। তখন আর জামাই টামাই কিছু মানব না। দিদি যে কেন এখনও তোমায় টলারেট করে ভেবে পাই না। যাকগে, সে তোমাদের ব্যাপার তোমরা বুঝবে।

উত্তরে স্যার বলেছিলেন, কিন্তু শশধর, টাকাটা কাল তোমায় দিতে পারছি না। বিবাহবার্ষিকীর দিনে নিশ্চয়ই আসছ—ওই দিনই পেয়ে যাবে। বুঝতেই পারছ অতগুলো টাকা।

শশধরদা শেষ কথা বলেছিলেন, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে উনি আঙুল বাঁকাবেন।

এই পর্যন্ত বলে ঋষি দেবনাথ থামলেন। তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, —মিস্টার ব্যানার্জি, আমি জানি, টাকার কোন যোগাড় করেননি স্যার, তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে টাকা না পেয়ে শশধরদা শেষপর্যন্ত। তাছাড়া উনি সেদিন প্রচুর মদ্যপানও করেছিলেন।

—কিন্তু সেদিন তো ওনাকে তেমন অবস্থায় দেখতে পাইনি।

—উনি হচ্ছেন পিপে। কতটা খেয়েছেন বোঝা যায় না। ওকে মদ খেতে আমি দেখেছি। ওসির কাছে স্টেটমেন্ট দিয়ে কখন চলে গেছে কেউ জানেনা।

চায়ের তলানিটুকু শেষ করে নীল আবার একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, —তাহলে আপনার সন্দেহের তালিকায় শশধর পাঠক যিনি বঞ্চনার শিকার আর একজন কার কথা বলছিলেন? রমা?

—রমার ব্যাপারটা বুঝিনা। বাবার সঙ্গেও মেলামেশা করে আবার ছেলের সঙ্গেও। এসব নোংরা মেয়েদের যে কেন বাড়িতে রেখেছেন মহারানী দেবী ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা।

—রমা কী খুন করতে পারে?

—এত সাহস হবে বলে মনে হয় না। তারওপর যে ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশা করত তাকেই। নাহ্, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে মেয়েটা সুবিধার নয় এটা বলতে পারি।

নীল কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করল,

—দেবনাথবাবু, আপনি তো আরাধ্যকে অনেক বার সামনে থেকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—এই গরমেও উনি হাতগ্লাভস এবং ফুল স্লীভ শার্ট কেন পড়েন বলতে পারবেন?

—এদিকটাতো আমি তেমন ভাবে ভাবিনি। তবে আপনার মতোই দোকানের দু একজন কর্মচারির একই কিউরিসিটি। বিশেষ করে ওই গ্ল্যাভস্। তবে এটা আমার শোনা কথা ওনার নাকি হাতে কুষ্ঠ আছে। সেটা ঢাকবার জন্যেই। সত্যি মিথ্যে অবশ্য জানি না।

—ঠিক আছে দেবনাথবাবু, আপনার ইনফরমেশনের জন্যে ধন্যবাদ। তবে আপনাকে একটা কথা বলি। শাস্ত্রীভিলার অনেক কিছু আপনি জেনে গেছেন। একটু সাবধানে থাকবেন। কারণ শাস্ত্রীভিলায় অনেক ডেঞ্জারাস লোক আছে।

—সে আমি জানি স্যার। ভেতরে ভেতরে চাকরি খুঁজছি। পেলেই কাটব।

—এ কেসটা সল্ভ্ হওয়া পর্যন্ত আপনাকে থাকতে হবেই। তারপর যেখানে খুশি যেতে পারেন। ও হ্যাঁ, অর্ধনারীশ্বরের কোন খবর পেলেন?

—না না ও চুরি টুরি বাজে কথা। ওই বাড়িতেই কোথাও লুকনো আছে। মহারানী দেবীকে অত কাঁচা মহিলা ভাববেন না। নিত্যি পুজো না করে যিনি জলগ্রহণ করতেন না, তিনি কী অত নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? দেয়ার ইজ সামথিং রঙ।

—আর কিছু?

—না স্যার। আমার জাস্ট কিছু কথা মনে হয়েছিল, আপনি ওবাড়িতে স্যার বেঁচে থাকতে রেগুলার যেতেন, তার ওপর আপনি একজন ইনভেস্টিগেটর। তাই এত কথা বললাম। যদি আপনার তদন্তের কোন সুবিধা হয়। তবে আপনি নিশ্চয়ই আপনার শর্ত মানবেন।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ঋষি দেবনাথ উঠে পড়লেন। নীল দীপুকে বলল, —যা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়। দীপু ফিরে এসে দেখে দেবনাথের ব্যবহৃত কাঁটা চামচ, জলের গ্লাস আর চায়ের কাপ খুব সাবধানে পলিপ্যাকে মুড়ে রাখছে নীল।

দীপু জিগ্যেস করল, —তাহলে দেবনাথও তোমার সাসপেক্টেড ওয়ান।

—ওহ্ সিওর। এত সিনসিয়ার স্টাফ। মনিবের এত কেচ্ছা উজাড় করে দিল! কেন? কোন কমপ্লিকেটেড কেসে সন্দেহ করা থেকে কাউকে বাদ দিতে নেই রে।

নয়

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দীপু দেখল নীল বাড়ি নেই। নয়নাকেও কিছু বলে যায়নি। অতঃপর অঙ্গনার ধ্যান করা ছাড়া ওর আর কিছু করারও ছিল না। দুপুরের দিকে একবার নন্দিনীর অফিসে ফোন করেছিল। না সেখানেও নীল যায়নি। সারা সকাল বসে অঙ্গনাকে চিঠি

লিখল। তারপর ভাল করে চানটান করে দুপুরে ঠেসে উদরভরাট করে অঙ্গনার মুখটা মনে করে সোফায় শুয়ে পড়ল। ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল পাঁচটা। গতকালের মতো আবার সেই আকাশ কালো করা মেঘ। তারপরই উঠল ঝড়। একটুপরেই পাল্লা দিয়ে বৃষ্টি। নীল থাকলে বৃষ্টি নিয়ে খুনসুটি করতে পারত। সেটা হল না। আবার ফোন নন্দিনীকে। সে নাকি ল্যাজেগোবরে হয়ে বাড়ি ফিরেছে এবং নীলের কোন খবরই জানে না।

অতঃপর একটা লঘু গল্পের বই নিয়ে বসে পড়ল। নীল ফিরল ন্যাতানো তেলেভাজা হয়ে। জলে ভাজা বললেই ভালো হত। জলেতো ভাজা হয় না। সেদ্ধ হয়।

এসেই সোজা চলে গেল বাথরুমে। ভালো করে চান সেরে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল,—নয়নাকে বল কড়া লিকার চা।

—আজ একটু কড়া হুইস্কি হলে হত না?

—না। অঙ্গনাকে বিয়ে করে এত হুইস্কি সামলাবি কি করে?

—দূর! কোথায় বিয়ে কোথায় কী? আগে চাকরি তারপর ওসব হবে। তুমি আগে, ও হ্যাঁ তোমার সাইকেল হাউসের চাকরিটাই নয় দাও।

—ঠিক আছে হবে। ওটা তো পাকা হয়েই আছে।

—গুড। তারপর আজ সারাদিন কী করলে বল?

—মহারানী দেবী আবার হুমকি ফোন পেয়েছেন খরগোসের কাছ থেকে।

—এ শালার খরগোসটা কে? শশধর পাঠক নয় তো?

—খরগোস যেই হোক, খুব ডেঞ্জারাস লোক। কথায় কথায় গুলি চালিয়ে দেয়।

—ও ব্বাবা। তাহলে তো মহারানী ভিক্টোরিয়ার লাইফ ইজ ইন ডেনজার।

—হ্যাঁ। আমি তাই বলে এলাম।

—তোমার কী মনে হয় কেসটা সল্‌ভ্‌ করতে কতদিন লাগবে?

—কেস তো সল্‌ভ্‌ হয়ে গেছে।

আকাশ থেকে পড়ল দীপু। —কী বলছ গুরু, কেস সলভ্‌ড্‌?

—হ্যাঁ। তা বলতে পারিস। মিসেস প্যাটেলের সঙ্গে দেখা না হলে বোধহয় জটটা খুলতো না।

—মিসেস প্যাটেল কে?

—পরে সব জানবি।

—তা, তিনজন অ্যাটেম্পটারকেই স্পট আউট করেছ?

—হ্যাঁ। সেটাও ঠিক।

—তাহলে অ্যারেস্ট করছ না কেন? তোমার বশিষ্ঠ মুনি কি করছেন?

—করবেন। ঠিক সময়েই করবেন।

—ঠিক সময়টা কবে?

—ঠিক সময়টা যেদিন আসবে। এখন মহারানী দেবীকে চোখে চোখে রাখতে হবে। মহিলার জীবন নির্ভর করছে আমাদের ওপর।

—আমাদের মানে? আমিও আছি?

—থাকবি।

—তা গুরু, সেটা কবে?

—বেশি দেরি নেই। বেশি দেরি করার সময় নেই সেই ভদ্রলোকের।

—কার?

—মিস্টার খরগোসের।

—উঃ আবার সেই খরগোস!

—হ্যাঁ খরগোস। ওই তো শেষ খুনটা করতে আসবে। আসতেই হবে। নইলে এত বড় একটা ব্যাপার—

—তুমি বড় হেঁয়ালি করছ।

—আর কটা দিন।

—হেবো? তার খবর কী?

—ভাড়াটে মাস্তানদের আর যাই থাকুক ব্রেনটা খুব বেশি খেলা করে না।

—তার মানে হেবো বাদ?

—আমার কথার কী সেটাই মানে হল? যাকগে, আমায় এখন বিরক্ত করিস না। একটু ভাবতে দে।

—নন্দিনীদিকে একটা ফোন করব?

—মারব গাট্টা। যা ঘুমগে যা।

—ঘুম হবে না। আজ সারাদিন ঘুমিয়েছি।

—তবে যা খুশি কর গে যা, আমাকে বিরক্ত করিস না। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। খাবারের ব্যবস্থা কর।

—তার আগে একটু—

নীল ওর মুখের দিকে তাকাল। একটু হাসল।

—যা, নিয়ে আয়। কিন্তু বেশি নয়।

—সে আর বলতে।

দীপু বেরিয়ে গেল। নীল ডুবে গেল আগামী দিনের পদক্ষেপ নিয়ে ভাবতে।

দশ

নীল বসেছিল চন্দ্রনাথ বশিষ্ঠের সামনে। তখন সন্ধে প্রায় সাতটা। দুজনকেই বেশ উদ্বিগ্ন

দেখাচ্ছিল। আসলে দুজনেরই অপেক্ষা একটা ফোনের। হয় সেটা আসবে নীলের মোবাইলে। নয়তো বশিষ্ঠ বাবুর বাজখাই টেলিফোনে। একসময় অধৈর্য্য হয়ে বশিষ্ঠ বললেন, —মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি কী সত্যিই মনে করেন যা হবার তা আজই হবে?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —আমি সাধারণত ক্যালকুলেশনগুলো করি ঘটনা বিন্যাস দেখে। আজই অর্ধনারীশ্বরকে চুরি করতেই হবে। নইলে আর সময় পাওয়া যাবে না। কেন সময় পাওয়া যাবে না, এটা নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে হবে না।

—তাতো বুঝলাম। কিন্তু সাধারণত যারা এই রকম অ্যাডভেঞ্চারাস চুরি করে, তারা কী এই ভরসন্ধেবেলা সেই রিস্‌কটা নেবে?

—কিন্তু চোরতো বাইরের কেউ নয়। সে ওই বাড়িতেই আছে। তার পক্ষে ঠাকুরঘরে যাওয়াটাও বিশেষ হাঙ্গামার কিছু নয়। সব থেকে বড় কথা মহারানীদেবী সব ব্যাপারটাই জানেন।

—সে কী, ওনাকে কিছু বলেছেন নাকি?

—উনি সাহায্য না করলে এ চুরি কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মহারানী দেবীর সঙ্গে শিবাজীদার ভেতরে ভেতরে যতই অসদ্ভাব থেকে থাকুক না কেন, বাইরে থেকে সেটা কোনকিছুই বোঝা যেত না। অন্তত আমার চোখে ধরা পড়েনি। একটা ব্যাপারে দুজনেই খুব সিনসিয়ার ছিলেন।

—ওই শিবের মূর্তির ব্যাপারে?

—হ্যাঁ। দুজনেরই ধারণা ছিল ওটা ওদের বংশের সৌভাগ্যের প্রতীক। অর্ধনারীশ্বর একটা রেয়ার স্পেসিমেন। জিনিসটা কালেক্ট করার পরই ঠাকুর ঘরে একটা অ্যান্টি চেম্বার তৈরি করেছিলেন। আর এই অ্যান্টিচেম্বার খোলা আর বন্ধের প্রসেসটা জানতেন তিনজন।

—তিনজন? দুজনকে চেনা গেল। বাট হু ইজ দ্য থার্ড ওয়ান?

— যে আজ চুরির জন্যে সম্পূর্ণ রেডি। আর সেই চোরটিকে ধরার জন্যে মহারানী দেবী আজ অ্যান্টি চেম্বারের দরজা প্রায় খুলেই রেখেছেন। অ্যাজ ইফ তিনি লক করতে ভুলে গেছেন।

—এটা নিশ্চয়ই আপনার প্ল্যান?

—তাই জন্যেই তো বলছি। চোর একজন। সে ব্যাপারটা আগেই টের পেয়েছে। অতএব এটাই তার পক্ষে মোক্ষম সুযোগ।

—কিন্তু বাড়ির অন্য লোকজনেরা।

—একমাত্র রচয়িত্রী মানে ওনার মেয়ে ছাড়া মহারানী দেবীর ঘরে খুব একটা কেউ থাকে না। হ্যাঁ আর একজন যায়। কিন্তু আপনার লোকজনেরা সব বামাল সমেত চোর ধরবার জন্যে রেডি আছে তো?

চন্দ্রনাথ বশিষ্ঠ একবার গোঁফে হাত ঠেকিয়ে বললেন, —ওসব নিয়ে আপনি চিন্তা

করবেন না। কিন্তু আপনার সাগরেদ কোথায়? তাকে কোথায় রেখে এলেন?

—দীপু ঠিক জায়গায় আছে। ঠিক সময়েই বেরুবে।

—আজ কী কোন খুনখারাপি হতে পারে?

—জিনিসটা হাতে পেয়ে গেলে অযথা কেউ খুন খারাপি করতে চায়? তাছাড়া মহারানী দেবী যাঁর আঘাত পাবার সম্ভাবনা বেশি তিনি তো ডাক্তারের নির্দেশে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে আছেন। মনে হয়না তেমন কিছু হবে। যদি কিছু হয় স্ল্যাপটা নিয়ে পালাবার সময়।

আর এক রাউণ্ড চা শেষ করতে করতে যখন ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘরে, নীলের মোবাইল ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

নীল মোবাইল স্ক্রীন দেখে অ্যাকসেপ্ট নব টিপে বলল, —হ্যাঁ, বল।

ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, —এতক্ষণ বাড়ি ছিল না। এইমাত্র ফিরেছে।

—এখন কী করছে?

—ওর ঘরে ঢুকেছে।

—ঠিক আছে। মহারানী দেবী কী করছেন?

—অঘোরে ঘুমচ্ছেন। ঘরে মাত্র একটা আলো জ্বলছে।

—কেউ আছে ওনার কাছে? মানে ওনার মেয়ে?

—না। রচয়িত্রী আজ সারা দিনই বাড়ি নেই। নিজের বাড়ি গেছে। বোধহয় সব কিছু গোছগাছ করার জন্যে।

—তার মানে এবার কি রচয়িত্রী সঙ্গে যাচ্ছে?

—শুনিনি তেমন কিছু। আপনি কখন আসছেন?

—তোমার সঙ্গে কথা শেষ হলেই বেরিয়ে পড়ব।

—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন। আমার খুব ভয় করছে।

—তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমরা এলাম বলে।

সাড়ে আটটার মধ্যেই নীল আর বশিষ্ঠ সাহেব শাস্ত্রী ভিলায় ঢুকে গেল। বাদল সিং এখনও পাহারা দিচ্ছে। নীল আর বশিষ্ঠকে দেখে কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে কেবলমাত্র সেলাম ঠুকে আবার কাঠের সিপাই হয়ে গেল।

সারা বাড়ি সান্নাটা। আরাধ্যর ঘর ভেজানো। প্রভাতী সম্ভবত সাতে পাঁচে থাকে না বলেই অধিকাংশ সময়েই তার ঘরের দরজা ভেজানো থাকে। কল্পিতার ঘরও বন্ধ। কে জানে আভাস আছে কিনা। ইদানীং আভাসের চালচলনে একটা বেপরোয়া ভাব। তার যাতায়াতেরও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কল্পিতার সঙ্গে আভাসের সেই মাখো মাখো ব্যাপারটা এখন আর তেমন নেই। দুজনেই থাকে দুজনের মতো। রমার ব্যাপারটা সম্ভবত জানাজানি হয়ে যেতে পারে। এটা বোধহয় তারই রিঅ্যাকশন। রচয়িত্রী নেই। নিজের বাড়িতে গেছে। চাকর মহেশ আর বাবলুর দেখা পাওয়া গেল না। শেফালি আর রমা হয়তো

রান্নাঘরে।

দোতলার বড় হলঘরের একটা সোফায় চন্দ্রনাথকে বসিয়ে রেখে নীল চলে গেল নির্দিষ্ট ঘরে।

ঘরটিতে যেতে গেলে মহারানীর ঘর পেরিয়ে যেতে হয়। আড় চোখে একবার মহারানীদেবীর বিছানাটা দেখে নিল। নাহ্ উনি নিঃসাড়ে ঘুমচ্ছেন। ঘরে একটা হাল্কা নীল আলো জ্বলছে। পকেট থেকে রিভলভারটা হাতে নিয়ে নীল সোজা গিয়ে ঢুকল ঠাকুরঘরে। আজ আর কোন বাছবিছার মানা সম্ভব হল না। নীলের পায়ে ছিল নর্থস্টার। খোলার কোন প্রশ্নই নেই। ঠাকুর ঘরে একটা টিমটিমে মোমবাতি জ্বলছে। মৃদু হাওয়ায় সেটা সামান্য কাঁপছে। সেই রকমই কথাবার্তা ছিল। চড়া আলো জ্বালা চলবে না। অ্যান্টি চেম্বারটার দিকে একবার তাকাল। এমনিতে মনে হবে একটা লম্বা দেওয়াল। কিন্তু সেই দেয়ালের সঙ্গেই আছে গুপ্ত দরজা। সেটা একটা বিশেষ নব টিপলে খুলে যায়। খোলা না থাকলে সেটাকে দেওয়ালের একটা অংশ বলে মনে হবে। দরজাটা সামান্য খোলা। কিন্তু দরজার ওপাশটা পরিপূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা।

হাতের ছোট টর্চ জ্বালিয়ে পুরনো সিংহাসনটা একবার দেখল। শূন্য সিংহাসনটা যেন ভেংচি কাটছে। নীল গিয়ে সিংহাসনের পিছনে ঘাপটি মেরে বসে রইল।

কে জানে কতক্ষণে প্রতীক্ষার শেষ হবে। কিন্তু শেষ হল। প্রায় রাত সাড়ে নটা তখন। যদিও সেটা আন্দাজে। কারণ নীলের হাতঘড়িতে কোন রেডিয়াম দেওয়া নেই।

খুট্ করে একটা শব্দ ভেসে এল। মহারানীদেবীর ঘর থেকে আসছে। তারও মিনিট পাঁচেক পর আবছা এক মূর্তি ঠাকুর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। নীল নিজের মাথাটা আরও নামিয়ে আনল। এবং সিংহাসনের কারুকাজের ফাঁক দিয়ে রিভলবারটিকে সজাগ করে রাখল। আগন্তুক ঘরে ঢুকে একবার চারদিকে টর্চের আলো ছড়ালো। তারপর সেটি গিয়ে আটকালো সামান্য খোলা দেওয়াল দরজার ওপর। ধীর পায়ে মূর্তি এগিয়ে গেল খোলা দরজার দিকে। আরও একবার সে দাঁড়াল। তারপর প্রায় নিঃশব্দে ঢুকে গেল অ্যান্টি চেম্বারে। নীল মুখে মুখে সেকেণ্ডের হিসেব করে যাচ্ছিল। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ......প্রায় পাঁচশ সেকেণ্ড পর আবার একটা শব্দ। অতি ধীর এবং প্রায় নিঃশব্দ আওয়াজ। স্ল্যাপটা ফের দেখা গেল দরজার মুখে। তার হাতে একটা বিগশপার। শপারের ভারে আগন্তুক যেন একটু বাঁ দিকে কাত হয়ে বেরচ্ছে।

ব্যস্ ওইটুকুই। তারপরই দেখা গেল আগন্তুককে পিছন থেকে জাপটে ধরেছে দীপু। দীপুর বাঁধন বজ্র বাঁধন। আগন্তুক চেয়েছিল অভীষ্ট বস্তুটি ফেলে দিয়েই ঝটকা দিয়ে পালাতে। কিন্তু ততক্ষণে নীল উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে উদ্যত রিভলভার।

—দীপু, ওকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের সব আলোগুলো জ্বেলে দে। নীচে চন্দ্রকান্ত বশিষ্ঠ বসে আছেন। ওঁকেও খবরটা দিয়ে দে।

চিৎকার চেঁচামেচিতে ততক্ষণে বাড়ির সব লোক বেরিয়ে পড়েছে। সব আলোটালো জ্বালা হয়ে গেছে। মহারানী দেবী ঘুমোননি। ওটা ওর ভান। উনিও উঠে পড়েছেন। কেবল মহারানীদেবীর মুখ থেকে বের হল একটাই বাক্য, —শেষকালে তুই?

এগারো

শেষ আসর বসেছিল দোতলার বড় হলঘরটায়। যেখানে চৈত্রের শুরুতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন শাস্ত্রীভিলার গৃহকর্তা শিবাজী শাস্ত্রী। সেই ডিভান এখনও পড়ে আছে। একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা।

সামনে অনেকগুলো চেয়ার। সেখানে আছেন অম্বরীশ ঠাকুর। মহারানী শাস্ত্রী, আরাধ্য শাস্ত্রী, তাঁর স্ত্রী প্রভাতী শাস্ত্রী, আছেন কল্পিতা শাস্ত্রী, আভাস শাস্ত্রী। আছেন সর্বময় পাঠক, শশধর পাঠক। আছেন পঞ্চদীপ সেন, রচয়িত্রী সেন। এছাড়াও শেফালি, বাবলু, মহেশ আর রমা। আর আছেন পুলিস অফিসার চন্দ্রকান্ত বশিষ্ঠ। নীল আর দীপু তো আছেই। বাদল সিংও একেবারে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া। আর আছেন এ গৃহের একান্তই অপরিচিতা এক রমণী যাঁর নাম শ্রীমতী সুচেতা প্যাটেল।

এই আসরে চায়ের কোন ব্যবস্থা নেই। আমন্ত্রণ নয়, পুলিসের বিশেষ সমনে সবাইকেই আসতে হয়েছে। বলতে গেলে বাধ্য হয়েছেন।

আসার পর থেকে শশধর পাঠক সমানে উসখুস করে চলেছেন। এক সময় বলে উঠলেন, —আপনাদের এই নাটক পর্ব কতক্ষণ চলবে? আমার অনেক কাজ আছে, যেতে হবে।

চন্দ্রকান্ত বশিষ্ঠ আজ নিজের মুডে আছেন। এক দাবড়ানিতে শশধরকে বসিয়ে দিলেন।

—বেশি কাজ দেখাবেন না। আপনার কাজ তো বাইরে গিয়ে তাড়িখানায় ঢোকা। একদিন ওই দিশি বিষগুলো না খেলেও কোন অসুবিধা হবে না।

—কিন্তু আমরা কী চোর না খুনি, যে সন্ধে থেকে আটকে রেখেছেন? এ শালার বাড়িতে আমার ঢোকার ইচ্ছেই ছিল না। শালা অভিশপ্ত বাড়ি। এ বাড়ির সব শালা চিটিংবাজ। এমন কী আমার দিদিটাও।

ঠিক যে ডিভানে শিবাজী শাস্ত্রী খুন হয়েছিলেন, নীল দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই। শশধরবাবুর কথার উত্তরে ও বলল, —শশধরবাবু, আপনার সব অভিযোগ আমি জানি। এ বাড়িতে আপনার থাকার ইচ্ছে নেই, সেটাও আমি জানি। কিন্তু আপনার কী মনে আছে শিবাজীবাবুকে মৃত্যুর দুদিন আগে আপনি তাঁকে খুন করার হুমকি দিয়েছিলেন?

চিড়বিড়িয়ে উঠে শশধর বললেন, —হ্যাঁ, এই বুদ্ধি নিয়ে আপনারা পুলিস হয়েছেন? একজন বলল, মেরে দোব, অমনি সে মেরে দিল। হ্যাঁ রাগ আমার ছিল। শিবাজী শাস্ত্রীকে

খুন করতে পারলে আমার মনের ঝাল মিটতো। তা আর হল না। তার আগেই কোন্ শালা ঝেড়ে দিয়ে গেছে। খুন করব বলা আর খুন করা দুটো এক জিনিস নয়।

নীল হাত তুলে ওকে থামিয়ে বলল, —আপনি যে খুনি একথা আপনাকে একবারও কেউ বলেনি।

—তবে আমাকে এই নাটক দেখাতে টেনে নিয়ে এলেন কেন? আমার ওসব চীপ্ নাটক ভাল্লাগে না।

—বাহ্, জানতে ইচ্ছে করে না, কোন্ সেই তিনজন যারা ঠিক একই দিনে তিনবার তিনটি মোক্ষম আঘাত হেনেছিল শিবাজীদাকে মারবার জন্যে। তবে তিনজন নয়, উনি খুন হয়েছেন একজনের হাতেই।

—কে কে? নামটা বলুন। তাহলে আমি কেটে পড়তে পারি।

এই একই গুঞ্জন উঠল আরও কয়েকজনের মুখ থেকে। সব থেকে বেশি পঞ্চদীপের কাছ থেকে। তার যুক্তি কাল সন্ধের ফ্লাইটেই তার লণ্ডন যাবার কথা। এভাবে আটকে থাকলে তার বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে।

নীল তাকেও সান্ত্বনা জানিয়ে বলল, —আমার কথাগুলো শেষ হতে নিশ্চয়ই রাত কাবার হয়ে যাবে না। আপনি প্লেন ধরার নিশ্চয়ই অনেক সময় পাবেন।

আরাধ্য বলল, —তাহলে আর দেরি করা কেন? আপনি শুরু করুন।

গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে নীল বলল, —এই কাহিনী শুরু করতে গেলে আমাকে একটু পিছিয়ে যেতে হচ্ছে। একটু একটু করে শাস্ত্রীভিলার মধ্যে জমে থাকা যে গল্পটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিল, অনুসন্ধানে নেমে তা আমাকে অনেক মেহনত করে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আসুন তাহলে আমরা একটু পিছিয়ে যাই। একটা ব্যাপার আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, একই দিনে তিনজন আততায়ী চেয়েছিল শিবাজী শাস্ত্রীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। এর একটাই অর্থ বিভিন্ন কারণে পুঞ্জীভূত রাগের বহিঃপ্রকাশ।

আমি বরং একেবারে শেষ থেকে শুরু করি। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী শেষ আঘাতটা হচ্ছে রিভলভারের গুলি। তখন বাজে সাতটা দশ। হ্যাঁ, ময়না তদন্ত সেই সময়টাই দিচ্ছে। কিন্তু সেই সময় আসর একেবারে তুঙ্গে। নীচের সব অতিথিরা হার্ড ড্রিঙ্কস্ নিয়ে বেশ টিপ্সি। ওপরের ঘর তখন ফাঁকা। ওপরের ঘরের কথা তখন কারোরই মনে নেই। রিভলবার হাতে আততায়ী এই সুযোগটাই খুঁজছিল। চুপিচুপি সে ওপরে উঠে এল। কী দেখল? অসুস্থ শিবাজী শাস্ত্রী তখন মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছেন। ঘরে হাল্কা নীলচে আলো। আততায়ীর হাতে অপেক্ষা করার সময় নেই। সে সরাসরি গিয়ে দাঁড়াল শিবাজী শাস্ত্রীর পা বরাবর খানিকটা তফাতে। প্যান্টের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে রিভলবারের মুখে একটা রুমাল বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে চেপে ধরে সরাসরি ফায়ার করল। রগের

একটু দূর থেকে। আততায়ী হাত কাঁপছিল। কারণ এর আগে সে কোনদিনও কাউকে গুলি করেনি। তার আর দাঁড়াবার সময় ছিল না। কোন মতে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সে ঘর ছেড়ে পালাল। একজন জীবিতকে গুলি করলে সে একটু ছটফট করবেই। কিন্তু আনাড়ি খুনির সেটা দেখার অবসর কোথায়? সে একবারও জানতে পারল না সে মরার ওপর ঘাঁড়ার ঘা মেরেছে।

বলতে পারেন সে লোকটি কে?

আবার এক দফা গুঞ্জন। মহারানী দেবীকে বলতে শোনা গেল, কে? কে সে?

নীল হাসল। তারপর বলল, —এই লোকটিকে সামনে আনার আগে আমাদের যে একটু পিছিয়ে যেতে হবে।

আজ থেকে সাঁয়ত্রিশ বছর আগে, সময়ের দু চারমাস এদিক ওদিক হতে পারে, শিবাজী শাস্ত্রী তখন এক বেকার যুবক। আজকের এই রমরমা অবস্থার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। তায় সদ্য পিতৃহীন হয়েছেন। মৃত্যুর আগে বাবা রেখে গেছেন অফিস থেকে পাওয়া লাখ দেড়েক টাকা। চাকরি টাকরি হয়তো খোঁজ খবর করলে একটা পেয়ে যেতে পারতেন। কারণ তিনি শিক্ষিত যুবক। কিন্তু তাঁর মন ব্যবসার দিকে। এদিক ওদিক অনেক রকম ব্যবসার কথা ভাবতেন। কিন্তু কোন বড় ব্যবসার কথা ভাবতে পারছিলেন না। সম্বল ওই লাখ দেড়েক টাকা। যদিও সাঁয়ত্রিশ বছর আগে দেড় লাখ টাকার দাম ছিল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে আলাপ হয়ে গেল পাঠক পেপার হাউসের মালিক দেবকান্ত পাঠকের সঙ্গে। দেবকান্তবাবুর তখন বয়েস হয়েছে। তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়ে। কিন্তু তার ব্যবসার অবস্থা তখন খুব একটা ভালো ছিল না। বড় সর্বময় পাঠক। বাবার সঙ্গে ব্যবসায় ছিলেন। কিন্তু ছোটছেলে শশধর পাঠক একটু অন্য প্রকৃতির। ব্যবসা ট্যাবসা তার মগজে ঢুকতো না। তিনি খেলাধূলো আর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হইচই করেই কাটিয়ে দিতেন। এদের দিদি মহারানী পাঠক। যদিও ছোটবেলায় মহারানীদেবীর অন্য নাম ছিল। মহারানী নামটা সম্ভবত অম্বরীশ ঠাকুরের দেওয়া। যাইহোক তিনি তখন কলেজে পড়ছেন। তরুণ এবং ব্যবসামনস্ক শিবাজী শাস্ত্রীকে দেবকান্তবাবুর ভালো লেগেছিল। হয়তো তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যের কথায় পরে আসছি।

দেবকান্তবাবুর শিবাজী শাস্ত্রীকে ভাল লাগার সম্ভাব্য দুটো কারণ। ছেলেটির মধ্যে ব্যবসার টেন্ডেন্সী আর তার কাছে নগদ বেশ কিছু টাকা থাকা যা সে ব্যবসায় কাজে লাগাতে চায়।

আগেই বলেছি দেবকান্তবাবুর তখন ব্যবসা খুব একটা ভালো চলছিল না। তিনি নগদ কিছু টাকার সন্ধানে ছিলেন। কিন্তু টাকার ব্যাপারটা সরাসরি শিবাজী শাস্ত্রীকে বলে উঠতে পারছিলেন না। দেবকান্তবাবুর মনোভাব বুঝতে শিবাজী শাস্ত্রীর খুব একটা অসুবিধা হয়নি।

এইখানে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছিল। সুন্দরী এবং যুবতী মহারানী দেবীকে দেখে

শিবাজী শাস্ত্রী এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে তিনি সরাসরি দেবকান্তবাবুর কাছে মহারানীদেবীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

হ্যাঁ, দেবকান্তবাবুরও মনে মনে সেই ইচ্ছাই ছিল। তিনি ভেবেছিলেন সংসারে একা তরুণ যুবকটিকে যদি তিনি জামাই করতে পারেন, তাহলে জামাইকে ব্যবসায় নিয়ে নিতে পারেন এবং তাৎক্ষণিক অর্থাভাবও মেটে। কিন্তু বেঁকে বসলেন মহারানী দেবী। কারণ তিনি অনেক ছোটবেলা থেকেই একজনকে ভালবাসতেন। অম্বরীশ ঠাকুর। তাঁরই প্রতিবেশী। অম্বরীশ ঠাকুরও শিক্ষিত যুবক। তিনি তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। দুজনের মধ্যে ভালবাসাটা এতই গভীর ছিল যে কেউই কাউকে না দেখে থাকতে পারতেন না। কিন্তু সেনাবাহিনীর কাজ। তাঁকে প্রায়শই কলকাতার বাইরে থাকতে হত। তাতে অবশ্য তাঁদের ভালবাসায় কোন ছেদ ছিল না।

দেবকান্তবাবু যখন মহারানী দেবীর কাছে শিবাজী শাস্ত্রীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন, একসময় মহারানী দেবী তা নাকচ করে জানিয়ে দিলেন তিনি বিয়ে করলে অম্বরীশ ঠাকুরকেই বিয়ে করবেন।

দেবকান্তবাবু পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। মা মরা মেয়েকে তিনি আঘাত করতেও চাইছিলেন না আবার শিবাজী শাস্ত্রীকেও ছাড়তে পারছিলেন না। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে যাওয়া কোন ছেলেকেও জামাই হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না।

দেবকান্তবাবু যখন আতান্তরে, সুযোগটা নিয়ে নিলেন শিবাজী শাস্ত্রী। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন দেবকান্তবাবুকে। তিনি নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার হিসেবে দিতে পারেন, যদি মহারানীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন।

অবস্থা যখন জটিল মহারানী দেবী মরিয়া হয়ে সবকিছু জানিয়ে চিঠি লিখলেন অম্বরীশ ঠাকুরকে। এও জানালেন অন্তত এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে তিনি যেন কলকাতায় এসে মহারানীকে বিয়ে করে আবার কর্মস্থলে ফিরে যান।

কিন্তু অম্বরীশবাবুর কাছ থেকে সে চিঠির কোন জবাব আসেনি। কারণ তিনি তখন শত্রু শিবিরে বন্দী এবং তাঁর একটি পা খোয়া গিয়েছে।

বছর দুই পর অম্বরীশ যখন কলকাতায় ফিরলেন, তখন সব কিছুই ওলট পালট হয়ে গেছে। মহারানী দেবীা বাধ্য হয়েছিলেন শিবাজী শাস্ত্রীকে বিয়ে করতে। দেবকান্তবাবু শিবাজী শাস্ত্রীকে নিজের ব্যবসায় নিয়ে গিয়েছিলেন চাকরি দিয়ে। এবং অদ্ভুত শর্তে শিবাজী শাস্ত্রীর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার হিসেবে নিয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে দেবকান্তবাবুকে টাকাটা শোধ করে দিতে হবে। অবশ্য বিনা সুদে। আর সেটা যদি তিনি না পারেন তাহলে পুরো পেপার হাউসের মালিকানা দিয়ে দিতে হবে মেয়ে জামাইকে।

দেবকান্তবাবু ভেবেছিলেন যতই হোক একমাত্র জামাই। যত কঠোর শর্তই থাক না কেন জামাই হয়ে শ্বশুরকে নিশ্চয়ই পথে বসাবেন না।

কিন্তু পথেই বসতে হল। পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যবসায় গোঁজা দিয়েও তিনি ব্যবসা ঠিক

মতো সামলাতে পারেননি। তর ওপর ছিল শশধর পাঠকের অত্যাচার। তিনি তখন মদ আর জুয়ার দাস। পেপার হাউস থেকে যথেচ্ছ পরিমাণে টাকা নিয়ে যেতেন। দেবকান্তবাবু বা সর্বময়বাবুর কোন নিষেধই তাঁকে আটকাতে পারত না। আর শিবাজী শাস্ত্রী তখন এক নগণ্য কর্মচারি। টাকাকড়ির ব্যাপারে তাঁর কথা বলার কোন এক্তিয়ার নেই। তবে তিনি তো মনে মনে এটাই চাইছিলেন।

এর ফলে দিনে দিনে পেপার হাউস আরও তলিয়ে যেতে শুরু করল। শিবাজী শাস্ত্রীর ধার শোধ তো দূরের কথা মিল থেকে নগদ টাকায় কাগজ তোলারও উপায় থাকতো না।

শিবাজী শাস্ত্রী তখন শ্বশুরকে বোঝালেন তাঁর বা সর্বময়ের এ ব্যবসা ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। তাছাড়া ধার শোধ করার মেয়াদ চলে গেছে। অতএব ব্যবসাটা তার মেয়ে জামাইয়ের নামেই করে দেওয়া হোক। শশধর পাঠককে সামলানো আর ব্যবসা সামলানোর দুটো দায়িত্বই তিনি নিয়ে নেবেন।

উপায়ন্তরে দেবকান্তবাবু তাই-ই করেছিলেন। অম্বরীশ ঠাকুর ফিরে দেখলেন মহারানী পাঠক তখন শিবাজী শাস্ত্রীর স্ত্রী এবং পাঠক পেপার হাউসের মালিক দেবকান্ত পাঠক নন, স্বয়ং শিবাজী শাস্ত্রী। শশধর পাঠক পেপার হাউস থেকে বিতাড়িত। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। শিবাজী শাস্ত্রীর মাঝে মাঝে কিছু দয়ার দানে তার নেশা নিবৃত্ত হয়। আর সর্বময় পাঠক, পাঠক পেপার হাউসের একজন সামান্য কর্মচারি মাত্র।

এই পর্যন্ত বলে নীল থামল। সবাই নীরবে সব কিছু শুনে যাচ্ছিল। নীল থামলেই অম্বরীশ বললেন,—মিস্টার ব্যানার্জি, আমাদের মধ্যে সম্ভবত সকলেই আপনার এই কাহিনী অল্পবিস্তর জানে। অন্তত আমি জানি। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু হোয়াট্‌স্ অ্যাবাউট ইওর থার্ড ক্রিমিন্যাল? শিবাজীকে শেষ আঘাতটা কে করেছিল সেটায় আসুন।

—হ্যাঁ মিস্টার ঠাকুর, আমি জানি এ কাহিনী আপনাদের অনেকেই জানেন। আমি কেবল নতুন করে আপনাদের শোনালাম একটাই কারণে। সেটা হল শিবাজী শাস্ত্রীকে খুনের প্রবৃত্তি এসেছিল রাগ থেকে। হ্যাঁ, অন্তত তৃতীয় বার যিনি আঘাত করেন তার মোটিভ হচ্ছে দীর্ঘদিনের জমে থাকা রাগ। একটা লোক যে তার বাবাকে ঠকিয়ে ব্যবসাটা হস্তগত করে ফেলেছে। তাকে প্রায় কাঙালের জীবন কাটাতে হয়। তার একমাত্র দিদির ওপর নির্দয় অত্যাচার, না, সেটা মেনে নিতে পারেননি সেই ব্যক্তিটি। এবার আপনাদের প্রশ্ন কে সে? খুন হবার দুদিন আগেই শশধরবাবুর সঙ্গে বচসা ধমকানি, তাকে খুন করার হুমকি—

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন শশধর পাঠক, —তার মানে? আমি খুন করেছি?

খুব শান্ত স্বরে নীল বলল, —আপনিই বলুন না, আপনি খুন করেননি?

—না। শিবাজীর মতো নোংরা লোকের গায়ে হাত দিতেও আমার ঘেন্না হয়।

—কিন্তু রাগ? সেটা ছিল না আপনার?

—এখনও আছে।

—তাহলেও বলছেন আপনি খুন করেননি?

—না করিনি।

—কিন্তু আপনি সেদিন এসেছিলেন।

—আমাকে শিবাজীদা আসতে বলেছিল। কিছু মালকড়ি দেবার কথা ছিল। কিন্তু দিদির মুখে শুনলুম শিবাজীদার স্ট্রোক হয়েছে। ব্যস, তবে হ্যাঁ যাবার সময় একটা মালের বোতল নিয়ে চলে গিয়েছিলুম। বিলিতি মাল তো!

—একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে?

—আপনি জানলেন কী করে?

—বাদল সিং—

—জি স্যার।

—তুমি বোধহয় একেই দেখেছিলে রোগারোগা লম্বা চেহারা। হাতে একটা কিছু ছিল, তাই না?

বাদল একটু গোঁৎ খেয়ে বলল,—মালুম হোতা সহি হোগা। থোড়া দূর থা। আউর উস্ টাইম মে বহুত লোক আ গিয়া থা...

—ঠিক আছে। তুমি বোস।

আবার অম্বরীশের গলা পাওয়া গেল, —তাহলে কী দাঁড়াল মিস্টার ব্যানার্জি?

সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ নীল বলে উঠল, —শশধরবাবু ঠিক কথাই বলেছেন। শিবাজী শাস্ত্রীর ওপর যত লোকের রাগ আছে শশধরবাবু নিশ্চয়ই তাদের একজন। কিন্তু একটা জিনিস জানবেন মেঘ যতটা গর্জায় ততটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বর্ষায় না।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নীল প্রশ্ন করল,—রিভলভারটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন মিস্টার সর্বময় পাঠক? একটু বলবেন কী?

যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সর্বময়ের। চমকে উঠে বললেন, —রিভলভার মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি?

—বলতে চাইছি ঠিক সাতটা বেজে বারো মিনিটে যে রিভলভারটা দিয়ে আপনি আপনার জামাইবাবুর রগে আনাড়ির মতো গুলি চালিয়েছিলেন সেটা কোথা থেকে জোগাড় করেছিলেন?

—কে বললে কথাটা আপনাকে?

—একজন আই উইটনেশ। সেদিন সে মুখ না খুললেও পরে তার কাছ থেকে সব কথা জানি। নীচে সবাই যখন গল্পগুজব এবং হার্ড ড্রিংক্সে ব্যস্ত, আপনাকে সে চুপি চুপি ওপরে উঠতে দেখেছিল। আপনার রাগটা অনেকটা তুষের আগুনের মতো। অনেকদিন ধরে পুষে রেখেছিলেন। আপনি আপনার ছোট ভাইয়ের মতো লোক জানিয়ে কিছু করেন না। কিন্তু

অভাব অনটন আর বঞ্চনার আগুনটা আপনার মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছিলই। আপনার ছোট ভাইয়ের রাগারাগির সুযোগটার সদ্ব্যবহার করার জন্যে ওই দিনটা বেছেছিলেন একটাই কারণে। শিবাজী শাস্ত্রীর বাড়ি গিয়ে তাকে একা পাবার এমন মোক্ষম সুযোগ আর কোনদিনও পাবেন না। তার ওপর আগের দিনই খবর পেয়েছিলেন উনি মাইল্ড অ্যাটাকে শুয়ে আছেন। অ্যাম আই রং মিস্টার পাঠক?

সর্বময় পাঠক কিছু না বলে খানিকক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর বলেন, —আই উইটনেশে কোন কাজ হয় না। আমিই যে গুলি করেছি তার জন্যে আরও সলিড প্রমাণ দিতে হয়। আছে নাকি তেমন কিছু?

—প্রমাণ হাতে না নিয়ে আমি একপাও এগোই না। আদালতেই সব প্রমাণ দাখিল হয়ে যাবে। এমন কী যে ভাড়াটে গুণ্ডার মারফৎ নগদ পাঁচ হাজার টাকায় রিভলবারটা ভাড়া নিয়েছিলেন আদালতের কাঠগড়ায় তাকেই দেখতে পাবেন।

—লাই। খেতে পায় না পঞ্চাকে ডাকে। পাঁচ হাজার টাকা আমি পাব কোত্থেকে?

—স্ত্রীর অসুখের নাম করে আপনার দিদি মহারানী দেবীর কাছ থেকে কর্জ হিসেবে নিয়েছিলেন। অস্বীকার করতে পারেন?

চুপসে গেলেন সর্বময়।

তারপর উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নীল বলল, —সর্বময়বাবুর মতো আপাতশান্ত মানুষটার হাতে অস্ত্র উঠে আসে যে রাগ আর বিতৃষ্ণা থেকে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন। এর সুবিচার করবে কোর্ট। আমি নই। তবে সর্বময়বাবু, শিবাজী শাস্ত্রীকে হত্যা করতে আপনি চেয়েছিলেন, তাকে আঘাতও আপনি করেছিলেন, তখন বেঁচে থাকলে উনি ওই বুলেট হিটেই মারা যেতেন। সো, আই অ্যাম সরি, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

নিমেষের মধ্যে দুজন কনস্টেবল তার দুপাশের দুটি চেয়ারে বসে পড়ে।

হলের মধ্যে গুঞ্জন আর অবাক হওয়া গুলো যখন চলছে ঠিক তখনই নীল শুরু করল তার দ্বিতীয় কাহিনী,—এবার আসি সন্ধে সাতটা বাজতে মিনিট চারেক আগে সেই ব্যক্তির কথায় যিনি শিবাজীবাবুকে জীবিত মনে করে তার নির্মম আক্রোশের আঘাতটি হানেন।

এ কাহিনী কিন্তু আরও চমকপ্রদ। অন্তত আপনারা এখানে আজ যারা আছেন তারা কল্পনাও করতে পারবেন না, এটা কতটা বেদনার এবং নৃশংসনীয়। মোটিভ অনেকরকম থাকে। এটা হল মানুষের থেকে মানুষের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেবার এক করুণ কাহিনী।

মহারানী বউঠান, কথায় কথায় আমি একদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার পুত্রসন্তান কটি। আপনি সম্ভবত কিছুটা অবাক এবং কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন আমার কথায়। এই ঘরে দুজন উপস্থিত আছেন যাঁরা এ কথার সঠিক জবাব দিতে পারবেন। এই মুহূর্তে তাদের নাম আমি বলছি না। আরও একটা প্রশ্ন মিস্টার আরাধ্য শাস্ত্রীকেও করেছিলাম,

কেন উনি এই নিদারুণ গরমেও ফুলস্লীভস্ শার্ট আর হাতে দস্তানা পরে থাকেন। উনি সঠিক উত্তর দেননি। কেউ একজন বলেছিল ওনার ডান হাতে নাকি কুষ্ঠ আছে। আরাধ্য নিজে বলেছিল রঙমশালের বারুদে ওর হাত পুড়ে যায়। আমার যতদূর মনে হয় আরাধ্য নিজেও জানে না তার ধবধবে ফর্সা চেহারায় অত্যন্ত বেমানানভাবে ডান হাতটা কালো কেন?

আবার সবার মধ্যে গুঞ্জন। সবারই চোখ তখন আরাধ্যর দিকে। প্রভাতী মাথা নীচু করে বসে আছে। আরাধ্যও তাই।

—এবার মহারানী বউঠান, আপনার না জানা প্রশ্নের উত্তর দিই। আজ থেকে একত্রিশ বছর আগে আপনাকে আপনার স্বামী নৈনিতাল বেড়াতে নিয়ে যান। আপনি তখন পূর্ণ অন্তঃস্বত্ত্বা। আপনি চেয়েছিলেন কলকাতাতেই আপনার সন্তানের জন্ম হোক। কিন্তু আপনার স্বামী সেটা চাননি। হয়তো উনি শীত শীত পাহাড়ী পরিবেশটাই বেশি প্রেফার করেছিলেন। তাছাড়া ওখানকার এক নার্সিংহোমের নিয়ামক ডাক্তার শ্রদ্ধানন্দ ভরদ্বাজের সঙ্গে ওঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল।

মহারানী দেবী বললেন—এটা হতেই পারে। এর মধ্যেও তো অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।

—ঠিকই বলেছেন। এত দূর পর্যন্ত সবটাই নরম্যাল। কিন্তু অ্যাবনরম্যালিটি এল এর পরেই। যার জন্যে শিবাজীদা একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। আরাধ্যর জন্মের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক গভীর রহস্য। মহারানী জন্ম দিয়েছিলেন যমজ সন্তানকে। আর পৃথিবীর বিরল বিস্ময়ের অন্যতম বিস্ময় শিশুদুটি ছিল সায়ামিজ টুইন।

অম্বরীশ আর মহারানী একই সঙ্গে বলে উঠলেন, —সায়ামিজ টুইন? মানে?

—বলছি। যমজ সন্তান কোন নতুন কিছু নয়। আকছার হয়। কিন্তু সায়ামিজ টুইন। কোটিতে গুটিক। খুব রেয়ার। নামটা এসেছে শ্যামদেশ বা সায়ামা থেকে। এখন যেটা থাইল্যাণ্ড। ১৮১১ সালে শ্যামদেশে দুটি ছেলে একসঙ্গে জন্মেছিল। কিন্তু যুগলবন্দী হয়ে। একজনের নাম চ্যাং আর একজন অ্যাং। তাদের মাথা দুটো আলাদা হলেও বুক থেকে আরম্ভ করে অবশিষ্ট দেহ দুটো ছিল জোড়া। প্রায় তেষট্টি বছর তারা বেঁচেও ছিল। কিন্তু অধিকাংশই বাঁচে না। ইরানি দুই বোন লালে বিজানি আর লাদান বিজানি। এরা আরও অদ্ভুত। এদের শরীর দুটো আলাদা হলেও মাথা একটাই। মানে দুটো মাথা এমনভাবে জোড়া ছিল যা কোনদিনও ছিন্ন করা যায়নি। প্রায় উনত্রিশ বছর দুটো আলাদা দেহ আলাদা সত্ত্বা যখন দেখল এভাবে বাঁচা যায় না, তারা অপারেশন করে আলাদা হতে চাইল। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। অপারেশন টেবিলেই দুবোন মারা যায়। এরকম নজির ইতিহাসে আরও আছে। সেসব বলে আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না।

মিস্টার বশিষ্ঠ একটু উসখুস করছিলেন। উনি বললেন—মিস্টার ব্যানার্জি এসব গল্পের

কী খুব দরকার আছে?

সামান্য হেসে নীল বলল, —সায়ামিজ টুইনের ঘটনার কথা না বললে যে আমাদের কাহিনী অধরা থেকে যাবে মিস্টার বশিষ্ঠ। আমি এবার আমাদের ঘটনায় আসি। মহারানী দেবীও এমনই এক সায়ামিজ টুইনের জন্ম দেন। এই দুটি শিশুর মাথা ছিল দুটো। দেহ ছিল দুটো। দুজনের একজোড়া করে পা। কিন্তু হাত ছিল তিনটে। একজনের ডান হাত আর একজনের বাঁ হাত। এমন ভাবে জোড়া ছিল যেন সেটা একটাই হাত। আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছিল। বলতে পারেন প্রকৃতির খেয়াল। অথবা জিন ঘটিত কোন পরম্পরা। তাদের একজন অত্যন্ত ফরসা অন্য জন অদ্ভুত কালো। আর জোড়া হাতটি সাদায় কালোয় মেশানো। কালার ডিস্ট্রিবিউশন অনেকটা জেব্রা প্যাটার্ন।

হঠাৎ মহারানী দেবী বলে উঠলেন, —নীলাঞ্জনদা আপনি কী আরাধ্যর কথা বলছেন? ওর হাতও তো—

—হ্যাঁ বউঠান, নৈনিতালের এক নার্সিংহোমে আপনার নরম্যাল ডেলিভারি হয়নি; সিজার করতে হয়েছিল। ন্যাচারালি আপনি তখন আনকনসাস। কিন্তু শিবাজীদা এই টুইন দেখে আঁৎকে ওঠেন। একজন অতীব সুন্দর। অন্যজন কুৎসিত। প্রকৃতির নিয়মই বোধ হয় এই। সুন্দর আর অসুন্দরের পাশাপাশি অবস্থান। স্বাভাবিকভাবেই নীলরক্তের অহমিকায় লাগে। শিবাজীদার একান্ত অনুরোধে এবং অজস্র টাকার বিনিময়ে সুন্দর ছেলেটিকে পঙ্গু না করে অসুন্দর ছেলেটির বাঁ হাতটি সুন্দর ছেলেটির দেহে রেখে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ইরানি বোনেদের পরিণাম আর হয়নি। দুজনেই সশরীরে বেঁচে আছে। একজন সুস্থ অন্যজন বিকলাঙ্গ।

আরাধ্য বলে উঠল,— তাই জন্যেই কী আমার ডান হাতের চেটো—

—ইয়েস আরাধ্য। এটা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি। তোমার উইকপয়েন্ট ভেবে আমি তোমায় কোনদিনও হাতের দস্তানা খুলতে বলিনি। তোমার দস্তানা পরা হাতটি খুললেই বোঝা যাবে তোমার ডান হাতের করতলটি যেন অন্য কারো বাঁ হাতের করতল। নিজের দুটো হাত জোড়বদ্ধ করলেই বুঝতে পারবে। সাধারণত আমরা হাত জোড় করলে বুড়ো আঙুলের সঙ্গে বুড়ো আঙুল, তর্জনীর সঙ্গে তর্জনী মিলে যায়। কিন্তু তোমার সেটা হয় না। তোমার বুড়ো আঙুলের পজিশনটা উল্টো দিকে। তুমি যখন কিছু লেখো মনে হবে কোন ন্যাটা লোক কিছু লিখছে, এবং তোমার কলম ধরার স্টাইলটাই অন্য রকম। মধ্যমা আর অনামিকায় কলম ধরে লেখো। তাই না?

আরাধ্য মাথা হেঁটে করে রইল। নীল এবার ঘরের এক কোণে বসে থাকা সুচেতা প্যাটেলের দিকে তাকিয়ে বলল, —মিসেস প্যাটেল, আমার দেওয়া তথ্যে কোন ভুল বা অবাস্তব কিছু খুঁজে পেলেন?

সুচেতা নীরব। তাঁর মুখেও কোন কথা নেই। নীল বলল, —হ্যাঁ, এটাই ঘটনা। বউঠান

এসব কিছু জানতেন না। আগেই বলেছি উনি তখন আনকনশাস। সেই রাত্রেই শিবাজী শাস্ত্রীর অন্য সন্তান হতভাগ্য সঞ্জয় প্যাটেলকে নিয়ে গিয়ে তুলে দেওয়া হয় সদ্য স্বামী হারা নিঃসন্তান ওই দরদি মহিলার হাতে। তারপর সুচেতো দেবীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কলকাতার ইউরেকা নার্সিং হোমে। কিন্তু তাঁকে জানতে দেওয়া হয়নি ওই শিশুটির আসল বাবা মা কে? তাই তো সুচেতো দেবী?

সুচেতো নীরবে ঘাড় নাড়েন। নম্র স্বরে বলেন, —সবকিছুতো আপনাকে আগেই বলেছি মিস্টার ব্যানার্জি।

—হ্যাঁ মিসেস প্যাটেল, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ না করলে এ রহস্য ক্লীয়ার হত না কোনদিনও। যা বলছিলাম, তারপর দীর্ঘ একত্রিশ বছর ধরে শ্রীমতী সুচেতো প্যাটেল নিজের সন্তানের স্নেহে তিল তিল করে বড় করে তোলেন। সঞ্জয় প্যাটেল নামটা ওঁরই দেওয়া। ঘুণাক্ষরেও কোনদিন সঞ্জয়কে জানতে দেননি সঞ্জয় তাঁর ছেলে নয়। সব কিছুই উনি গোপন রেখেছিলেন। রাখতেও চেয়েছিলেন। হয়তো এইভাবেই সঞ্জয়ের জীবনটা কেটে যেত। কিন্তু সুচেতা দেবীর হাজব্যাণ্ডের একটি ডায়েরি সব কিছু এলোমেলো করে দেয়। সেই ডায়েরি পড়েই সঞ্জয় জানতে পারে সে সুচেতার সন্তান নয়। তারপর যেভাবেই হোক সঞ্জয় জানতে পারে তার আসল বাবা কে?

এবার অম্বরীশ প্রশ্ন করেন,—এত বড় একটা শহরে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে থেকে কী ভাবে সে নিজে বাবাকে আইডেন্টিফাই করতে পারল? এটা তো একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

নীল বলল—আপনার কথা ঠিক। আমরা সঞ্জয়কে একথাটাও জিগ্যেস করেছিলাম। সে যা বলেছিল সেটাই বলছি। তার আগে বলি বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সত্য আর পাপ কখনও চাপা থাকে না। যেমন করেই হোক একদিন সেটা ভেসে উঠবে। নিজের অজ্ঞাত জীবনের খোঁজে নেমে পড়ে সঞ্জয় ক্রমশ হতাশ ব্যাধিতে ভুগতে আরম্ভ করে। হতাশাকে দমন করার জন্যে সে মদ খেতে শুরু করে। কিছু অ্যান্টিসোশ্যালের সঙ্গেও তার যোগাযোগ হয়ে যায়। মনে পড়ে তোমার আরাধ্য, আজ থেকে বেশ কিছুদিন আগে, তোমারই বাড়ির সামনে কয়েকজন লোক তোমাকে ঘিরে ধরেছিল, তোমার কাছে যা আছে তা ছিনতাই করার জন্যে?

আরাধ্য বলল, —হ্যাঁ কাকু। সেদিন ফিরতে আমার একটু রাত হয়েছিল। গাড়ি থেকে নামতেই চার পাঁচজন অ্যান্টিসোশ্যাল আমাকে ঘিরে ধরে। তারা আমার কাছে টাকা কড়ি চায়। আমি দেবো না বলায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটা ধ্বস্তাধ্বস্তিও হয়। এবং এই টানা হেঁচড়ার মধ্যে তাদের একজন আমার ডান হাত ধরে সজোরে টান মেরে আমায় রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। সেই সময় আমার দস্তানা খুলে লোকটার হাতে চলে যায়। আমার নগ্ন হাতটা দেখে লোকটা হঠাৎই থেমে যায়। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে

তাকিয়ে থেকে কেবল জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার নাম কী? আমি কোথায় থাকি? আমি প্রথমে কোন উত্তর না দেওয়ায় ওদেরই একজন ছুরি বার করে আমাকে মারতে উদ্যত হয়। তখন বাধ্য হয়েই আমাকে নাম ঠিকানা সব কিছুই বলতে হয়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, যে লোকটা আমার হাতটা ধরেছিল, সে হঠাৎই তার সঙ্গীদের বলে, ওকে ছেড়ে দে। বলেই সে চলে যায়। অবশ্য মানিব্যাগটা ওরা নিয়েই যায়।

নীল বলল—হ্যাঁ। সঞ্জয় ওই একই কথা বলেছে। তোমার ডান হাতের তালুর পজিশন দেখেই সঞ্জয়ের মনে সন্দেহ উঁকি দেয়। তারপর সে একদিন মুখোমুখি হয় শিবাজী শাস্ত্রীর। বাদল সিং জানে, এ বাড়িতে কতদিন গোপনে সেই হতভাগ্য ছেলেটি শুধুমাত্র পিতৃপরিচয়ের স্বীকৃতির আশায় শিবাজী শাস্ত্রীর কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছে। কিন্তু প্রতিবারই নোংরা ভাষায় গালাগাল হজম করে তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

—কিন্তু, মহারানী বললেন, সে কেন আমার কাছে এলো না?

—বউঠান, আপনি কী করে ভাবলেন সঞ্জয়কে আপনার নাগালের মধ্যে আসতে দেওয়া হবে? তাছাড়া সঞ্জয়ের মধ্যে এখনও বদ্ধমূল ধারণা আপনিও সবকিছু জানেন। এবং কুৎসিত বলে আপনি তাকে পরিত্যাগ করেছেন। হয়তো আপনার বিরুদ্ধে তার অভিমান আরও বেশি।

মহারানী বললেন, —ভুল, ভুল। সঞ্জয় যদি একবারও আমার সঙ্গে দেখা করতো! কোন মা কী কুৎসিত বলে তার সন্তানকে ফেলে দিতে পারে?

কথা ঘুরিয়ে নীল বলল, —আভাস, তুমি বোধহয় এই ঘটনার অনেকটাই আঁচ করেছিলে, তাই না?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আভাস বলল, —সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে হঠাৎই একদিন এবাড়ি থেকে বেরোবার মুখেই দেখা হয়ে যায়। সঞ্জয়বাবু আমাকে সব কিছুই জানিয়েছিলেন।

—প্রতিবাদ করনি কেন? তুমি তো মিনমিনে স্বভাবের ছেলে নও।

—একজন দাম্ভিক, কুটিল আর শয়তান লোক, যে নিজেরটি ছাড়া আর কিছু বোঝে না, বুঝতে চায় না, সেই দুশ্চরিত্র লোকটিকে বাবা বলতেও আমার ঘেন্না হয়। সেই জন্যেই আমি কোন প্রতিবাদ করিনি। করে কোন লাভই হত না। তবে আমি জানতাম এমন একটা কিছু হতে পারে। প্রতারিত সঞ্জয় প্যাটেল যে শিবাজী শাস্ত্রীকে ছেড়ে দেবে না সেটা সঞ্জয়ের চোখ মুখ দেখেই বোঝা গিয়েছিল।

—তোমার ধারণাই ঠিক। ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষ, যখন তার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, সে হয়ে ওঠে বড় ভয়ংকর। সঞ্জয় চেয়েছিল স্বীকৃতি। হুমকিও দিয়েছিল তার মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু শিবাজী শাস্ত্রী চেয়েছিলেন অন্য খেলা খেলতে। হেবো নামে একটা ভাড়াটে খুনিকে নিয়োগ করেছিলেন সঞ্জয়কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। যদিও হেবো নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলেছে, কিন্তু ঘটনা এটাই, হেবো কিছু

করার আগেই সঞ্জয় নিঃশব্দে উৎসবের আড়ালে সোজা চলে আসে দোতলায়। বাদল সিংও তাকে দেখতে পায়নি। পেলেও হয়ত ছেড়ে দিত, কারণ আরও কয়েকবার সঞ্জয় তো এ বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু সঞ্জয় তো প্রফেশনাল খুনি নয়। সাতটা বাজতে মিনিট চারেক আগে সে সবার অলক্ষ্যে এই ঘরে আসে। দেখে মাথা নীচু করে শিবাজী শাস্ত্রী ঝিমোচ্ছেন। ঝিমোননি। তিনি তখন বিগত। সঞ্জয়, জীবনের সমস্ত আক্রোশ, সমস্ত অভিমান আর এক সমুদ্র রাগ ঢেলে দিয়েছিল তার জন্মদাতার ঘাড়ে। জানে ওই এক আঘাতেই তার মৃত্যু হবে। সঙ্গে সঙ্গেই সবার অলক্ষ্যে সে উৎসব বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

নীলের কথা শেষ হলে সুচেতা কান্না ভেজানো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,—মিস্টার ব্যানার্জি, আমার ওই সারাজীবন দুঃখ পাওয়া সঞ্জয় কী ছাড়া পাবে? ও তো আর সত্যিই খুন করেনি।

—আপনাকেও ওই একই উত্তর দেবো, যেটা দিয়েছি সর্বময় পাঠককে। ওই অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হয়তো হয়নি—কিন্তু মৃত্যুতো চেয়েছিল সঞ্জয় প্যাটেল। ইনটেশন টু মার্ডার। মহামান্য আদালত কী রায় দেবেন সেটা আমার জানা নেই।

আবার কয়েক মিনিটের নীরবতা। সমস্ত হলঘর, পিন পড়ার আওয়াজ শোনা যাবে এমনই নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে। নীরবতা ভাঙলেন মহারানী দেবী,

—নীলাঞ্জনদা এবার বলুন, কে সেই সত্যিকার খুনি, কে সেই ভয়ংকর রাগী লোকটা?

চোখ বুজে সামান্য সময় চুপ করে থাকার পর নীল বলল—জানিনা, এটা আপনি সহ্য করতে পারবেন কিনা? কিন্তু যত অপ্রিয়ই হোক, শেষ সত্যটা আপনাদের জানা দরকার।

মহারানী বললেন, —আপনি বলুন। আমি সব সহ্য করতে পারব।

—পারতেই হবে বউঠান। সত্যকে কখনও চাপা দিয়ে রাখা যায় না। আপনার দ্বিতীয় সন্তানই আপনার স্বামীর সব থেকে বড়ো শত্রু। সে তার বাবাকে ঘৃণা করত। সে তার বাবাকে নরপশু ছাড়া আর কিছুই ভাবত না। কেন জানেন, কারণটা জানেন আপনার বড় ছেলের স্ত্রী প্রভাতী দেবী। প্রভাতী দেবীকে আপনারা জানতেন বড় দেমাকি, বড় উন্নাসিক। নিজেকে নিয়েই থাকতে ভালবাসেন। এবং প্রায় সর্বদাই নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখতেন। কেন জানেন?

হঠাৎ নিজের স্বভাবের বাইরে গিয়ে প্রভাতী বলে উঠলেন,—থাকনা নীলকাকু এসব কথা। আমি তো সে রাতটা ভুলতেই চাই।

—না। প্রায় হুঙ্কারে মহারানী থামিয়ে দিলেন প্রভাতীকে। বললেন,—বলুন নীলাঞ্জনদা আপনি এসেছেন সত্য উদ্‌ঘাটন করতে। আপনাকে সেটাই করতে হবে। সত্য যতই কদাকার হোক। তার মুখোশ আপনাকে খুলে দিতে হবে।

—বেশ তাই হোক। আপনার স্বামীর অ্যান্টিকের ওপর একটা টান ছিল। আর প্রভাতী শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে, ইতিহাসের ছাত্রী, অগাধ বিশ্বাস নিয়ে শ্বশুরের কাছে যেত মূর্তিগুলোর ইতিহাস জানতে। সেগুলো কোথা থেকে এসেছে? কত সালের পুরনো জিনিস? কীভাবে

আবিষ্কৃত হয়েছে? হয়তো এরই ওপর প্রভাতী একটা বই লিখতে আগ্রহী হয়েছিল। বাট, আপনার স্বামী, এক নির্জন রাতের সুযোগ নিয়ে—

মহারানী চিৎকার করে উঠলেন, —থাক, আর বলতে হবে না। আমি সব বুঝে গেছি।

—কিন্তু কোন কিছুই বুঝতে চায়নি আপনার দ্বিতীয় সন্তান। আভাস তার বাবাকে কোন দিনই বিশ্বাস করেনি। বিশেষ করে নারীঘটিত ব্যাপারে। প্রভাতীর ঘন ঘন তার বাবার ঘরে যাওয়াটা তার মনে সন্দেহেক উদ্রেক করেছিল। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে সে দেখেছিল প্রভাতীকে লাঞ্ছিত হতে। আভাস আরও অনেক কিছুই দেখেছে। দেখেছে রমাকে নিয়ে রাতের পর রাত অভিসার রজনী কাটিয়েছেন শিবাজী শাস্ত্রী। এছাড়াও আভাস জেনেছিল কীভাবে ষড়যন্ত্র করে পাঠক পেপার হাউস উনি কব্জা করেছিলেন। কীভাবে অন্ধকারে দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন পুরো পরিবারটিকে। মনে মনে চেপে থাকা ক্ষোভ পুঞ্জিভূত লাভার আকার নিচ্ছিল। চরম ডিসিশনটা নিয়ে নিল সেদিনই যেদিন সন্ধ্যায় সঞ্জয় প্যাটেলের কাছ থেকে ও সব কিছু শোনে। সঞ্জয়কে ও অবিশ্বাস করেনি, কারণ ও জানে পৃথিবীর যে কোন নোংরা কাজই তার বাবা করতে পারে।

অম্বরীশ বললেন, —তাহলে মৃত্যুবিষটা আভাসই তুলে দিয়েছিল শিবাজীর হাতে?

—না। আভাসের একান্ত অনুগত যাকে এ কাজের জন্যে অনেক টাকাও দেওয়া হয়েছিল, আর একটা ভালো চাকরির অফারও দেওয়া হয়েছিল, সেই ঋষি দেবনাথের হাতেই মদের সঙ্গে অ্যাট্রোপিন সালফেট মিশিয়ে শিবাজী শাস্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঋষি আমার কাছে গিয়েছিল অকারণে সাফাই গাইতে। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে। সেটাই হল ওর কাল। বশিষ্ঠ সাহেব ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটু পেটাতেই ও সব কিছু উগড়ে দেয়। সন্ধে ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে ঋষি মদের গ্লাসটা নিয়ে যায় শিবাজীদার কাছে। ঋষিকে শিবাজীদা অতি বিশ্বস্ত কর্মচারি হিসেবে বিশ্বাস করতেন। ঋষি জানিয়েছিল ওঁর ওই অবস্থায়, ডাক্তারের নির্দেশ আছে সামান্য ব্র্যাণ্ডি পান করা। তাতে নাকি ঘুম ভালো হবে। তারপর মিনিট দশেকের মধ্যেই সব শেষ। বিশ্বস্ত সেবকের হাতেই শিবাজী শাস্ত্রী খুন হয়ে গেলেন।

আবার অম্বরীশ, —তাহলে আসল খুনি কে? ঋষি না আভাস?

সিগারেট ধরিয়ে নীল ধীরে ধীরে বলল, —অন্যায় যে করে, আর যার প্ররোচনায় অন্যায় সংঘটিত হয়, আইনের চোখে তারা দুজনেই সমান অপরাধী।

—আবার সেই অম্বরীশই জিগ্যেস করেন, —অর্ধনারীশ্বর চোরের কী হবে?

—পঞ্চদীপবাবু কী সেটা না জেনে এতবড় ঝুঁকি নিয়েছেন? অনেক টাকা খাইয়ে রমাকে দিয়ে অ্যান্টিচেম্বার থেকে অর্ধনারীশ্বরের প্লেটটা তুলে আনতে চেয়েছিলেন। খরগোস মানে মিস্টার উইলসন হেয়ারের হাতে পরদিনই প্লেটটা তুলে দিয়ে উনি ইংল্যাণ্ড পাড়ি দিতেন। সস্ত্রীক। আর একবার দেশের বাইরে চলে গেলে তখন অনেক কাঠখড় পোড়ানোর

ব্যাপার। যাক, মহারানী বউঠান, আপনার অর্ধনারীশ্বর ঠিক জায়গাতেই আছে তো?

মহারানী নীরবে ঘাড় নাড়েন।

অনেকক্ষণ পর আরাধ্য জিজ্ঞেস করল, —খরগোস নামে চিঠিগুলো কে পাঠাতো?

—ওটা পঞ্চদীপবাবুকে জিগ্যেস করো। কী পঞ্চদীপবাবু, কে লিখতো, আপনি না আপনার সঙ্গী?

পঞ্চদীপ নীরব। রচয়িত্রীও নীরব।

মহারানী কেবল বিড়বিড় করলেন—আমার যে সব তছনছ হয়ে গেল নীলাঞ্জনদা। ওই অভিশপ্ত পাথরটা কালই আমি গঙ্গায় দিয়ে আসব।



আর এক ওথেলো

নীল জিগ্যেস করল, —কী নাম বললেন? কালবোস?

হাত কচলাতে কচলাতে ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে আমার যথার্থ নাম হল গিয়ে কালী চরণ বোস। কিন্তু আমার বন্ধুরা আমায় ওই নামে ডাকতে ডাকতে এখন ওই নামটাই চালু হয়ে গেছে। আসলে, আমার চেহারাটাই—

দীপু আড় চোখে একবার ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। মনে মনে ভাবল হ্যাঁ, যাঁরা এই নাম দিয়েছেন তাঁদের রসবোধ সন্দেহাতীত। এরকম ধূসর কালো লোক চট্ করে দেখা যায় না। এছাড়াও ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, প্রায় থ্যাবড়া মুখ, থ্যাবড়া ঠোঁট, বেঢপ পেট, এবং নীচের দিকটা ক্রমশ ক্ষীণাবয়ব। পাঁচফুট এক কী দু ইঞ্চি লম্বা হবেন। কুতকুতে চোখ। অপূর্ব ছ্যাতরানো গোঁফ। আসলে সব মিলিয়ে কালবোস মাছের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল পাওয়া যায়। বয়েস আন্দাজ চল্লিশের এধার ওধার। তাঁর গায়ের রঙ যাই হোক, ভদ্রলোক শৌখিন। ফিনফিনে আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবি। চুনোট করা ধুতি। পায়ে লখনউ নাগরা। দুহাতে গোটা আষ্টেক আংটি। মূল্যবান পাথরের। অর্থাৎ ভদ্রলোক জ্যোতিষে বিশ্বাসী।

নীলও একবার আড়চোখে ভদ্রলোককে দেখে নিয়ে বলল, —তা আমার কাছে হঠাৎ আপনার আগমনের হেতু?

প্রায় কদাকার চেহারার কালবোসবাবুর হাসিটি কিন্তু ভারি মিষ্টি। যাকে বলে ভুবনমোহিনী হাসি। এও প্রকৃতির এক অনাবিল পরিহাস। অথবা বলা যেতে পারে অ-রূপের মাঝেও রূপের ছিটে ফোঁটা লেগে থাকা বিচিত্র নয়। কালবোস তাঁর অমলিন হাসিটি হেসে বললেন, —আসলে কী জানেন নীলাঞ্জনবাবু, আমি একটু বিপদে পড়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। অবশ্য নির্ভেজাল সত্যি কথা এই যে ইতিপূর্বে আমি আপনার নাম শুনিনি। তার কারণ গোয়েন্দা পুলিস এদের তো আমার কোন দরকার কখনও হয়নি। পারতপক্ষে আমি এঁদের এড়িয়েই চলি। ওই কথায় আছে না ঠ্যাকায় পড়লে বাপ।

—তার মানে, এমন কিছু ঘটেছে যার জন্যে দরকার পড়ে গেছে। তা আমার যখন নামই শোনেননি তখন আমার সন্ধান পেলেন কী করে?

—তাহলে একটু খুলেই বলি। আমার বাড়ি কালাচাঁদ পতিতুণ্ডি লেন। পাইকপাড়ায়। আর ইন্সপেক্টর বিকাশ তালুকদার মহাশয় আমার এলাকারই বাসিন্দা। মাত্র দুটি স্টপেজের ব্যবধান। তা আমার বিপদসঙ্কুল অবস্থাটি নিয়ে কোথায় যাই কোথায় যাই যখন ভাবছি তখন আমার এক বন্ধু বিকাশবাবুর নামোল্লেখ করলেন। পূর্বেই বলেছি থানা পুলিসে আমার বেজায় আপত্তি। ধরুন আমি গেলাম আমার বিপদ নিয়ে তেনাদের কাছে দরবার করতে।

তো নানান তালে গোলে কথার মার প্যাঁচে তেনারা আমাকেই বিপদে ফেলে দিলেন। ও বড় নির্মম জায়গায় মশাই। এই যে সব লোকে স্বর্গ নরক নিয়ে কথা বলে, আমি বলি কী স্বর্গ টর্গ বলে কোনও কিছু নেই। তবে নরক আছে। এখানেই। হাসপাতাল, থানা, মর্গ সব নারকীয় জায়গা। কী, বলুন আপনি কথাটা ঠিক কিনা?

দীপু গলা খাঁকারি দিল। কালবোসের সুন্দর দাঁতের মতো মস্তিষ্কও বেশ সজাগ সুন্দর। এবং একটু বেশিমাত্রায় কথা বলার প্রবণতা। দীপুর দিকে তাকিয়ে কালবোস বললেন, —বুঝেছি। ওই আমার এক দোষ। শুরু করলে শেষ করে উঠতে পারি না। আমার বাকসংযম খুবই কম। আপনারা নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে পড়ছেন।

সামাল দিল নীল, —না না, অধৈর্য হবার কিছু নেই। আপনি তো আমার সঙ্গে কথা বলতেই এসেছেন। অনুমান করা যেতে পারে বিকাশবাবুই আমার কাছে আপনাকে পাঠিয়েছেন।

মুক্তো ঝরিয়ে কালবোস বললেন,—একেই বলে গোয়েন্দা। আপনার অনুমান যথার্থই। বিকাশস্যার বললেন—পুলিস এখন নানান সামাজিক বিপদাপদ নিয়ে ব্যস্ত। খুন, ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণ। আমার যা অভিযোগ তা পুলিস খাতায় কলমে গ্রহণ করলেও তেমন কিছু কাজ এগুবে না। মানে কাজেই দেবে না।

ওঁকে থামিয়ে নীল বলল, —ঠিক আছে মিস্টার বোস—

—আমাকে কালবোস বলেই ডাকবেন। শুনতে বেশ বলতেও বেশ। নইলে ঠিক মনের জোরটা পাইনা। অন্য নামে কেউ ডাকলে নিজেকে খুঁজে পাইনা।

—বেশ। আপনার নাম, ধাম জানা গেল। এবার বলুন আমার কাছে আপনার আসার কারণটা কী?

বিনয়ে নতমুখী হয়ে কালবোস বললেন, —বলতে খুব লজ্জা বোধ করছি স্যার।

—বলুন বলুন। লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। তার সঙ্গে বলুন, চা না কফি?

—আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই। তবে এখন গরম কাল। চাই বলুন। দুধ ছাড়া লিকার।

নীল দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল, — তোর নন্দিনী বউদি বেরিয়ে গেছে?

—না। অফিস যাবার জন্য রেডি হচ্ছে। আমি নয়নাকে বলে আসি।

তপার মা চলে যাবার পরে নয়না এ বাড়ির কাজের মেয়ে। বিয়ের পর নন্দিনীই ওকে নিয়ে এসেছে। দীপু বেরিয়ে গেল চায়ের ব্যবস্থা করতে।

নীল বলতে শুরু করল —আপনার নাম জানা গেল। কে পাঠিয়েছে সেটাও জানা গেল। এবার আমি শুনব আপনার প্রবলেমটা কী? যার জন্যে বিকাশবাবুর মতো মানুষ তেমন কোন ইন্টারেস্ট পেলেন না।

—ঠিক উল্টোটাই স্যার। ইন্টারেস্ট উনি পেয়েছেন। আর সেই কারণেই আমাকে উনি

বিশেষ করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

—ঠিক আছে আপনি শুরু করুন।

ইতিমধ্যে নয়না নয়, দীপু নিজেই তিন পেয়ালা চা আর কিছু স্ন্যাক্স নিয়ে এসে কালবোসের সামনে রেখে দিল। স্ন্যাক্‌স বলতে কিছু কুরকুরি আর পোট্যাটো চীপস্।

কয়েকটা চীপ্‌স্ মুখে ফেলে একবার চায়ে চুমুক দিয়ে কালবোস বললেন,

—ভগবান মানুষকে দু শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। কালো আর ফরসা। সুন্দর আর কদাকার। আমি বোধহয় কালার ডিস্ট্রিবিউশনে সামান্য ব্যতিক্রম। ধূসর কালো। আমার এখনও বিয়ে হয়নি। আসলে কোন মেয়েই আমাকে ঠিক পছন্দ করে না আমার এই রূপের জন্যে। আর আমারও প্রতিজ্ঞা আমি কোন কদাকার কাল্লো মেয়েকে বিয়ে করব না। কিন্তু, মাসখানেক যাবৎ দেখছি, একটি মেয়ে, মেয়ে কেন বলি, মহিলা, আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। হাবেভাবে ঠারে ঠোরে তিনি যেন আমায় প্রেম নিবেদন করতে চান।

দীপু ফস করে বলে ফেলল,—প্রজাপতি নির্বন্ধ। কে কোথায় বাঁধা পড়ে কেই বা বলতে পারে? ওথেলো আর ডেসডিমনার কাণ্ড কারখানার কথাটা একবার ভাবুন।

সুগঠিত দন্ত চতুষ্পাটি বার করে কাল বোস বললেন, —হেঁ হেঁ, সেদিকটাও আমি চিন্তা করেছি। তার পরিণামটাও মনে আছে। তবে এক্ষেত্রে আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। এর মধ্যেও কোন গূঢ়ভিসন্ধি আছে।

নীল জিগ্যেস করে, —হঠাৎ এমন কথা আপনার মনে হল কেন?

—কারণ আছে স্যার। মহিলাটি রীতিমতো সুন্দরী। শিক্ষিতা। বেশ চটকদার। তিনি যখন রাস্তায় বের হন, অনেক উন্মুখ নেত্র তাঁকে অবলোকন করে। সুন্দরী মাত্রই পুরুষের আকর্ষণীয়। এটি প্রকৃতির নিয়ম। তদুপরি তিনি একজন সেলিব্রিটি। ফিল্ম অ্যাকট্রেস। যদিও আমি তাঁর কোন ছবি দেখিনি। বা একবারে দেখিনি বললে ভুল হবে। একবার একটি টিভি চ্যানেলে সম্প্রীতির মুখ দেখেছিলাম।

দীপু বলল, —আরে, আপনি মশাই ভাগ্যবান। সম্প্রীতি চক্রবর্তী তো নামকরা টিভি স্টার।

—তবেই বুঝুন।

নীল সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বলল,—আপনি বুঝলেন কেমন করে তিনি আপনার প্রতি আসক্ত। আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে না তো?

—তবে আর বলছি কী? আমার বাড়িটা ঠিক রাস্তার ওপরেই। সামনে দিয়ে বিশ ফুটের মতো একটা রাস্তা চলে গেছে। বিশ ফুট খুব একটা চওড়া রাস্তা নয়। এবং আমার ঘরের সংলগ্ন ব্যালকনির ঠিক সামনেই শ্রীদুর্গা আবাসন। এবং ওনার ব্যালকনিটি ঠিক আমার ব্যালকনির মুখোমুখি। তো কী বলব মশাই, প্রথম প্রথম আমি ব্যাপারটা কোন আমল দিইনি। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি, উনি এসে নিয়ম করে ব্যালকনিতে দাঁড়াচ্ছেন।

—দাঁড়াতেই পারেন। তাঁর নিজের ব্যালকনিতে তিনি দাঁড়াবেন না?

—একশোবার দাঁড়াবেন। কিন্তু প্রতিদিন সকাল নটা পর্যন্ত, ওনার চুল আঁচড়ানো, টুকিটাকি প্রসাধন, মায় শুটিং যাবার আগে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ সব ওই ব্যালকনিতেই। এবং আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে। যেটা কোন মতেই আশা করা যায় না। তারপর, রাত আটটার মধ্যে উনি ফিরে আসেন। এবং ব্যালকনিতে এসে ড্রিংক্স নিয়ে বসেন। এবং যথারীতি আমার ঘরের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন।

—কতক্ষণ থাকেন?

—যতক্ষণ না আমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি।

—উনি কী আপনার অনুমান মতো ওনার হাবে ভাবে তেমন কিছু প্রকাশ করেছেন?

—তাহলে এটা কী, বলেই পকেট থেকে হাল্কা গোলাপী রঙের একটা কাগজ নীলের দিকে এগিয়ে দিলেন। ছোট্ট একটা লাইন, 'তুমি কী নির্বোধ? তুমি কি কিছুই বোঝনা?'

চিঠিটা ফেরৎ দিতে দিতে নীল বলল, —এটি আপনার কাছে এল কীভাবে? এটা যে আপনাকেই লেখা হয়েছে তারও তো কোন প্রমাণ নেই।

—দুষ্ট দুষ্টু খেলা। কী আর প্রমাণ থাকবে? একদিন আমি কর্মস্থলে বেরোচ্ছি, সবে গাড়িতে উঠতে যাব, একটি ছোকরা এসে আমায় কাগজটা দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যালকনিতে চোখ ফিরিয়ে দেখি সম্প্রীতি হাসতে হাসতে হাত নাড়ছে।

নীল কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল,—বিকাশবাবু ঠিকই বলেছেন। এ পুলিসের কাজ নয়।

—জানি, এটা একান্তই ব্যক্তিগত টরেটক্কা। উদ্ভিন্ন যৌবনের চাপল্য। আর অনুরাগ তো কোন অপরাধ নয়। কিন্তু আমি তো এই মাদনিক ষড়যন্ত্রে প্রায় ভস্মীভূত হবার দাখিল। কোন কষ্ট কল্পনাতেও পুলকিত হতে পারছি না। অমন জাঁদরেল, ডাকসাইটে সুন্দরী, তায়, উরিবাবা! স্যার, এখন বলুন আমি এই দোদুল্যমান অবস্থা থেকে উদ্ধার পাই কেমন করে?

—দোদুল্যমান বলছেন কেন? আপনিও কি মহিলার প্রেমে পড়েছেন?

—ধুত্তর মশাই। প্রেম কোথায়? তবে, এই ভরা যৌবনে, এমন উর্ধশীর হাতছানি, মুনিঋষিরাই চিৎপাত হয়ে যায়।

—আরও কিছুদিন দেখুন। হয়তো আপনাকে মহিলার ভালো লেগে গেছে।

—আমার মধ্যে ভালো লাগার কিছু নেই সেটা আমি খুব ভাল করেই জানি। এই তো দেখছেন আমার মুখশ্রী আর কলেবর। কিন্তু—

বাধা দিয়ে নীল বলল, —আপনি কী করেন?

—রেলের বগি রিপেয়ারমেন্টের বরাত পাই। অনেকদিন থেকেই পেয়ে আসছি। এছাড়াও আমার কারখানায় কাঠ আর লোহার আসবাবপত্র তৈরি হয়। আমার রেট কম। কাজ ভালো। রেলের সাহেবদের গুডবুকে আছি। অবশ্য তার মধ্যে খরচও করতে হয়।

—কাট মানি?

—যে ঠাকুরের যে ফুল। চড়াতেই হবে। তবে রেলের কাজ অনেক। দিনরাত রেল অবরোধ, ভাঙচুর, আগুন লাগানো লেগেই আছে লোকজনও অনেক পুষতে হয়।

—তার মানে আপনার টাকাকড়ি আছে?

আবার সেই ভুবনমোহিনী হাসি। হাত কচলে বললেন—তা স্যার গ্রহকৃপায় সামান্য কিছু আছে। কলকাতায় আমার চারখানা বাড়ি। অবশ্য তিনটে বাড়ি ভাড়া দেওয়া। সেখান থেকেও মন্দ আসে না। বড় রাস্তার ওপরই বাড়ি। একতলাগুলো ব্যাঙ্ক আর দুটি বড় কোম্পানিকে ভাড়া দিয়েছি। ওপর তলাগুলো ফ্ল্যাট সিস্টেমে ভাড়াটে আছে। তবে আমার বেশির ভাগ ভাড়াটেই ননবেঙ্গলি।

দীপু জিগ্যেস করল, —বাঙালিদের দেননি কেন?

—বড় হুজ্জোত করে মশাই। একবার জাঁকিয়ে বসতে পারলে ওঠার নাম করেনা। সময়মতো ভাড়া দেয় না। একটু কিছু বললেই রেন্ট কন্ট্রোল। ভাড়াটেদের ফেভারেই তো আইনের পাল্লা ভারি। তবে আমিও ঠিক করেছি, এবার তিনবছর কনট্র্যাক্টে ভাড়া দোব। তিনবছর অন্তর ফেলো কড়ি মাখো তেল।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল, —সম্প্রীতি দেবীর আগে ওখানে কে থাকতেন?

—কেউ না। উনিই প্রথম। ওতো একটা পড়ে পাওয়া জমি। ছিল একটা বুড়ির ভাঙাচোরা আস্তানা। পাশে অনেকটা ঝোঁপঝাড় জঙ্গুলে জমি। বুড়ি টাঁসার আগেই প্রোমোটারের খপ্পরে।

হঠাৎ দীপু বলল, —সেকী! আপনার নাকের ডগা দিয়ে এত বড় একটা সুযোগ বেরিয়ে গেল?

আবার সেই ভুবনমোহিনী হাসি, বিনয়ে তরলম্ হয়ে বললেন—কোর্ট পেপারের ওপর বুড়ির দস্তখত করা কাগজটা কী এমনি এমনি আছে? পাঁচলক্ষ টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছি। জমি কেনা বাবদ।

—তাহলে আর একজন কীভাবে বাড়ি তোলে?

—ওই হাড় বজ্জাত প্রোমোটার নরেন উকিল, না ও বেটা ল-ইয়ার নয়। পদবি উকিল। হ্যাঁ যা বলছিলাম, বেটা এখানকার পার্টির লোকেদের কব্জা করে নিয়েছে। কিছু ভাড়াটে গুণ্ডাও ফিট্ করা আছে। ফটাফট জমির ওপর বাড়ি তুলতে আরম্ভ করে দিল।

নীল জিগ্যেস করল,—আপনি কোন বাধা দেননি?

—গায়ের জোরে তো আর পারব না। দানব শক্তির সঙ্গে মানব শক্তি, পারে কখনও? তার মানবের মহামস্তিষ্ক, বড়ই উর্বর। দিয়েছি কেস ঠুকে। দরকার হলে সুপ্রীম কোর্টেও যাব।

—কিন্তু, দীপু বলল, এ রকম তো হয় না। আপনি অ্যাডভান্স করলেন। আর একজন

বাড়ি তুলল?

—আমি রেজিস্ট্রি করার আগেই বিশলক্ষ টাকা দিয়ে নরেন উকিল কোর্টে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছিল।

—তা আপনি বুড়িকে বললেন না?

—পাব কোথায়? তিনি তো তখন স্বর্গারোহণ করেছেন।

—আর তার টাকাকড়ি?

—বুড়ির এক মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেছে! সেই বোধহয় সব পাবে। এ ব্যাপারে আমি কোন খোঁজ রাখিনি।

—কিন্তু ওঁর মেয়েকে তো আপনার জানানো উচিত ছিল।

—ভাবছেন জানাইনি? মেয়ে বলে মা কাকে কী দিয়েছে কার কাছ থেকে কী নিয়েছে সে সব সে বোঝে না বা বুঝতেও চায় না। স্পষ্ট বলে দিয়েছে কোর্ট খোলা আছে কোর্টে গিয়ে নালিশ করুন।

দীপু বলল, —তা হলে মনে হচ্ছে আপনার পাঁচ লক্ষ টাকা জলে গেল।

—ব্যবসা করতে গেলে মাঝে মাঝে লস অ্যাকাউণ্ট তো হয়। তবে আমার নাম কালবোস। দেখিনা কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আসলে কী জানেন, এ শালার দেশে কোন আইনকানুন বলে কিছু নেই। ছিল পুকুর। হয়ে গেল রাধামাধবের মন্দির। তারপর মন্দির ক্রমাগত ছোট হতে হতে উঠে গেল মাল্টিস্টোরিড ফর্মা। আর পুকুরের মালিক, মাঝে মাঝে রাতকুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে। ব্যস্ ওই পর্যন্ত।

গল্পের গরু গাছে উঠছে দেখে নীল প্রসঙ্গ পাল্টালো—আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

—একান্ত নিজের বলতে কেউ নেই। মা বাবা অনেকদিন আগেই গত। মাসতুতো এক দিদি আছে। বিধবা। তার এক ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটা ভাল। পড়াশুনো করছে। এম. এ. পড়ছে। কিন্তু ভাগনেটি লুচ্চা ছেলে মশাই। কাজের চেয়ে অকাজ করে বেশি। এদিক ওদিক ধান্দা করে বেড়াচ্ছিল। তারপর দিদির অনুরোধেই আমার কারখানায় খাতাপত্তর লেখার একটা চাকরি দিই। কিন্তু গাছে না উঠতেই কাঁদি। ঝিয়ের সোমত্ত মেয়েটার সঙ্গে লট্‌ঘট্ চলছিল। অত খেয়াল করিনি। টেস্ট বলতে কিছু নেই। একদিন ভরদুপুরে শাঁখ আর উলুধ্বনি। বেটাচ্ছেলে ওই ধিঙ্গি মেয়েটাকেই রেজিস্ট্রি করে একেবারে ঘরে এনে তুলল। দিদি আর কী করে? বাধ্য হয়ে ঘরে তুলতে হল। মনে হয়েছিল ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিই। সেটা আর করিনি। চাকরিটাও খাইনি। আছে। তো, এই আমার সংসার।

হঠাৎ দরজায় এসে নন্দিনী হাজির। একবার বৈঠকখানাটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, —নীল, আমি বেরচ্ছি। নিশ্চয়ই তুমি এখন খুব ব্যস্ত?

হাল্কা হেসে নীল বলল, —হ্যাঁ, ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথা বলছি।

—ওয়েল, আমি তাহলে এগোই। তোমার কী গাড়ির দরকার হবে?

—তুমি নিয়ে যেতে পার। সে রকম দরকার পড়লে ট্যাক্সি তো আছেই।

—দীপু, তুই কী এখন তোর গুরু-র সঙ্গে গ্যাজাবি? সাইকেল হাউসে যাবিনা?

—হ্যাঁ, বউদি যাব। তুমি কিস্‌সু চিন্তা কোর না।

—চারটে সাইকেল ভ্যানের ডেলিভারি আছে কিন্তু।

—বললাম না, কিছু ভেবোনা।

বলা নেই কওয়া নেই কালবোস তিড়িং করে লাফ মেরে সটান নন্দিনীর কাছে গিয়ে 'আপনি বউদি' বলেই প্রণাম করতে যাচ্ছিল।

অস্বস্তিতে ছিটকে গিয়ে নন্দিনী বলল—এসব কী করছেন? না না এসব আমি পছন্দ করি না।

—যতই হোক আপনি বউদি, মাতৃস্থানীয়া। নমস্কারে দোষ নেই। তায় ব্রাহ্মণী।

—ঠিক আছে। নীল আমি চললাম। বলেই হাওয়া।

অস্বস্তির রেশটা কাটবার পর নীল বলল, —আপনি নিশ্চয়ই আমার কাছে জমি প্রবলেম নিয়ে আসেননি?

—না না, সে সব ল-ইয়ারের কাজ। আমার প্রবলেম একটাই। তাহলে স্যার, বলুন, আমি এখন কী করব?

কালবোসের বয়ান মতো নীল এর মধ্যে কোন অপরাধের গন্ধ খুঁজে পেলো না। কেন যে ভদ্রলোক এতদূর রাস্তা তেল পুড়িয়ে তাঁর কাছে এসেছেন তারও কোন যথার্থ ব্যাখ্যা পেলো না।

ও বলল, —কালবোসবাবু, কিছু মনে করবেন না। যে ঘটনাটা আপনি বললেন, এটা এতই সাধারণ ব্যাপার যে, এর মধ্যে পুলিস বা গোয়েন্দার কোন কাজ নেই। একটি মেয়ে আপনাকে প্রেম নিবেদন করতে চান। এতে তাঁর কোন অপরাধ নেই। এবং আপনি অবিবাহিত। সম্ভবত মহিলাও। এখন এটা কীভাবে ডীল করবে সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। আপনার এগোবার ইচ্ছে হলে মহিলার সঙ্গে আলাপ করুন। কথা বলুন। দেখুন সে কী চায়? সত্যিই যদি দেখেন মহিলার মধ্যে অনুরাগের ব্যাপার স্যাপার আছে, এগিয়ে যান। নিজেও স্থিতু হোন। তা যদি না চান তাহলে নীরব হয়ে যান।

কালবোস গোত্তা খাওয়া ভঙ্গীতে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, —নাহ্ আপনারা কেউই আমার সমস্যাটা বুঝতে পারছেন না। ঠিক আছে দেখি আমি নিজেই কী করতে পারি।

কালবোস তার অদ্ভুত আকারের শরীর নিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়ি চলে যাবার আওয়াজ পাওয়া গেল। অর্থাৎ তিনি সত্যিই চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর নীল জিগ্যেস করল,—কী বুঝলি?

—মাথায় দুগজের মতো ছিট আছে। তাও সস্তা দরের ছিট। একজন সুন্দরী মহিলা, তারও কিছু নাম আছে, অভিনেত্রী হিসেবে দরও আছে, তোর মতো একটা মাকাল উদভুটে দেখতে লোকের সঙ্গে প্রেম করতে চায়? কোথায় নমো নমো করে ঝুলে পড়বি, তা নয় ...এসব কী জানতো, এক পুরুষের বড়লোক, নিজেকে জাহির করার এক ধরনের কমপ্লেক্স। জমির ব্যাপারটা আমার কাছে হেঁক্কোরবাজি বলে মনে হল। ঘাগু মাল। পাঁচ লক্ষ টাকা আগাম দিয়ে উনি বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষছেন? তার ওপর ব্যবসাদার লোক। ভেতরে কোন গণ্ডগোল আছে।

—হুঁ, বলে নীল অন্য প্রসঙ্গে গেল, —নন্দিনীর সঙ্গে তোর কথা হয়েছে?

—হ্যাঁ হয়েছে। শুনলে তো কিরকম কাঁধে কাজ চাপিয়ে দিয়ে গেল। সেটাই ভাল বুঝলে। তোমার সাইকেল হাউসটা দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে। নন্দিনী বউদি বলেছে আমাকে ওয়ার্কিং পার্টনার করে দেবে। যাবতীয় দেখভাল সব আমার। অর্থাৎ এককথায় ম্যানেজার কাম হাফ ডিরেক্টর। তোমার ল্যাংবোট হয়ে থাকলে আর আমার চলবে না। ওদিকে অঙ্গনাও আর বসে থাকতে রাজি নয়।

—হ্যাঁ, চম্পাগীরে বসে নন্দিনীকে আমি সেটাই বলছিলাম। দেখ, দুজনে মিলে চেষ্টা করে যদি সাইকেল হাউসটা দাঁড় করাতে পারিস।

—ও তুমি ভেবোনা গুরু। আমি জান লড়িয়ে দোব। তবে গুরু, তুমি আমায় একেবারে অবসর দিয়ে দিও না। তোমার লেজুড় হয়ে হয়তো তেমনভাবে পয়সার মুখ দেখতে পাইনি। কিন্তু তোমার কাজে যেরকম থ্রীল, যে রকম একটা উত্তেজনা, তুমি যে রকম মাথা ঘামিয়ে সত্যগুলো উদ্ধার কর, সে কিন্তু তোমার সাইকেল হাউসের ব্যবসা করে পাব না।

—কথাটা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি না। ওই জন্যেই তো আমি ও মুখো হই না। প্রভাতবাবুর ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। তবে ওটারও দরকার। শুধু প্রাইভেট গোয়েন্দাগিরিতে পেট ভরে না। এতদিন একার ব্যাপার ছিল, কোন চিন্তাভাবনাই ছিল না। কিন্তু নন্দিনী চায় সাইকেল হাউসটা আবার চলুক। তার ওপর তোর প্রতিও আমার একটা কর্তব্য আছে। সব মিলিয়ে—

—ঠিক আছে। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি তোমার সাইকেল হাউসকে আমি মরতে দোব না। তবে, আমাকে তোমার পাশ থেকে ছেঁটে ফেলে দিও না। প্লীজ নীলদা।

কিছু না বলে নীল কেবল মুখ টিপে হাসল।

দুই

কালবোসের ব্যাপারটা নীল মাথা থেকে উড়িয়েই দিয়েছিল। একজন বছর চল্লিশের ভদ্রলোক।

বিয়ে টিয়ে করেননি। সে অনেকেই করে না। কিন্তু সম্ভবত কদাকার চেহারার জন্যে কোন মেয়েরই কৃপাদৃষ্টি পাননি। অথচ সুন্দরী ফর্সা মেয়ে না হলে বিয়ে করবেন না। দীপু শেষমেষ একটা কথাই বলেছিল, কালবোস এক ধরনের মানসিক রোগী। অনেক সুন্দরী মেয়ে ওনার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, এই সব বলে এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া।

নন্দিনী কিন্তু সব শুনে বলেছিল, —রূপবান নিষ্কর্মা পুরুষের থেকে কদাকার কর্মী মানুষকে অনেক মেয়েই পছন্দ করবে বেশি। ভ্যানগগও তো সেই অর্থে কুৎসিত দর্শন পুরুষ। কিন্তু তাঁরও প্রেমে পড়েন এক সুন্দরী মহিলা।

দীপু তর্ক জুড়েছিল— বোকা বোকা কথা বোলো না তো বউদি। পরিণামটা কী হল? নিজের কানটান কেটে। পাগল না হলে কেউ অমন কাজ করে না। একসেনট্রিক।

নন্দিনী আর তর্কের মধ্যে যায়নি। যায়নি এই কারণে ওকে বোঝানো সম্ভব নয়। আসল সৌন্দর্য মনে, বাইরের রূপ, ক্ষণিকের আত্মতৃপ্তি।

কালবোস চলে যাবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে নতুন কোন জটিল রহস্য না আসায় নীল সারাদিন বইটই পড়ে কাটায়। নয়তো বিকাশ তালুকদারকে ডেকে পাঠায়। বিকাশ তালুকদার তাঁর পুলিস জীবনের রোমাঞ্চকর সব গল্প কাহিনি বলে যান। নীল সময় কাটানোর তাগিদে বিকাশ তালুকদারের গল্প শুনে কাটায়। একদিন এরই মধ্যে কালবোসের কথা উঠেছিল। তালুকদার তো কালবোসের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। নীল মনে করিয়ে দিতেই তালুকদার বললেন—আরে হ্যাঁ তাইতো? ভদ্রলোককে তো আমিই আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পর টাকে হাত বোলাতে বোলাতে তালুকদার সহাস্যে বললেন, —পাগল আর কাকে বলে? পুলিসের কাছে এসেছেন, পরমাসুন্দরী এক মেয়ে তার ওই বদন দেখে প্রেমে পড়ে গেছে। এরপর উনি কী করবেন, সেটা সমাধান করে দিতে হবে পুলিসকে? আচ্ছা বলুন তো, পাবলিক আমাদের কী ভাবে? দেশের শান্তি ফেরানোর জন্যে আমরা আছি, ঠিক আছে, তাই বলে কে কার সঙ্গে প্রেম করছে, কী প্রেমে ল্যাঙ খেয়েছে তার শান্তিজল ছিটনোর দায়িত্ব পুলিসকে নিতে হবে? দিয়েছেন তো ভাগিয়ে?

নীল স্মিত হেসে বলল,—ডাইরেক্ট তো আর না বলা যায় না। সেটা অভদ্রতা। ওই কোনরকমে পাশ কাটনো আর কি।

—খুব ভালো কাজ করেছেন। এর থেকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ঢের ভাল।

কিন্তু কালবোস মুক্তি দিলেন না। মাস দুয়েক বাদে বাইরে মোটরের আওয়াজ। নীল ঝুলবারান্দায় গিয়ে দেখল ধবধবে সাদা এসটিম গাড়ি থেকে নামছেন প্রায় বর সাজে সজ্জিত কালবোস। অবশ্য এর আগের দিনও সাজটা এরকম ছিল। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি। ধাক্কা দেওয়া ধুতি। পায়ে কে এম দাশের পা মোড়া চটি। দামি চটি। কোঁচাটি হাতে ঝোলান। কেবল মাথায় টোপর আর গলায় জুঁইগোড় নেই।

নীল তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল। দীপু ছিল না। সাইকেল হাউস নিয়ে মেতে গেছে। নন্দিনীর কড়া হুকুম। ওয়ার্কিং পার্টনারকে কোন মতেই ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। রেগুলার খাটতে হবে। নইলে কোম্পানি দাঁড়াবে না।

অতএব নীলকে প্রায়শই একা বাড়ি থাকতে হচ্ছে। ইদানীং হাতে কোন কেসও নেই, —আরে কালবোসবাবু, আসুন আসুন।

কালবোস বেশ গটগটিয়ে নীলের বৈঠকখানায় এসে সোফায় বসলেন। সম্ভবত গায়ে বিলিতি পারফিউম মেখেছেন। দামি পারফিউম। ঘরটি ম ম করে উঠল।

নীল সামনে সিঙ্গল সোফায় বসতে বসতে বলল, —এখনও কী তিনি আপনাকে চিঠি পাঠিয়ে যাচ্ছেন।

হাঃ হাঃ শব্দে ঘর কাঁপানো হাসি হাসলেন। সেই ভুবনমোহিনী হাসি।

নীল জিজ্ঞাসা করল, —হাসছেন কেন? খুব হাসির কথা বলে ফেললাম নাকি?

হাতব্যাগের পকেট থেকে একটি সুদৃশ্য বিশাল সাইজের কার্ড বের করে নীলের সামনে তুলে ধরলেন। তাতে সোনার জলে লেখা শুভ পরিণয়।

নীল বিস্মিত দৃষ্টিতে কালবোসের দিকে তাকিয়ে বললেন, —তাহলে শেষে বিয়ের ফুল ফুটল? কিন্তু কার? ভাগনীর নাকি?

—আরে দুর, ভাগনির বিয়ে। সে তো শুনেছি তার কোন ক্লাশমেটের সঙ্গে রাস্তায় পার্কে ঘুরে বেড়ায়। তা নয়। একবার খুলে পড়ুন।

নিমন্ত্রণ পত্রটি নীল খুঁটিয়ে পড়ল। তারপর কিছুটা আনন্দ, কিছুটা বিস্ময় নিয়ে বলল, —গুড। ভেরি গুড নিউজ। এ তো ভাবাই যায় না।

—হ্যাঁ, মানুষ আগে থেকে অনেক কিছুই ভাবে, যেটা কোনদিনও ফলে না। আবার মানুষ যা ভাবে না, সেটাই কখন ঘটে যায়। একেই বলে বিধিলিপি।

—বিধিলিপি? তা বলতে পারেন। হাতে যতগুলো গ্রহ আটকে রেখেছেন, বিধিলিপি বাপবাপ বলে আপনার আদেশে চলবে। তা শেষ পর্যন্ত সম্প্রীতি দেবী জিতে গেলেন?

—সে অনেক গল্প মশাই। আর একদিন বলব। আপনার কিন্তু যাওয়া চাই। এবং অবশ্যই বউদিকে নিয়ে। সঙ্গে আপনার ওই লেজুরটিকেও নেবেন। না বললে শুনব না। আমি অনেক আশা নিয়ে এসেছি। সম্প্রীতি যে এত ভাল মেয়ে তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি। বউদি কী বেরিয়ে গেছেন?

—হ্যাঁ। ওর দশটা পাঁচটা ডিউটি।

—দুর্ভাগ্য। দেখা হল না। তাহলে আসছেন তো?

—অতদূর থেকে কষ্ট করে নেমন্তন্ন করতে এলেন। আর রিটার্ন তেল পুড়িয়ে আপনার আমন্ত্রণ আমি নিশ্চয়ই রক্ষা করব। বিকাশ সাহেবকে বলেছেন?

—ওনাকে বলব না? ওর সুবাদেই তো আপনার সঙ্গে পরিচয়। তাহলে আজ উঠি।

আজ বিকেলে সম্প্রীতিকে নিয়ে একবার সুপার মার্কেটে যেতে হবে। কিছু কেনাকাটা আছে।

—একটু চা খেয়ে যাবেন না?

—না গো দাদা। অনেক নেমন্তন্ন সারতে হবে।

কালবোস চলে যাবার পর নীল খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। সিরিয়াল টিরিয়াল দেখার কোন অভ্যেস ওর নেই। কিন্তু সম্প্রীতিকে একবার দেখার জন্যে ওর একটা রানিং সিরিয়াল দেখেছিল দিন কয়েক। পর্দা সমীক্ষায় ওর একটা কথাই মনে হয়েছিল, এই মেয়ে কখনোই কালবোসকে পছন্দ করতে পারে না। মেয়েটি শুধু রূপসীই নয়, অভিনয়টাও দারুণ করে। কালবোসের কথামতো সত্যিই যদি মেয়েটি তার দুর্বলতা দেখিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন গণ্ডগোলের ব্যাপার আছে। একজন কদাকার পুরুষকে বিয়ে করার মধ্যে কী সম্প্রীতির কোন উদ্দেশ্য আছে? কে জানে?

নীলের সন্দেহপ্রবণ মন সচকিত হয়ে উঠল। এমনিতে এত সামান্য পরিচয়ের খাতিরে ও হয়তো নেমন্তন্ন এড়িয়ে যেত। কিন্তু একটা খট্‌কা। মনে মনে ঠিক করে নিল কালবোসের বিয়েতে যেতেই হবে।

তিন

এলাহি ব্যাপার। ইদানীং নহবত টহহত খুব একটা কেউ বসায় না। ক্যাসেটে সাঁনাই বাজে। কালবোস বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বিশাল বাড়িটার গেটের মুখে নহবতখানা বসিয়েছেন। গেটে ঢোকার মুখেই অদৃশ্য কোন জায়গা থেকে গোলাপজল সিঞ্চিত হচ্ছে। অতিথি অভ্যাগতে সারা বাড়িটা গম গম করছে। নিশ্চয়ই এককালে বাড়িটা কোন রাজা অথবা ইংরেজ মহামান্যের বাড়ি ছিল। এখন যাঁর হাতে আছে তিনি পার্মানেন্ট ভাড়া না বসিয়ে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ সবেতেই ভাড়া দেন। কোন ঝক্কি ঝামেলা নেই। সবটাই নগদ।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই মনে হল কোন হাটে বাজারে এসে পৌঁছেছে। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সারসার মোটর। নন্দিনী আসেনি। ওর আবার একটু নাক উঁচু ব্যাপার আছে। বিশেষ পরিচিত আর হার্দিক সম্পর্ক না থাকলে ও হুটহাট কোন নেমন্তন্ন বাড়ি যায় না। তালুকদার সাহেব হয়তো আঁসবেন। বাড়ির কাছেই। হয়তো পরে কোন এক সময় এসে যাবেন।

দীপু ফুট কাটল, —হ্যাংলার মতো না এলেই বোধহয় ভালো হত।

নীল চারদিক দেখতে দেখতে বলল,—হ্যাংলামির কী আছে? ভদ্রলোক বাড়ি বয়ে নেমন্তন্ন করে এলেন। আর আসব না? নীল ব্যানার্জি কী এতই অভদ্র?

—উ হুঁ, নীলদা তোমার পাশে পাশে তো আর কমদিন রইলাম না। কালবোসের

বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসা, এর পেছনে নিশ্চয়ই তোমার কোন উদ্দেশ্য আছে।

উদাস গলায় নীল বলল, —কোন উদ্দেশ্য নেই বাবা। ওই দ্যাখ, কালবোস আমাদের দেখতে পেয়ে কেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে আসছে।

দীপু বলল, —কালবোস কীরকম মাঞ্জা দিয়েছে দেখছো। কালোর সিল্কের হাঁটু ছাড়ানো পাঞ্জাবি, ধাক্কা পাড় কালো ধুতি, পায়ে সাদা বিদ্যাসাগরী চটি। ঠিক রামানন্দ সাগরের জাম্বুবান। একে শালা কালবোস মাছের মতো গায়ের রঙ, তায় কালো পাঞ্জাবি? লোডশেডিং হলে তো পাগলাকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। বল গুরু ঠিক কিনা?

—বড্ড বাজে বকছিস। চুপ কর। এসে গেছে।

একে গরমকাল। তায় সিল্কের পাঞ্জাবি। কালবোস ঘেমে নেয়ে একসা। ভুবনমোহিনী হাসি ছড়িয়ে বললেন,—দাদা এসেছেন। ভাবতেই পারি না। আমার কী সৌভাগ্য। তা বৌদি কোথায়?

নীল কিছু বলার আগেই দীপু বলল—আর বলেন কেন, আজ সকালের ফ্লাইটে মুম্বাই চলে গেলেন। অফিসের কাজে।

—আহা। উনি এলে আমার কী যে ভাল লাগত। সম্প্রীতিকে বলতে পারতাম, তুমি শুধু একাই সুন্দরী নও। তোমাকে টেক্কা দেবার মতো সুন্দরী বউদিও আছে।

নীল একটু বিব্রত কণ্ঠে বলল—আহা, ওসব কথা কেন? চলুন যাই একটু মিসেসের সঙ্গে আলাপ করি।

—সে তো বটেই। সে তো বটেই।

কালবোস নিয়ে গিয়ে হাজির করল সম্প্রীতির সামনে। সমানে তখন ভিডিও ক্যামেরা চলছে। রাজকীয় সিংহাসন তৈরি হয়েছে। চারদিকে ফুলে ফুলে ছয়লাপ। সম্প্রীতি এমনিতেই সুন্দরী। তায় কনে সাজ। আরও বেশি মনলোভা হয়ে উঠেছে। কালবোস আলাপ করিয়ে দিল, —প্রীতি, এর কথাই তোমায় বলেছিলাম। আমার দাদা। বিখ্যাত গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি। আর উনি—

দীপু বলল, —গুরুর চেলা।

সম্প্রীতি হেসে নমস্কার জানাল। প্রতি নমস্কার করে নীল ওর উপহারটা তুলে দিল সম্প্রীতির হাতে। সৌজন্য করে বলল, —আজ আপনি ব্যস্ত। পরে একদিন আলাপ হবে কেমন?

বুফে সিসটেম। খাদ্যায়োজনও দেদার। খাওয়া দাওয়া সেরে কালবোসের কাছে বিদায় নিয়ে ওরা যখন মারুতির সামনে এসে দাঁড়াল রাত প্রায় সাড়ে নটা। পাশের সীটে বসতে বসতে দীপু বলল, —কাল গলায় যেন মুক্তোর মালা গুরু?

নীল সম্ভবত অন্য কিছু ভাবছিল। দূরমনস্ক ভঙ্গিতেই বলল—কথাটা বড় পুরনো হয়ে গেছে। আসলে আমি একটা অন্য জিনিস ভাবছিলাম।

—কী বলতো?

—সম্প্রীতি তো ফিল্ম বা সিরিয়াল লাইনের মেয়ে। হেভি স্মার্ট। দারুণ সুন্দরী। ইচ্ছে করলেই ও আরও বড় মাছ গাঁথতে পারত। কিন্তু কালবোসকে ও কেন বিয়ে করল? কারো চেহারা নিয়ে আমি কখনও ঠাট্টা করি না। কিন্তু ওই মহিলার পাশে আমি কিছুতেই কালবোসকে মানিয়ে নিতে পারছি না। বারবার এটা কেন মনে হচ্ছে? কেন?

—এটাই তো স্বাভাবিক। তোমার কেন, সবারই তাই মনে হচ্ছে। খাবার সময়ই তো শুনলে কতরকমের টিকাটিপ্পনি। দেখবে দুদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সেটাই আমি চাই। বাট, আমার কেন জানিনা, মনে হচ্ছে, এই দম্পতি আমায় ভাবাবে। এক্ষুনি না হলেও, পরে।

—তুমি আর কু গেয়ো না তো। সবে বেচারিরা বিয়ে করেছে।

—বলছিস? অলরাইট। আমার ভাবনা গুটিয়ে নিচ্ছি।

চার

অতিথি অভ্যাগতরা সব চলে গেছে। ভাগনে রূপমের ওপর আগে যতই রাগ থাকুক না কেন মামার বিয়েতে সে নাওয়া খাওয়া ভুলে কোমর বেঁধে লেগে পড়েছিল। তার মামা যে কোনদিন বিয়ে করতে পারে তাও প্রেম করে, এটা রূপম কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। যদিও মনে মনে তার একটা সুপ্ত আশা ছিল। কালবোসের তো আর কোন নিকট আত্মীয় স্বজন নেই। মামার অবর্তমানে একদিন সবই তার হবে। কিন্তু মা অনুপমা এসে যখন বললেন,—শুনেছিস তো তোর মামা বিয়ে করছে। শুনে রূপম বলেছিল,—বল কি গো, মামা এই বয়সে বিয়ে করছে? মেয়ের মামাকে পছন্দ হয়েছে তো? তার ওপর এমন সুদর্শন পুরুষ?

অনুপমা বলেছিলেন—ছিঃ, কারও চেহারা নিয়ে এমন কথা বলতে নেই। তাছাড়া তোর মামার এমন কিছু বেশি বয়স হয়নি। এই তো একচল্লিশে পড়ল। এই বয়সে বহু লোক বিয়ে করে। কালুর মতো এমন সচ্চরিত্রের মানুষ তুই আজকের দিনে খুঁজে পাবি না। তার ওপর তোর মামার টাকার বহর দেখেছিস?

একটু বাঁকা হাসি হেসে রূপম বলেছিল,—তুমি একটু আগে বললে না, মামুর মতো সচ্চরিত্রের লোক আর হয় না। তুমি কী জানো, আজকের দিনে বেশি সৎ হলে তার কপালে অষ্টরম্ভা। তুমি কী মনে করো মামু যে দুটো ব্যবসা চালাচ্ছে একটা কাঠের আর একটা লোহার তার মধ্যে কোন দুনম্বরি ব্যাপার নেই?

অনুপমা বলেছিলেন, —ব্যবসা করতে গেলে ওসব একটু আধটু করতেই হয়। সকলেই করে। কালু তো আর স্বামী বিবেকানন্দ নয়। আমি অন্য চরিত্রের কথা বলছি। না নেশাভাঙ,

না অন্য কিছু। মনটাও ভাল। ও না থাকলে আমরা কোথায় যেতুম? এই যে তোকে হিসেব আর খাতাপত্তর দেখার কাজ দিয়েছে, তোর একার মুরোদে কুলোতো? তারপর যে কাণ্ডটা করলি? অন্য কোন মামা হলে মেনে নিত?

—তুমি ঝুমাকে বিয়ের কথা বলছ? তার অপরাধ কী? তার বিধবা মা পরের বাড়ি বাসন কোসন মেজে সংসার চালায়। এতেই তার মেয়ে অচ্ছ্যুত হয়ে গেল?

অনুপমা বলেছিলেন—ঠিক আছে বাবা, আমি এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না। তবে তোমার মামা বুদ্ধিমান হলেও একটু লাজুক প্রকৃতির। দায়িত্ব নিয়ে মামার বিয়েটা উতরে দিও। এতে তোমার মামার সুনজরে আসবে। আখেরে তোমারই লাভ। বলা যায় না একদিন তোকেই ম্যানেজার করে দিল।

সম্ভবত সেই লাভের দিকটা মনে রেখেই আগাগোড়া সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। মামা আর মামিকে ফুলশয্যার ঘরে ঢুকিয়ে সে রাতের মতো তার ছুটি। রূপম চলে যাবার পর খুব দুরু দুরু বুকে কালবোস ঘরে ঢুকে দেখলেন সম্প্রীতি ঘোমটা টোমটা টেনে আপাদমস্তক ফুলের বাণ্ডিল হয়ে চুপচাপ বসে আছে। ঠিক সিনেমায় দেখা ফুলশয্যার সীন। অতঃপর ঘরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে গুটি গুটি পায়ে বিছানার এককোণে এসে বসলেন। কথা হারিয়ে ফেললেন। অনেক ক্ষণ ধরে ভেবে পেলেন না কী দিয়ে কথা শুরু করবেন। মনে পড়ে গেল প্রাক্ বিয়ের কথা। তখন প্রণয়পর্ব চলছে। কথা শুরু করার একটা রাস্তা খুঁজে পেলেন কালবোস। একটু একটু করে পাছা টেনে একটা ভদ্রস্থ জায়গায় থেমে গিয়ে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলেন, —প্রীতি, তোমায় একটা কথা জিগ্যেস করব?

সম্প্রীতি নিজেই ঘোমটা খুলে ফেলে বলল, —নতুন বউটা কে? আমি না তুমি? আমতা আমতা করে কালবোস বললেন,—না মানে, যেদিন তুমি আমায় বললে তুমি আমায় বিয়ে করবে সেদিন থেকেই কথাটা আমার মাথায় চক্কর দিচ্ছে।

—বেশতো, বলনা কী বলতে চাও?

—সত্যি কথা বলতে কী, তোমার পাশে আমি তো একটা দাঁড়কাক। তাছাড়া—

—তাছাড়া?

—তোমার আমার বয়সেরও বেশ ফারাক। আমার চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। আর তুমি হার্ডলি চব্বিশ।

—তো?

—তো, একটাই। তুমি বলতে গেলে এরকম সেলিব্রিটি। কত ভালো অভিনয় করো। তোমার এত ফ্যান। ইচ্ছে করলেই তুমি একজন রূপবান, গুণবান ছেলেকে বিয়ে করতে পারতে। কিন্তু আমাকে কেন সিলেক্ট করলে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

সম্প্রীতি চট্ করে এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল। তারপর ধীরে

ধীরে বলল,—আমাকে বিয়ে করে তোমাকে অনেক কূট প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে, তাই না?

—ঠিক উল্টোটা। শুনে সবাই অবাক হয়ে তোমাকেই কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে। সব তোমায় সহ্য করতে হয়েছে।

—আমি ওসব গায়ে মাখি না।

—বেশ, গায়ে মাখো না। তুমি বলবে তুমি আমায় ভালবাস। প্রীতি, সত্যিই তুমি আমায় ভালবাস?

সম্প্রীতি আবার কিছুক্ষণ নীরব। তারপর বলল, —একটি মেয়ে একটি ছেলের কী দেখে ভালবাসে তা তোমার আন্দাজ আছে?

—কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই, পহেলে দর্শনধারী, ফির গুণ বিচারি।

—আমি যদি বলি এই কনসেপ্ট আমি মানি না। আমাদের ফিল্ম লাইনে তো অনেক ছেলেকে দেখলাম। অমুক কুমার, তমুক কুমার, কখনো প্রোডিউসারের হ্যাণ্ডসাম ছেলে, কি ডাইরেক্টরের আপন ভাই, সব পেছন পেছন ঘুরতো। কেন জান, বিয়ে নয়, সংসার নয়, শুধু স্ফূর্তি, আনন্দ আর ভেসে চলা। একটা মেয়ের জীবন এভাবে কাটে না। আমার কাকা। নিরুপম চক্রবর্তী। তিনি আমায় বলেছিলেন, জীবনসঙ্গী বাছবে অনেক চিন্তা করে। দুদিনের স্ফূর্তি কখনও বাকি জীবনের নিরাপত্তা নয়। সেদিন থেকেই আমি ঠিকই করেছিলাম, আমি যাকে ভালবাসব, যাকে বিয়ে করব, মানুষটাকে হতে হবে সৎ, সরল, কর্মঠ। তা সে ব্যবসাই করুক আর চাকরিই করুক।

—কিন্তু আমাকে তোমার ওই রকম একটা কিছু মনে হল কেন? কদিন বা আমায় দেখেছ?

—যদ্দিন এই ফ্ল্যাটে এসেছি। ও ফ্ল্যাটটা কিন্তু আমারই নামে। আমারই উপার্জিত টাকায়।

—ওই বাড়িটা নিয়ে একটা ডিসপিউট আছে। সে সব তোমায় পরে বলব।

—আমার শোনারও কোন আগ্রহ নেই। তোমার কোথায় কী আছে তাও আমি জানতে চাই না। আমি চাই আমার পাশে তুমি থাক, আমার আজীবনের ভরসা হয়ে। পারবে না তুমি?

পুট করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে কালবোস গভীর আবেগে সম্প্রীতিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, —আমাকে তুমি এইভাবে সারাজীবন ভালবাসতে পারবে?

কালবোসের আদর খেতে খেতে সুন্দরী সম্প্রীতি গাঢ় স্বরে বলল,—সেটা ভবিষ্যতই বলে দেবে।

পাঁচ

দেখতে দেখতে একটা ঘোরের মধ্যে আট মাস কেটে গেল কালবোস আর সম্প্রীতির দাম্পত্য জীবনের। কালবোস খুব খুশি। একেবারে ডগমগ। সে নিজের ভাগ্যকে বারবার প্রণাম জানায়। এমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো বউ যে তার জীবনে পাবে তা তার কল্পনাতেও ছিলনা। সত্যি সম্প্রীতির ভালবাসায় কোন খামতি ছিল না। মাত্র একদিন, প্রগাঢ় মিলন মুহূর্তে কালবোস বলেছিলেন,—প্রীতি, তুমি যদি মনঃক্ষুণ্ণ না হও তাহলে তোমায় একটা কথা বলি।

কালবোসের লোমশ বুকে হাত বোলাতে বোলাতে সোহাগী কপোতিনীর মতো বকবকম করে উঠেছিল সম্প্রীতি, —আহা, কী কথা সেটাই বল না। এত সংকোচ কেন?

কালবোস বলেছিলেন,—আমাদের এই এলাকায় আমার যৎকিঞ্চিৎ নামধাম আছে। পাড়ার লোক আমায় সমীহ করে। পুজোপার্বণে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে সভাপতির আসন দেয়। টাকাকড়ির জন্যেও ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার কোন চিন্তা করতে হয় না। চারটে বাড়ি থেকে যা আয় হয় তাও নেহাৎ কম কিছু নয়।

সম্প্রীতি বলেছিল, —আমি কী কোনদিনও তোমায় টাকাকড়ির ব্যাপারে কিছু বলেছি। নাকি কোনদিনও জানতে চেয়েছি তোমার কী আছে, কোথায় আছে? আমি তো ভালবেসেছি তুমি মানুষটা ভালো বলে। আরও একটা কারণ আছে তোমাকে বিয়ে করার।

—কী?

—কোন সুন্দর দেখতে ছেলেকে আমার বিশ্বাস হয় না বলে।

—তার মানে তোমার জীবনে কী তেমন কিছু ঘটনা ঘটেছে?

—না। আমার জীবনে নয়। তবে—

—থামলে কেন প্রীতি, বল তুমি।

—কী হবে সেসব শুনে? পুরনো কথা আর ভাবতে ইচ্ছে করে না।

—একান্ত নিরুপায় হলে বোল না। আমি আমার বর্তমান নিয়েই সুখী। অতীত জানার কোন ইচ্ছেই নেই।

ঘরের মধ্যে স্বল্পালোকিত কমলা রঙ আলোয় এক মোহ সৃষ্টি করেছিল। সেই আলোয় সম্প্রীতিকে আরও মোহময়ী লাগছিল। খুব আলতো করে সম্প্রীতির ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ফিসফিস করে কালবোস বলেছিলেন—থাক ছেড়ে দাও অতীতকে। অতীত এসে বর্তমানের আলোটা কেড়ে নিক সে বাসনা আমার নেই। বরং এই ভালো।

হঠাৎ সম্প্রীতি কেমন যেন বিমনা হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর আদর খেতে খেতে একসময় বলেছিল, —না গো, তোমার কাছে কোন কিছু লুকনোর ইচ্ছে আমার নেই। তোমাকে বিয়ে করার ডিসিশন যেদিন নিই, সেদিন সবাই আশ্চর্যই হয়েছিল। আমার স্টুডিওপাড়ার বন্ধুরা

থেকে শুরু করে আমার কিছু আত্মীয় স্বজন সবার চোখে দেখেছিলাম বিস্ময়। আর আমার টেস্টের অধঃপতনে তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। একমাত্র বুঝে ছিলেন আমার মা আর কাকা। তারা আমার এই নির্বাচনে এককথায় সায় দিয়েছিলেন।

—তুমি কিন্তু বড় করে তুলছ সামান্য একটা ব্যাপারকে।

—না গো মশাই, সামান্য ব্যাপার নয়। এ আমার জীবনের অভিজ্ঞতা। আমার মা আর কাকা নিরুপম চক্রবর্তীকে তো দেখেছ?

—হ্যাঁ। ওনারা তো খুবই ভালো। বিশেষ করে তোমার মা। আমাকে তো নিজের ছেলের মতো ভালবাসেন। একদিনের জন্যে আমার এই চেহারার জন্যে কোন ভ্রূকুটি পর্যন্ত করেননি।

—ওইখানেই তো সব রহস্য লুকিয়ে আছে। আমার কাকার প্রসঙ্গ টানলাম আর একটা কারণে। কাকাকে দেখতে কেমন বলতো।

—দারুণ হ্যাণ্ডসাম। এককথায় যাকে বলে সুন্দর আর সুপুরুষ। আমার তো খুবই হিংসে হয়। এই বয়সেও নিজেকে কত স্মার্ট আর সৌখিন করে রেখেছেন।

—আমার কাকার ওই রূপের ওপর আরও চারগুণ রূপ বাড়িয়ে দাও। সেটাই আমার বাবার প্রতিচ্ছবি।

—তাই জন্যেই তুমি এত সুন্দর।

—কিন্তু ওই সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে ছিল একটা বিষাক্ত পোকা। একটা কমপ্লেক্স। নার্সিসাস কমপ্লেক্স। যদিও প্রেম করে আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু মায়ের ওই সাদামাটা চেহারাটা নিয়ে বেশিদিন খেলা করতে ভালোলাগেনি আমার বাবার। দিনের পর দিন মায়ের চোখের সামনেই নানান সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে এসে বাড়িতে বসে স্ফূর্তি করতেন। মায়ের একটা কমপ্লেক্স তো ছিলই। বাবার পাশে মাকে ঝি বলে মনে হত। তার ওপর বাবা ছিলেন একটা বড় কোম্পানির উঁচু পোস্টের কর্মচারি। মাইনেও পেতেন দেদার। উপরি আয়ও ছিল অনেক। প্রথম প্রথম ওই হীনন্মন্যতার জন্যেই মা বাবার অনেক উচ্ছৃঙ্খলতা মেনে নিতে বাধ্য হতেন। শেষে একদিন এক সুন্দরী মহিলাকে ধরে নিয়ে এসে বাবা বলেছিলেন,—এই মহিলাকে আমি বিয়ে করব। আমি কোর্ট পেপার নিয়ে আসছি। সই করে দাও। ক্ষতিপূরণ যা দেবার সেটা দিয়ে দোব।

কালবোস বললেন, —সে কী? জোর করে ডিভোর্স পেপারে সাইন? এতো রীতিমতো অন্যায় অত্যাচার।

—ঠিক তাই। মাও বলেছিলেন সেই কথা। তিনি বলেছিলেন, কিন্তু আমি তোমার বিয়ে করা বউ। এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ে তো করতে পার না।

বাবা বলেছিলেন, —সেই জন্যেই ডিভোর্স দিতে চাইছি। তোমার সঙ্গে তো নিরুপমের খুব দহরম মহরম। ডিভোর্স নিয়ে ওকে বিয়ে করে ফেল।

প্রতিবাদে মা ওই একবারের জন্যে গর্জে উঠেছিলেন। কিন্তু সে গর্জন থেমে গিয়েছিল। অত্যাচার আর নিত্যনতুন অপমানে। মা ডিভোর্স দেননি, কোন ক্ষতিপূরণও নেননি। বাবাকে মুক্তি দিয়ে চলে এসেছিলেন। স্কুলে শিক্ষকতা করে আমাকে বড় করে তুলেছেন।

সব শোনার পর কালবোস বলেছিলেন, —এবার বুঝলাম, কেন তুমি রূপবান পুরুষদের দেখতে পার না।

—হ্যাঁ তাই। আর এটাই আমার চ্যালেঞ্জ। আমি মনে করি বাইরের রূপ নয়, ভেতরের সৌন্দর্যটাই মানুষের আসল রূপ। আমি প্রমাণ করে দিতে চাই একজন কুরূপ মানুষ একজন অপরূপের থেকেও অনেক ভাল হতে পারে। হ্যাঁ, তুমি যেন কী বলছিলে?

—বলছিলাম, তুমি অভিনয় কর, এতে আমার তেমন কোন আপত্তি নেই। আজকাল সব ভদ্রবংশের মেয়েরাই অভিনয় লাইনে আসছেন।

সম্প্রীতি কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বলেছিল, —আমি বুঝতে পারছি তোমার সংকোচটা কোথায়? ঠিক আছে। তাই হবে।

—কী হবে?

—সেটা সময় এলেই বুঝতে পারবে।

বোঝা গেল কিছুদিনের মধ্যে। একটু একটু করে সম্প্রীতি নিজেকে স্টুডিও পাড়া থেকে গুটিয়ে নিল। যে কটা হাতের কাজ ছিল সেগুলো একসময় শেষ করল। নতুন করে আর কোন কাজ নিল না। একসময় তাকে দেখা গেল পাকা গৃহিণীর মতো কালবোসের সংসার নিয়ে সে ব্যস্ত।

কালবোস সবই লক্ষ্য করতেন। একদিন সুযোগ বুঝে বললেন,—তাহলে স্টুডিওর কাজ সব ছেড়ে দিলে?

সম্প্রীতি রান্না করছিল। রান্না করতে করতে বলল, —আমি যখন যে কাজটা করি মন দিয়েই করি। যখন ছোটবেলায় গান শিখতাম, মন দিয়ে গান শিখেছি। মন দিয়ে লেখাপড়াও করেছি। অভিনয় করার সময় সারা মনপ্রাণ ঢেলে অভিনয় করেছি। কিন্তু সারাদিন যদি বাইরে বাইরে অভিনয় করে বেড়াব, তাহলে আমাদের সংসারটা দেখবে কে?

কালবোস মনে মনে খুশি হলেও মুখে কিছু না বলে চলে আসছিলেন। সহসা একটা কথা মনে হওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, —ছোটবেলায় তুমি তো গান শিখতে?

—তো?

—সেটাই আবার নতুন করে শুরু কর। সারাদিন বাড়িতে শুধু রান্না আর সংসার নিয়ে থাকলে আত্মিক কোন উন্নতি হয় না। দেখবে দুদিন পর হাঁপিয়ে উঠেছ। যদি রাজি থাক তাহলে আমি একজন গানের শিক্ষকের ব্যবস্থা করি। প্রতিদিন তিনি এসে তোমাকে গান শেখাবেন। টিভিও খোল না। বইটইও তেমন পড়তে দেখি না। একটা কিছু নিয়ে তো মানুষকে বাঁচতে হয়।

সামান্য ক্ষণ কড়ায় চাপানো তরকারিতে খুন্তি চালাতে চালাতে সম্প্রীতি কিছু একটা ভাবল। তারপর বলল, —তুমি বলছ গান শিখতে?

—হ্যাঁ বলছি।

—বেশ, তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। কলেজ লাইফে আমি একজনের কাছে গান শিখতাম। গলাটা ভাল। খুব যত্ন করে গানও শেখাতেন। কিন্তু গানের জগতে কিছু করে উঠতে পারেননি। পারতে গেলে যা যা করতে হয়, সেগুলো ওর দ্বারা হয়নি। যদি বল তো তাকে ডেকে পাঠাতে পারি?

—একশোবার। তুমি অবিলম্বে তাকে ডেকে পাঠাও।

চল্লিশোত্তীর্ণ কালবোস যেন পঁচিশ বছরের যুবক হয়ে গেছেন। ঘরে সুন্দরী সুগৃহিণী। নিপুণ হাতের পরশে তাঁর সংসার যেন স্বর্গোপম হয়ে উঠেছে। এখন তাঁকে হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়না সকালের চায়ের জন্যে। আগে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে চাতকের তৃষ্ণা নিয়ে আকুল হয়ে থাকতে হত কখন রূপমের বউ ঝুমা এসে চা জলখাবার দেবে। বিয়ের আগে থেকে ঝুমার মা এবাড়ির কাজ ছেড়ে দেয়। সম্পর্কে বিয়ান বাড়ি। লোকেই বা কী বলে? ঝুমা মেয়েটা ভাল। সহজ সরল মেয়ে। ওর মায়ের কাজগুলো ধীরে ধীরে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। সেই তার মামা শ্বশুরের দেখভাল করতো। প্রথম প্রথম কালবোস আপত্তি করতেন। কিন্তু অনুপমা, মানে রূপমের মা সে আপত্তিতে আমল না দিয়ে ঝুমাকে দিয়েই সব কাজ করাতেন। সম্প্রীতি আসার পর ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ঝুমাকে দিয়ে সে আর ঝিয়ের কাজ করাতে চাইল না। যতই হোক সে ভাগনে বউ। অন্য একটা কাজের মাসি রেখেছে। সেই সব করে।

দুপুরের দিকে সম্প্রীতি ঘুমোয় না। আগে যখন সে ছবি বা সিরিয়ালে কাজ করতো, অভ্যেসটা তখন থেকেই তৈরি হয়ে গেছে। বইটই পড়ে দুপুরটা কাটিয়ে দেয়। আজও একটা উপন্যাস নিয়ে বসেছিল। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারছিল না। কদিন থেকে একটা অস্থির আকুতি তাকে ঘিরে ধরেছে। কালবোস তাকে গান শেখার ঢালাও অনুমতি দিয়ে গেছে। কিন্তু গান শেখার প্রসঙ্গ এলেই তার দিগন্তর কথা মনে পড়ে যায়। দিগন্ত সেন। তার একদা কলেজ জীবনের অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। তার থেকে সিনিয়র স্টুডেন্ট। কিন্তু ভাবটা হয়েছিল শুধু ওই গান থেকেই। কলেজ সোশ্যালে দিগন্তের গান শুনে ও নিজেই তার সঙ্গে আলাপ করে। দিগন্তর কাছে সে গান শিখতে চায়। দিগন্ত খুব কষ্ট করে লেখাপড়া চালিয়ে যেত। ওর রোজগার ছিল টিউশন। বিধবা মা ছাড়া দিগন্তর আর কেউ ছিল না। একগাদা দেনা রেখে বাবা মারা গিয়েছিলেন। ও যে এত কষ্ট করে লেখাপড়া করতো সেটা ওর মুখ দেখলে অনুমান করা যেত না। সর্বদাই হাসিখুশি। মজার মজার কথা বলে নিজের দুঃখটা চেপে রাখত। সম্প্রীতি যখন ওর কাছে গান শেখার আবদার করল, হাসতে হাসতেই জবাব দিয়েছিল আমার বাবা গলায় ক্যানসার নিয়ে মারা গিয়েছিলেন। বোধহয় খুব বেশি রকম

গানের চর্চা করতেন বলে। তোমারও কী মরার সাধ হয়েছে? সম্প্রীতি বলেছিল,—ওটা ভুল ধারণা। ক্যানসারটা হয়েছিল অন্য কারণে। গান গাওয়ার জন্যে নয়। তাহলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ গায়কের ক্যানসারে মৃত্যু হত।

দিগন্ত হার মেনে গান শেখাতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য তখনই ধরা পড়ে তার আর্থিক অবস্থা। অন্য একটা টিউশন বাদ দিয়ে সেই সময়টা সে দিত সম্প্রীতিকে। জানতে পেরে সম্প্রীতি তার সামর্থ অনুযায়ী জোর করে তার হাতে প্রতিমাসেই টাকা গুঁজে দিত।

কিন্তু সেই দিগন্তই একদিন গান গাওয়া ছেড়ে দিল। আসল কারণটা ও জানতো না। জেনেছিল পরে। দিগন্ত একটি মেয়েকে ভালবাসতো। মেয়েটি ধনী ঘরের একমাত্র মেয়ে। তাকেও দিগন্ত গান শেখাতো। আর গান শেখাতে গিয়েই দিগন্ত মেয়েটির প্রেমে পড়ে। মেয়েটিও। কিন্তু সেটা ছিল মেয়েটির প্রতারণা। বেশ কিছুদিন গান শেখার পর হঠাৎ মেয়েটি তার বাবার দৌলতে জলসায় গান গাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। দিগন্তও খুব উৎসাহ নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গত করতো। কিছুদিন পর দেখা গেল দিগন্তকে বাদ দিয়েই সে নানান জলসায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। এবং সেগুলো সব সস্তা হিন্দি চটুলগান। দিগন্ত আপত্তি করে। করলে কী হবে? মেয়েটির তখন অন্য এক বয়ফ্রেণ্ড জুটে গেছে। দিগন্তকে অস্বীকার করে সেই বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে শুরু হয় ঘোরাফেরা। তারপর, একদিন যা হবার তাই হয়। দিগন্তর সব ভালবাসাকে নস্যাৎ করে সেই ছেলেটিকেই বিয়ে করে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। যাবার সময় সৌজন্যবশত বিদায়টুকুও নিয়ে যায় না। নির্বোধ দিগন্ত অভিমানে, অপমানে গান গাওয়াটাই ছেড়ে দেয়। তারপরই মাতৃবিয়োগ। এম এ পরীক্ষাটাও দেয়নি। শেষ পর্যন্ত কলকাতা ছেড়ে সামান্য একটা কেরানির চাকরি নিয়ে অতি সাধারণভাবে দিন কাটাতে থাকে। সম্প্রীতিরও গান পর্ব সেখানেই শেষ।

তারপর অভাবনীয় ভাবে তার ফিল্মে অভিনয়ের সুযোগ আসে। সিরিয়ালেও মাথা গলিয়ে দেয়।

দিগন্তকে হয়তো ও ভুলেই যেত। কিন্তু আচম্বিতে একদিন টালিগঞ্জের পাতাল রেলের সামনে দিগন্তর সঙ্গে দেখা। সম্প্রীতি চমকে উঠেছিল। সেই ছিপছিপে প্রাণচঞ্চল হাসিখুশি ভরা ছেলেটা দাড়িগোঁফের জঙ্গলে কোথায় হারিয়ে গেছে। চেহারাটাও ভেঙেচুরে তছনছ।

একটা কথাই সেদিন সম্প্রীতি বলেছিল,—দিগন্ত, এটা কী তোমার আত্মহত্যার নতুন পদ্ধতি?

ম্লান হেসে বিনা উত্তরে সেদিন দিগন্ত চলে যাচ্ছিল। সম্প্রীতি যেতে দেয়নি। নিয়ে এসেছিল একটা রেস্তোরাঁয়।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সম্প্রীতি বলেছিল—তুমি কী আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে অন্তত একদিনের জন্যে আসতে পার?

দিগন্ত বলেছিল—কেন বলতো?

—এসোই না। এলে বুঝতে পারবে।

তারপর সম্প্রীতি তার হাতের ডায়েরির পাতায় দিগন্তর ঠিকানা লিখে নেয়। আর একটা কাগজে নিজের ফোন নাম্বারটাও দিয়ে দেয়।

এরপর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। সম্প্রীতির বিয়ে হয়ে গেছে। স্টুডিওর কাজও ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু দিগন্ত তার প্রস্তাব অনুযায়ী আর ফোনে যোগাযোগ করেনি। উপন্যাসের পাতা বন্ধ করে সম্প্রীতি সঙ্গে সঙ্গে ছোটে তার পুরনো ফ্ল্যাটে। বিয়ের পর থেকে উল্টোদিকের ফ্ল্যাটটা বন্ধই আছে। কালেভদ্রে এক একবার ঝাড় পোঁছ করার জন্যে খোলা হয়। একটা র‍্যাকে তার পুরনো দিনের সব অ্যাপয়েন্টমেন্টের ডায়েরি সাজানো ছিল। সালটা মনে করে ডায়েরিটা খুঁজে পেল। আছে। দিগন্তর ঠিকানা আছে।

সেদিন রাত্রেই কালবোসকে বলল—আমার গানের সেই শিক্ষকের ঠিকানাটা খুঁজে পেয়েছি। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে কাল বিকেলে একবার তার খোঁজে যাব?

কালবোস হেসে বললেন—সেকী কথা? তুমি যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। আমি জগদীশকে বলে দিচ্ছি। ঐ তোমাকে নিয়ে যাবে।

—জগদীশকে দরকার নেই। আমি নিজেই চলে যেতে পারব।

—কিন্তু অনেকদিন গাড়ি চালাওনি। দেখো বাবা—

কালবোসের একেবারে সামনে এসে ওর বুকে হাত রেখে সম্প্রীতি বলল, —তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না গো। তুমি ওনিয়ে চিন্তা কোর না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর খিদিরপুর অঞ্চলের একটা বস্তি অঞ্চলের মেঠো এক বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল দিগন্তর। যতটা ভেবেছিল ঠিক ততোটা দূর রাস্তায় ছিল না। দাড়ি গোঁফটা এখনও কামায়নি। তবে বেশবাসে যে জীর্ণতা ছিল সেটা এখন নেই। সম্ভবত অফিস থেকে ফিরে একটু পরিষ্কার হয়ে ছোট্ট তক্তাপোষে বালিশে হেলান দিয়ে নিজের মনে বসেছিল।

সম্প্রীতিকে দেখতে পেয়ে একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, —সম্রাজ্ঞী এসেছেন কাঙালের ঘরে? ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না।

অতিথি আপ্যায়ণের জন্যে একটা ছোট টুল ছিল। সেটা দখল করে সম্প্রীতি বলল, —হ্যাঁ সম্রাজ্ঞীই তো। গোপনে তোমার দূরবস্থা দেখতে এলাম।

—সে তো শুনেছি প্রজানুরাগী রাজারা মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে নিশি অভিযানে বেরতেন। কিন্তু তুমি তো মহারাজা নও। কর্তা ছাড়ল?

ধমকে চুপ করিয়ে দেয় সম্প্রীতি, —বাজে কথা শোনাতে বা শুনতে আমি আসিনি। তুমি আর গেলেনা ফোনও করলে না, কেন?

—কী হবে? এই তো বেশ আছি।

—না। তুমি ভাল নেই তোমার মুখ দেখেই বোঝা যায়। কে কোথায় কবে একটা মেয়ে

তোমায় ল্যাঙ্‌ মেরেছে বলে তোমার প্রতিভাটাকে তুমি খুন করে ফেলবে?

—প্রতিভা? আমার? কী যে বল? এরকম প্রতিভা ভারতবর্ষে কোটি কোটি আছে।

—চুপ করো। প্রতিভা যাদের থাকে তারা আপনিই ওঠে। তবে তার জন্যে পরিশ্রম করতে হয়। একনিষ্ঠ হতে হয় যেটা তুমি করনি। তোমার যেটুকু ছিল সেটুকুও নষ্ট করে ফেলছ। এটা একটা অপরাধ।

—তুমি কী আবার নতুন করে আমায় গ্যাস খাওয়াতে এসেছ। আর আমি গ্যাস খেয়ে উড়ন্ত বেলুন হয়ে যাব? না বাবা না, এসব আর আমার দ্বারা হবে না। গানটান আমি ভুলে গেছি। গান গাইতে গেলে সাধনার দরকার। যেটা আমার নেই। হবেও না।

—হবে। সেটাকেই আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাকে গান শেখাতে হবে। আবার নতুন করে তোমায় বাঁচতে হবে। আবার তোমায় গানের জগতে ফিরে যেতে হবে।

—বোকামি কোর না। বাড়ি যাও। তোমার স্বামী জানতে পারলে অনর্থ হবে।

—আমি তাঁর মত নিয়েই এসেছি। তিনি খুব উদারচেতা মানুষ।

—হবে না সম্প্রীতি। আর হবে না। আমি ওসব মন থেকে মুছে দিয়েছি।

—মন তো শ্লেটের লেখা নয়। মুছে দিলেই মুছে যাবে?

হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে দিগন্তর হাতে দিতে দিতে বলল, —বাড়িটাতো চেনই। তবু ঠিকানাটা রাখ। বেশি খুঁজতে হবে না।

দিগন্ত বলল, —কিন্তু সম্প্রীতি, তোমার বাড়ি আর এক প্রান্তে। যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া তো এক সপ্তাহেই আমার মাইনে শেষ করে দেবে।

—সেটা যাতে শেষ না হয় তার জন্যে তো আমি আছি।

—করুণা?

—না। যে একদিন বড় গায়ক হতে পারে, তাকে মদত দেওয়াটা করুণা নয়। বন্ধুর কাছ থেকে এটা নেওয়া যায়। তাছাড়া তুমি তো বিনিময়ে আমায় কিছু দিচ্ছ।

দিগন্তর কোন ওজর আপত্তি শোনেনি। কার্ডটা রেখে দিয়ে ও চলে এসেছিল।

ঠিক একসপ্তাহ পর দিগন্ত ফোন করল।

—কী ঠিক করলে?

—দেখি আর একবার চেষ্টা করে। মনে মনে আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি। তোমাকে শেখানোর নামে যদি আর একবার—

—তাহলে সুমতি হয়েছে। কবে আসছ?

—কবে যেতে বলছ?

—আমার স্বামী তো ঢালাও অর্ডার দিয়েছেন। আমি চাই ওঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় হোক। ও একটু ব্যস্ত মানুষ। ওর সময়টা জেনে তোমায় আমি জানিয়ে দোব। তোমার অফিসের ফোন নাম্বারটা দাও।

—লিখে নাও।

তারপর দিগন্ত এল রবিবার সন্ধে বেলা। সম্প্রীতির নিজের ফ্ল্যাটে। কালবোসও বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করাতেই কালবোস বললেন, —আরে আমি তো ভেবেছিলাম খুব গুরুগম্ভীর চেহারার কেউ একজন হবেন। এতো বাচ্চা ছেলে। মানে ঠিক মাস্টার মশাই বলে মনে হয় না। তা মাস্টারবাবু, প্রীতি তো আপনার সম্বন্ধে খুবই উচ্ছ্বসিত। প্রথমদিন কী মাস্টারবাবুর একটা গান শোনা যেতে পারে? আমি অবশ্য গানের তেমন কিছু বুঝিনা। আমার মগজে ব্যবসা ছাড়া আর কিছু নেই। তবু শুনতে ভালো লাগলে সে গানটা আমি মন দিয়েই শুনি।

সেই শুরু। গান ছেড়ে দিলেও দিগন্তের রক্তে গান ছিল। কালবোসও অভিভূত। পাকা কথা হয়ে গেল সপ্তাহে সে দুদিন আসবে। তার জন্যে মাসে দুহাজার টাকা দক্ষিা ধার্য হল। বিগলিত দিগন্ত সম্প্রীতিকে মন দিয়ে গান শেখানো শুরু করল। সম্প্রীতিও ধীরে ধীরে ডুবে গেল গানের সাধনায়।

ছয়

রূপম ভেবেছিল মামার বিয়েতে এত খাটাখাটুনির জন্যে মামার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে। ঝুমাকে বিয়ে করাটা মামার একেবারেই না-পসন্দ ছিল। বিয়ের আগে সে কোনরকম কাজকর্মই করতো না। তার কিছু অগোপণ্ড বন্ধুবান্ধব ছিল। তাদের সঙ্গে থেকে থেকে মদ খাওয়া আর জুয়া খেলাটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছিল। তারপর ঝুমার নধর শরীর আর তরতাজা যৌবন তাকে উদভ্রান্ত করে তুলল। জানতো এই নিয়ে বাড়িতে একটা অশান্তি শুরু হবে। এবং সেটা করবে কালবোস। তবু একটা ঝুঁকি নিয়ে সে ঝুমাকে বিয়ে করে নিয়েছিল। কালবোস তাড়িয়ে দিতে পারেননি। অনুপমার অনুরোধে তার অফিসে একটা ছোটখাটো চাকরি দিয়েছিলেন। খাতাপত্তর লেখার। মাইনেও নামমাত্তর।

এই মাইনেতে চলে না। কিন্তু দামি কোন চাকরি জোগাড় করার কোন যোগ্যতা তার ছিল না। তার ওপর বর্তমান বাজারে। তদুপরি ঝুমার আবদারের পরিসীমা ক্রমশ বাড়ছিল। মেয়েটা এমনিতে সহজ সরল আর বোকা বোকা। তার লোভ ছিল একটু ভাল থাকা। ভাল খাওয়া। ভাল সিনেমা দেখা। অনেকদিন থেকে একটা রঙীন টিভি কেনার বায়নাও ধরেছিল। ইচ্ছে থাকলেও রূপমের পক্ষে একটা রঙীন টিভি কেনার সামর্থ ছিল না।

আসলে ঝুমার অরিজিনটাতো একেবারে লোয়ার ডেপ্থ থেকে। অবিশ্বাস্য ভাবে সে এক পরিবেশ থেকে অন্য এক আশাতীত পরিবেশে চলে এসেছে। দিন দিন তার চাওয়ার খিদেটাও বাড়ছিল। মাঝে মাঝে সে রূপমকে একটু আধটু খোঁটা দিয়েও ফেলত। বিয়ের পর রূপম মদের মাত্রাটা অনেকটা কমিয়ে নিয়েছিল। নেশা সে করত ততটুকু যতটুকু দিয়ে

ঝুমার শরীরটা মদালসে তছনছ করা যায়। ওই অবস্থায় একদিন ঝুমা আর না বলে থাকতে পারেনি —এর থেকে যদি আমার কোন মুদিঅলা, নিদেনপক্ষে ঠেলাঅলার সঙ্গে বিয়ে হত, সে এতদিনে আমায় একটা টিভি কিনে দিত। কী হলো তোমায় বিয়ে করে?

হাল্কা ঝিমঝিম নেশায় রূপম বলতো—সামান্য একটা টিভির জন্যে তুই এত সুন্দর রাতটা নষ্ট করে দিতে চাইছিস?

—হুঁ, ওই সামান্য জিনিসটাই তো এনে দিতে পারছ না। বিয়ের আগে কত কথা। তুই যা চাইবি সব কিছু নিমেষে তোর হাতে চলে আসবে। জানিস আমার মামা কত বড়লোক। এখন কোথায় গেল তোমার সেই মামা?

—কেন? মামা তো আমায় একটা চাকরি দিয়েছে।

—ওই কটা টাকায় সংসারই চলে না। আসলে তোমার মামা তোমায় দুচোক্ষে দেখতে পারে না। নইলে বিয়েতে এত খাটলে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে। কী তার পরিণাম? এক পয়সাও তো মাইনে বাড়লো না।

কারখানা থেকে ফিরে গনগনে চোখে জানলার ধারে বসে একা একা বিড়ি ফুঁকছিল রূপম। ঝুমার ঠেস দেওয়া কথাগুলো তার মাথায় গেঁথে আছে। মামা শালা কিছুতেই তার দিকে ফিরে তাকাবে না। ভেতরের রাগটা দাপাদাপি শুরু করেছিল তার চোখে। যথারীতি চা করে এনে রূপমের লাল চোখ দেখে ঝুমা বলল, —কী হল, আজ আবার মদ গিলে এসেছো তো? আর তোমার মদ গেলা মানেই তো সারারাত তোমার অত্যাচার সহ্য করা।

রাগত চোখে একবার ঝুমার দিকে তাকিয়ে রূপম বলল, —চুপ কর। বেশি আনসান বকবি না। শুঁকে দেখ আমার মুখ। মাল খেয়েছি?

—তাহলে? কী হয়েছে তোমার? তোমার মামাকে জানতুম হুঁকোমুখো বলে। মামার কাজ করতে করতে দিন দিন তোমার মুখটাও ওই রকম হয়ে যাচ্ছে।

চিড়বিড়িয়ে উঠে রূপম,—তুই একটা মাথামোটা কাত্‌লা মাছ। ঘটে যদি কোন বুদ্ধি থাকে?

—ওমা, আমি আবার তোমার কোন পাকা ধানে মই দিলুম?

—শরীরটা কী করতে রেখেছিস? মামাকে একটু তোয়াজ করতে পারিস না?

—আগে তো করতুম। কিন্তু উনি যে এত ধোয়া তুলসি পাতা কে জানতো। তার ওপর নতুন মামি এসে—

—মামি? হুঁ। শালী ছিল স্টুডিওপাড়ার খান্‌কি। মামাকে রূপে মজিয়ে এখন হয়ে গেছেন মহারানী। তবে শালা আমার নামও রূপম দাস। আমিও দেখে নোব।

—কী দেখবে?

নিজের মনে গজরাতে গজরাতে রূপম বলল, —শালা, কত আশা ছিল বুড়ো ম্যানেজারটা রিটায়ার করলেই, মামা আমাকে ওই পোস্টে নিয়ে যাবে। দিল শালা একমন দুধে এক চামচ গোচোনা ফেলে। সব আশায় নুন জলের কুলকুচি!

—আহ্ কী হয়েছে সেটা বলবে তো?

—ওই শালা গানের মাস্টার। শাঁকচুন্নীটার হঠাৎ গান শেখার শখ হল। কোত্থেকে ধরে নিয়ে এল ওই শালা দিগন্তকে। আমি সব খবর নিয়েছি। ও ছিল শাঁকচুন্নীর বয়ফ্রেণ্ড। কলেজ লাইফে ওই ছেলেটার সঙ্গে অনেক কেলো করেছে। ছেলেটার পয়সা কড়ি ছিল না। রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছিল। কথায় আছে না পুরনো চাল ভাতে বাড়ে। ঠিক তেমনি পুরনো প্রেম গদগদিয়ে ওঠে। কেন তুই কিছু লক্ষ্য করিসনি?

—ওমা আমি আবার কী লক্ষ্য করব? মামি তো ও বাড়িতে গান শেখে।

—সাধে কী আর তোকে বলি মাথা মোটা কাত্‌লা। পাড়াশুদ্ধ সব লোক জেনে গেল। তোর গতর ছাড়া আর কিছু নেই।

—দেখ, আমার গতরের দিকে একদম নজর দেবে না।

—বেশ করব দোব। ওটা তো আমার সম্পত্তি।

—খুব হয়েছে, এখন তোমার রাগের কারণটা কী বলতো?

—ওই শালা শুয়ার কা বাচ্চা, দিগন্ত, মামু আজ তাকে নিয়ে এসে ম্যানেজারের পোস্টে বসিয়ে দিয়েছে। আমাকে টপ্‌কে।

—ও, তাই বাবুর এত রাগ? তা তার নিশ্চয়ই গুণ আছে। লেখাপড়াও সে তোমার থেকে বেশি জানে। দেখতে বেশ। তাকে দেবে নাতো কী তোমার মতো হোঁৎকাকে নেবে?

—বাজে বকিস না ঝুমা। ফের যদি ওই ছোকরার দিকে নজর দিবি তো চোখ গেলে দোব। তারপর একটু থেমে বলে, —আরে বাবা লেখাপড়া জানলেই হল? ব্যবসার ও কী বোঝে? আমি এতদিন বসে বসে কী ঘাস ছিঁড়ছি? আমি পারতুম না ম্যানেজারি করতে? আমাকে এখন ওই ছোকরার পা চাটতে হবে? কভি নেহি। আসলে সব হয়েছে ওই শাঁকচুন্নীর জন্যে? ভেড়ুয়া মামাকে একেবারে বশ করে ফেলেছে। যা আবদার করছে সব পেয়ে যাচ্ছে।

—তা যার যা কপাল।

—তোর কপালও ফোঁপড়া হয়ে যাবে যদি আমার কপাল না ফেরে।

—সে তো বুঝতেই পারছি। তা এখন তুমি কী করবে? আমার কাছে রাগ দেখিয়ে তো কোন লাভ নেই। মাগের কাছে পেগের বড়াই করে তারা যাদের কিছু করার থাকে না।

—করব। এমন কিছু করব, তুই শালী কল্পনাও করতে পারবি না।

আর একটা বিড়ি ধরিয়ে হুস হুস করে কয়েকটা টান মারল রূপম। তারপর বলল, —আমার নাম রূপম দাস। তুই শুধু দেখে যা আমি কী করি। কী করতে পারি। খালি মাঝে মাঝে যা করতে বলব কোন প্রশ্ন না করে সেই কাজগুলো করে যাবি।

—তুমি কী মামাকে খুন করবে?

—সত্যিই তোর মাথাটা কাত্‌লা মাছের মতো। এখন আর শুধু মামুকে সরালে চলবে

না। সঙ্গে মামুনি আছে। নাহ্ কবে তোর বুদ্ধি হবে? শালী ঝি কা আউলাদ। পেটে বোমা মারলেও 'ক' বেরোবে না। বুদ্ধির অষ্টরম্ভা।

—দেখ? ভালো হবে না কিন্তু।

—যা যা বেশি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিস না। যা বলি সেটাই শোন। এখন ভাদ্দর মাস। মামু তালের বড়া খেতে খুব ভালবাসে। আগে মা প্রায়ই করে খাওয়াতো। আমি তাল এনে দেবো। বড়া করবি আর একদিন অন্তর খাইয়ে যাবি। কোন দিন তালের বড়া করবি, কোনদিন পরোটা করবি। কোনদিন পায়েস করবি। কিছু বুঝলি?

—না বুঝিনি। তাছাড়া মামিমা সেগুলো খেতেই বা দেবে কেন?

—সেই জন্যেই মামুনিকে হাতে রাখা দরকার। সেটাও করবি।

—তোমার মতলবটা কী বল তো?

— বলেছি না, কোন প্রশ্ন না করে যেটা করতে বলছি সেটাই করবি।

—জানিনা বাপু, কী তোমার মতলব, বলে ঝুমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিড়িটা নিভে গিয়েছিল। আবার নতুন করে আগুন ছোঁয়াল পোড়া বিড়ির মুখে।

সাত

—তুমি বোধহয় আগের জন্মে আমার কেউ ছিলে।

হো হো করে হেসে উঠে সম্প্রীতি বলে, —তুমি এসব বিশ্বাস কর দিগন্ত? জন্ম, পরজন্ম, ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ নরক?

—আগে করতাম না। কিন্তু তুমি আমার জন্যে যা করলে, আমার অতি বড় শুভাকাঙক্ষীও তা করবে না। করতোও না।

—কী এমন করেছি, তোমার জন্যে? কলেজ জীবনে তোমার গান আমায় মুগ্ধ করতো। নিজেও একটু আধটু গান করতাম। যাকে বলে বাথরুম সং। তোমার গান শুনে মনে হয়েছিল তোমার কাছে গান শিখব। তোমাকে বলতেই তুমি নির্দ্বিধায় রাজি হয়েছিলে। এমন কী কোনদিনও টাকাপয়সার কথা তোলনি। দিতে গেলেও নাওনি। তারপর একটি মেয়ের প্রেমে পড়লে। প্রেমটা টিকলো না। তুমি হেলায় জীবনটা নষ্ট করছিলে। আমি তোমাকে বেঁচে থাকার একটা রাস্তা করে দিয়েছি। এর জন্যে জন্মজন্মান্তর টানার কোন মানে হয় না।

—গতজন্মের উদাহরণটা আমার আবেগের কথা। কিন্তু সামান্য গান শেখানোর বিনিময়ে মাসিক দুহাজার! কল্পনাও করতে পারি না। তার ওপর এই চাকরি। তোমার স্বামী ভদ্রলোক তোমায় খুব ভালবাসেন, তাই না সম্প্রীতি?

—সব মেয়েদেরই তো সেটাই কাম্য। স্বামী যেন তাকে ভালবাসে। আমার সৌভাগ্য

আমি কালবোসকে আমার স্বামী হিসেবে পেয়েছি।

—তুমি তোমার স্বামীকে কতোটা ভালবাস?

—খুব। খুউব। ওর বাইরের চেহারাটা দেখে অনেকে ওকে ভুল ভাবে। ভুল বোঝে। কেউ ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করে। কিন্তু আমি তো জানি উনি কত ভালমানুষ। আমার তো মনে হয় যে কোন মেয়ে এমন স্বামী পেলে নিজেকে ভাগ্যবতী ভাববে। অন্তত আমি তাই ভাবি।

—কিন্তু, একটা কথা বলতে গিয়েও দিগন্ত সহসা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে সম্প্রীতি। মুখ টিপে একটু হেসে ও বলল, —আমি জানি তুমি কী ভাবছ? কিন্তু দিগন্ত, আজ তোমার পুরনো সব কিছু ভুলে যাওয়া দরকার। অতীত নিয়ে হা হুতাশ করার কোন মানে হয় না। শরৎচন্দ্র দেবদাস লিখেছিলেন, যাতে আর কেউ দেবদাস না হয় সেই জন্যে। তোমাকে বড় হতে হবে দিগন্ত। বাঁচতে গেলে টাকার দরকার। সেই কারণেই আমি আমার স্বামীকে বলে তোমার আর্থিক সাশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছি। বাট এটা মনে কোরনা, আমাকে গান শেখানো, আর কালবোসের ব্যবসায়ের ম্যানেজারি করাটাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য। তোমাকে বড় গায়ক হতে হবে। যেটা ছিল তোমার জীবনের স্বপ্ন। মাঝের কটা দিন, তোমার জীবনের দুঃস্বপ্ন। সব মানুষের জীবনে বিপর্যয় আসে। যাকে বলে ব্যাড প্যাচ। আমারও এসেছিল। আমার বাবা যেদিন আমারই চোখের সামনে আমার মাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর এক মহিলাকে নিয়ে নতুন সংসার পেতেছিলেন। মাকে আমি ভেঙে পড়তে দেখিনি। সে এক বিপর্যয়ের দিন। সেটা তো আমি কাটিয়ে উঠেছি। তোমাকেও আমি সেই ভাবে দেখতে চাই।

সামান্য সময় নীরব থেকে দিগন্ত বলল—তোমার কথা আমি মনে রাখব সম্প্রীতি। তোমার মত সত্যিকার একজন বন্ধু পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। তবে কী জান, আমি তো ঘর পোড়া গরু। মাঝে মাঝে একটা ভয় আমাকে ভীষণ ভাবে তাড়া করে।

—ভয়? কিসের ভয়?

—এই যে আমি প্রায় প্রতিদিন তোমার কাছে আসছি, তোমাকে গান শেখাচ্ছি, এটা তোমার স্বামী ঠিক মতো মেনে নেবেন তো?

—এ কথার মানে?

—খুব ক্রুড় অর্থে বলা যায়, তুমি এক সুন্দরী যুবতী, আমিও এক যুবক। যদি তিনি আমাদের মেলামেশাটাকে সহজ ভাবে মেনে নিতে না পারেন। যদি কোনদিন সন্দেহ করে বসেন।

সম্প্রীতি সামান্য হাসল, বলল,—আমার স্বামীকে আমি তোমার থেকে অনেক বেশি চিনি। উনি খুব উদার চেতা মানুষ। আমাকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করেন। যে কথা তোমার মনে এসেছে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি জানি আমি আমার স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে কখনো ভালবাসিনি। ভবিষ্যতেও নয়। আমার ব্যবহারে অন্য কিছু কী কোনদিন মনে হয়েছে?

—ছিঃ সম্প্রীতি। লোকে তোমাকে কী ভাবছে না ভাবছে তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি তো জানি তুমি কী? আমি তো জানি তোমার মনের পবিত্রতা।

—ব্যস দিগন্ত। এ প্রসঙ্গে এভাবেই শেষ হোক। আমরা খুব সুন্দর বন্ধু। এটাই আমাদের সম্পর্কের মূল কথা। নাও, অনেকক্ষণ আজে বাজে বকা হোল। এবার তানপুরাটা তোল। একটু রেওয়াজ করা যাক।

—হ্যাঁ। সেই ভাল।

হঠাৎ দরজায় টক্ টক্ আওয়াজ শুনে সম্প্রীতি বলল,—কে?

বাইরে থেকে ঝুমা বলল, —মামিমা, আমি ঝুমা।

—আয় ভেতরে আয়।

ঝুমা ভেতরে এল। হাতে একটা বড়সড় বাটি।

—কী ব্যাপার? হঠাৎ তুই, এসময়ে এ বাড়িতে?

—আমি দোতলায় গেছিলুম। দেখলুম দরজায় চাবি দেওয়া। তারপর দেখলুম এবাড়িতে আলো জ্বলছে। তাই—

—হ্যাঁ। কিন্তু কেন?

—মা এটা পাঠাল।

—দিদি পাঠিয়েছেন। কী আছে ওতে?

—তালের বড়া। মামা খুব খেতে ভালবাসেন তো? তাই।

—মামা তালের বড়া খেতে ভালবাসে তুই জানলি কী করে?

—কেন, তোমার বিয়ের আগে তো মামা প্রায়ই আমার শ্বাশুড়িমাকে তালের বড়া করতে বলতেন। আর আমিই তো রোজ এসে মামাকে খাইয়ে যেতুম।

—তাই? জানতাম না। আমাকেও উনি কোনদিনও তালের বড়ার কথা বলেননি। ঠিক আছে, তুই এখন নিয়ে যা। ও বাড়িতে যাবার সময় নিয়ে নোব। দিগন্ত তুমি খাবে নাকি?

—না। আজ দুপুরে একটু মোটারকমের টিফিন খাওয়া হয়ে গেছে। অনেকদিন পর হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। দীপু। ও আবার গোয়েন্দাগিরি করে। অন্যদিন হলে খেতাম। ঝুমা, ভাই এরপরের দিন যখন করবে, একটু বেশি করে করতে বোল তোমার শ্বাশুড়িমাকে। কেমন?

ঝুমা বলল, —এ আর বেশি কথা কী? আমি কালই খাওয়াব।

দিগন্ত বলল, —কাল নয়। এরপর যেদিন আস্‌ব, সেদিন।

—এরপর কবে আসবেন?

—এই ধর সামনের রবিবার।

—ঠিক আছে। বলে ঝুমা চলে গেল।

ঝুমা চলে যাবার পর সম্প্রীতি বলল, —আচ্ছাই পাগল মেয়ে তো! ওবাড়ি থেকে

তালের বড়া বয়ে নিয়ে এসেছে।

—মেয়েটি বেশ সরল। সাধাসিধে।

—হ্যাঁ। কিন্তু পড়েছে এক ভূতের পাল্লায়।

আট

হাতে কোন কাজটাজ না থাকলে নীল যাহোক একটা বই নিয়ে বসে পড়ে। নন্দিনী আসে সন্ধে ছটার পর। দীপুও সাইকেল হাউস নিয়ে ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। অবশ্য বিকাশ তালুকদার মাঝে মধ্যে এসে গেঁজিয়ে যান। ইদানীং পুলিসের কাজকর্ম একটু বেড়েছে। চারদিকে যে পরিমাণে খুন জখম আর ধর্ষণ বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পুলিসের তৎপরতা বাড়বেই। প্রাইভেট গোয়েন্দাদের বর্তমানে হালও বেশ খারাপ। রোমহর্ষক খুন খারাপিগুলো পুলিস নিজের হাতেই তুলে নিচ্ছে। তাদের গোয়েন্দাবাহিনী মাথা ঘামাচ্ছে সে সব নিয়ে।

এই তো সেদিন, সল্টলেক থেকে একটা মেয়েকে তার গাড়ি থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল কয়েকটা ছেলে। মুক্তিপণ দাবি করে টাকা পেয়ে মেয়েটাকে ছেড়েও দিল। কিন্তু পুলিস আর গোয়েন্দাদের তৎপরতায় তাদের অধিকাংশই মূল পাণ্ডা সমেত দু তিনদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল। এর মধ্যে তাদের দলের একজন খুনও হয়ে যায়। সব থেকে বড় কথা পুলিস পুরো টাকাটাই উদ্ধার করেছে। কেস কোর্টে তোলা হয়েছে।

অর্থাৎ কলকাতা পুলিস চেষ্টা করলে অনেক অসাধ্য সাধনই করতে পারে। কিন্তু ঘুণটা ধরে গেছে আগাপাছতলায়। বহু কেস পুলিস কোর্টে তুললেও সমস্যার শেষ হয়না। কোথায় যে কলকাঠি নড়ে ওঠে। বিচারক পাল্টে যায়। পাবলিক প্রসিকিউটর নাম উইথড্র করার তাল খোঁজেন একটা বাহানা দিয়ে। একটা নেটওয়ার্ক চলছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। অদৃশ্য জাল। চোখে দেখা যায় না। কিন্তু কাজগুলো টের পাওয়া যায়।

এসব ব্যাপার নীল জানে। কিন্তু কিছু করার নেই। একটা টোটাল অবক্ষয় চারদিক থেকে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ধরেছে। সমাজের দুর্নীতিগুলোও কখন যেন গা সওয়া হয়ে গেছে। নীল জানে তার একার ভাবনা চিন্তায় কোন লাভ নেই। তার হাত পা বাঁধা। অগত্যা বইটই পড়ে সময় কাটানো ভাল।

নন্দিনী আজ ফিরতে একটু দেরি করছে। ফোনে জানিয়েও দিয়েছে একটা দরকারি কাজে সে আটকে পড়েছে। ফিরতে সামান্য রাত হবে। নীল যেন তার জন্যে অযথা চিন্তা না করে।

সাতটা নাগাদ দীপু ফিরে এল। সোফায় বসেই একটা সিগারেট ধরাল।

—গুরু, বউদি এখনো ফেরেনি?

—নাহ্। আসতে একটু দেরি হবে। চিন্তা নেই। গাড়ি আছে সঙ্গে।

—আজ একটা মজার ব্যাপার ঘটল।

বই থেকে মুখ না তুলেই নীল বলল, —আছিস ভাল। মজা পাওয়া ব্যাপারটা আজকাল খুবই দুর্লভ। আর সেটাই তুই যখন তখন পেয়ে যাস। তোকে ভাগ্যবান বলা যায়।

—আবার কথার প্যাঁচ ঝাড়ছ? আগে ব্যাপারটা শোন।

—বলে যা শুনছি। তবে বেশি ফ্যাটাস না।

—আজ ডালহাউসির দিকে দুপুরবেলা গিয়েছিলাম পেমেন্টের তাগাদায়। অনেকদিন ধরে লোকটা ঘোরাচ্ছে। তো ওখান থেকে বেরিয়ে রাধাবাজারের কাছ বরাবর এসেছি, বাস ধরব বলে, হঠাৎ পিঠে চাপড়।

—কথাগুলো কিন্তু আরও সংক্ষেপে বলা যেত।

—আহ্ আগে শোনোই না। ইন্টারেস্ট পাবে। পেছন ফিরে দেখি দিগন্ত। দিগন্ত সেন। চেনো তো?

—না, নীলের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মুখে একটা চুকচুক শব্দ করে দীপু বলল, —আরে বাবা ওর কথা তোমায় বলেছিলাম। ভুলে গেছ। আমরা এক কলেজেই পড়তাম। আমি ওর থেকে সিনিয়র ছিলাম। আমি তো ক্লাসে মস্তানি করতাম। কিন্তু দিগন্ত ছিল খুব ট্যালেন্টেড ছেলে। গানটা দারুণ গাইত।

—লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

—ঠিক আছে। সংক্ষেপেই বলছি। ছেলেটা একটা মেয়েকে ভালবেসে ল্যাঙ খেয়ে গান ফান ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর আর ওর সঙ্গে দেখা টেখা হয়নি।

—বেশ। এদ্দিন পরে দেখা হল। এটা কী ঘটা করে দেবার মতো সংবাদ?

—ইয়েস গুরু। এটাই তো আসল কথা। ইদানীং ও ওর এক বান্ধবীকে গান শেখাচ্ছে। এবং তার অফিসে ঢুকেই ম্যানেজার হয়ে গেছে।

—এটাও দেবার মতো খবর নয়।

—কিন্তু সেই স্বামীটির নাম কালবোস।

এবার নীল দীপুর দিকে তাকাল। তারপর বলল—কালবোসের বউ? ওই মহিলাই তো আগে টিভিতে অভিনয় করতেন। আমরা তো ওদের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো ব্যাপারটা তোমায় বললাম।

—কেন বললি?

—ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে হয়তো কিছু নয়। কিন্তু দুটো কারণে মনটা খচ্‌খচ্ করছে।

—যেমন?

—কালবোসের চেহারাটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। তার বয়েসটাও স্মরণে আছে। এবং তাঁর স্ত্রী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেন। এবং বিয়ে করেন। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু সেই পরমাসুন্দরী অল্প বয়স্কা বধূটি, একজন অল্পবয়স্ক যুবককে কেন

গানের মাস্টার করলেন?

—এটা ভাবার মতো কোন ধারালো পয়েন্ট নয়। নিশ্চয় কালবোসবাবু জেনেশুনেই রেখেছেন। এবং তাকে ম্যানেজারের পোস্টে চাকরি দিয়েছেন।

—তুমি বলছ এটা নিয়ে ভাবার কিছু নেই। ভাল কথা। কিন্তু দিগন্তর অফিসের কেউ একজন ওর পেছনে লেগেছে এবং ওঁর নামে মালিকের কাছে চুক্‌লি খাচ্ছে।

—তাতে তোর মাথাব্যথা কেন? দিগন্ত অ্যাডাল্ট ছেলে। হয়তো তোর থেকে এক আধ বছরের ছোট। সে নিশ্চয় তার অবস্থা সামাল দিতে পারবে।

—কে জানে। কিন্তু ওকে একটু চিন্তাচ্ছন্ন দেখলাম। নতুন চাকরি। যদি চলে যায়?

—তোর কাছে কী কোন পরামর্শ চেয়েছে? নাকি ওর চাকরি চলে গেলে তুই কিছু করতে পারবি?

—না। তেমন কিছু নয়। এমনিতে দিলখোলা হাসিখুশি মার্কা ছেলে। কিন্তু কোথায় যেন একটা, কী বলব, মানে—

—কে পেছনে লাগছে সে রকম কোন ইঙ্গিত কী দিয়েছে?

—না। সেটাই ও বুঝতে পারছে না। অবশ্য আমার ফোন নাম্বার আর ঠিকানা নিয়ে রেখেছে।

—ঠিক আছে। দরকার পড়লে নিশ্চয়ই ফোন করবে। আজ যে বেরোলি, টাকাকড়ি কালেক্ট করেছিস?

—ছ্যাঁচড়া পার্টি। কিছু দিয়েছে। আবার ঘুরতে হবে।

ইতিমধ্যে নন্দিনী অফিস থেকে ফিরে এল। নীলের সঙ্গে দু একটা কথাবার্তা বলেই ওপরে যাবার সময় বলে গেল, —দীপু, দাদার সঙ্গে কথা হয়ে গেলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।

দীপু আরও কিছুক্ষণ গোঁত্তা খেয়ে বসে রইল। নীল একমনে বই পড়ে যাচ্ছে। ওঠার মুখে দীপু জিগ্যেস করল, —এরপর কালবোসকে খোঁচা দেবে নাকি?

আড়চোখে একবার দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল,—নীল ব্যানার্জি কি এতোটাই ফালতু হয়ে গেছে বলে তোর মনে হচ্ছে?

—আরে গুরু সে কথা নয়। আসলে, বলেই থেমে গিয়ে বলল,—তোমার সঙ্গে থেকে থেকে আমার মনটাও কেমন সন্দেহবাতিক হয়ে গেছে। দ্যূর শালা। আমার কী? আমি ওপরে যাচ্ছি।

দীপু চলে গেল। নীল আবার খোলাপাতায় চোখ রাখতে গিয়ে ভাবল, ক্ষণিকের ভাবনা, তবু ভাবল—দীপুর ভাবনাটা কী সত্যই অলীক? উড়িয়ে দেবার মতো? কে জানে!

নয়

আজ বিশ্বকর্মা পুজো। বিশ্বকর্মা পুজোটা কালবোসের কারখানায় বেশ ধূমধাম করেই হয়। নতুন রেলমন্ত্রী আসার পর তাদের কারখানার কাজও বেড়েছে। রেলমন্ত্রীর হুকুম যে সমস্ত বগি নষ্ট হয়ে পড়ে আছে কারশেডে সেগুলো অবিলম্বে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলতে হবে। তাছাড়া সামনেই আসছে পূজো। পুজোয় ভ্রমণার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে অতিরিক্ত বগির ব্যবস্থা করতে হয়। পুরোদমে কাজ চলছে। এর মধ্যেই পড়ে গেছে বিশ্বকর্মা পূজো। প্রতিবারেই কালবোস পুজার সময় কারখনায় হাজির থাকবেনই। কিন্তু সপ্তাহখানেক হল শরীরটা তার ভাল যাচ্ছেনা। প্রেসারটা ফ্লাকচুয়েট করছে। সর্বদাই একটা গা বমি ভাব। বেশি চলাফেরা করলে মাথা ঘুরে যায়। ডাক্তারের নির্দেশে তাই কমপ্লীট্ বেড রেস্ট।

কদিনেই কাজপাগল মানুষটা হাঁপিয়ে উঠেছেন। কিন্তু ডাক্তার ছাড়াও সম্প্রীতির কড়া হুকুম এখন কোন মতেই কোন টেনশন নয়, কোন দৌড়ঝাঁপ নয়। যে কদিন কালবোস শয্যাবন্দী সে কদিন সম্প্রীতি একবার করে কারখানাটা ঘুরে আসে। তাছাড়া ওখানে দিগন্তও আছে।

কালবোস শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন, দিগন্ত ছেলেটা খুবই কাজের ছেলে। গুণী ছেলে। কোন ব্যাপার একবার বলে দিলে ব্যস নিশ্চিন্ত। এ ব্যাপারেও তিনি সম্প্রীতির কাছে মনে মনে কৃতজ্ঞ। ও একরকম জোর করেই দিগন্তকে কাজে নেওয়াতে বাধ্য করেছিল। কাজ না জানা, বা অভিজ্ঞতা না থাকার জন্যে কালবোস প্রথমে একটু ইতস্তত করেছিলেন বটে, কিন্তু কাজে দেবার পর দেখলেন, ঠিক লোককেই ঠিক জায়গায় দিয়েছেন। রূপম, তার ভাগনে হলেও তার ওপর কোন বিশ্বাস নেই। ছেলেটা মহাফাঁকিবাজ। তার ওপর সর্দারি করার প্রবণতা। হাতটানের ব্যাপারটাও রয়ে গেছে।

একটা ব্যাপারে কালবোসের একটু খুঁতখুঁতুনি ছিল। কাজের চাপের জন্যে বেশ কিছুদিন সম্প্রীতির গান শেখাটা মুলতুবি রয়েছে। দিগন্ত আসতে পারছে না। আর দিগন্ত না এলে সম্প্রীতিরও কেমন একটা ছাড়াছাড়া ভাব।

অসুস্থ অবস্থাতেই কালবোস একদিন বলেছিলেন, —দেখো দিকি, আমার জন্যে তোমায় কতটা অসুবিধের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

সম্প্রীতি একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিল, —তোমার জন্যে আমার অসুবিধা? তার মানে?

—তোমার নিয়মিত গান শেখাটা হচ্ছে না।

—আমি কী পেশাদার গায়িকা হবার জন্যে গান শিখছি? এটা আমার কাছে টাইমপাস। আসলে আমি চাই দিগন্ত আবার গানের জগতে ফিরে আসুক। ওকে আমি প্রতিষ্ঠা দিতে চাই। এটা আমার কাছে কী রকম একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—অর্থাৎ তুমি ওকে দাঁড় করাবেই? কিন্তু চাকরি করলে কী গানের চর্চা তেমন ভাবে হবে?

—কিছু না হওয়ার চেয়ে কিছু হওয়াটাও তো কিছু। দেখি না ও কতটা এগোতে পারে। আমার দিক দিয়ে চেষ্টার ক্রুটি হবে না। তাছাড়া তুমি যদি সাহায্য করতে যাও সেটা ও নেবে না। তার চেয়ে নিজের আয়ের টাকায় যতটা পারে করুক।

—ছেলেটা ভাগ্যবান। তোমার মতো একজন বন্ধু পাওয়া কী চাট্টিখানি কথা? অবশ্য সেই সেঙ্গে আমিও। তোমার মত বউ পাওয়া। সেটাও কী কম ভাগ্যের?

সম্প্রীতি একটু রহস্যময় হাসি হেসে সেদিন চলে গিয়েছিল ওর কাজে।

জানলার দিকে তাকিয়ে কালবোস অনেক কিছুই ভাবছিলেন। হঠাৎ রূপম আর তার বউ ঝুমা এসে হাজির। কালবোসের ভ্রূটা সামান্য কোঁচকালো। রূপমের দিকে তাকিয়ে বললেন, —রূপম, তুমি আজ কারখানায় যাওনি? এখনও বাড়িতে? তারওপর আজ বিশ্বকর্মা পুজো। কত লোককে ইনভাইট করা হয়েছে।

রূপম হাত কচলাতে কচলাতে বলল, —মামু, তুমি কিছু চিন্তা কোর না তো। সকালে আমি একবার গিয়ে সব দেখেশুনে এসেছি। পুজো, রান্নাবান্না সব স্মুথ্‌লি চলছে। তাছাড়া দিগন্ত তো আছেই। ও একাই একশো। আমরা কেউ না থাকলেও আপনি জানবেন যতক্ষণ দিগন্ত আছে ওই সব ঠিকঠাক চালিয়ে নিয়ে যাবে। দিগন্তকে তুমি কোত্থেকে খুঁজে বার করলে বল তো?

— কেন বল তো? তোমার কী দিগন্তকে নিয়ে কোন অসুবিধা হচ্ছে?

—আরে রামোঃ রাম, এ সব কী বলছ? তাহলে এতক্ষণ আমি ওর সম্বন্ধে কী বললুম। ছেলেটা ভাল। কাজের ছেলে। তাছাড়া সম্প্রীতি মামিও তো সেখানে আছে। ও তুমি কিছু চিন্তা কোর না।

—ঠিক আছে। কালবোস লোক চিনতে ভুল করে না। আর ওকে একটু সমীহ করে চলবে। প্রথমত ও আমার স্ত্রীর বন্ধু ও গানের টিউটর। তাছাড়া, আমি ঠিক করেই নিয়েছি, ওকে পুজোর পর থেকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নোব। আমি না থাকলে ওই সব দেখা শুনো করবে।

—তাই নাকি মামু? এতো দারুণ খবর। আহ্, আমি যদি মামির মতো একটা বন্ধু পেতুম! আমার জীবনটাই পাল্টে যেত।

—ঠিক আছে। তা তোমাদের দুজনের হঠাৎ আগমনের হেতুটি কী?

ঝুমা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কালবোসকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। এবার এগিয়ে এসে বলল, —আজ তো বিশ্বকর্মা পুজো। আজ তোমার জন্যে কী এনেছি বলতো মামু?

—তুই তো রোজই কিছু না কিছু নিয়ে আনছিস। হঠাৎ তোর এত মামুপ্রীতি জেগে উঠল কেন?

—কেন মামু, তোমার বিয়ের আগে কী তোমার সেবা যত্ন করিনি?

—আজ কী এনেছিস সেটাই বল?

—তালগুড়ের পায়েস। তুমি তো খুব ভালবাস।

—ডাক্তার আমায় বেশি মিষ্টি খেতে বারণ করেছে। সেটা জানিস?

—ও ডাক্তাররা কত কিছুই মানা করে। সব মানলে তো না খেয়েই রুগী মরে যাবে। তুমি খাওতো। কিস্‌স্যু হবে না।

—পাকা বুড়ি হয়ে গেছিস। দে। আমার আবার তালের প্রতি এত দুর্বলতা। তাড়াতাড়ি দে, তোর মামি এসে গেলেই বিপদ।

ঝুমা তাড়াতাড়ি পায়েসের বাটিটা এগিয়ে দিল। কালবোস খেতে শুরু করলেন। খেতে খেতেই রূপমকে বললেন, —এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই ফাঁকি দেওয়াটা না ছাড়লে কোনদিনও তোর উন্নতি হবে না।

—যাচ্ছি। মামু, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। মানে, বলব কিনা ভরসা পাচ্ছি না। মানে, মামি যদি আবার কিছু মনে করে?

—কী এমন কথা যে সেটা শুনলে মামি কিছু মনে করবে?

—না, আসলে দিগন্তকে নিয়েই কথাটা। দিগন্ত আবার মামির অনেকদিনের পুরনো বন্ধু তো—

—তো? যা বলার ধানাই পানাই না করে সোজাসুজি বল।

—বলছিলুম কি, ঝুমা তুমিই বল না।

ঝুমা ফিক্ করে হেসে বলল, —ও সেই কথাটা? জানো মামাদাদাবাবু—

কথার মাঝেই প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন কালবোস, —ওটা আবার কী ধরনের সম্বোধন? যখন ঝি ছিলি তখন দাদাবাবু বলতিস কিছু মনে হতো না। এখন তো আর তা নস।

রূপম একবার কটমটিয়ে কালবোসের দিকে তাকাল। তারপর স্বাভাবিক হয়ে বলল, —ঠিকই তো! মামুতো ঠিক বলেছে। তুই কি এ বাড়ির ঝি নাকি?

অধৈর্য হয়ে কালবোস বললেন,—মোদ্দা কথাটা কী সেটা তাড়াতাড়ি বলে ফেলতো বাপু। আমার আবার একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

—হ্যাঁ মামু, আমিই বলছি। ও কাত্‌লা মাছের মুড়ো দিয়ে আসল কথায় আসতেই তিন ঘন্টা লেগে যাবে। বলছিলুম কী, বৈশালী তো দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল।

—মানুষ পৃথিবীতে আসে দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবার জন্যে। সেটা কোন নতুন কথা নয়। বৈশালীটা কে?

—দেখছ ঝুমা? মামুর কাণ্ডটা? বৈশালী মানে আমাদের বুড়ি গো।

—ও তোর বোন। ওর ভাল নাম বুঝি বৈশালী। তা সে তো বেশ ভাল মেয়ে। এম. এ না কী যেন পড়ছে?

—হ্যাঁ। তুমি তো ওকে বি.এ পাশের পর এম.এ তে পড়তে বললে। বললে খরচ পাতির কথা চিন্তা করিস না।

—তা তার প্রবলেমটা কী?

—প্রবলেম তার নয়। প্রবলেম আমাদের। সোমত্ত মেয়ে বাড়িতে থাকলে চিন্তা হয় না।

—ভাবিস এসব? ভালো। তা এ ব্যাপারে আমার যা কর্তব্য নিশ্চয়ই করব। ছেলে দেখেছিস?

—সেই কথাই তো বলছি। আচ্ছা এই দিগন্ত ছেলেটাতো বেশ ভালো ছেলে। আমাদের বৈশালীও খুব ভালো মেয়ে। দেখতে শুনতে, সে আর তোমায় নতুন করে কী বলব! যদি—

সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন কালবোস। তারপর বললেন,—ম্যাচিং ইজ গুড। কিন্তু এ ব্যাপারে তোর মামির সঙ্গে কথা না বলে আমি কিছু বলতে পারছি না।

—মামির তো এতে অরাজি হবার কথা নয়। অবশ্য যদি—

—অবশ্য যদি, মানে?

—নাহ্ থাক, সেসব কথা। তা তুমি কী একটু সিরিয়াসলি চিন্তা করবে?

—বললাম তো এ ব্যাপারে তোর মামির কথাই শেষ কথা। ঠিক আছে, তোরা এখন যা। পরে কথা হবে। আমি শুচ্ছি। ঝুমা চাদরটা একটু টেনে দেতো।

ওরা বেরিয়ে যাচ্ছিল। শুয়ে শুয়েই কালবোস বললেন,—আজ বিশ্বকর্মা পুজো। লেবারদের তো মোচ্ছবের দিন। দিগন্তকে বলে দিস, ওরা যেন বেশি মদটদ খেয়ে বেলেল্লাপনা না করে। আর তুমিও একটু রয়ে সয়ে খাবে।

—আমি তো মামু বিয়ের পর ওসব ছাইভস্ম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

—তাই পরশুদিন রাতে তোর ঘর থেকে ঝুমার চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, দরজা বন্ধ করে এখন বেরো।

দশ

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হেলতে দুলতে কারখানায় হাজির হল রূপম। ততক্ষণে পুজোটুজো শেষ। অতিথি অভ্যাগত যাঁরা এসেছিলেন খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারা চলে গেছেন। আসলে নেমন্তন্নর ব্যাপারটা বিকেলের আগেই শেষ হয়ে যায়। দিগন্তর ফেরার উপায় নেই। ওকে চারদিকেই নজর রাখতে হচ্ছে। গতবার নাকি বিশ্বকর্মা পুজোর হই হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে কিছু মালপত্র চুরি হয়ে গিয়েছিল। এবার পুজোর আগেই গুদোম ঘরে বেশির ভাগ জিনিস পত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাবি দিগন্ত নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। ইতিমধ্যে লেবাররা দলে দলে ভাগ হয়ে তাসের আসর বসিয়েছে। তাস মানেই জুয়োর আসর। সঙ্গে ঢালাও মদ আর মাংস। এমনিতে কালবোসের কড়া হুকুম, কারখানার

মধ্যে কেউ মদ্যপান করবে না। লেবাররা সে কথা মেনে চলে। মাত্র এই একটা দিনই তারা কালবোসের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু একটা কথাই তিনি বলে দিয়েছিলেন, একদিনের জন্যে তাদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, তবে সেটা যেন লিমিটের মধ্যে থাকে। কেউ মদ খেয়ে কোন বেলেল্লাপনা করলে তার চাকরিটা সেদিনই যাবে।

অফিস ঘরে বসে দিগন্ত আর সম্প্রীতি দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছিল। তারপর কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে সামান্য গল্পগাছা করে সম্প্রীতি বাড়ি চলে যায়। কিছুক্ষণ পুজোর জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার পর দিগন্ত অফিস ঘরে চলে আসে। সম্প্রীতি যাবার আগে দিগন্তকে বলে গিয়েছিল লেবারদের দিকে যেন সে কড়া নজর রাখে। সম্প্রীতিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ও কিছুক্ষণ পুজো মণ্ডপের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। আসলে এই মদ আর তাসের আসর পাহারা দিতে তার মোটেও ভাল লাগছিল না। রূপম তখনও গিয়ে পৌঁছয়নি। লেবারদের মধ্যে সব থেকে সিনিয়ার ইয়াসিন মল্লিক। লোকটা একটু টেঁটিয়া টাইপ। কথাবার্তাও রুক্ষ। তবু ও ইয়াসমিনকেই একটু সামলাতে বলে অফিস ঘরে চলে এসেছিল। সময় কাটানার জন্যে অফিসেরই একটা ফাইল নিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করল। রাত আটটার আগে কারখানা বন্ধ করা যাবে না। তার ওপর সন্ধেপুজো আছে। সব মিটিয়ে কারখানা বন্ধ করে পুরো চাবির গোছা পৌঁছে দিতে হবে কালবোসের বাড়িতে। রূপমের হাতে যেন কোনমতেই চাবির গোছা না দেওয়া হয়। এটাই কালবোসের হুকুম।

দেখতে দেখতে সন্ধে ছটা বাজল। পুরুতমশাই এসে পুজোটুজো সেরে ফিরে গেলেন। রূপম তখনও ওখানেই ছিল। সেও মদের আসরে জমে গিয়েছিল। পুরুতঠাকুর চলে যাবার পর ও একবার রূপমকে ডেকে বলল—এবার তো বন্ধ করে দিলেই হয়।

প্রায় আঁতকে উঠে রূপম বলে—এখুনি? আটটার আগে তো কারখানা বন্ধ করাই যাবে না। মামুর সেই রকমই নির্দেশ। বলা যায় না আমন্ত্রিত কেউ এসেও যেতে পারে। তুমি এক কাজ করো, অফিস ঘরে গিয়ে বোস, আমি আসছি। বুঝতে পারছি, এসব তোমার ভাল লাগছে না। কিন্তু কী আর করা? এই তো একটা দিন।

কিছুক্ষণ পর রূপম এল। তখন প্রায় সাতটা বাজে। তার হাতে একটা না-খোলা হুইস্কির বোতল আর সাদা জলের বোতল। কথা বার্তা ঈষৎ জড়ানো। আচার আচরণে বেশ বোঝা যায় ইতিমধ্যে বেশ কিছু তরল পদার্থ তার পেটে পড়েছে।

সামনের চেয়ারটা আর একটু টেনে এনে বস্‌ল একেবারে দিগন্তর সামনে। সাধারণত এটা সে করে না। মোটামুটি একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে। অবশ্য কোনদিনও সে দিগন্তকে ম্যানেজার হিসাবে পাত্তা দেয়নি। দিগন্তও সেটা বেশ বুঝতে পারে। এটাও বুঝতে পারে তার বিরুদ্ধে লেবারদের মাঝে মাঝে তাতায়। এ নিয়ে সে কারো কাছে কোনদিন নালিশ করেনি। কিন্তু রূপমকে সে এড়িয়েই চলে। রূপমের ইগোটা সে বুঝতে পারে। সম্পূর্ণ বাইরের

লোক হয়ে মামার ভাগ্নেকে টপ্‌কে ম্যানেজার হয়ে বসা। এটা যে কেউই ঈর্ষার চোখে দেখবে। হঠাৎ ওকে ওই অবস্থায় একেবারে সামনে এসে বসতে দেখে দিগন্ত বলে,
—কী ব্যাপার রূপমদা, তুমি কী এখানেও আসর বসাবে নাকি?

নেশাসক্ত চোখে একবার দিগন্তর দিকে তাকিয়ে রূপম বলে, —এখন কিন্তু দিগন্তবাবু, তুমি আমার বস্‌ নও। আজকের দিনে কেউ আমরা কারো বস্‌ নই। সবাই সমান। তা তুমি কী মদ্যপান করনা? বুকে হাত দিয়ে বল, কোনদিন ছিটেফোঁটাও গলায় ঢালোনি?

কী বলবে দিগন্ত? অলকা চলে যাবার পর তার দিন আর রাত কেটেছে সুরাপান করে। তাকে কেউ বাধা দেবার ছিল না। গান টান ছেড়ে দিয়ে তখন তার দিওয়ানা অবস্থা। খাদ্য যতটা খেয়েছে বোতল শেষ করেছে তার তিনগুণ। সেন্টিমেন্টাল ছেলে। ভেবেছিল মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ভুলে যাবে অলকাকে। ভোলা যায় নি। জ্ঞান ফিরলেই অলকার স্মৃতি। তার হাসিমাখা মুখ আর প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি। এখন ভাবে দিগন্ত। সেদিন যদি টালিগঞ্জ স্টেশনের সামনে সম্প্রীতির সঙ্গে দেখা না হত তাহলে আজ তাকে মদই খেয়ে ফেলত।

—কী ভায়া? কী ভাবছ বলতো?

ততক্ষণে রূপমের দুটো গ্লাস তৈরি হয়ে গেছে। চট্‌কা ভেঙে দিগন্ত বলে,—না, রূপমদা, মদ কোনদিন খাইনি একথা বলব না। তবে মদ খাওয়া এখন ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া অফিসঘরে বসে মদ খাওয়া বোস সাহেব একেবারেই পছন্দ করবেন না। আরও একটা কথা, আমি যদি মদ খেয়ে বেহেড হয়ে যাই, আর ওরা যদি মত্ত হয়ে কারখানীর মধ্যে মাতলামি শুরু করে দেয় বোসসাহেবের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

ফুৎকারে সেকথা উড়িয়ে দিয়ে রূপম বলে, —তুমি ভীষণ ভীতু আছ মাইরি। এখন কে দেখতে আসছে যে তুমি অফিস ঘরে বসে মালের গেলাসে চুমুক মারছ? নাও নাও, আমার অনারে, বেশ অনারের কথা বাদ দাও, আমাকে কেই বা আর অনার দেয়, নিজের মামাই যখন দিল না! কিন্তু পরবের দিনে একটু আধটু খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

তবু দিগন্ত বলে— থাকনা রূপমদা। মদ আমি অনেক খেয়েছি। ওটা কোন বাহাদুরির ব্যাপার নয়। কিন্তু ডিসিপ্লিনটা আমি ব্রেক করতে চাইনা।

—এটা কী তোমার মনিবানীর হুকুম?

—তুমি সম্প্রীতির কথা বলছ?

—ও, তুমি আমাদের মালকিনের নাম ধরে ডাক বুঝি। তা ভাল। বান্ধবী বলে কথা। তা তিনি কী বকবেন? এক গেলাস মদ খেলে? নাকি পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার চাকরিটা চলে যাবার ভয়?

—না, ওসব ভয় আমার নেই। আর মদ খেলে অশুদ্ধ হয়ে যাব তেমন কোন প্রেজুডিস সম্প্রীতিরও নেই।

—ব্যস, ব্যস। তাহলে শুরু কর। কালবোস জানলেও তোমার সাত খুন মাপ। আরে বাবা, মালকিন তোমার দিকে আছে না? তাহলে শুরু কর। নাও তোল। আমার অনেক কষ্টের নেশাটি ছুট হয়ে যাচ্ছে। তুমি মাইরি এত কাপুরুষ সেটা আমি জানতুম না। সামান্য একটা মহিলার ভয়ে—

ব্যাপারটা দিগন্তর ইগোয় লাগার মতো হয়ে দাঁড়াল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে অন্য গ্লাসটা তুলে নিল।

—হ্যাঁ, এই তো হচ্ছে মরদকা হিম্মত। চীয়ার্স।

প্রথমে এক গ্লাস। নাছোড়বান্দা রূপমের চাপে আরও দু গ্লাস। এরপর আর অনুরোধ করতে হল না। কারণ, মদ কোন মানুষকে প্রথমে খায় না। কিন্তু যেই মুহূর্তে ক্লিক্ করে তখন কেউ না বললেও নিজেই সে নিজের গ্লাস ভর্তি করে নেয়। দিগন্তও তাই করল। কিছুক্ষণ পরে একেবারে আত্মহারা। নেশার ঘোরে তার মনে কেবল সম্প্রীতির কথা। শুরু করল তার প্রশস্তি গাওয়া। কত কী করেছে সে তার জন্যে। এ ঋণ সে জীবনেও শোধ করতে পারবে না। নেশার ঘোরে একসময় বলেও ফেলল, এমন একজন মহিলাকে যদি জীবনসাথী হিসেবে পেতাম, তাহলে জীবনের মানেটাই পাল্টে যেত—

মদ একটি জিনিস পেটে পড়লেই মগজের লুকনো কথা হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসে। অ্যালকোহলিক অ্যাডভানটেজে সে বুক ঝেড়ে মনের কথা বলে।

দিগন্তব যখন তুরীয় অবস্থা, রূপম কিন্তু তখন মাতাল নয়। মাতাল হওয়াতো তার উদ্দেশ্য নয়। তার মনে আছে অন্য কথা। অন্য কিছু। চট্ করে সে দিগন্তর শেষের কথাগুলো লুফে নিল, বলল—কি জান দিগন্তবাবু, এ ব্যাপারটা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।

জড়ানো গলায় দিগন্ত জিগ্যেস করল,—কোন্ ব্যাপারটা?

—ওই যে একটু আগে বললে আমার মামুনি সঙ্গে তোমার একটা অ্যাফেয়ার্স ছিল। মানে যাকে বলে ছোটবেলার প্রেম। তা কী কখনও ভোলা যায়? আর সত্যিই তো, এতে তো মামুনিকেও কোন দোষ দেওয়া যায় না। নামেও কালবোস। দেখতেও কালবোস। তোর কী ওরকম সুন্দরী বউ মানায়? তুমি ঠিক পথেই এগোচ্ছ। তারপর মামুর কাছে আমি যে কথাটা শুনলুম,—

—কী কথা?

—তোমাকে তো মামু অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিচ্ছে। তারপর মামুকে একদিন—

—কী একদিন?

—তুমি মাইরি একেবারেই গবেট। বুঝলে না, একেবারে রাজত্ব আর রাজকন্যা...

নেশা হলেও জাগতিক জ্ঞান নিশ্চয়ই ছিল, তাই দিগন্ত বলল, —নো, রূপমদা, এসব কথা তুমি কিন্তু আর কোনদিনও আমায় বলবে না। কালবোস স্যারকে আমি ভগবানের মতো মনে করি, আর সম্প্রীতি,

—তোমার ভগবতী, তাই তো? ঠিক আছে বাবা, ও কথা থাক। আমি তোমায় আর একটা প্রোপজাল দিতে পারি। যোগ্য সহধর্মিনী। স্বভাবচরিত্রে মেয়েটা খুব ভাল। এম এ পড়ছে। যদি বল তাহলে, একটা ব্যবস্থা করি, আসলে সে আমার বোন, বৈশালী—

সজোরে মাথা নাড়তে নাড়তে দিগন্ত বলল— নো রূপমদা, আমার পক্ষে আর কাউকেই বিয়ে করা সম্ভব নয়। আমি বেশ আছি।

—না, না, আমি তোমাকে কোনরকম জোর করছি না। তবে নিজের বোন বলে বলছি না, বৈশালী কিন্তু খুব ভাল মেয়ে। তোমাদের দুটিকে বেশ ভাল মানাতো।

—বৈশালী দেবী নিশ্চয়ই ভাল মেয়ে। কিন্তু আমি এসব কথা কোনদিন ভাবিনি। ভাবতেও চাই না। প্লীজ—

ঠিক তখনই খুট করে একটা শব্দ হল। রূপম তৈরিই ছিল। চোখ চলে গেল দরজায়। উঁকি দিচ্ছে একটা মুখ। ইয়াসিন। দুজনের চোখে চোখে কিছু কথা হয়ে গেল। ইয়াসিন ঘাড় নেড়ে চলে গেল। রূপম বলল, —ঠিক আছে দিগন্তবাবু, এটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার। তোমার ইচ্ছে না হলে কেনই বা বিয়ে করবে—

রূপমের কথা তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ কারখানার ভেতর থেকে ভেসে এল দুমদাম আওয়াজ। জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি, আর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ।

নেশাসক্ত মাথা তুলে দিগন্ত জিগ্যেস করল, —রূপমদা, কী হচ্ছে ওখানে?

—তুমি বোস, এ অবস্থায় ওখানে যেতে হবে না। আমি দেখছি। এ শালার লেবারদের নিয়ে আর পারা যায় না। পেটে মাল পড়লে—

নিমেষে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রূপম। ক্রমাগত গোলমালটা যেন বেড়েই চলল। দিগন্ত আর বসে থাকতে পারল না। তার মনে পড়ে গেল কালবোস সাহেবের কথা। তার ওপর ভার দিয়েছিলেন সব কিছু শান্তিতে মিটে যাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখার। যাবার সময় সম্প্রীতিও বারবার বলে গিয়েছিল।

উঠে পড়ল দিগন্ত। আর বসে থাকা যায় না। পা টলছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সেখানে যাওয়া দরকার।

দরজা খুলে দিগন্ত হতভম্ব। এ সব কী হচ্ছে এখানে? যেন দক্ষযজ্ঞ। পাঁচ ছজন মিলে নিজেদের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি আর গালিগালাজ করে চলেছে। রূপমকেও দেখা গেল। সে একপাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে থামতে বলছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? এরই মধ্যে লেগে গেল মারামারি। এদের মধ্যে ইয়াসিনের গায়ের জোর সম্ভবত বেশি। সে একজনকে এক ঘুষিতে শুইয়ে দিল। ব্যস, আর যায় কোথায়? বাকিরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইয়াসিনের ওপর। তারই মধ্যে একজন, হ্যাঁ দিগন্ত স্পষ্ট দেখতে পেল, মদের একটা খালি বোতল লোহার রডের ওপর সজোরে আঘাত করে আধখানা করে ফেলেছে। তারপর ছুঁচলো মুখ অস্ত্রটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ইয়াসিনের দিকে।

এরপরই ব্যাপারটা খুনোখুনির জায়গায় পৌঁছবে। দিগন্তর মাথা থেকে তখন নেশা ফিকে হতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব মদ্যপ লোকগুলো রাগের মাথায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সে ছুটে গেল রণোন্মত্ত লোকগুলোর দিকে। এই মুহূর্তে ওদের থামানো দরকার। নইলে চরম বিপর্যয় অনিবার্য।

ওদের সামনে গিয়ে দিগন্ত চিৎকার করে উঠল, —তোমরা সব কী আরম্ভ করেছ? থামো, থামো এখুনি। নইলে প্রত্যেকের নামে রিপোর্ট যাবে—

হঠাৎ ইয়াসিন চেঁচিয়ে উঠল,—আবে যা যা, মালিককা চামচা কাঁহিকা। ভাগ এখান থেকে। অফিস ঘরে বসে মাল সাঁটাচ্ছিস, তাই সাঁটা। আমাদের নিজেদের ঝগড়ার মধ্যে মাথা গলাতে আসবি না।

একে নেশার ঘোর, তার মধ্যে এই ধরনের অপমানজনক কথা। দিগন্ত আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে ইয়াসিনের কলার চেপে ধরে বলল, —কী? কী বললে তুমি?

মাত্র এক লহমা। ইয়াসিন লম্বা চওড়া চেহারার পাট্টাই লোক। এক ঘুষিতে সে দিগন্তকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। ইতিমধ্যে যে লোকটির হাতে ধরা ছিল ভাঙা বোতল সে ছুটে এসেছে ইয়াসিনের দিকে। তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। দিগন্ত শুনতে পেল একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ।

রূপম একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে যেন সব কিছু দেখে যাচ্ছিল। এই যুদ্ধে তার ভূমিকা নীরব দর্শকের। স্পষ্ট দেখল, যে লোকটা ভাঙা বোতল নিয়ে ছুটে এসেছিল, সেই মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। তারই অস্ত্র তারই পেটে আমূল গেঁথে আছে।

রূপম ঝটিতি টুল থেকে নেমে এসে ইয়াসিনের কানে কানে বলল, —ইয়াসিন, পালা এখান থেকে। এখুনি পুলিস আসবে।

জামার রক্ত মুছতে মুছতে ইয়াসিন নিমেষে কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অন্যান্য লেবাররাও যুদ্ধ ভুলে যে যার রণে ভঙ্গ দিয়েছে। নিমেষে কারখানা ফাঁকা। ঘটনাস্থলে পড়ে আছে কেবল, মরণাপন্ন শ্রমিকটি আর দিগন্ত। তার মাথায় বেশ চোট লেগেছিল। ঠোঁটটাও ফেটে গেছে। রক্ত পড়ছিল। হাঁটু দুমড়ে সে শুয়ে আছে। তার নেশা ছুট্। রূপম কাছে এসে বলল, —স্যার, এবার কী হবে?

এখন আর রূপম দিগন্তকে দিগন্তবাবু বলে ডাকল না। কারণ সে বুঝেই গেছে ঘটনা অন্য দিকে মোড় নেওয়া শুরু করেছে। সে আবার ডাকল, —স্যার, উঠুন, আপনার কী খুব লেগেছে?

দিগন্ত আস্তে আস্তে মাথা তুলে বলল, —ওই লোকটাকে দেখ। আমি পুলিসে খবর দিচ্ছি।

—স্যার পুলিসে খবর দেওয়ার আগে একবার মামুকে খবর দিলে হত না?

কালবোসের কথা মনে করাতেই দিগন্ত মনে মনে কেঁপে উঠল। কী জবাব দেবে সে? তারই ওপর তো ভাল ছিল সব কিছু সুষ্ঠভাবে মেটানোর। কেন যে সে মরতে মদ খেতে গেল?

—কী ভাবছেন স্যার? যা হোক একটা কিছু করুন। যাদব যদি মরে তাহলে তো কেলেঙ্কারী হবে।

—আমার মাথায় কিছু আসছে না রূপমদা। তুমি যা হোক কিছু কর।

—না স্যার, এভাবে আপনার ভেঙে পড়লে চলবে না। যাদব আস্তে আস্তে কেমন নেতিয়ে পড়ছে। চলুন কয়েকটা জায়গায় এখুনি টেলিফোন করা দরকরা।

যথারীতি পুলিস এল। হাসপাতালের গাড়িও এল। পুলিস যাদবকে পরীক্ষা করে দেখল সে এখনও বেঁচে আছে। তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পুলিস যখন দিগন্তকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে, তারই ফাঁকে রূপম ফোন করল বাড়িতে। ফোন ধরলেন কালবোস, —কী? কী হয়েছে বললে?

—মামু, খুব সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।

—সেটা তো বুঝলাম। ঘটনাটা কী?

—যাদব মার্ডার হয়ে গেছে।

—তার মানে?

—আসলে ওরা মদ খেয়ে হইহল্লা করছিল। তার মধ্যেই বচসা। মারপিঠ। এরই মধ্যে কে একজন যাদবের পেটে মদের ভাঙা বোতল ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—কে? লোকটা কে?

—তাতো বলতে পারব না মামু। সবাই তো ওই দেখে পালিয়ে গেছে।

—দিগন্ত কোথায়?

—না না মামু, ওর কোন দোষ নেই। ও তো ছাড়াতেই গিয়েছিল।

—দিগন্ত এখন কোথায়?

—পুলিস জেরা করছে।

—পুলিস চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা কারখানা বন্ধ করে আমার বাড়ি চলে আসবে।

—ঠিক আছে।

—যাদব বাঁচবে তো?

—বলা শক্ত। পুরো বোতলটাই পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। ওকে মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—রাবিশ।

এগারো

রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। কালাচাঁদ পতিতুণ্ডি লেনের বাড়িতে তখন চারজন বসে আছে। কালবোস, সম্প্রীতি, দিগন্ত আর অনুপমা দেবী। দিগন্ত এক কোণে একটা চেয়ারে মাথা নীচু করে বসে আছে। তার গা দিয়ে তখনও মদের গন্ধ ছাড়ছে। অবশ্য নেশার আর কিছু বাকি নেই। ইয়াসিনের এক ঘুষিতে তার ঠোঁট ফুলে গেছে। রক্ত পড়াটা বন্ধ হয়ে গেছে। জামায় তখনও রক্তের দাগ।

কালবোস জিগ্যেস করলেন—তোমার জামায় রক্তটা এলো কোত্থেকে?

কোনমতে আমতা আমতা করে দিগন্ত উত্তর দিল,—ইয়াসিনকে ছাড়াতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ও একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারল। ঠোঁটে এসে লাগতেই—

—ওষুধ, ওষুধ কিছু দিয়েছ?

কোন উত্তর না দিয়ে কেবল মাথাটা নীচু করে বসে থাকে।

—প্রীতি, দেখতো ওখানে মারকিউরোক্রোম আছে কিনা। থাকলে একটু লাগিয়ে দাও।

সম্প্রীতি ওষুধ আনতে চলে যায়। কালবোস বললেন—দিদি, তোমার গুণধর ছেলেটি কোথায়? আমি যে বললাম কারখানা বন্ধ করেই চলে আসতে।

অনুপমা বললেন, —সেটাই তো ভাবছি। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। তার আবার কোথায় যাবার দরকার পড়ল কে জানে।

কালবোস বললেন, —দিগন্ত তুমি জান রূপম কোথায়?

—আজ্ঞে, রূপমদাতো বলল একবার মেডিকেলে খবর নিয়ে আসবে।

—হসপিটালে গিয়ে ওর লাভ কী? ও কী ডাক্তার নাকি? খবর নেবার সে তো কাল সকালে নিলেই চলবে।

তারপর দিগন্তের দিকে ফিরে বললেন, — নো দিগন্ত, ইটস্ আ ডিসক্রেডিট অন য়োর পার্ট। তোমার ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। আর শেষে কিনা এই কাণ্ড। এখন লোকটা যদি মরে যায়, কী সিচুয়েশন দাঁড়াবে বুঝতে পারছ?

ইতিমধ্যে সম্প্রীতি তুলোয় করে মারকিউরোক্রোম ভিজিয়ে এনে দিগন্তর ঠোঁটে লাগিয়ে দিল। তারপর বলল, —অযথা ওকে দুষছ কেন? দেখছ তো ও নিজেই মার খেয়ে বসে আছে।

অধৈর্য হয়ে কালবোস বললেন, —ওকে বলব না তো কাকে বলব? কয়েকটা লেবারকে সামলাতে পারে না?

এমন সময় রূপম এসে হাজির। শেষ কথাটা ওর কানে গিয়েছিল, ও বলল, —লেবারদের ঠিকঠাক সামলে রাখা কী সহজকাম মামু? জানোই তো পেটে মদ পড়লে কারোরই কাণ্ডজ্ঞান থাকেনা।

—তাই বলে খুনোখুনি? তুমি কী করছিলে? মদের আসর গরম করছিলে? আর দিগন্তর এতদূর স্পর্ধা, সেও ওদের সঙ্গে বসে মদ খেতে শুরু করে দিল?

—না না, মামু, দিগন্ত তো ওদের সঙ্গে বসে মদ খায়নি।

—তাহলে কোথায় বসে মদ খাওয়া হয়েছিল?

মাথা চুলকে রূপম বলে, —সে রকম কিছু নয়। পরবের দিন। তাই একটু অফিস ঘরে। আসলে দিগন্তের পক্ষে তো লেবারদের সঙ্গে বসে মদ খাওয়াটা শোভন নয়।

—তুমি জানো, অফিস ঘর হচ্ছে আমার লক্ষ্মীর স্থান। ওখানে কোনদিন মদ ঢোকেনি। দিগন্ত তুমি কী জবাব দেবে? এ কথাটাতো তোমার জানা ছিল।

দিগন্তকে নীরব থাকতে দেখে কথা ধরে নেয় রূপম, —হ্যাঁ মামু, বড় ভুল কাজ করা হয়ে গেছে। আসলে দিগন্তের বয়সটাতো কম। ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে ও ঠিক বুঝতে পারেনি।

—তুমি তো ধেড়ে পাঁঠা। তুমি বারণ করতে পারনি?

—খুব অন্যায় হয়ে গেছে মামু। আর কোনদিনও হবে না।

—তুমি তো হসপিট্যালে গিয়েছিলে? যাদব কেমন আছে?

—কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। ইমারজেন্সীতে বলল, ওটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মুখটা ব্যাজার করে কালবোস বললেন,—দেখ, এখন কী হয়? সব দোষ তোমার, দিগন্ত, আমি তোমায় বলছি, শুনতে পাচ্ছ?

দিগন্ত নীরব।

—মামু,

—কী তখন থেকে মামু মামু করছ? কী বলতে চাইছ তুমি?

—দিগন্তকে তুমি অযথা দুষছ। আচ্ছা ও কী করতে পারে বলত? ষণ্ডামার্কা চেহারার সব লোক। মদ খেয়ে তারা মারামারি করলে দিগন্তর পক্ষে কী ছাড়ানো সম্ভব? তা ওতো ছাড়াতেও গিয়েছিল। মুখের অবস্থাটা কি হয়েছে দেখ।

—ওর অন্যমনস্কতার জন্যেই ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন, ইরেসপন্সেবল্ কোথাকার। কোথায় আমি ওর অন্য সম্বন্ধে কথা ভাবছিলাম। ওকে আমি আমার ডানহাত করে নিতে চেয়েছিলাম।

হঠাৎ সম্প্রীতি বলে উঠল, —ঠিক আছে, এখন এসব আলোচনা করে কী লাভ? একটা ভুল ও করে ফেলেছে। আর ভুল তো মানুষ মাত্রেই হয়।

—নো, নো সম্প্রীতি, যে ভুলের সঙ্গে আমার কারবারের ভালমন্দ জড়িত, সেটাকে অন্য কিছুর দোহাই পেড়ে আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। কাল থেকে আমি আবার বেরবো। আর দিগন্ত তুমি এখন অসুস্থ। কদিনের জন্যে ছুটি নাও। কালই আমায় একবার বটতলা থানায় যেতে হবে। দেখি কদ্দুরের জল কোথায় গিয়ে থামে। তোমরা এখন এসো। প্রীতি, আমায়

একটা ট্যাঙ্কুইলাইজার দাও। টেনশন হলেই আমার শরীর খারাপ হতে আরম্ভ করে। যাও, দিদি, শুয়ে পড়োগে।

বারো

ফোনের আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল কালবোসের। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গতরাতে তাঁর কারখানায় একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেছে। সামনের দেওয়াল ঘড়িতে চোখ পড়ে গেল। সাড়ে আটটা। ফোনটা তখনও বেজেই যাচ্ছে। ফোন তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল অসীমবাবুর গলা। অসীম ঘোষাল তাঁর ক্যাসিয়ার। কালবোস বললেন,—হ্যাঁ, অসীমবাবু বলুন কী হয়েছে?

ওপাশ থেকে অসীমবাবু বললেন,—স্যার, খুব ঝামেলার ব্যাপার হয়ে গেছে। কারখানার লোকেরা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত যাদবের খুনের ফয়সালা হয় ততক্ষণ তারা কোন কাজে জয়েন করবে না। রাস্তা ভিড়ে ভিড়। আমি জানি স্যার আপনি অসুস্থ্। অ্যাটলীস্ট আপনি দিগন্তবাবুকে পাঠিয়ে দিন। আমি একা তো সামলাতে পারছি না।

—যাদব মারা গেছে? কখন?

—সে তো কাল রাত্রেই মারা গেছে। হসপিট্যালে নিয়ে যেতে যেতেই।

—তবে যে রূপম বলল—

—কী স্যার?

—নাহ্ কিছু না। ঠিক আছে আপনি বরং থানায় একটা খবর দিন। আমি এক্ষুনি আসছি।

—দিগন্তবাবু এলেও হয়ে যেত। উনিও তো এখনও এলেন না।

—কারো দরকার নেই। আমি আসছি। কিন্তু কাল যখন মারামারি হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

—ছটা নাগাদ পুরুতঠাকুর পুজো করে চলে গেলেন। আমিও ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। জানেনই তো স্যার, আমার ওসব মদ্যপান চলে না। হার্ট পেশেন্ট।

ফোন ছেড়ে দিয়ে কয়েক মিনিট থম্ মেরে বসে রইলেন কালবোস। একটু পরেই ভার ভার মুখে চা নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল সম্প্রীতি।

—খুব সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে প্রীতি।

—আবার কী হল?

—যাদব কাল অন দ্য ওয়ে মারা গেছে।

—সে কী? রূপম যে বলল ওকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—সেটাই তো আমায় কনফিউশনে ফেলে দিচ্ছে। ওদিকে কারখানার লোকেরা ঝামেলা শুরু করে দিয়েছে। নাহ্ আর কারবার রাখা যাবে না। রেলের আঠারোটা বগির কাজ চলছে। পুজোর আগেই সব রেডি করে ফেলতে হবে। এর মধ্যে—

—সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি অত দুশ্চিন্তা কোর না তো। তার ওপর তোমার কিছু একটা হয়ে গেলে, এর মধ্যে অযথা তুমি দিগন্তকে বসিয়ে দিলে। ও থাকলে এই সময় তোমায় কত হেল্প করতে পারতো।

—না। তুমি ওর কথা আমায় বলবে না। আমি একাই যা পারব করব।

আধঘণ্টার মধ্যে স্নানটান সেরে কালবোস বেরিয়ে গেলেন। দেখা গেল রূপম আগেই এসে গেছে। কারখানার দুএকজন লোকের সঙ্গে ও যেন কিছু কথাবার্তা বলছিল। কালবোস গাড়ি থেকে নামতেই সবাই এসে কালবোসকে ছেঁকে ধরল। অবশ্য চেঁচামেচিটা সামান্য কমল।

কালবোস সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,— তোমরা অযথা চেঁচামেচি করছ কেন? গতকাল রাত্রে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এবং সেটা তোমাদের নিজেদের বচসার জন্যেই ঘটেছে। ঠিক আছে, তোমাদের মধ্যে দু একজন আমার সঙ্গে এস।

কথায় কাজ হল। লেবাররা চেঁচামেচি থামাল বটে। কিন্তু কেউ আর কাজে গেল না। ওইখানেই ধর্না দেওয়ার ভঙ্গীতে বসে রইল।

কালাচাঁদ আর হরিপদ নামে দুজন পুরনো কারিগর কালবোসের পেছন পেছন এসে অফিসে ঢুকল। ওদের মুখে পুরো ঘটনাটা শোনার পর কালবোস বললেন, —তাহলে তোমরাই বল, এর মধ্যে কোম্পানির দোষটা কোথায়? উৎসবের দিনে তোমরা একটু আধটু মদ্যপান কর। আমি তেমন করে তোমাদের বারণ করি না। তোমরা নিজেদের মধ্যে মারমারি করবে, একজন তার মধ্যে খুন হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই তার জন্যে আমি দায়ি নই।

কালাচাঁদ বলল, —কিন্তু স্যার যাদব তো মারা গেল। আর নতুন ম্যানেজারবাবুর সামনেই। আগের ম্যানেজারবাবু থাকলে এরকম ঘটনা কখনোই ঘটতো না। নতুন ম্যানেজারবাবু, তিনি কোথায় ঝগড়া থামাবেন তা নয় উনি এসে ইয়াসিনের কলার চেপে ধরলেন। তাতেই তো আরও ইয়াসিনের রোক বেড়ে গেল।

—যাদবকে মেরেছিল কে?

—যাদবের একটু নেশা হয়ে গিয়েছিল। ওরই হাতে ছিল ওই ভাঙা বোতলটা। ইয়াসিন রাগের মাথায় ওটাই ওর পেটে ঢুকিয়ে দেয়।

—ইয়াসিন কোথায়?

—আসেনি স্যার। তবে থানা থেকে দারোগাবাবু পুলিস পাঠিয়েছিলেন। তারাও ইয়াসিনের খোঁজ করছে।

—ঠিক আছে। আমি থানায় খোঁজ খবর নিচ্ছি। তার আগে তোমরা কাজে যাও।

সবাইকে বুঝিয়ে বল, যাদবের মৃত্যুর জন্য কোম্পানির মালিক দায়ি নয়। তাছাড়া তোমরা নিজেরাই তো জানো একসঙ্গে আঠারোটা বগির কাজ চলছে। কাজ বন্ধ করে দিলে তো সবই ডুবে যাবে। ওদিকে কারশেডের বগি মেরামতি ঠিক মতো চলছে?

—স্যার, তারা তো ক্যাজুয়াল লেবার। তারা ঠিক কাজে এসে যাবে। কিন্তু স্যার, যাদবের ছেলেমেয়ে আছে। বউ আছে। তাদের কী হবে?

—সে যাহোক একটা কিছু ব্যাবস্থা হবে। তাছাড়া ওর নামে তো ইনসিওর করা আছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডও আছে। ছেলেমেয়েরা না খেতে পেয়ে মরবে না। আমার দিক থেকে যতদূর যা পারি করব।

—ঠিক আছে স্যার। আপনি বলছেন, আমরা কাজে যাচ্ছি। কিন্তু দেখবেন স্যার, যাদবের পরিবার যেন ভেসে না যায়।

—বললাম তো দেখব। বডি ছেড়ে দিয়েছে?

—না স্যার। ও সব কাটাছেঁড়া হবে। পেতে পেতে রাত হয়ে যাবে।

—আমি অসীমবাবুকে বলে দিচ্ছি। তোমাদের শ্মশান খরচ টরচগুলো ওর কাছ থেকেই নিয়ে নিও।

ঘটনাটা হয়তো এখানেই মিটে যেতো। কিন্তু মিটল না। বেলা একটা নাগাদ থানা থেকে ফোন এল। ইয়াসিনকে খুঁজতে গিয়ে ইয়াসিনের ডেডবডি পাওয়া গেছে ওর ঘর থেকে। আরও দুঃসংবাদ, ইয়াসিনের ঘরেই পাওয়া গেছে একটা রক্তমাখা রুমাল। যার গায়ে ইংরেজি ডি অক্ষরটা সবুজ রঙের সুতো দিয়ে লেখা আছে। কারখানার কোন লোক যেন বাইরে না যায়। পুলিস এখুনি যাচ্ছে তদন্ত করতে।

কালবোস কোন কথা বলারই সুযোগ পেলেন না। তার আগেই ফোন কেটে গেল।

মাথায় হাত চেপে অনেকক্ষণ বসে রইলেন কালবোস। যাদবকে মেরেছে ইয়াসিন। এটা সবাই জানে। কিন্তু ইয়াসিনকে মারল কে? একটা রুমাল পাওয়া গেছে রক্তমাখা। রুমালে এক কোণে 'ডি' লেখা। এই 'ডি'টা কে? দিগন্ত? কালবোসের মাথা তখন চক্কর খাচ্ছে। বিপদ মুহূর্তে মানুষের সবার আগে মনে পড়ে নিকটতম মানুষটিকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডায়াল করা শুরু করলেন। ওপাশ থেকে সম্প্রীতি ফোন তুলে বলল—হ্যাঁ গো, কি হল? সব মিটে গেছে তো?

—না। আরও সর্বনেশে ব্যাপার ঘটেছে। ইয়াসিনকে কে যেন খুন করেছে। আর ওর ঘর থেকে একটা রক্তমাখা রুমাল পাওয়া গেছে। রুমালের এক কোণে সুতো দিয়ে স্টীচ্ করা আছে একটা লেটার। লেটারটা হল ইংরেজির 'ডি'।

সম্প্রীতি কালবোসের থেকে অনেক সাহসী মেয়ে। ও বলল, —তা এনিয়ে তোমার গলা শুকিয়ে যাবার কী হল? তোমার নামের আদি অক্ষর কী ডি?

—কিন্তু দিগন্তর আদ্যাক্ষর তো ডি।

—সে ভাবনাটা পুলিসের। তোমার নয়।

—আমি কী একবার আমার ল-ইয়ারের সঙ্গে কথা বলব?

—তারা তো আরও প্যাঁচাবে। আর তোমার পকেট হাল্কা করবে। পুলিস কী বলে না বলে আগে সেটাই দেখ। উকিলের ব্যাপার এখনই ভাবার দরকার নেই। আচ্ছা তোমার কে একজন গোয়েন্দা বন্ধু ছিল।

—গোয়েন্দা বন্ধু? না, না, বন্ধু ঠিক নয়। তবে আলাপ হয়েছিল। নীল ব্যানার্জি।

—তাঁকেই একবার ফোন কর না। তবে তোমায় আমি একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি। রুমালে 'ডি' অক্ষরটা লেখা থাকলেও দিগন্ত কাউকে খুন করতে পারে না। পুলিস ব্যাপারটাকে গোল মেলে করে দিতে পারে। আমার মনে হয় তোমার ওই নীলবাবুকে একটু তদন্ত করতে বল। এ সব ব্যাপারে এঁরা অনেক রিলায়েবল।

তেরো

সবে নীল খেতে বসেছে, সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বেজে উঠল, বাঁ হাতে রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে কালবোস বলে উঠলেন, —ব্যানার্জিদা বলছেন?

—হ্যাঁ। আপনি?

—অধমের নামটা কী আপনার স্মরণে আছে? আমি কালবোস।

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। কিন্তু আপনার প্রবলেম তো সল্‌ভ্ হয়ে গেছে।

—আপনাদের আশীর্বাদে সে প্রবলেম সল্‌ভ্ হয়ে গেছে তা তো আপনি ভালো করেই জানেন। কিন্তু এবার যে আরও বড়ো প্রবলেমে পড়েছি।

—আপনার স্ত্রীকে নিয়ে কিছু?

—না না। আমার স্ত্রীরত্নটি সত্যিই একটি রত্ন। সে ব্যাপারে আমি অতীব সুখী। কিন্তু—

—হ্যাঁ বলুন।

—দাদার কী একবার আসার সময় হবে?

—ব্যাপারটা যদি একটু হিন্টস্ দিতেন।

—এত কথা তো ফোনে হবে না। আপনার সময়ের মূল্য আমি দোব। যদি অনুগ্রহ করে একবার আসেন। আমি নিজেই যেতে পারতাম। কিন্তু এদিকের অবস্থা—

—বুঝেছি। কখন যেতে বলছেন?

—পারলে আজই। এবং সেটি আমার কারখানায়।

—আপনি এখন কোথা থেকে বলছেন?

—আমার কারখানার অফিস থেকে। মানিকতলা থেকে একটু এগিয়েই। বাঁদিকের ফুটে। ...নাম্বার সার্কুলার রোড। এখন হয়েছে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড। কে.বি.ওয়ার্কশপ।

—ঠিক আছে। আমি আসছি।

চারটে নাগাদ নীল গিয়ে পৌঁছল কে.বি. ওয়ার্কশপে। ঢুকতেই দেখল অনেকগুলো লোক নানরকম কাজকর্মে ব্যস্ত। একদিকে কিছু লোহার ফ্রেমের কাজকর্ম চলছে। আর একদিকে পাতলা পাতলা গদী বানানোর কাজ হচ্ছে। নীল গিয়ে ঢুকতেই রূপম এগিয়ে এল। ওর এখন কাজ লোকজনকে অ্যাটেন্ড করা। পার্টির সঙ্গে কথা বলা। দিগন্ত না থাকায় ওর কাজ কিছু বেড়েছে। নীলকে দেখে জিগ্যেস করল,—বলুন স্যার. কী করতে পারি?

—কালবোসবাবু আছেন?

—হ্যাঁ আছেন। আপনিই কী মিস্টার ব্যানার্জি?

—হ্যাঁ।

—আসুন আমার সঙ্গে। মামু আপনার কথা বলে রেখেছেন।

—কালবোসবাবু কী আপনার মামা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমি ওনার একমাত্র ভাগ্নে। আপনি আসুন।

ছোটখাট অফিস ঘর। কিন্তু বেশ সাজানো। এসি চলছে। কালবোস চেয়ারে বসেই ঘুমচ্ছেন। মাথাটা ঝুলে পড়েছে। রূপম একটু গলা তুলে ডাকল, —মামু উনি এসেছেন।

লাল লাল চোখ মেলে তাকিয়েই সেই ভুবনমোহিনী হাসি—আসুন দাদা আসুন। একটু ঝিমুনি এসেছিল। ইদানীং শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। তার ওপর এই সব ঝামেলা। বসুন দাদা। রূপম দাদার জন্যে খুব ভালো করে চা তৈরি কর। আর, সিঙারা, অমৃত্তি, মোড়ের দোকান থেকে। একদম গরম—

—আমি কিন্তু খেয়েই বেরিয়েছি।

—না খেয়ে কেউ বাড়ি থেকে বের হয় না। তাও এই দুপুর রোদে। ও সব না টা আমি শুনছি না। যাও, যা বললাম তাই কর।

নীল সামনের চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। তারপর প্রথমেই জিগ্যেস করল, —অবেলায় ঘুমচ্ছেন কেন? এটা তো আপনার মতো লোকের অভ্যেস হওয়া উচিত নয়।

—কি জানি দাদা। কিছুদিন হল দেখছি সারাক্ষণ একটা ড্রাউজি ব্যাপার চলছে। এরকম কোনদিনই ছিল না। কী জানি হয়তো বয়সটা বাড়ছে বলে হতে পারে।

—না। আপনার বয়স বড় জোর বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ। আমার থেকে আপনি বয়েসে বেশ ছোট।

—বিয়াল্লিশ।

—অতএব আপনি এখন যুবক। সুগারটা টেস্ট করিয়েছেন?

—হ্যাঁ। সুগার ঠিক আছে। তবে প্রেসারটা হাই হয়ে গেছে। সর্বদা মাথার মধ্যে একটা ভার ভার ব্যাপার। রোজ একটা করে প্রেসারের ওষুধ তো খেয়েই যাচ্ছি। যাকগে ছেড়ে দিন ওসব কথা। এখন যে জন্যে আপনাকে ডেকেছি সেটাই বলি।

এরপর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন থেকে শুরু করে ইয়াসিন খুন পর্যন্ত সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে বললেন, —এবার বলুন দাদা এই গেরো থেকে কী করে উদ্ধার পাব?

নীল বলল—কিন্তু এর মধ্যে আপনার গেরোটা কোথায়? আপনার ওয়ার্কশপে একজন খুন হয়েছে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে। এবং যে খুন করে সেই খুন হয়েছে তার নিজের ঘরে। এতে আপনি কী করতে পারেন? যা কিছু করার সে তো পুলিসই করবে। এতে তো আপনার জড়িয়ে পড়ার ব্যাপার নেই।

—কিন্তু ওই 'ডি' লেখা রুমাল? ডি দিয়ে আমার এখানে দুজন আছে। একজন দেবেন মারিক। লোকটা কাঠের কাজ করে। আর একজন দিগন্ত সেন। যার কথা আগেই বলেছি।

—দিগন্ত? নামটা শোনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ মনে পড়েছে। দীপুর পরিচিত। বোধহয় ওরা একই কলেজে পড়তো।

—তা হবে। কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই বিশ্বাস করেন না যে দিগন্ত কাউকে খুন করতে পারে।

—কিন্তু দিগন্তর ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর ইন্টারেস্ট কেন?

—আপনাকে বলা হয়নি। দিগন্ত আমার স্ত্রীর সঙ্গে একই কলেজে পড়ত। তখন থেকেই বন্ধুত্ব। তার ওপর ও আমার স্ত্রীকে গান শেখায়। প্র্যাকটিক্যালি আমি ওকে এখানে চাকরি দিই আমার স্ত্রীর অনুরোধেই।

—ছেলেটি কেমন?

—খুবই কর্মঠ ছেলে। খুবই সিনসিয়ার। কিছুদিন টুকটাক কাজ করার পর ওকে আমি ম্যানেজারের পোস্টে নিয়ে এসেছিলাম।

—এটাও কী আপনার স্ত্রীর অনুরোধে?

—ঠিক তা নয়। আমার পুরনো ম্যানেজার। অনেক বয়স হয়েছিল। কর্মক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে দীনেশবাবু রিটায়ার করেন।

—কী নাম বললেন? দীনেশ। মানে এখানেও আদ্যাক্ষর 'ডি'।

—আরে ছি ছি। দীনেশদা আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি। প্রায় পঁয়ষট্টি ছেষট্টি বছর বয়স। তার পক্ষে ইয়াসিনকে খুন করা সম্ভব নয়।

—বেশ। তারপর?

—দীনেশবাবু চলে যাবার পর ওই পোস্টে আমি নিয়ে আসি দিগন্তকে। ওর কাজে সন্তুষ্ট হয়েই।

—দিগন্ত এখন কোথায়?

—ওকে ওর কর্মে গাফিলতির জন্যে আমি কিছুদিনের জন্যে সাসপেণ্ড করেছি। সে রাত্রে যদি ও সজাগ থাকতো, তার ওপর আমার এই অফিসঘরে বসে মদ্যপান, এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারিনি।

—আপনার স্ত্রী এই সাসপেনশনের জন্যে কিছু বলেননি?

—হ্যাঁ, বলেছিলেন। লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়ে যাচ্ছে এমন কথাও বলেছিলেন। কিন্তু আমার একটা প্রিন্সিপ্যাল আছে। সেটা আমি বরাবর মেইনটেন করি।

—আপনি এখন কী চাইছেন?

—দুটো জিনিস। প্রথম কথা কে ইয়াসিনকে খুন করল? 'ডি' লেখা রুমালটা কার? সত্যিই কী দিগন্ত এর মধ্যে ইনভলভ্ড্? কারণ এর ওপর আমার ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং নির্ভর করছে।

—হুঁ

খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে নিজের ভ্রূতে আঙুল চালাতে চালাতে নীল জিগ্যেস করল, —দিগন্ত কেন খুন করবে এ ব্যাপারে আপনি কিছু ভেবেছেন? অর্থাৎ দিগন্তর মোটিভটা কী?

—একটাই মোটিভ হতে পারে, তার আগের দিন মানে বিশ্বকর্মা পূজোর রাতে ইয়াসিন যা তা ভাষায় দিগন্তকে গালিগালাজ করে এবং পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে সে দিগন্তকে ঘুষি মেরে তার ঠোঁট ফাটিয়ে দেয়। এবং সেটা ঘটেছে লেবারদের সামনেই। হয়তো সেই রাগ থেকে হতে পারে।

—দিগন্ত কী খুব রগচটা ছেলে?

—না। একেবারেই না। শান্ত, ভদ্র ছেলে। যার জন্যে আমি ভেবেছিলুম ওকে আমার কোম্পানিতে সেকেণ্ড ম্যান করে নোব।

—এ কথাটা কী আর কাউকে বলেছিলেন? মানে আর কে কে জানে?

—আমার স্ত্রী জানেন। আর একদিন রাগের মাথায় আমার ভাগনেকে বলেছিলাম।

—ভাগনে মানে রূপম?

—হ্যাঁ।

—রূপম তো আপনার ভাগ্‌নে। তা ওকে ছেড়ে একজন আউটসাইডারকে আপনার ডেপুটি করার কারণ?

—ওটি একটি অপদার্থ। ফাঁকিবাজ। সুযোগ পেলেই হাতটানের রোগ আছে। সে তো আপনাকে প্রথম দিনই বলেছিলাম। যম জামাই আর ভাগনে, তিন নয় আপনে।

—বুঝলাম। তা দিগন্ত থাকে কোথায়?

—আগে ভ্যাগাবণ্ডের মতো ঘুরে বেড়াতো। তবে আমার এখানে চাকরি পাবার পর বেলগাছিয়ার দিকে একটা ঘর নিয়েছে। অ্যাড্রেসটা আমাদের খাতায় পাওয়া যাবে। কেন, আপনি দেখা করতে চান?

—দেখা তো করতেই হবে। আপনার ভাগনের সঙ্গেও কিছু কথা বলতে চাই। কিন্তু আমি প্রাইভেটলি কথা বলব। আপনার স্ত্রীর কাছ থেকেও আমার কিছু জানার আছে।

আপনি একটা কাজ করুন, আগামী রবিবার বিকেলের দিকে আমি আপনার বাড়ি যাব। ওদের প্রত্যেককেই আপনি থাকতে বলবেন।

—সে তো খুবই ভালকথা। তাহলে আপনি কেসটা নিচ্ছেন?

—চেষ্টা করতে দোষ কী?

ইতিমধ্যে রূপম নিজেই খাবার আর চা নিয়ে এল। পরিবেশন করে ও চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ নীল বলে উঠল, —সামনের রবিবার আপনি কী করছেন রূপম বাবু?

—ছুটির দিনতো। সারাদিন মোটামুটি বাড়িতেই থাকি। সন্ধেবেলা বউকে নিয়ে একটু ঘুরতে বের হই।

—একটা রবিবার বাদ দেওয়া যাবে না?

—কেন যাবে না স্যার। একশোবার যাবে।

—তাহলে সামনের রবিবার সন্ধেবেলা আমি আপনাদের বাড়ি যাচ্ছি। থাকবেন।

—নিশ্চয়ই থাকব স্যার।

রূপম বেরিয়ে গেল। কালবোস জিগ্যেস করলেন, —এখানকার কাউকে কিছু প্রশ্ন করবেন নাকি?

—আজ থাক। আমায় একবার বটতলা থানায় যেতে হবে। এটা তো বটতলা থানার আণ্ডারে?

—হ্যাঁ দাদা।

জলখাবার সারা হয়ে গিয়েছিল। নীল নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়ল। আজ ও সঙ্গে গাড়ি এনেছিল। সোজা চলে এল বটতলা থানায়। ওসি মৃগেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে ওর আলাপ ছিল। মৃগেনবাবুকে থানায় পাওয়াও গেল। নীলকে দেখেই মৃগেনবাবু বললেন,—আরে নীল ব্যানার্জি, হঠাৎ এ অধমের কাছে কেন দাদা?

—মৃগেন, আমার যে ভাই কয়েকটা ইনফরমেশন চাই। এবং একমাত্র তুমিই সেটা দিতে পার।

—বল দাদা, তোমার জন্যে কী করতে পারি?

—বিশ্বকর্মা পুজোর দিন কে বি ওয়ার্কশপে একটা খুন হয়েছিল।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মৃগেন বললেন, —মজাটা কী জান দাদা, ওই খুনটা যে করেছিল, পরদিন সেই লোকটাই খুন হয়ে যায়।

—হ্যাঁ, সেটা জানতেই আমি এসেছি। আমি প্রশ্নগুলো করব। তুমি কেবল উত্তরগুলো দিয়ে যাবে।

—বেশ। তবে এখানে নয়। দেখছই তো কী রকম হট্টগোলে জায়গা। চল ভেতরের রুমে গিয়ে বসি।

পাশেই একটা ছোট ঘরে গিয়ে দুজনে বসল। দেখেই বোঝা যায় এটা কয়েদিদের পেট

থেকে কথা বার করার ঘর। একটা দমচাপা পরিবেশ। জোরে চিৎকার করলেও বাইরে তার আওয়াজ বের হবে অতি ক্ষীণ।

মৃগেন বললেন—নাও দাদা, প্রশ্ন কর। এখন তুমি পুলিস আমি আসামি।

সামান্য হেসে নীল বলল, —বিশ্বকর্মা পুজোর দিন যে লোকটির পেটে ভাঙা বোতল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, লোকটার পি.এম রিপোর্ট কী?

—রিপোর্ট এখনও হাতে আসেনি। তবে মেডিকেলের ডাক্তার জানাচ্ছেন, লোকটি অত্যন্ত মদ্যপান করেছিল। ভাঙা বোতলের গলাটা বাদ দিলে সবটাই তলপেটের মধ্যে ঢুকে যায়। ইনটেসটাইন ফালা ফালা হয়ে গিয়েছিল। প্রফিউজ ব্লিডিং হয়। হসপিট্যালে নিয়ে যেতেও দেরি হয়। ফলে রাস্তাতেই লোকটি মারা যায়। আসলে আমরা খবর পেয়েছি অনেক পড়ে।

—তুমি কারখানার লোকেদের ইন্ট্যারোগেট করেছিলে?

—সেদিন তো গিয়ে দেখি সব ভোঁভা। ছিল দুজন লোক। একজনের নাম রূপম দাস। আর একজনের নাম দিগন্ত সেন। দিগন্তও ইনজিওরড় হয়েছিল। ওই ইয়াসিন লোকটাই নাকি ঘুষি মেরে ওর মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিল।

—হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। পরের দিন কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলে?

—করেছিলাম। ওদের কেউ কেউ বলছে ইয়াসিনই খুনটা করেছে। আবার কেউ কেউ ঠিক করে মনে করতে পারছিল না। আসলে সেদিন সবাই বেহেড অবস্থায় ছিল তো।

—এবার বলতো ইয়াসিনের খুনের খবরটা কখন পেলে?

—পরদিন দুপুরে।

—কে দিয়েছিল খবরটা?

—ও থাকতো একটা বস্তিতে। ওর পাশের ঘরের একটি বউ, সকাল থেকে ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় আউট অব কিউরিয়সিটি দরজা ধাক্কা দেয়। খুলেই দেখে ডেডবডি। সঙ্গে সঙ্গে বস্তি সরগরম। বস্তিরই কেউ একজন ফোন করেছিল।

—তুমি গিয়ে কী দেখলে?

—এমনি ভাঙাচুরো ঘর। একটা তক্তাপোষ। অর্ডিনারি একটা চাদর আর বিছানা পাতা। তবে লোকটা খাবারের থালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছিল। আমি যখন গেলাম, রক্ত তখন চাপ চাপ ডেলায় পরিণত হয়ে গেছে।

—লোকটি কী দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল?

—এগজ্যাক্টলি তাই।

—অস্ত্রটা কী?

—ধারালো ভোজালি দিয়ে পিছন থেকে স্ট্যাব করা হয়েছে। চারটে উণ্ড আছে। তিনটে পিঠে আর একটা গলায়।

—আশেপাশের লোক কেউ ওর চেঁচামেচি শোনেনি?

—নাহ্ তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই হইহুল্লোড় পড়ে যেত। ইয়াসিনও হেভি ড্রিংক করেছিল।

—অস্ত্রটা পাওয়া গেছে?

—না।

—একটা রক্তমোছা রুমাল পাওয়া গিয়েছিল।

—হ্যাঁ। একটা নামের আদ্যাক্ষরও ছিল।

—রুমালটা কী রঙের?

—হাল্কা সবুজ। অনেকটা মেয়েলি রুমালের মতো। তবে জেন্টস্ রুমাল। ডি অক্ষরটা গাঢ় সবুজ সুতোয় স্টীচ্ ওয়ার্ক। হরফটা রোমান।

—রুমালটা কার জানতে পেরেছ?

—না। তবে রূপম বলে লোকটি বলল, ওটা দিগন্তের হতে পারে।

—যেহেতু 'ডি' লেটারটা লেখা আছে তাই?

—মনে হচ্ছে। অবশ্য ডেফিনিট হয়ে কিছু বলেনি।

—আর দিগন্তের বক্তব্য কী রুমালের ব্যাপারে?

—ও রকম কালারড্ রুমাল নাকি ও ব্যবহার করে না।

—উণ্ডগুলো দেখে তোমার কী মনে হয়েছিল? খুব পাকা হাতের নাকি আনাড়ি এলোমেলো?

—না, আনাড়ি হাত না। জায়গা হিসেব করেই মারা হয়েছে। তবে খুব যে পাকা এবং নিখুঁত তাও বলা যাচ্ছে না। গলার উণ্ডটা সব থেকে মারাত্মক। গলার নলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

—ইয়াসিনের চেহারার যে বর্ণনা পেয়েছি, তাতে মনে হয় লোকটা বেশ স্বাস্থ্যবান।

—স্বাস্থ্যবান কী বলছ দাদা? কসাই টাইপের চেহারা। প্রায় ছ ফুটের মতো হাইট। পিঠটাই তো বিশাল।

—এর অর্থ, কোন রোগাপটকা লোক ওইভাবে জখম করতে পারবে না। এবং যতদূর মনে হয়, খুনি ইয়াসিনের চেনালোক। নইলে তাকে ঘরে ঢুকতেই দিত না। বিশেষ করে সেই রাত্রে, কিছুক্ষণ আগে যে একটা মার্ডার করে এসেছে।

—এগজ্যাক্টলি সো।

—রাত কটা নাগাদ এই কাণ্ড ঘটেছে বলে মনে হয়?

—ডাক্তারের মতে রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারো সোয়া এগারোর মধ্যে।

—আশ্চর্য।

—কেন?

—এখন গরমকাল। এগারোটা সওয়া এগারোটায়, লোক জেগে থাকে। বিশেষ করে বস্তি এলাকায়। লোকটার সাহস আছে বলতে হবে।

একটু থেমে নীল আবার জিগ্যেস করল, —কোন মোটিভ কিছু পেলে?

—নাহ্, ঘরের মধ্যে এমন কিছু ছিলও না। একটা সস্তা কাঠের ছোট আলমারি। তাতে ভাঁজ করা জামাকাপড়, কম্বল, কিছু টাকাকড়ি। দু একটা পরার লুঙ্গি গেঞ্জি। দুজোড়া চটি। একটা তক্তপোষ। ব্যস।

নীল সিগারেট ধরাল। মৃগেনকেও একটা দিল। তারপর ভাবতে ভাবতে বলল, —মাই লাস্ট কোশ্চেন, তুমি কী দিগন্তকে সাসপেক্ট করছ?

ঠোঁট উল্টিয়ে মৃগেন বললেন—দিগন্তকে আমি দেখেছি। নিরীহ টাইপের ছেলে। ভদ্রঘরের ছেলে। শুনলাম গানটানও নাকি করে। সেই লোকের পক্ষে মোটামুটি জনবহুল একটা বস্তিতে গিয়ে ছুরি মেরে একজন মহিষাসুর বধ করা, নাহ্ দাদা, কাজটা দিগন্তের পক্ষে বেশ শক্ত কাজ।

—ঠিক আছে। আজ আমি উঠি। অনেক ধন্যবাদ তোমায়। যদিও এলাকাটা তোমার। তবে তোমায় আমি ডিসটার্ব করব না।

—নীলদা, তুমি মাথা গলালে আমার ভালোই লাগবে। আসল কথা কী জান, আমরা এখন খুন, ধর্ষণ অথবা কিডন্যাপিং নিয়ে খুব ব্যস্ত। এই সব ঘরোয়া খুন, আমাদের আর ভাবার সময় নেই। তাও যদি সমাজের কোন হোমড়াচোমড়া হত। এই কেসটা নিয়ে দিনকতক কাগজে বেরবে। অপদার্থ পুলিসের মুণ্ডপাত করবে। ব্যস্ সেখানেই শেষ। কাউকে অ্যারেস্ট না করে আমরা তো আর চার্জশীট তৈরি করে কোর্টে তুলতে পারব না। দিন কতক পর দেখবে, কে ইয়াসিন আর কে যাদব মাহাতো? তবে তুমি যদি পাঁক ঘেঁটে কিছু উদ্ধার করতে পার আমায় জানিও।

—ওহ্ সিওর। আজ চলি।

চোদ্দ

বাড়ি ফিরেই নীল দেখল দীপু বড় সোফায় টানটান শুয়ে ফুকফুক করে সিগারেট টেনে যাচ্ছে। আড়চোখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে ফ্যানটা বাড়িয়ে দিয়ে এসে সামনের সোফায় বসল। দীপুও উঠে সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল, —কোথায় গিয়েছিলে গুরু? এত রাত পর্যন্ত? নতুন কোন কেস টেস এল নাকি?

সে কথার জবাব না দিয়ে নীল জিগ্যেস করল, —তোর বউদি ফিরেছে?

—হ্যাঁ। কখন। আমায় বলেছে তুমি এলেই যেন খবর পাঠিয়ে দিই।

দীপু চলে যাবার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই নন্দিনী নীচে নেমে এল।

—ওপরে গেলে না কেন? কখন এসেছ?

—এই মাত্র। তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা আছে।

—আবার খুন খারাপি?

নীল হাসতে হাসতে বলল, —সেই হোমো স্যাপিয়েন্স পিরিয়ড থেকে খুনের শুরু। তখন কয়েকটা কারণে মানুষ মানুষকে বা পশুকে বধ করতো। এখন পৃথিবী যত এগোচ্ছে তত খুন বাড়ছে। আর শাখাপ্রশাখায় মোটিভ হয়ে গেছে আরও কমপ্লিকেটেড। এখন মনস্তাত্ত্বিক নিখুঁত খুনের কমপিটিশন লেগে গেছে। অবশ্য, ভোঁতা খুনও অনেক হচ্ছে। এই যেমন ধরনা, এই কেসটা,

—কোন্ কেসটা?

—তোমায় বলা হয়নি। ঠিক আছে দীপু আগে আসুক।

বলতে বলতেই 'আমি এসে গেছি গুরু' বলে চা আর চানাচুরসহ দীপু ঘরে ঢুকে সোফায় বসে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে নীল শুরু করে, —হ্যাঁরে, দীপু, তুই সেদিন তোর কোন এক কলেজ লাইফের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল বলেছিলি।

—হ্যাঁ। দিগন্ত সেন। ভালো গান গায়।

—ছেলেটা কেমন রে?

—বোঝ ঠ্যালা। বেশ কয়েক বছর পরে একটা লোকের সঙ্গে একবার দেখা হলে তুমি কী বুঝতে পারবে, একমাস আগে সে কোথায় কী কুকর্ম করে বসে আছে?

—আমি সে কথা বলছি না। এমনিতে কী রকম মনে হত?

—নরম্যাল। শান্তশিষ্ঠ, ভদ্র ছেলেরা যেমন হয়। তা হঠাৎ তাকে নিয়ে পড়লে কেন?

নন্দিনীও উসখুস করে উঠল, —মাঝখান থেকে তুমি এমন সব কথাবার্তা শুরু কর, যার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। গোড়া থেকে খুলে বল।

চা খেতে খেতে নীল আগাগাড়া কালবোস কাহিনি ব্যক্ত করল। এমনকি কিছুক্ষণ আগে মৃগেন ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আলোচনাটুকুও। সব শুনে টুনে নন্দিনী বলল,—এখানে আসল গণ্ডগোল পাকাচ্ছে ওই 'ডি' লেখা রুমালটা। রুমালের যা ডেসক্রিপশন দিলে সেটা ইয়াসিনের মতো লোক ব্যবহার করবে না। যে মার্ডার করেছে রুমালটা তারই।

সিগারেটে টান দিতে দিতে নীল বলল, —নন্দিনী, রুমালের থেকেও অন্য কয়েকটা ব্যাপার আমায় ভাবাচ্ছে বেশি। প্রথম কথা, কালবোসের মতো ওই রকম একটা সাদা মাটা প্রায় পার্সোন্যালিটি নেই, কালোকুলো হতকুচ্ছিৎ দেখতে একটা লোককে কেন যেচে বিয়ে করল সম্প্রীতির মতো সুন্দরী, এবং নামকরা অভিনেত্রী? যেটা আপাতদৃষ্টিতে বড়ই চোখে লাগে।

দীপু বলে উঠল, —তোমায় তো আগেই বলেছি, কালবোসের টাকার জন্যে।

নীল বলল,—কত টাকা আছে রে কালবোসের? কলকাতায় গোটা চারেক বাড়ি। আর একটা কারখানা। রেলের প্যানেলে নাম লেখা আছে। টেন্ডার ভ্যালু কম দেখিয়ে বাবুদের ঘুষটুষ খাইয়ে প্রতি বছরই একটা মোটা অ্যামাউন্টের কাজ পায়। হয়তো ওই কারখানায়

আরও বাইরের অর্ডার টর্ডার আসে। এই কলকাতা শহরেই, কালবোসকে কিনে নেবার মতো অনেক ব্যবসাদার আছে। নারে, টাকা নয়, সম্প্রীতির বোধহয় অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে যেটা আমরা জানি না।

নন্দিনী জিগ্যেস করল, — তোমার দ্বিতীয় পয়েন্ট কী?

—কালবোস নিজের শারীরিক দীনতার কথা জেনেও কী করে দিগন্তের মতো একজন তরতাজা যুবককে তার সুন্দরী স্ত্রীর জন্যে গানের মাস্টার হিসেবে রাখে?

—হয়তো কালবোস তার স্ত্রীকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে।

—বেশ। বিশ্বাস জিনিসটা খুব ভালো। ঈশ্বর-বিশ্বাস তো মানুষকে দিয়ে অসম্ভব সব কাজ করিয়ে নিচ্ছে। অলরাইট। কিছু বলার নেই। কিন্তু সেই গানের মাস্টারের জন্যে এত উমেদারী করা কেন? তারই অনুরোধে কালবোস দিগন্তকে ম্যানেজার করে দিয়েছিলেন। ইভ্‌ন, ওই ছেলেটিকে নিজের কারবারে ডানহাত করে নিতে চেয়েছিলেন। এবং আমার ধারণা সেটি সম্প্রীতির সুপারিশেই হতে চলছিল।

—তার মানে, নন্দিনীই বলল, তুমি বলছ সম্প্রীতি দিগন্তকে একেবারে আপার মহলে নিয়ে যেতে চাইছে?

—এটা কী খুব অবান্তর ভাবনা? আরও একটা জিনিস আমার চোখে খারাপ লাগল। দীপু তোর মনে আছে প্রথম যেদিন কালবোস এ বাড়িতে এলেন, চেহারা যাইহোক, স্বাস্থ্যে এবং কথা বার্তায় চালচলনে একটা তেজী ভাব ছিল।

—হ্যাঁ, সেটা বিয়ের দিনও দেখা গেছে।

—সেই লোকটাই, মাত্র কয়েক মাসে, এত ক্ষীণজীবী এবং দুর্বল হয়ে যাবেন কেন? এমন তো কিছু বেশি বয়স নয়। আমি গিয়ে দেখি উনি নিজের চেয়ারে বসে ঘুমচ্ছেন।

দীপু বলল—তোমার কী মনে হয় কোনরকম স্লো পয়জনিং চলছে? অর্থাৎ খুব ধীরে ধীরে কালবোসের স্বাভাবিক মৃত্যু চাইছে কেউ?

—আরও জিজ্ঞাস্য আছে। উপযুক্ত ভাগনে থাকা সত্ত্বেও, যদিও কালবোসের কথায় সে অপদার্থ, তাকে টপ্‌কে সম্পূর্ণ একটা বাইরের আনকোরা ছেলেকে বড় পোস্টে বেশি টাকা মাইনে দিয়ে রাখা, ভাগ্‌নে কী সেটা ভাল চোখে মেনে নেবে?

দীপু বলল—না নেওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সব ব্যক্তিগত লাভালাভির কারণে সম্পূর্ণ বাইরের দুটো লোক খুন হবে কেন? তোমার ওই যাদব মাহাতো আর ইয়াসিন মল্লিক এদের খুন হওয়ার কারণ?

—কেউ হয়তো চাইছে, কারখানার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করতে।

—সেটা কে?

—জানি না। তাই তো আরও ভেতরে ঢুকতে হবে। খুন দুটো, হয় কোনকিছু চাপা দেওয়ার জন্যে, নয়তো বৃহত্তর কিছু প্রাপ্তির আশায়।

—কিন্তু, সিগারেটে একটা দম ভোর টান দিয়ে দীপু বলল, —তোমার এই নয়া একসপিডিশনে, তোমার হনুমানটি এবার আর তোমার পাশে থাকতে পারছে না। বউদি এমন গন্ধমাদন চাপিয়ে দিয়েছে। কী বউদি, একটু গন্ধমাদন হাল্কা করবে? তাহলে রামচন্দ্রের অনুগামী হতে পারি।

নন্দিনী শ্লেশ কঠোর কণ্ঠে জবাব দিল, —না, গোয়েন্দাগিরি করলে তোমার পেট ভরবে না। তুমি তো নীল ব্যানার্জি নও। তাছাড়া অঙ্গনা বলে একটি মেয়ে তোমার আশায় বসে আছে। তার দিকটাও তো দেখতে হবে। তুমি কী বল নীল?

—দেবীর আদেশ। আমার কিছু করার নেই। ভক্তকে তো মানতেই হবে।

দীপু কিছু বলার আগেই নন্দিনী বলল, —যাও দীপু, কাল তোমার অনেক কাজ আছে। খেয়ে নিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো শুয়ে পড়।

বেজার মুখে দীপু উঠতে উঠতে বলল, —জেণ্ডারে ভুল কোর না বউদি। লক্ষ্মী আবার ছেলে হয় কী করে? বরং বলতে পারতে সুবোধ বালকের মতো শুয়ে পড়তে।

আর কথা না বাড়িয়ে দীপু চলে গেল। নীল বলল, —তোমার পাল্লায় পড়ে দীপুটা খুব টাইট হয়ে গেছে। দেখছ না আমার কী অবস্থা। সুবোধ, নট অবোধ বালকের মতো কেমন বাড়িতে বসে থাকি।

—নেহাৎ হাতে এখন কোন কাজ নেই। নইলে বাবুর টিকিরও দেখা পাওয়া যেত না। এখন ওঠো। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নেবে।

পনেরো

শনিবার হাফ ডে। কালবোস কারখানা বন্ধ হবার পরই বাড়ি ফিরে এসেছেন। শরীরের দুর্বলতা কিছুতেই কাটছে না। কেন যে এত ঘুম ঘুম ভাব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। এই সময় রাগের মাথায় দিগন্তকে বসিয়ে দিয়ে এখন মনে হচ্ছে কাজটা খুব ভুলই হয়ে গেছে। এখন এত কাজের চাপ। একা সব দিক সামলে উঠতে পারছেন না। রেলের কাজ তো চলছেই। দুটো বড় বাড়ির গ্রীল আর কোলাপসিবল্ গেটের সম্পূর্ণ কাজটাই এসে গেছে। আর এখন তো সব মালটি স্টোরড় বিল্ডিং। গ্রীল আর কোলাপসিবল্ গেটের অর্ডার আসছে প্রচুর। আরও লোক রিক্রুট করার দরকার। এসব কাজ রূপমকে দিয়ে হবার নয়।

কারখানা থেকে ফিরেই শুয়ে পড়েছিলেন। সম্প্রীতি একটু আগেই গরম কফি আর বিস্কিট খাইয়ে গেছে। দিগন্তও বাড়িতে এসেছে। এই কদিন ভয়ে আর কালবোসের সঙ্গে দেখা করছে না। গান শিখিয়ে ও বাড়ি থেকে চলে যায়। ওদের গান শুনতে শুনতেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। স্পষ্টই টের পেলেন কে যেন তার পা টিপে দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখলেন। না সম্প্রীতি নয়, ঝুমা।

—একী রে? তুই? তোকে আবার কে আমার পদসেবা করতে বলল?

—কে আর বলবে? দেখছি তো দিন দিন তুমি কত রুগ্ন হয়ে যাচ্ছ। আগে তো কতই তোমার সেবাযত্ন করতুম। মামি আসার পর সে সব পাঠতো উঠেই গেছে।

—হুঁ। তা তোর মামিমা কোথায় গেল?

—তার কথা আর বোলনি। তেনার কী আর এসব দিকে নজর আছে।

—ছিঃ, ওকথা বলিস না। তোর মামি আসার পর—

—চুপ করো দিকি। তেনার যদি ইদিকে নজর থাকবে, যাকগে আমার কী দরকার সে সব কথা বলার।

—দেখ ঝুমা, কোন কথা অর্ধেক বলে চুপ করে যাবি না। ওসব আমার একবারেই ভাল লাগে না। যা বলতে চাইছিস, স্পষ্ট করে বল।

—সে সব তোমার শুনে কাজ নেই। এক কান থেকে পাঁচ কানে যাবে। আর চেনোই তো তোমার ভাগ্নেকে। আমার চুলের মুঠি ধরে ঘর থেকে বার করে দেবে।

—বলছি তো কাউকে বলব না। কথাটা কী?

—একে তো তোমার শরীরে কষ্ট। তার ওপর ওসব কথা শুনলে তোমার মনে কষ্ট হবে। থাক ওসব কথা।

—এরপর আমি তোর চুলের মুঠি খামচে বাড়ি থেকেই বার করে দোব।

—আচ্ছা মামু, যে মানুষটাকে তুমি নিয়ে এদ্দিন ঘর করছ, তার কিছুই কী তোমার নজরে পড়ে না?

—তুই প্রীতির কথা বলছিস?

—তবে আর কার কথা বলব? আর আছে কে তোমার ঘরে?

—প্রীতি আবার কি করল? সে তো বেশ ভালোই আছে। আমার সংসারটা এমন করে সাজালো কে? সেই তো? জানিস ও কত ভাল মেয়ে?

—চারদিকে ধিধিক্কার পড়ে গেছে। সে খবর রাখো?

—তার মানে?

—লোকে কত কী বলাবলি করছে তা শুনেছ? লোকের কথা ছেড়েই দিলুম, আমরা কী সব কানা হয়ে গেছি? ওই যে সেই খরগোস না কার একটা গপ্পো আছে,

কালবোস ধমকে ওঠেন, —ওসব গপ্পো টপ্পো ছাড়। তোর মামির কথা বল।

—আচ্ছা তুমি কী গো মামু? বাড়ির মধ্যে একটা সোমত্ত ছেলেকে ঢুকিয়েছ। তায় তোমার বউটি আবার সুন্দরী। এই কাঁচা বয়স।

—কেন, দিগন্ত কিছু করেছে নাকি?

—শুধু সেই বাবুটাকে দোষ দাও কেন? তোমার বউতো আর কচি খুকি নয়। তার ওপর এখন আবার তার চাকরিটাও নেই। পোয়াবারো।

—দিগন্ত এখন আসে কখন?

—তুমি কারখানায় চলে গেলে। ব্যস, মামিও ঘরের কাজ কম্মো তাড়াতাড়ি সেরে নিল। ওই যে তোমাদের কাজের মাসি, কী নাম যেন, পূর্ণিমাদি, ওর হাতে সব ঘরদোর ছেড়ে দিয়ে দুজনে গিয়ে উঠবেন ও বাড়িতে। তারপর দুপুরে তেনাদের খাবার দিয়ে আসবে, চলবে সেই সন্ধে সাতটা আটটা পর্যন্ত। হাসি, গান আরও কত কী?

—আরও কত কী মানে?

—সে সব আমি তোমায় বলতে পারব না। বুঝে নাও।

কালবোস খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে রইলেন। তারপর প্রায় নিজের মনেই বললেন, —ও তাই এত সুপারিশের ধাক্কা!

ঝুমা সমানে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল কালবোসকে। রূপম তাকে যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিল, সেইভাবেই সে এগোচ্ছে। কালবোসের ভাবান্তর লক্ষ্য করে বুঝল, তীরটা আসল জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে। মাছ টোপ গিলেছে। এখন শুধু হ্যাঁচকা টানের অপেক্ষা। ঝুমা আবার একটু সুতো ছাড়ল, —মামির আজকাল এত ভুলো মন হয়েছে তোমায় কী বলব। এই তো দেখনা, এই রুমালটা, বলেই ব্লাউজের মধ্যে লুকনো একটা হাল্কা সবুজ রঙের রুমাল বার করে কালবোসের চোখের সামনে নাড়াল, রুমালটা সেদিন ছাদে মেলে দিয়েছিল। তারপর আনতেই ভুলে গেছে। সে রুমাল মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। আমি তুলে যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

—দেখি রুমালটা, বলে ঝুমার হাত থেকে রুমালটা নিয়ে খুব ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। মনে পড়ে গেল নিউ মার্কেট থেকে এক সেট রুমাল কেনা হয়েছিল। তিন রঙের ছটা রুমাল। দুটো হাল্কা সবুজ, দুটো হাল্কা পিঙ্ক্ আর দুটো হলুদ। হ্যাঁ, ওর মনে পড়েছে সেদিনের কথা। এই রুমাল কিনতে দেখে কালবোস বলেছিলেন, এগুলো তো জেন্টস্ রুমাল। লেডিজ রুমাল তো এত বড় হয় না। সম্প্রীতির উত্তরটাও মনে পড়ছে। সম্প্রীতি বলেছিল, লেডিজ রুমাল তো সৌখিন রুমাল। ওতে রুমালের কাজ মেটে না। রুমাল একটু বড় হওয়াই ভাল।

রুমালটা দেখতে দেখতে আর একটা সন্দেহ মাথায় ঢুকে গেল। ইয়াসিনের ঘর থেকে নাকি একটা রুমাল পাওয়া গেছে। সেটারও রঙ নাকি হাল্কা সবুজ। তাতে সুতো দিয়ে 'ডি' লেটারটা স্টীচ্ করা ছিল। তবে কী সম্প্রীতিই দিগন্তকে রুমালটা দিয়েছিল 'ডি' অক্ষরটা বসিয়ে। মাথার মধ্যে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ঝুমা এসব কী বলল তার কাছে। সম্প্রীতি তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। এতদিন এই বিশ্বাসটাই তাকে এনার্জি জুগিয়ে এসেছে। আর সেও তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। তার কোন আবদার সে কোনদিনও না বলে উড়িয়ে দেয়নি। তাহলে কী সবটাই সম্প্রীতির ছলনা? তাকে বিয়ে করা? দিগন্তকে ডেকে আনা? তার কছে গান শেখা? তাকে বড় পোস্টে চাকরি দেওয়া? সবটাই কি কোন

বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে? সে উদ্দেশ্যটা কী? এই যে দিন দিন তার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সর্বদা মাথা ঝিমঝিম, একটা গা বমি ভাব, ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা, এটা কী কোন বিশেষ উদ্দেশ্যর ফল? তাকে কী স্লো পয়জনিং করা হচ্ছে? কেন? সম্প্রীতি কী তাকে মেরে ফেলতে চায়? এখন তো মনে হচ্ছে সেই সম্ভাবনাটাই বেশি। সে মরে গেলে সব কিছুর মালিক হবে সম্প্রীতি। তারপর দিগন্তকে নিয়ে ঘর বাঁধবে?

—কী ভাবছ মামু? তুমি আবার কোথায় উড়ে গেলে?

সম্বিত ফিরে পেয়ে কালবোস বললেন, —ওরা এখন কোথায় রে?

—কেন শুনতে পাচ্ছ না? হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে মামির ফ্ল্যাট থেকে।

কালবোসও শুনলেন দুজনের উচ্চৈঃস্বরে হাসির আওয়াজ।

—দুজনেই হাসছে তাই না? এত জোরে জোরে হাসছে?

ঝুমা বুঝতে পারল ওর ওষুধ কাজ করতে শুরু করেছে। আপাতত থাকার প্রয়োজন মিটে গেছে। এসব শুনলে রূপম যা খুশি হবে ভেবেই ও শিউরে উঠল। নিমেষে নিজের মনোভাব পাল্টে ও বলল, —এ আর নতুন কী শুনছ? পাড়া প্রতিবেশিরা এমন হাসিঠাট্টা রোজই শোনে। নাহ্। আমি যাইগো মামু। দেখো তুমি আবার বলে ফেলনি, ঝুমা এইসব বলছিল। মামু, তুমি আমার আপনার জন। তোমার কিছু খারাপ হলে আমরা মুখ বুজে থাকতে পারি না। অনেকদিন চেপে চেপে থেকে আজ বলে ফেললুম। দোহাই মামু, মা আর ওর কানে যদি এসব কথা যায় সত্যিই আমায় মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেবে। আমি যাইগো।

—চলে যাবি?

—হ্যাঁগো, আমার এখন কত কাজ। রুটি করতে হবে। তরকারি করতে হবে। আর একজন পটের বিবি আছে। তোমার ভাগ্নী। লেখাপড়া শিখে যেন দিগগজ হবেন। সংসারের কুটোটি নাড়বে না। ছিলুম ঝিয়ের মেয়ে। এখনও ঝিগিরিই করে চলেছি। যাই গো।

ঝুমা চলে গেল। রেখে গেল একরাশ সন্দেহ আর একটু একটু করে বাড়তে থাকা ঘৃণা।

ষোল

কালবোসকে দেখে প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠল নীল। মাত্র কদিনেই লোকটার একী চেহারা হয়েছে? গাল বসে গেছে। চোখের কোণে কে যেন পুরু করে কালি লেপ্‌টে দিয়েছে। একে তো লোকটার গায়ের রঙ খসখসে কালো। তায় এই কাহিল অবস্থা। কোথায় গেল সেই ভুবনমোহিনী হাসি? কোথায় গেল সেই হার্দিক আমন্ত্রণ ভঙ্গী? নীল একা আসেনি। আজ রবিবার বলে সঙ্গে দীপুও ছিল। অত্যন্ত করুণ স্বরে কালবোস বললেন, —নীলবাবু, এসেছেন? আপনার কথার দাম আছে। বসুন।

আজ আর সেই প্রাণখোলা 'দাদা' ডাকটাই নেই। সরাসরি নাম ধরে ডাকছেন। একটু বিস্মিত হয়ে নীল জিজ্ঞাসা করল,—কিন্তু কী হয়েছে আপনার? একী চেহারা করেছেন?

—মৃত্যুবান ছোড়া হয়েছে নীলবাবু। হয়তো একদিন খবর পাবেন আমি আর নেই।

—না, না, এসব কী বলছেন? অসুখ করেছে। সেটা ভালোও হয়ে যাব। আপনার মিসেস কোথায়?

—মিসেস? ক্লান্ত হাসলেন। আছেন। পাশের ঘরে। আপনি যাদের যাদের থাকতে বলেছেন, তারা সবাই আছে। ও হ্যাঁ, পকেট থেকে একটা চেক বার করে বললেন, আপনার পারিশ্রমিকটা বসিয়ে নেবেন। টাকাটা আমি লিখিনি।

আশ্চর্য হয়েই নীল জিগ্যেস করল,—এ সবের কী মানে আমি বুঝতে পারছি না। আপনার কাজ হয়তো আমি শুরু করেছি। কিন্তু এখনই পারিশ্রমিকের প্রশ্ন কেন? আগে আপনার কাজটা শেষ হোক।

—হবে। আপনি নিশ্চয়ই আপনার কাজ শেষ করবেন। তাই আগাম চেকটা দিয়ে রাখলাম। তালুকদার সাহেবের কাছে আপনার সব কথা আমি জেনেছি। কিন্তু আমি কাউকে ফাঁকি দিতে চাইনা। কোনদিন কারো একটা টাকাও মারিনি। ব্যবসা বাড়াতে গিয়ে হয়তো কিছু উপঢৌকন দিয়েছি। হয়তো কোন কাজ বা টেণ্ডার পাবার জন্যে কিছু অসৎ উপায় অবলম্বন করেছি। সে সব ব্যবসায়েরই করে। এটাকে আমি কোন গভীর অন্যায় বলে মনে করিনি। বরং আমি সৎ থাকতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ঠকেছি। এই তো দেখুন না, সামনের জমিটা পাওয়া উচিত ছিল আমার। তার জন্যে পাঁচ লক্ষ টাকাও দিয়েছি। আর নোংরা পথে নামলে হয়তো জমিটা আমার হাতে আসতো। কিন্তু, যাক সে সব কথা। আপনি আপনার আজকের কাজ আরম্ভ করুন। আমায় যদি কোন প্রশ্ন করার থাকে, সেটাই নয় আগে করুন।

নির্নিমেষ নেত্রে কালবোসকে দুজনেই লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ নীল জিগ্যেস করল, —ঠিক আছে, আপনাকে দিয়েই শুরু করা যাক, মৃত্যুবানের কথা কী বলছিলেন?

—তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন ব্যানার্জি সাহেব, অবিশ্বাস করে জেতার চেয়ে বিশ্বাস করে হারাও ভাল, তাই না?

—বড় কঠিন প্রশ্ন। ফিলসফিক। উত্তরটার মধ্যে অনেক তর্কবিতর্কের ব্যাপার আসবে। কিন্তু তার আগে যে প্রশ্নটা করলাম তার উত্তর দিন। হঠাৎ আপনার, কেন মনে হচ্ছে আপনার জন্যে মৃত্যুবান ছাড়া হয়েছে?

সামান্য সময় উদাস হয়ে বসে রইলেন, তারপর বললেন,—ব্যানার্জিসাহেব আমার যা কিছু উত্তর সব আমার ওই প্রশ্নের মধ্যেই বলা হয়ে গেছে। আপনি বুদ্ধিমান লোক। একটু চিন্তা করলে আপনি নিজেই উত্তর খুঁজে পাবেন।

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —আমার উত্তর আমি পেয়ে গেছি। এ নিয়ে আমরা

নিজেদের মধ্যে কদিন আগেই আলোচনা করেছিলাম। আপনাকে আর দুটো প্রশ্ন করব, ঠিক কবে থেকে আপনার ভেতরের এই অস্বস্তিটা আসছে?

—সঠিক দিনক্ষণ হয়তো বলতে পারব না। তবে দিগন্তকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার পর থেকেই শরীরের অবসাদটা ফীল করতে থাকি। প্রথম প্রথম বেশি ছিল না। কিন্তু এখন, আমার মনে হয় আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। আপনাকে বলা রইল, যদি হঠাৎ আমার মৃত্যু সংবাদ পান জানবেন আমার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। আপনি তদন্ত করবেন। আর চেকটা আপনি কালই ভাঙিয়ে নেবেন।

এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—আপনার ফুড হ্যাবিটে কিছু চেঞ্জ হয়েছে কী? মানে আপনার খাদ্য তালিকার কোন নতুন অন্তর্ভূক্তি?

সামান্য সময় চিন্তা করে কালবোস বললেন, —না, সেভাবে কিছু নয়। তবে ইদানীং ঝুমা প্রায়ই তাল দিয়ে তৈরি নানান ধরনের খাবার খাওয়ায়।

—তাল?

—হ্যাঁ। আমার খুব প্রিয় খাদ্য। তা সে তো ও আমাকে বিয়ের আগেও খাওয়াতো। যখন তাল পাওয়া যেত না তখন তালের পাটালি দিয়ে পায়েস করে খাওয়াতো। সেটা অবশ্য বিয়ের আগে। তারপর আমার বিয়ের পর ঝুমা আর ওপরে আসতো না। ইদানীং আসছে। অবশ্য সম্প্রীতির অগোচরে।

—আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

—সবাই তো আমার আত্মীয়। কিন্তু কেউই আমার পরমাত্মীয় নয়। তাই বিশেষ কারো নাম বলাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—ঠিক আছে। আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আপনার স্ত্রীকে একবার পাঠিয়ে দিন।

কালবোস চলে যাবার পর দীপু বলল, —মৃত্যুবাণটা কী খাবারের মধ্যে দিয়ে আসছে?

—হ্যাঁ। তাই। কিন্তু এটা রোধ করতে গেলে তো ওনাকে নিজের হাতে রান্না করে খেতে হবে। কারণ উনি ওনার স্ত্রীকে এখন মোটেই বিশ্বাস করেন না।

—হ্যাঁ, ওনার কথা থেকে সেটাই মনে হল। কাউকে অবিশ্বাস করে জেতার থেকে বিশ্বাস করে হারাও ভাল। কালবোসের মধ্যে ফ্রাস্টেশন এসে গেছে। বুঝলে নীলদা, কেন তোমায় প্রথমদিনই ওথেলো আর ডেসডিমোনার উপমা দিয়েছিলাম।

—তাহলে ইয়াগো কে? ক্যাসিওই বা কে?

—সেটা আমি বলতে পারলে তো আমিই নীল ব্যানার্জি হয়ে যেতাম।

সম্প্রীতি এল। চেহারার সেই ঝিলিকটা খানিকটা নিষ্প্রভ। খানিকটা চিন্তান্বিতও বটে।

—আপনারা আমায় ডেকেছেন। অবশ্য ইয়াসিন মার্ডারের ব্যাপারে আমি ওকে আপনার কথাই বলেছিলাম।

—হ্যাঁ। কালবোসবাবু আমাকে সবই বলেছেন। আপনি বসুন। আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।

—বলুন।

—আপনার স্বামী খুব অসুস্থ। ওঁর ধারণা উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। কেউ ওঁকে ধীরে ধীরে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করতে চাইছে। এ ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?

—ও অসুস্থ সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আপনি যেটা বললেন সেটাতো ও আমায় কোনদিন বলেনি তো? আশ্চর্য, ওর এরকম ধারণা হল কেন?

—আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর ইতিমধ্যে কোন কারণে কোন মনোমালিন্য ঘটেছে কী?

—কী বলছেন মিস্টার ব্যানার্জি? আমাদের প্রায় আট ন মাস বিয়ে হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোন কারণেই ওর সঙ্গে আমার সামান্য কথাকাটাকাটিও হয়নি। তবে—

—হ্যাঁ বলুন।

—কাল রাতে ও আমার সঙ্গে তেমনভাবে কোন কথা বলেনি। খুব গম্ভীর মুখে বসেছিল। এমনকি আমি দু একটা প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পাইনি।

—তাতে আপনার কিছু মনে হয়নি?

—না। তেমন কিছু নয়। যদিও এটা ওর স্বভাববিরুদ্ধ। তবে আমার যেটা মনে হয় ও কোন কারণে চিন্তিত। ওর নিজের অসুস্থতা নিয়ে ও কখনো ভাবে না। বলে আমাকে নিয়ে আমি ভাববো কেন? সে তো তুমিই আছো। অসুস্থতা নয়। অন্য কিছু।

—সেটা কী?

—বোধহয় কারখানার মধ্যে এরকম একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল, সেই জন্যে টেনশন হতেই পারে। ও হ্যাঁ, একটা কথা ও আমাকে জিগ্যেস করেছিল। তবে সেটা খুবই মামুলি কথা।

—হোক মামুলি। একান্ত ব্যক্তিগত না হলে বলুন কথাটা কী?

—একবার নিউমার্কেটে গিয়ে আমরা ছটা রুমাল কিনেছিলাম। তিনরকম রঙের দুটো করে। তার মধ্যে দুটো ছিল হাল্‌কা সবুজ রঙের। তা হঠাৎ আমায় বলল, সবুজ রুমাল দুটো একবার আনবে?

—আপনি এনে দিয়েছিলেন?

—না, আরনফরচুনেটলি দুটো রুমালই নেই। একটা দিয়েছিলাম দিগন্তকে আর একটা হারিয়ে গেছে।

—দিগন্তবাবু কী লেডিজ রুমাল ব্যবহার করেন?

—ওগুলো জেন্টস্ রুমাল। আমি জেন্টস্ রুমালই ব্যবহার করি।

—আপনি দিগন্তবাবুকে যে রুমালটা দিয়েছিলেন, তাতে কী 'ডি' অক্ষরটা সুতো দিয়ে

মনোগ্রাম করে দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। আমি সুতোর কাজ খুব ভালো করতে পারি। আমার মায়ের কাছে শেখা।

—মিসেস বসু, আপনি কি জানেন, ইয়াসিন যে ঘরে খুন হয়েছিল, সেই ঘরে একটা রুমাল পাওয়া যায়, সেটার রঙ হাল্কা সবুজ এবং তার এক কোণে একটা অক্ষরও পাওয়া যায়, সেটা 'ডি'।

—ওহ্ মাই গড। আমার স্বামী অবশ্য বলেছিলেন ইয়াসিনের ঘর থেকে যে রুমাল পাওয়া যায় সেখানে 'ডি' লেখা ছিল। এটা তো আমায় কেউ বলেনি। নট ইভন্ দিগন্ত। ওটা কী দিগন্তরই রুমাল?

—দুটো জিনিস একই সঙ্গে মিলে যাওয়াটা খুব রেয়ার। রঙ এবং মনোগ্রাম।

—আপনি কী দিগন্তকে সন্দেহ করছেন? ওর পক্ষে কিন্তু কাউকে খুন করা সম্ভব নয়।

—এত জোর দিয়ে একথা কী ভাবে বলছেন?

—কারণ আমি দিগন্তকে চিনি।

—কতদিন থেকে?

—আমার কলেজ লাইফ থেকে। আসলে আমি যেটুকু গান শিখেছি তা ওর কাছ থেকেই।

—দিগন্তবাবু কী গান শেখান? প্রফেশনালি?

—আগে তাই করতো। এখন শুধু আমাকে শেখায়।

—নিশ্চয়ই টাকা দেন।

—হ্যাঁ। আমার স্বামী ওকে দুহাজার টাকা করে দেন। গান শেখানোর জন্য।

—টাকার অঙ্কটা একটু বেশি নয় কি?

—ওটা আমি ইচ্ছে করেই করেছি। কারণ ওর তখন আর কোন ইনকামের রাস্তা ছিল না।

—এটা করুণা বা বদান্যতা বলা যেতে পারে তাই না?

—না। কারো করুণা নেবার ছেলে ও নয়। আমার পীড়াপীড়িতেই ও টাকাটা নিচ্ছে।

—ওর চাকরিটাও তো আপনি করে দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। আমি ওকে জীবনে দাঁড় করাতে চাইছি।

—অর্থাৎ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্যে আপনি সর্বদাই এ ধরণের দয়াভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন?

—না, ঠিক তা নয়। ওর জীবনে একটা ট্র্যাজিক ব্যাপার আছে। যার জন্যে ও প্রায় নিজেকে শেষ করে দিতে চাইছিল। আমি ওকে বাঁচাতে চাইছি। বন্ধুর জন্যে বন্ধু এটুকু করতেই পারে।

—নিশ্চয়ই পারে। আচ্ছা, ইফ ইউ ডোণ্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, আপনার স্বামী এ নিয়ে কিছু মাইণ্ড করেন না?

—কী ব্যাপারে?

—কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি বিশেষ অন্তরঙ্গতা?

—আমার স্বামীর এ ধরনের কোন কমপ্লেক্স নেই। উনি সাদা মনের মানুষ। সাদা চোখেই জগৎটাকে দেখেন।

—আর ইউ সিওর?

—হানড্রেড পার্সেন্ট।

—যদি কোনদিন তাঁর মনে কোন সন্দেহের ছায়া নেমে আসে সেদিন কী করবেন?

—সেরকম দিন তো আসেনি। এলে তখন ভাবব।

—ওয়েল, এখন আপনার ছুটি। কাইণ্ডলি একবার দিগন্তবাবুকে পাঠিয়ে দিন।

সম্প্রীতি চলে গেল। দীপু জিগ্যেস করল, —কী বুঝলে?

নীল পাল্টা প্রশ্ন করল, —তোরা তো একই কলেজে পড়তিস। মেয়েটাকে দেখেছিস কোনদিন?

—নাহ্। দেখলেও মনে নেই। তবে টিভিতে দেখেছি।

—তোর কী মনে হয়?

—বোঝা মুশকিল। মেয়েদের চেনা খুব শক্ত। অঙ্গনাকেই আজও চিনতে পারলাম না। কেন যে পাগলি এখনও আমার জন্যে ওয়েট করছে?

—আর বেশিদিন স্বাধীন জীবন ভোগ করতে হবে না। এবার ওর নরকযন্ত্রণা শুরু হবে।

—তার মানে?

—মানে কিছু নয়। বোধহয় দিগন্ত আসছে। পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

দিগন্ত এসে নীলকে হাত তুলে নমস্কার জানাল। তারপর দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল, —আরে তুই? ও বুঝেছি।

আর কিছু না বলে ও সামনের চেয়ারে বসল। নীল জিগ্যেস করল,

—আপনার ব্যবহৃত রুমালটা ইয়াসিনের ঘরে গেল কী ভাবে?

—জানিনা। এটাই তো আমার কাছে একটা বিস্ময়।

—অথচ আপনি পুলিসকে বলেছিলেন রুমালটা আপনার নয়।

মাথা চুলকে দিগন্ত বলল—কী করব? আমি যদি স্বীকার করি রুমালটা আমার তাহলে পুলিসতো আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতো।

—তাহলে আমায় বললেন কেন?

—আপনি তো আর ওদের মতো নির্দয় নয়। আপনি আমাব অসহায় অবস্থাটা বুঝবেন। তাই।

—রুমালটা মিসেস বসু আপনাকে দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি তাহলে বলছেন ইয়াসিনকে আপনি খুন করেননি?

—কাউকে খুন করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। আর ইয়াসিন তো লম্বা চওড়া এক তাগড়াই লোক। আমার মতো এক খুদে দুব্‌লা বাঙালির পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

—কিন্তু সে সবার সামনে আপনাকে ঘুষি মেরেছিল। অপমানজনক কথা বলেছিল। সেই রাগে—

—যদিও আমি সেই রাতে মদ্যপান করে ফেলেছিলাম, কিন্তু পরে ভেবেছি, ইয়াসিন যা করেছে সেটা মদ্যপ অবস্থার জন্যে। লোকটা অন্যদের তুলনায় একটু বেশি রাগী। পরের দিন আবার সব ঠিক হয়ে যেত।

—প্রথম খুনটা, আই মিন যাদব উণ্ডেড হয়েছিল কটার সময় মনে আছে?

—না। বললাম না আমি তখন ডেড ড্রাঙ্ক্। সময়টা ঠিক খেয়াল নেই। তবে আটটা নাগাদ হতে পারে।

—পুলিস এসেছিল কটায়?

—প্রায় ঘণ্টাখানেক পর। ধরুন নটা।

—তার মানে বডি রিমুভ করতে করতে প্রায় সাড়ে নটা। তাই তো?

—সেটাও ঠিক বলতে পারব না। কারণ পুলিস তখন আমায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে অফিসে বসে।

—সে সময় রূপম বাবু কোথায় ছিলেন?

—তাও জানিনা।

—একটু অড্ কোয়েশ্চেন করছি। আপনার সঙ্গে সম্প্রীতি দেবীর কী সম্পর্ক?

—আমি ওকে গান শেখাই।

—আর কিছু নয়?

—আপনি যা বলতে চাইছেন তা নয়। একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের ওই একটি সম্পর্ক ছাড়াও আরও অনেক সম্পর্ক থাকতে পারে। তবু যখন জিগ্যেস করলেন তখন বলি, আমাদের সম্পর্ক নিটোল বন্ধুত্বের।

—কিন্তু কালবোসবাবুতো আপনাদের সম্পর্কে জটিলতা খুঁজে পাচ্ছেন।

—অ্যাবসার্ড। স্যার অত্যন্ত উদার মনের মানুষ। উনি আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন। এবং ওনার স্ত্রীকে। না মিস্টার ব্যানার্জি, স্যার সম্পর্কে এসব কথা চিন্তা করাই পাপ।

—কিন্তু তিনি আপনাকে কিছুদিনের জন্যে সাস্‌পেণ্ড করেছেন।

—সে দোষটা আমার। আমার উচিত হয়নি ওনার পার্সোন্যাল চেম্বারে বসে মদ্যপান করা। আমার অসাবধানতার ফলে সেদিন একটা অঘটন ঘটে যায়। আমি যদি সেদিন সাদা মাথায় থাকতাম হয়তো এত বড় একটা মিসহ্যাপ হত না।

—ইয়াসিনকে কে খুন করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

—সরি স্যার। ইয়াসিন যে ধরনের রগচটা লোক, ওর আরও অন্য কোন শত্রু থাকতে পারে। আপনি ধরেই বা নিচ্ছেন কেন কারখানায় কেউ এ কাজ করেছে?

—ইয়াসিন কিন্তু সে রাত্রেই খুন হয়েছিল।

—এটা কাকতালীয় ব্যাপার।

—কিন্তু রুমালটা যে ধন্দের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। আচ্ছা সে রাত্রে কী আপনি একাই মদ্যপান করেছিলেন?

—না। প্র্যাকটিক্যালি রূপমই আমাকে জোর করে খাওয়াতে বসে। মদের বোতল আর গ্লাস ওই নিয়ে এসেছিল। আমি অনেক করে আভয়েড করার চেষ্টা করেছিলাম।

—রূপম তো আপনার জুনিয়ার স্টাফ্। তা সত্ত্বেও তার সঙ্গে বসে মদ খেলেন?

—প্রথম কথা, রূপমদা স্যারের ভাগনে। দ্বিতীয়ত সেদিন ছিল উৎসবের দিন।

—কিন্তু রূপম তো আপনার প্রতি জেলাস।

—তা হতে পারে। এটা তো খুব স্বাভাবিক। সে অনেক পুরনো স্টাফ। তায় মালিকের ভাগ্‌নে। তাকে টপ্‌কে কেউ বসলে জেলাসি তো আসবেই।

—সেদিন আপনি কোন্ রুমাল ব্যবহার করেছিলেন তা কী মনে আছে ?

—নো স্যার।

—ঠিক আছে। আপনি আসতে পারেন। রূপমকে একবার পাঠিয়ে দিন। আর আপনার বাড়িতে সবুজ রঙের রুমালটা পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নেবেন।

দিগন্ত একবার দীপুর দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। দীপু নিম্নস্বরে জিগ্যেস করল, —এ কে? ইয়াগো না ক্যাসিও? তোমার কী মনে হয় নীলদা?

—এখন কোন কিছুই মনে হচ্ছে না।

রূপম একগাল হাসি ভরিয়ে ঘরে ঢুকল।

—বসব স্যার? আপনি তো একদিন আমাদের কারখানায় গিয়েছিলেন।

—চিনতে পেরেছেন। বসুন।

খানিকক্ষণ রূপমের দিকে তাকিয়ে নীল জিগ্যেস করল, —আপনার মামাকে স্লো পয়জনিং কে করছে?

—স্লো পয়জনিং? মামাকে? ইরিবাবা, এ সব আপনি কী বলছেন?

—ন্যাকামি না করে যা জিগ্যেস করছি তার উত্তর দিন।

—মাইরি বলছি স্যার। এ কথা আমি এই প্রথম শুনলুম। মামা অসুস্থ সেটা জানি। তার জন্যে দুবেলা ডাক্তারও আসছে। কিন্তু মামাকে কে মারবে আর কেনই বা মারবে? মামাতো কোরো কোনো ক্ষতি করেনি।

—কিন্তু আপনার মামা আপনাকে ভালো চোখে দেখতেন না। আপনার আশা ছিল পুরনো ম্যানেজার চলে যাবার পর মামা আপনাকে সেখানে নিয়ে বসাবেন। কিন্তু মামা অন্য লোককে সে জায়গা দিয়েছেন। আপনার রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক।

একটু থেমে থেমে রূপম বলল. —একেবারে রাগ হয়নি যে তা নয়। কিন্তু তার জন্যে মামাকে মারব? এসব আমার মাথাতেই আসেনি।

—আপনার মামা তো তালের বড়া খেতে খুব ভালবাসেন।

—আমার বউ ঝুমা তো মামাকে প্রায়দিনই ওই সব করে খাওয়ায়। এটা তো কোন অপরাধ নয়। তাছাড়া মামাকে বিয়ের আগে তো প্রায়ই খাওয়াতো।

—হুঁ। প্রসঙ্গ পাল্টে নীল বলল, —দিগন্তের রুমালটা কখন সরিয়েছিলেন? কারণ আপনি ছাড়া তখন ও ঘরে আর কেউ ছিল না। আর দিগন্ত ছিল ডেড ড্রাঙ্ক। তার রুমালটা সরিয়ে নিতে আপনার তো কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

—আপনি কী আমাকে সন্দেহ করছেন?

—সেসব অনেক পরের কথা। রুমালটা আপনি নিয়েছিলেন কিনা সেটা বলুন?

—অন্যের ব্যবহৃত রুমাল ব্যবহার করতে আমার ঘেন্না করে।

—কী রঙের রুমাল ছিল মনে আছে।

—আজ্ঞে না।

—আপনি সেদিন মানে বিশ্বকর্মা পূজোর দিন কত রাতে বাড়ি ফেরেন?

একটু চিন্তা করে রূপম বলল, —রাত সাড়ে এগারোটা কি পৌনে বারোটা হবে।

—কিন্তু যাদবের বডি হসপিট্যালে চলে গিয়েছিল রাত সাড়ে নটার আগে। পুলিস রিপোর্ট তাই। তাহলে এই ঘন্টা দুই আপনি কোথায় ছিলেন?

—পুলিস চলে যাবার পর আমি আর দিগন্ত কারখানা বন্ধ করে দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। দিগন্ত বাড়ি ফিরে যায়। আমি হসপিট্যালে যাই। যাদবের খোঁজ নেবার জন্যে। তারপর বাড়ি ফিরি।

—খোঁজ নিয়েছিলেন যাদবের?

—হ্যাঁ। ইমারজেন্সী বলল বডি ওটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—ড্যাম লাই। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

—কেন স্যার?

—আপনি সেদিন হসপিট্যালে যাননি। বডি হসপিট্যালে নিয়ে গিয়েছিল পুলিস। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। যেহেতু বডির সঙ্গে তার কোন পরিচিত বা আত্মীয় স্বজন কেউ ছিলনা, পুলিসই বডি পোস্টমর্টেমের জন্যে পাঠিয়ে দেয়।

—না, মানে, আমাকে তো সেইরকমই বলল, স্নানে ওই কাউন্টারে যিনি ছিলেন।

—এবার বলুনতো ইয়াসিনকে কেন খুন করলেন?

—এ আপনি কী বলছেন স্যার? ইয়াসিনকে আমি কেন খুন করতে যাব? আমার সঙ্গে তার কোন বচসাও হয়নি। কোন ঝগড়া বিবাদও হয়নি। ওকে মেরে আমার কী লাভ?

—এটাই তো মিলিয়ান ডলার কোয়েশ্চেন। আপনার মোটিভটা কী?

—স্যার, বিশ্বাস করুন আমি কাউকে কোনদিন খুন করার কথা ভাবতে পারিনা।

—কিন্তু আপনার পাস্ট হিস্ট্রি অন্য কথা বলছে। আজ থেকে দু বছর আগে একটা জুয়ার ঠেকে, আপনি যখন প্রচুর টাকা হেরে যাচ্ছিলেন, তখন একজনকে গলা টিপে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন। বরাত জোরে সে বেঁচে যায়। কথাটা কী মিথ্যে?

বোকা বোকা মুখে রূপম নীলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—ঠিক আছে, আপনি এখন আসতে পারেন। আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন। আর একটা কথা, কোনভাবেই কলকাতা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করবেন না। পুলিস কিন্তু আপনার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

মাথা হেঁট কের রূপম যেন পালাতে পারলে বাঁচে এইভাবে চলে গেল। ও চলে যেতেই দীপু বলল, —তাহলে এই কী ইয়াগো?

—কিন্তু সেটা তো প্রমাণ করতে হবে।

—ওর পাস্ট ক্রাইম রেকর্ড তুমি জানলে কী করে?

—মৃগেন চক্রবর্তীর দৌলতে।

—মানে বটতলা থানার ওসি?

—হুঁ।

বেশ ঠমকি ঠমকি চালে ঝুমা এসে সামনে দাঁড়াল। বছর বাইশ তেইশ মতো বয়স। সারা শরীরে যৌবন প্রকট। ডুরে শাড়ি পেঁচিয়ে পড়তে যৌবনরেখা আরও স্পষ্ট। গায়ের রঙটা শ্যামলা। মুখ চোখে একটা টসটসে ভাব।

—বাবুরা আমায় ডেকেছেন?

নীল বলল, —হ্যাঁ, বোস। তোমার মা আগে এ বাড়িতে কাজ করতো?

—হ্যাঁ বাবু। আমিও করতুম।

—তারপর রূপম তোমায় বিয়ে করল।

—সে বাবু অনেক কথা। আমার সঙ্গে মিশত। তারপর যেই আমার মা বিয়ের কথা বলল তখন বাবু বেঁকে বসলেন। তখন আমি ঝিয়ের মেয়ে হয়ে গেলুম। তারপর পাড়ার লোক এসে যখন হামলা করল তখন বাধ্য হয়ে রেজিস্তিরি করল। তবে এখন আর কোন গণ্ডগোল করে না।

—তোমায় মারধোর করে না?

—সে আবার করে না? পান থেকে চুন খসলেই। যেমন শাশুড়ি, তেমনি ননদ তেমনি বর। ননদ তো ভুলেও কোনদিন কথা বলে না।

—আজকাল তো মাঝে মাঝেই তোমার মামাশ্বশুরকে নানা রকম খাবার তৈরি করে খাওয়াতে?

—সে তো বাবু আগেও খাওয়াতুম। মামিমা আসতে কিছুদিন বন্ধ ছিল। তা মামিমার তো আর মামাবাবুর দিকে নজর নেই। মামা যে তালের বড়া খেতে এত ভালবাসে।

একদিনের জন্যে করে খাইয়েছে? সেই আমাকে আবার করে করে খাওয়াতে হয়।

—তোমার মামিমা রাগ করেন না?

—দেখতে পেলে তো?

—তা প্রতিদিন নিয়ম করে এই খাদ্যটি তোমার মামাশ্বশুরকে খাওয়াতে কে বলেছে? তোমার শ্বাশুড়ি না তোমার বর?

—আজ্ঞে দুজনেই। বললেন, মামুর শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মামিমার তো ওদিকে কোন হুঁশ নেই। তিনি তার নাগর নিয়ে ব্যস্ত।

—তালের সঙ্গে কী বিষ মেশাতে?

—ওমা, কী বলেরে! বিষ মেশালে কী এতদিন মামাবাবু বেঁচে থাকতো? এমন কথা শোনাও পাপ গো। দেবতার মতো মানুষটাকে কী বিষ খাইয়ে মারতে পারি?

—ঠিকই তো। সে কী কেউ পারে? তা আজকেও কী মামুর জন্যে স্পেশাল কিছু রান্না করেছ?

—পায়েস করেছি।

—পায়েস? শুধু মামার জন্যেই?

—আর তো তেমন কেউ খায় না।

—ঠিক আছে। ওই পায়েসটা আজ আর তোমার মামুকে দিও না। ওটা আমরা খাব। আপত্তি নেই তো। আমি আবার পায়েস খেতে খুব ভালবাসি।

—কিন্তু ও যদি রাগ করে?

—অতিথি মানুষ। নিজে যেচে খেতে চাইছি। না না তোমার ও একদম রাগ করবে না। দীপু, ওর সঙ্গে যা তো। পায়েসের বাটিটা নিয়ে আয়।

—আচ্ছা। ঠিক আছে। যখন জোর করে খেতে চাইছ। এসো গো বাবু।

দীপুকে সঙ্গে নিয়ে ঝুমা বেরিয়ে গেল। নীলের মুখে মিটিমিটি হাসি। ঝুমার বয়েসী একটি মেয়ে আর তার ঠিক পেছনেই বছর পঞ্চাশের এক মহিলা এলেন। মেয়েটি বৈশালী। দেখতে শুনতে ভাল। মুখে গাম্ভীর্যের প্রলেপ। মহিলা মানে অনুপমা দেবী আর পাঁচজন গৃহিণীর মতোই। পোশাকে আশাকে নিতান্তই ঘরোয়া।

নীল প্রথমেই অনুপমা দেবীকে জিজ্ঞাসা করল, —আপনার তো দুই ছেলে মেয়ে?

অনুপমা বললেন,—হ্যাঁ। বৈশালী আর রূপম।

—রূপমের বিয়েটাতো আপনাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেই হয়েছিল।

—কে আর সাধ করে এমন বিয়ে মেনে নেয় বলুন?

—বৈশালী দেবী, আপনার কী মত?

নীচু গলায় বৈশালী বলল, —যেখানে বড়রা মেনে নিয়েছেন সেখানে আমার তো কিছু বলার থাকতে পারে না।

—ঝুমা মেয়েটি কেমন? বৈশালী আমি আপনাকে জিগ্যেস করছি।

—এবাড়ির কারো সম্বন্ধেই আমি কোন খবর রাখি না।

—সেকী? একবাড়িতে থেকেও?

—এক বাড়িতে থাকলে কী এক মনের মানুষ পাওয়া যায়?

—তাও তো বটে। আপনি কী পড়ছেন?

—এম এ। ফিলসফি নিয়ে।

—আপনার দাদাকে একবার পুলিস অ্যারেস্ট করেছিল। অ্যাটেম্পট টু মার্ডারের অভিযোগে। অবশ্য ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল লোকটি বেঁচে যাওয়ার জন্যে। জানেন কিছু?

—একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। তারপর আর কোন খবর রাখিনি।

—ঝুমার সঙ্গে তো আপনার সম্পর্ক তেমন সুবিধের নয়।

বৈশালী চুপ করে থাকে। অনুপমা উত্তর দেন, —কী করে ভালো সম্পর্ক হবে বলুন? একটা অশিক্ষিত ঝিয়ের মেয়েকে বৌদি বলে ডাকা, বুঝতেই তো পারছেন।

—অনুপমা দেবী, আপনার সঙ্গে ভাবসাব কি রকম?

—ওই যা হয়। শাশুড়ি বউ-এ মিল আর কটা বাড়িতে হয়। তবে ছেলে আর ভায়ের অন্নে বেঁচে আছি। মুখ বুজিয়ে সব কিছু মেনে নিতে হয়।

—আপনার ভাইকে মেরে ফেলার একটা চক্রান্ত চলছে। কে এ কাজ করছে বলে আপনার সন্দেহ?

—খবরটা এই মাত্র আপনার মুখে শুনলাম। এ নিয়ে ভাবার কোন অবকাশই পাইনি। তবে আমার ভাই দেবতুল্য মানুষ। কেন তাকে মারবে? কে মারবে?

—কেউ একজন। আপনার ভাই না থাকলে যার লাভ বেশি।

—আমি ঠিক বলতে পারব না।

—বৈশালী আপনি কিছু গেইস করতে পারেন?

—আগেই বলেছি, এ বাড়ির কোন ব্যাপারে আমি থাকি না। থাকতেও চাই না।

—অনুপমা দেবী, আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করব, আপনার ভ্রাতৃবধূ মহিলা কেমন?

—ভালোই তো। একটু গানবাজনা নিয়ে থাকে। তা কিছু একটা নিয়ে তো তাকে থাকতে হবে।

—কিন্তু দিগন্তবাবুর সঙ্গে আপনার ভাইয়ের স্ত্রীর এত অন্তরঙ্গ মেলামেশায় আপনার কিছু মনে হয়নি।

—খারাপ ভাবলেই খারাপ। নইলে কিছুই নয়। তাছাড়া আমি তো জানি প্রীতি ওর বরকে খুব ভালোবাসে।

—বৈশালী দেবী, দিগন্তবাবুকে নিশ্চয়ই দেখেছেন। আপনার কী মনে হয়?

পায়েসের বাটি নিয়ে দীপু আগেই ফিরে এসেছিল। নীলের প্রশ্নে ও সরাসরি বৈশালীর

দিকে তাকাল। দিগন্ত প্রসঙ্গে ওর মুখটা রক্তিম হল। এ রক্তিমতা কী রাগ না অনুরাগ? দীপুর মাথায় কিছু ঢুকল না। তাকাল নীলের দিকে। নীলের মুখে মিটিমিটি হাসি। বৈশালী অধোবদন। নীল ফের জিগ্যেস করল, —দিগন্তবাবুকে কেমন মনে হয়? ও কী কাউকে খুন করতে পারে?

অধোবদনা বলল, —আমি ঠিক জানি না।

—ঠিক আছে। আপনারা এবার আসতে পারেন। ও হ্যাঁ, কালবোসবাবুকে বলে দেবেন, এই পায়েসের বাটিটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি। আমি আর আমার স্ত্রী আবার পায়েসের খুব ভক্ত। বাটিটা আবার ফেরৎ দিয়ে যাব।

অনুপমা বললেন,—ওমা সেকী কথা? আপনি পায়েস খেতে ভালবাসেন আগে বলবেন তো। আমি নিজে হাতে আপনার জন্যে তৈরি করে রাখতাম। ওইটুকু পায়েস দুজনে কী করে খাবেন?

—পরমান্ন অল্পই ভাল। আজ আমরা চলি। পারেন তো ভাইয়ের দিকে একটু নজর রাখবেন।

সতেরো

নীল গাড়ি নিয়ে এসেছিল। পাশে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে দীপু বলল, —তোমার নাটকে ওথেলোকে চিনতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ডেসডিমোনার চরিত্র স্খলন ঘটে গেছে।

—কী করে বুঝলি? মেয়েদের এত তাড়াতাড়ি চেনা যায়?

—হয়তো যায় না। কিন্তু সম্প্রীতি সম্বন্ধে ঝুমা কী বলল শুনলে?

—এই ধরনের মেয়েদের চরিত্র এইরকম। আবার অন্য কথা বললেন অনুপমা দেবী। কারটা ধরবি? কে সত্যি বলছে আর কে সত্যিটাকে এড়িয়ে যাচ্ছে এটা বোঝাই তো সমস্যা। তবে এটা ঠিক, ওথেলোর মনে অবিশ্বাসের ছায়া নেমে এসেছে। সেটা করেছে ঝুমা। এবং ইয়াগোর নির্দেশে।

—ইয়াগোকে চিনতে পেরেছ?

—তোরও পারা উচিত। কিন্তু ইয়াগো কী চায়? আর একটা নতুন ওথেলো বৃত্তান্ত। তাহলে যে পরিণতিটা ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

—কিন্তু এই ইয়াগো কী চাইছে?

—শেক্সপীয়রের ইয়াগো যা চেয়েছিল। এক ঢিলে তিনটে পাখি বধ।

—এতে ইয়াগোর লাভ?

—হ্যাঁ। মোটিভ? মোটিভটা কী? ওথেলো আর ডেসডিমোনা যদি বেঁচে না থাকে তাহলে আইনত ইয়াগোই হবে সম্পত্তির মালিক। এখানে ইয়াগোর প্ল্যানটা একইরকম

আছে। ক্যাসিও আর ডেসডিমোনার কল্পিত অনুরাগ ওথেলোর কানে ঢোকানো হল। ওথেলোর মন সন্দেহের বিষে জর্জরিত। হ্যাঁরে দীপু, কালবোস আবার খুনটুন করে বসবে নাতো?

—মনে তো হয়না। আজকের ওথেলোরা কী এত সেন্টিমেন্টাল হবে? তবে বলা যায় না। যে হারে চারদিকে সামান্য কারণে খুন ডাকাতি হচ্ছে। কিন্তু তুমি এই ইয়াগোকে পাকড়াও করবে কী ভাবে? অবশ্য ওর এগেনস্টে একটা পুলিস রেকর্ড আছে।

—হ্যাঁরে পায়েসের বাটিটা কোথায়?

—আছে।

—আজ ওটাকে ফ্রীজে রেখে দে। কালই ল্যাবটেস্টে পাঠাতে হবে। যদি ওর মধ্যে পয়জনাস কিছু থাকে ওটা একটা বিরাট প্রমাণ হিসেবে দাঁড়াবে। কিন্তু আমি চাই কোন অঘটন ঘটার আগেই ওকে হাতে নাতে ধরতে।

—সেটা কী?

—আমায় একটু ভাবতে দে।

কিছুক্ষণ এক মনে গাড়ি চালাতে চালাতে নীল বলল, —ঝুমা মেয়েটি কিন্তু খুব সাংঘাতিক।

দীপু বলল, —আমার তো মনে হয় ও হচ্ছে পুতুল নাচের পুতুল। যেমনভাবে নাচানো হচ্ছে সেইভবেই নাচের খেলা দেখাচ্ছে।

—ইউ আর রাইট।

—তবে নীলদা, স্টীয়ারিং হাতে বেশি অন্যমনস্ক হয়ো না। বাড়ি ফিরে নিরিবিলিতে বসে চিন্তা করো।

—এগেন ইউ আর রাইট।

কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। গাড়িটা একদা থিয়েটার পাড়ার মুখে আসতেই নীল বলল, —একবার ইয়াসিনের ঘরটা দেখে গেলে হোত।

—এত রাত্রে আবার ইয়াসিনের ঘর দেখতে যাবি? সে ঘর নিশ্চয়ই পুলিস তালাবন্দী করে রেখেছে।

কথা বলতে বলতেও ও ডানদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দিয়েছে। রঙ্গনা আর বিজন থিয়েটার পার করে সারকারিনার কাছে এসে বলল, —মৃগেন এখন থানায় থাকলে হয়।

—ওদিকে বউদি কিন্তু বাড়িতে একা।

পকেট থেকে মোবাইলটা দীপুর হাতে গছিয়ে দিয়ে নীল বলল, —নন্দিনীকে একটা ফোন করে দে। আমরা ঘন্টা খানেকের মধ্যে পৌছে যাচ্ছি।

দীপু ফোন করতে করতেই ওরা বটতলা থানার সামনে পৌছে গেল। নীল বলল, —তুই বোস। আমি এখুনি আসছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে নীল ফিরে এল। দীপু জিগ্যেস করল, —চাবি পেলে?

—হুঁ। এই ভদ্রলোকের হাতে আবার চাবিটা দিয়ে দিতে হবে। এই যে ভাই, আপনি পেছনে বসুন। আপনার নামটা কী?

কনস্টেবলটি বলল, —বিজন দাস।

—ইয়াসিন বলে একটা লোক খুন হয়েছিল। সে ঘরটা আপনি চেনেন?

—হ্যাঁ স্যার। সেদিন আমিই তো বড় সাহেবের সঙ্গে ছিলাম।

—আপনি তাহলে একটু রাস্তার ডিরেকশনটা দিয়ে যান। এদিকের রাস্তা আমার অচেনা।

—ঠিক আছে স্যার। আপনি বিধান সরণী ধরে সোজা চলুন। তারপর আপনাকে বলছি।

স্কটিশচার্চ স্কুল আসতেই বিজন দাস বললে,—এবার বাঁদিকে সোজা গিয়ে ডানদিক মোড় নেবেন। ঈশ্বর মিল লেন। ওখানেই গাড়ি দাঁড় করাতে হবে। তারপর একটু হেঁটে বস্তির মধ্যে ঢুকতে হবে।

ইয়াসিনের ঘর তালাবন্ধ। লাগোয়া আরও কয়েকটা একতলা। তারপরই একটা দোতলা টিনের চালা দেওয়া বাড়ি।

বিজন দাস গিয়ে দরজা খুলল। পুলিস দেখে অত রাতেও দুচারজন করে লোক জমতে শুরু করল। নীল কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটা ভ্যাপসানো গন্ধ। সেটা ঘর বন্ধ থাকার জন্যেই। টর্চ জ্বেলে সুইচ অন করল।

অত্যন্ত সাদামাটা ঘর। একটা তক্তাপোষ পাতা আছে। তার ওপর বিছানা বালিশ। একদিকের দেওয়ালে একটা ছোট্ট আয়না। ওই দেওয়ালেরই এক পাশে একটা দেওয়াল আলনা। কয়েকটা শার্ট আর পাজামা ঝুলছে। তার ঠিক নীচেই এক জোড়া চামড়ার চপ্পল। একজোড়া সস্তা রবারের চটি এলোমেলো। অন্য দিকের দেওয়ালে একটা ছোট্ট সস্তা কাঠের আলমারি। আলমারির গায়ে চাবি লাগানোই ছিল। আলমারির মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। কিছু খালি মদের বোতল। কিছু ভাঁজ করা শার্ট প্যান্ট। শার্টগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে কয়েকটা জিনিস বের হল। একটা মেয়ের ছবি। কিছু বাংলায় লেখা চিঠি। তুমি কেমন আছো। কতদিন আসোনি। টাকা পাঠিও। আমি ভাল আছি গোছের চিঠি। ছবিটি আটপৌরে মেয়ের। সালোয়ার কামিজ পড়া। একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো ইয়াসমিনের বউ এর ছবি। সেগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে নীচের তাকে চলে এল। গোটা দুয়েক কম্বল। কম্বল ঘাঁটতে গিয়ে বের হল একতাড়া নোট। আর একটা ভাঁজ করা চিঠি। চিঠিটাও বাংলায় লেখা। লেখা একটাই মাত্র লাইন। এটা এখন রাখ। বাকিটা পরে। একশটাকার নোট। বাইশখানা।

বিজন দাস পাশেই ছিল। নীল জিগ্যেস করল, —এগুলো আপনার সাহেব দেখেননি?

বিজন বলল, —না বোধহয়। সাহেব এখন একটা রেপ কেস নিয়ে খুব ব্যস্ত। এখানকার এম এল এর শালার মেয়ে। কয়েকজন মিলে তাকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে খুন করেছে। বুঝতেই পারছেন এম এল এর শালা। প্রেফারেন্স বেশি পাবেই। কোনমতে চোখ বুলিয়ে গেছেন আর কি?

—ঠিক আছে। টাকাগুলো আমি যথাস্থানে রেখে দিচ্ছি। কিন্তু এই লেখাটা আমার দরকার। আপনার সাহেবকে বলে দেবেন আমার কাজ হয়ে গেলে আমি আবার এটা আপনার বড়সাহেবকে দিয়ে দোব।

—ঠিক আছে স্যার। বড় সাহেব আমাকে সব বলেই দিয়েছেন। আপনার প্রয়োজন মতো আপনি সবকিছুই নিতে পারেন। কেবল লীস্টটা আমায় দিয়ে দেবেন।

ঘরের মধ্যে আর কিছু দেখার ছিল না। নীল বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হতে ও নীচু হয়ে তক্তাপোশের নীচে টর্চের আলো ফেলল। একেবারে শেষপ্রান্তে দেওয়াল ঘেঁষে কিছু একটা পড়ে আছে। বিজনের দিকে তাকিয়ে নীল বলল, —সম্ভবত খাটের তলাটাও তেমনভাবে খুঁটিয়ে দেখা হয়নি। জিনিসটা একটু বার করা যাবে?

—ইয়েস স্যার। আমি বার করে দিচ্ছি।

বিজন স্প্রিংয়ের মতো ছিট্‌কে তক্তাপোষের নীচে ঢুকে গেল। টেনে নিয়ে এল একপাটি চটি।

চটিটা বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। সাধারণ চটি। চারদিকে রক্তের দাগ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। ফিরে গেল যেখানে অন্য দুজোড়া জুতো পড়েছিল। মেপে দেখল। মাপে আকাশপাতাল তফাৎ। স্বগতোক্তির মতো ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, —তাহলে চটিটা কার?

বিজয় দাস শুনতে পেয়েছিল। বলল,—তাতো স্যার বলতে পারব না?

—আপনার সিজার লীস্টে এটাও ঢুকিয়ে নিন।

বিজন বলল, —স্যার কার না কার চটি? ওটা হাতে করে নিয়ে যাবেন?

—যেতেই হবে দাসবাবু। অনেক সময় সামান্য একটা পোড়া সিগারেটও, আরে হ্যাঁ তাই তো। মিস্টার দাস, একবার খুঁজে দেখবেন, কোথাও পোড়া সিগারেট বা বিড়ি পড়ে আছে কিনা?

বিজন দাস আর দীপু দুজনেই খোঁজা শুরু করল। খান দশেক পোড়া বিড়ি আর একটাই মাত্র আধপোড়া সিগারেট পাওয়া গেল।

নীল জিগ্যেস করল, —ব্র্যাণ্ডটা পড়া যাচ্ছে?

দীপু বলল—দামি সিগারেট গো। মার্লবোরো।

—দাস সাহেব, ওটাও আপনার লীস্টে লিখবেন। বিড়ি গুলো নেবার দরকার নেই। বোঝাই যাচ্ছে ইয়াসিন বিড়ির ভক্ত ছিল।

হঠাৎ বিজন দাস বলল, —স্যার একটা কথা বলব?

—হ্যাঁ, কেন বলবেন না। বলুন।

—আমি স্যার একজন সামান্য কনস্টেবল। আমাকে দাস সাহেব বলে ডাকবেন না। যদিও আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি। তবু, একটা পদমর্যাদার ব্যাপার আছে তো?

নীল সামান্য হেসে বিজনের পিঠ চাপড়ে বলল, —ঠিক আছে ভাই। তোমায় আমি পরে দেখা হলে বিজন বলেই ডাকব। এখন চলো। এখানকার কাজ শেষ।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বিজন জিগ্যেস করল, —স্যার, খুনিকে ধরতে পারবেন বলে আপনার মনে হয়? আমাদের বড়সাহেবতো এটা নিয়ে মাথাই ঘামাচ্ছেন না।

—নন ইমপর্ট্যান্ট কেস। হয়তো সেই জন্যেই। ইয়াসিন তো আর কোন এম এল এর শালা নয়। মৃগেনের কোন দোষ নেই। একই এলাকায় যদি একই সঙ্গে দশ বারোটা খুন জখম হয়, পুলিস আর কটা দিক দেখবে? ঠিক আছে। অনেক রাত হল।

—আপনি স্যার কতদূর যাবেন?

—সেই নিউ আলিপুর। অনেকদূর।

বাইরে তখন বেশ ছোটখাটো একটা জটলা। নীল একবার লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে একজন মাঝবয়েসী লোককে কাছে ডাকল,—এই ঘরের বাড়িওয়ালা কে?

লোকটি বলল—ঘনশ্যাম দা।

—উনি কী এখন বাড়িতে আছেন?

—আছেন। একটু আগেই তো এখানে ছিল।

—একটু ডাকা যাবে?

—আপনি দাঁড়ান, আমি ডেকে আনছি।

—আর একটা কথা।

—হ্যাঁ বলুন।

—ইয়াসিনের পাশের ঘরটা তো বন্ধ দেখছি। যে বউটি প্রথম বডিটা দেখেছিল তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—পুলিসের ভয়ে বোধহয় দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি ডেকে দিচ্ছি।

লোকটি গিয়ে বন্ধ দরজায় ঘা দিতে লাগল, —বঙ্কুদা, দরজাটা খোল। পুলিস থেকে লোক এসেছে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে।

ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল। শীর্ণকায় মধ্যবয়সী একটি লোক বেরিয়ে এল। নীল আগের লোকটিকে বলল, —আপনি দেখুন বাড়িওলা ভদ্রলোককে পান কিনা। আমি ততক্ষণ এঁর সঙ্গে একটু কথা বলি।

লোকটি চলে গেল। নীল বঙ্কু নামধারী লোকটিকে জিগ্যেস করল, —একজন মহিলা প্রথম ইয়াসিনের বডি টা দেখেছিল। তিনি কোথায়?

বঙ্কু নামক ব্যক্তিটি রীতিমতো কাঁপছিল। নীল হেসে বলল,—আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। যিনি দেখেছিলেন তিনি আপনার কে হন?

—আজ্ঞে আমার বউ। ওর কিন্তু কোন দোষ নেই।

—ওনার কোন দোষ নেই সে তো আমরা জানি। আপনি নির্ভয়ে ওঁকে ডাকতে পারেন।

বছর চল্লিশের এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনিও ভয়ে জড়োসড়ো। মহিলা বললেন, —আজ্ঞে বাবু, আমি ইয়াসিনকে খুন করিনি।

নীল বলল, —ইয়াসিনকে ওইভাবে খুন করতে গেলে যে শক্তি আর সাহসের দরকার সেটা আপনার নেই। আমি ওসব জিগ্যেস করতে আসিনি। আপনি তো পাশের ঘরেই থাকেন। সে রাত্রে কোন অস্বাভাবিক আওয়াজ বা ধস্তাধ্বস্তির শব্দ পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ বাবু, একটা ধস্তাধ্বস্তির আওয়াজ পেয়েছিলুম। আর ইয়াসিন খুব খিস্তি দিচ্ছিল।

—তা আপনি আর সবাইকে ডাকলেন না কেন?

—এতো বাবু নিত্যি লেগেই ছিল। ঘরের মধ্যে বসে বসে ইয়ারবাজদের নিয়ে রোজই মদ খেতো আর গালাগালির চূড়ান্ত করে ছাড়তো। রোজকার ব্যাপার। তাই আর ওদিকে মন দিইনি।

—তা আপনারা কিছু প্রতিবাদ করতেন না?

—কে করবে? ও তো একটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। কেউ ওকে ঘাঁটাতো না। তবে ওকে না ঘাঁটালে ও-ও কারো সাতে পাঁচে থাকতো না। তবে লোকটার একটা গুণ ছিল, পেটে মদ না পড়লে একেবারে মাটির মানুষ।

—সে রাত্রে কাউকে পালিয়ে টালিয়ে যেতে দেখেছিলেন?

পেছন থেকে একটি উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে বলল, —আমি দেখেছি বাবু। একটা ঝাঁকড়া চুলের লোক। হুটপাট করে বেরিয়ে গেল।

—কী রকম দেখতে লোকটাকে?

—তেমন ভালা মনে নেই। খুব বেশি লম্বা নয়। একটু নাদু নাদু চেহারা। রঙটা ফর্সা।

—জামা কাপড় কী পড়েছিল?

—আজ্ঞে শার্ট প্যান্ট।

—পায়ে জুতো ছিল?

—বোধহয় ছিল। শার্ট প্যান্ট পরা লোক। পায়ে জুতো থাকবে না?

—তখন রাত কত হবে?

—তা ধরুন গিয়ে সাড়ে দশটার পর। না এগারোটা হবে। একটা সিরিয়াল শেষ হল। আমিও কেলাব ঘর থেকে বেরিয়েছি। লোকটা হুড়মুড় করে চলে গেল।

ইতিমধ্যে বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক এসে গিয়েছিলেন। নীলকে জিগ্যেস করলেন, —আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার?

—হ্যাঁ। ইয়াসিন কতদিন আপনার ঘর ভাড়া নিয়েছিল?

—তা বছর পাঁচেক হবে।

—ওর বউ ছেলে মেয়ে নেই?

—বছর দুয়েক আগে একবার বউকে এনেছিল। তারপর তো আর আসেনি।

—ওর দেশ কোথায় জানেন?

—বলতো তো দ্বারভাঙ্গা।

—ভাড়া টাড়া ঠিক মতো দিতো?

—হ্যাঁ স্যার। সে ব্যাপারে একেবারে দিলদার। মাস কাবার হতে না হতেই নিজে এসে টাকা দিয়ে যেত।

—রোজই কী মদের আসর বসাতো?

—আসরটা মাঝে মাঝে বসতো। তবে মদ খাওয়াটা ওর নিত্য অভ্যেস। কিন্তু স্যার, সে তো মরেই খালাস। তা আমার ঘরটা আর কতদিন আটকে থাকবে?

—এ ব্যাপারে থানার বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলুন।

দীপু তাগাদা দিল, —এবার চলো নীলদা। রাত এগারোটা হল।

—হ্যাঁ চল্। চল বিজন। মৃগেনকে বোল পরে ওর সঙ্গে আমি দেখা করব। তোমায় আর থানায় পৌঁছে দিতে হবে নাতো?

—না না স্যার। থানা তো হাত বাড়ালেই। আপনি যান স্যার। আপনাকে অনেকটা যেতে হবে।

আঠারো

দিন পাঁচেক পরের ঘটনা। নন্দিনী আর দীপু বেরিয়ে গেছে যে যার কাজে। তবে আজ আর নীল একা নয়। ওপরের ঘরে বসে এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিল। এমন সময় নয়না এসে খবর দিল বিকাশ তালুকদার এসেছেন। মনে মনে নীল হয়তো বিকাশবাবুকেই চাইছিল।

বিকাশই বললেন,—আপনি তো তাহলে দু দুটো খুনের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো।

আবার নীলকে সব কিছু খুলে বলতে হল। সব শুনে বিকাশ বললেন, —তাহলে তো ইমিডিয়েট ছোকরাকে অ্যারেস্ট করা দরকার।

—তার আগে যে দুটো জিনিস আপনাকে ভেরিফাই করে নিতে হবে। ফুটপ্রিন্টটা মিলিয়ে নেওয়া আর হাতের লেখা চিঠিটা।

—সে আর করতে কতক্ষণ? ছোকরাকে থানায় তুলে আনলেই হয়ে যাবে।

—না তালুকদার বাবু, আমি চাইছি ওর সেল্‌ফ্ কনফেশন। ওর নিজের কাছ থেকেই সব শুনতে চাই। খুন ছাড়াও যে আরও একটা বড় ক্রাইম করতে যাচ্ছিল সে। নিজের হাতে করতো না। কিন্তু ঘটনাগুলো আপনা আপনিই ঘটে যেত। এ সমস্ত লোক খুব ডেইনজেরাস হয়।

এমন সময় পরিচিত সুরে মিউজিক বেজে উঠল নীলের মোবাইলে। ভিউ স্ক্রীনে দেখল কালবোসের বাড়ির নাম্বার।

—হ্যাঁ, নীল ব্যানার্জি বলছি।

ওপাশের থেকে সম্প্রীতির গলা—ব্যানার্জি সাহেব, আপনি যেখানেই থাকুন এক্ষুনি আমার বাড়ি চলে আসুন।

—কেন? নতুন কিছু আবার ঘটল নাকি?

—সে অনেক কিছু। আপনি এক্ষুনি আসুন। আমি ফোনে সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারব না। শুধু জেনে রাখুন আমার বড় বিপদ।

—আমি এক্ষুনি আসছি।

মোবাইল অফ্ করে নীল বলল, —এখুনি আপনার পাড়ায় যেতে হবে।

—হোয়াটস্ রং? হোলটা কী?

—চলুন। যেতে যেতে বলছি। দাঁড়ান, তার আগে চটিটা নিয়ে নিই। আর ওপরের ঘরে আমার এক বন্ধু আছে। তার একটু ব্যবস্থা করে আসি।

কালাচাঁদ পতিতুণ্ডি লেনে কালবোসের বাড়িতে যখন ওরা পৌঁছল তখন প্রায় বারোটা বাজে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। নীলের ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলল, একটা বড় রকমের অঘটন কিছু ঘটেছে।

কলিং বেল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে আজ এসে দরজা খুলল বৈশালী। তার চোখ লাল। সম্ভবত কান্নাকাটি করেছে। আজ আর আপনি নয়, একেবারে তুমি দিয়ে শুরু করল নীল, —তুমি আজ কলেজ যাওনি?

একটু ধরা গলায় বৈশালী বলল, —আপনি ওপরে যান। মামিমা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। খুব কান্নাকাটি করেছেন।

—তোমার দাদা কোথায়?

—বোধহয় নিজের ঘরেই আছে।

নীল বিকাশ তালুকদারের দিকে তাকাল। চোখে চোখে দুজনের কথা হয়ে গেল। তালুকদার শুধু বললেন, —ঠিক আছে। আপনি ওপরে যান।

দুটি প্রাণী ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না। জানলার বাইরে চোখ রেখে অদ্ভুত উদাস ভঙ্গীতে বিছানার ওপর বসে ছিল সম্প্রীতি। ঘরের এককোণে একটা চেয়ারে মাথা নীচু অবস্থায় দিগন্ত।

নীল ডাকল, —মিসেস বসু।

ধীরে ধীরে নীলের দিকে মুখ ফিরিয়ে সম্প্রীতি বলল, —আপনি এসেছেন। বসুন।

নীল গিয়ে একটা চেয়ারে বসতে বসতে জিগ্যেস করল, —এত জরুরী তলব? কী হয়েছে মিসেস বসু?

কিছু না বলে কোলের ওপর পড়ে থাকা একটা চিঠি নীলের দিকে এগিয়ে দিয়ে শুধু বলল, —এটা পড়ুন।

কালবোসের প্যাডে লেখা একটা চিঠি। নীচে কালবোসের সই। নীল চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

প্রীতি,

আমি জানি আমি এক কদাকার পুরুষ। ভুলেও কোন মেয়ের দিকে ফিরে তাকাতাম না। তুমি যেদিন আমাকে প্রথম ভালবাসার কথা জানিয়েছিলে, আমি বিশ্বাসই করিনি। তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমাকে ভালবাসবে এটা অনেকটা ঈশ্বরকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়ার মতো। অবিশ্বাস্য ঘটনা। তবু সেটা ঘটল। তোমার ভালবাসায় আমি কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন ভেবেছিলাম আমি সত্যিই স্বর্গটাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি।

কিন্তু সেদিন বুঝিনি একটা বিষাক্ত সাপকে আমি আমার ঘরে এনে তুলেছি। কেন এমন করলে আমার সঙ্গে প্রীতি? দিগন্ত তোমার ছোটবেলার প্রেমিক একথা আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। কেননা আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করতাম। তোমার সব আবদার আমি রেখেছি। দিগন্তর করুণ অবস্থার কথা জানিয়ে তুমি ওকে গানের শিক্ষক হিসাবে রাখতে চেয়েছিলে। যোগ্যতার চেয়েও বেশি টাকা দিয়ে রেখেছিলাম। তোমার কথায় ওকে আমি ম্যানেজারের চাকরি পর্যন্ত দিয়েছি।

আমায় বললেই পারতে, তুমি ওকে আজও ভালবাস। ওকে তুমি ভুলতে পারনি। কিন্তু আমার বিশ্বাসকে পায়ে মাড়িয়ে আমারই ঘরে বসে দিনের পর দিন, প্রীতি, আমি তো মানুষ। কদাকার হলেও রক্ত মাংসের মানুষ। আমাকে প্রতিদিন একটু একটু করে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা কেন করতে গেলে? কী জন্যে? টাকা, গাড়ি, বাড়ি, ব্যবসা এসবের জন্যে?

তাই হোক। সব আমি তোমার জন্যে রেখে গেলাম। আলমারিতে আমার উইল রেখে গেছি। এখন থেকে তুমি সব কিছুর মালিক। দিগন্তকে বিয়ে করে তুমি সুখী হও। তোমার সুখই তো আমার ভালবাসা।

ইতি, কালবোস।

চিঠি পড়া শেষ করে নীল বলল, —ভুল, ভুল। বিরাট ভুল। হিসেবের ভুল। একজন বিজ্ঞ মানুষ হয়েও—। মিসেস বসু, দিগন্তর ব্যাপার নিয়ে আপনাকে উনি কোনদিনও কিছু জিজ্ঞাসা করেননি?

প্রায় কান্নাজড়ানো গলায় সম্প্রীতি বলল, —না। তাহলে তো সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যেতো। ওযে ভেতরে ভেতরে এভাবে জ্বলে পুড়ে মরছিল তা আমাকে কোনদিন বুঝতেও দেয়নি। নীলাঞ্জনবাবু, আমি এখন কী করব? কোথায় ওকে খুঁজে পাব? কী করে আমি ওকে জানাব দিগন্তকে আমি দাদার মতো শ্রদ্ধা করি। আমার নিজের কোন ভাই নেই। ওকে আমি সেই ভাইয়ের আসনটাই দিয়েছিলাম। কী করে আমি ওকে জানাব দিগন্তর ছন্নছাড়া জীবনটাকে আমি প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছিলাম। ওর সঙ্গে আমি বৈশালীর বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম। আপনার বিশ্বাস না হলে আপনি বৈশালীকে ডাকুন। দুজনকে একসঙ্গে বসিয়ে আমি ওদের জিগ্যেস করেছিলাম কিনা? ওদের দুজনের বিয়েতে মত আছে কিনা তাও জেনেছি। নীলাঞ্জনবাবু, আপনিও কি বিশ্বাস করবেন না, আমার স্বামীকে আমি পাগলের মতো ভালবাসি। অমন সুন্দর উদার মনের মানুষ আমি আর একজনকেও দেখিনি। কেন? কেন ও আমাকে বিশ্বাস করতে পারল না? ও কী করে ভাবতে পারল যে ওকে আমি একটু একটু করে বিষ খাইয়ে মারতে চাইছি? এর পর তো আমি নিজেকেই ক্ষমা করতে পারব না।

সামান্য সময় নিয়ে নীল বলল, —ভুল আপনিও করেছেন মিসেস বসু। সে সব কথা এখন থাক। আচ্ছা, এর মধ্যে আপনার স্বামী কী কোনদিনও আপনাকে রুমালের প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

—হ্যাঁ। সেই সবুজ রুমাল। আপনাকে তো বললামই একটা দিগন্তকে দিয়েছি আর একটা কোথাও খুঁজে পাইনি। বোধহয় হারিয়ে গেছে।

—একথা আপনার স্বামীকে বলেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—এটাও ভুল। এনিওয়ে উনি কোথায় যেতে পারেন বলে আপনার বিশ্বাস?

—জানি না। সম্ভবপর সব জায়গাতেই খবর নিয়েছি। ইভন্ পুলিসকেও জানিয়েছি। নীলবাবু, আমার স্বামী বেঁচে আছেন তো?

—এতটা অবুঝের মতো কাজ করবেন বলে তো আমার মনে হয় না। কিন্তু—

—হ্যাঁ, কিন্তু আমার স্বামী তো একটা কমপ্লেক্সে ভুগেছেন সারাজীবন। যার জন্যে উনি ভীষণ সেন্টিমেন্টাল।

—মিসেস বসু, আমার কাছে এখন সমস্ত ব্যাপারটা স্বচ্ছ জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। কার জন্যে, কী কারণে এত কিছু ঘটেছে সেটাও পরিষ্কার। কিন্তু সবার আগে দরকার আপনার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া। তারপর আমি সব রহস্যের যবনিকা টানব। কিন্তু মিস্টার বোস কোথায় যেতে পারেন, কোথায়? এমন কোথাও কী যেখানে আপনি ভুলেও খোঁজ করবেন না? আছে এমন জায়গা?

—আমার মাথায় কিছু আসছে না।

দিগন্তর দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, —দিগন্ত, তুমি কিছু ভাবতে পার?

দিগন্ত বলল, —সরি, আমি স্যারের কতটুকুই বা জানি? কিন্তু উনি আমায় সারাজীবনের মতো একটা কলঙ্কের মধ্যে ডুবিয়ে গেলেন।

হঠাৎ নীল বলে উঠল, —ওভাবে দরজার আড়াল থেকে কথা শুনতে নেই বৈশালী। এস ভেতরে এস।

অত্যন্ত সলজ্জ ভঙ্গিতে বৈশালী এসে ঘরে ঢুকল। নীল বলল, —তোমার মামিমা তোমার জন্যে একটি ছেলে পছন্দ করেছেন। তাকে তোমার পছন্দ?

বৈশালী নীরব। নীল বলল, —বুঝলাম, দিগন্ত তোমার কী মত?

দিগন্ত বলল—সম্প্রীতি হাতে তুলে আমায় যা দেবে তা উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই।

—তাহলে আমাদের হাতে এখন দুটো কাজ। প্রথম কাজ আপনার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া। দ্বিতীয়, আসল কালপ্রিট কে সবার সামনে তুলে ধরা। তালে প্রথম কাজটা সেরে ফেলা যাক।

সবিস্ময়ে সম্প্রীতি বলল, —সেরে ফেলা যাক মানে? আপনি জানেন ও কোথায় আছে?

হঠাৎ বৈশালী বলে উঠল—আমি জানি।

—তুই? তুই জানিস মুখপুড়ি ও কোথায় আছে? এতক্ষণ বলিসনি কেন? কোথায় সে?

—নীলাঞ্জনদার বাড়িতে। উনি আমাকে মুখবন্ধ রাখতে বলেছিলেন।

বড়বড় চোখ দুটোকে আরও বড় করে, অবাক স্বরে তাকিয়ে সম্প্রীতি বলল, —আপনার বাড়িতে?

মৃদু হেসে নীল বলল, —এটার থেকে সেফেস্ট জায়গা আর নেই। এবং এটা হয়েছে আমার প্ল্যানেই। দুটো কারণে আমি ওঁকে আমার বাড়িতে রেখে দিয়েছি। একজন ওঁকে স্লো পয়জনিং করছিল। সেটা যাতে বন্ধ হয়। আর ওই চিঠিটা লেখা, শুধু আপনার মনের কথা জানার জন্যে।

অভিমানী কণ্ঠে সম্প্রীতি বলল, —শুধু আমার মনের কথা জানবার জন্যে আমায় সারারাত কাঁদাবেন?

—জীবনের পরম সম্পদকে পেতে গেলে কিছু যন্ত্রণা, কিছু কান্না তো কাঁদতেই হবে। তাহলে আপনার স্বামীকে আসতে বলি? খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তো?

—আপনি খুব খারাপ লোক, বলে বিছানার ওপর নিজেই দুমদাম করে ঘুষি মারতে লাগল।

—থাক মিসেস বসু, এখন একটা বড় কাজ পড়ে আছে। নীচে পুলিস অফিসার বিকাশ তালুকদার বসে আছেন। তার আগে আমি ফোনটা সেরে নিই।

মোবাইল টিপল নিজের বাড়িতে। ধরেছিল নয়না। —হ্যাঁ, শোন আমি দাদাবাবু বলছি। আমার ঘরে একজন ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। ওঁকে বল ফোন আছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কালবোস এসে ফোন ধরলেন, —কালবোসবাবু, এক্ষুনি চলে আসুন। হ্যাঁ, আপনার নিজের বাড়িতে। দেরি করবেন না।

উনিশ

এখন বিকেল। রাস্তা জ্যাম থাকার জন্যে কালবোসের বাড়ি ফিরতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগে গেছিল। কালবোস কারো সঙ্গে একটিও কথা না বলে সোজা নিজের ঘরে চলে গেছেন। কালবোস বাড়ি ফিরে এসেছেন এই আনন্দে সম্প্রীতি আর বৈশালী দুজনে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। খেতে বসা হয়েছিল এক সঙ্গেই। খাবার আগে নীল কেবল বলল, —একদম নির্ভয়ে সব খাবার চেটেপুটে খেয়ে নেবেন। হ্যাঁ, আমি নীল ব্যানার্জি বলছি। প্রাণ ভরে খান। এবং সব আপনার প্রিয় খাদ্য।

তারপর এল বিকেল। বিকাশ তালুকদার মাঝে একঘণ্টার জন্যে তাঁর দপ্তরে ঢুঁ মেরে এসেছেন। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল। তারা নীচের বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করছে।

কালবোসের দোতলার ড্রইংরুমে এখন সবাই হাজির। অনুপমা দেবী একপাশে গম্ভীর মুখে বসে আছেন। বৈশালী তার পাশে। মাঝে মাঝে সে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল। দিগন্ত সকালে যেখানে বসেছিল সেই চেয়ারেই চুপ করে বসে আছে। রূপম আর ঝুমা এক কোণে বসে উসখুস করছিল। মধ্যে বড় সোফায় নীল, বিকাশ তালুকদার আর কালবোস।

বিকাশ বললেন,—আর দেরি কেন ব্যানার্জি সাহেব। আপনি শুরু করুন।

নীল কিছু বলার আগেই রূপম বলে উঠল, —এ একধরনের পুলিসি জুলুম। আচ্ছামামু সকাল থেকে ঠায় আমায় ঘরবন্দী করে রাখার কী মানে হয় বুঝতে পারছি না। এমনকি ঝুমাকে পর্যন্ত রান্নাঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এ সবের অর্থ কী? ওদিকে কারখানায় কী হচ্ছে কে জানে?

খুব ঠাণ্ডা গলায় নীল বলল, —কারখানার কথা আপাতত মাথা থেকে ঝেরে ফেলে দিন। আপনাদের অসীমবাবু খুব সিনসিয়ার লোক। তার আগে একটা কথা বলি, আপনাকে আটকে রাখার অর্থ কী জানতে চাইছিলেন? অর্থ আছে রূপম বাবু। অনেক গভীর অর্থ আছে।

—তা দয়া করে আপনার গভীর অর্থ ক্লীয়ার করে আমাদের যেতে দিন। পুরো দিনটাই মাঠে মারা গেল। কাল থেকে আবার ঘানিতে জুড়তে হবে। কত কাজ জমে আছে। আচ্ছা মামু, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তুমি ভেল্কি দেখিয়ে কোথায় কেটে পড়েছিলে? সারা বাড়ির লোক দুশ্চিন্তা করছে।

নীল বলল, —আপনারও কী খুব দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল?

—হবে না কেন? আমার একমাত্র মামু। না থাকলে তো সব চাটিবাটি উঠে যাবে।

—কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউ একজন ওনার না থাকাটাই তো চেয়েছিলেন।

—আমাদের মধ্যে? কে সেই লোক?

—আসছি। আমি সেই কথা বলার জন্যেই আপনার মহামূল্যবান দিনটা নষ্ট করে দিলাম। হ্যাঁ, এবার আমার কথাগুলো আপনারা মন দিয়ে শুনুন। প্রথম যেদিন কালবোসবাবু আমার বাড়ি গিয়ে ওনার প্রবলেমের কথা বলেছিলেন, সেদিন আমার সহকারী বন্ধু দীপু, সে আজ এখানে নেই, সে একটা কথা বলেছিলে, দেখো নীলদা, আবার নতুন করে ওথেলো ডেসডিমোনের ঘটনা ঘটে না যায়।

দীপুর কথায় সেদিন কোন মূল্য না দিলেও আজ কিন্তু ব্যাপারটা সেই দিকেই চলে গিয়েছিল। আপনাদের মধ্যেও একজন ইয়াগো আছেন। যিনি চেয়েছিলেন কালবোসবাবুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। মোটিভ একটাই। তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি গ্রাস করা। এ মতলবটা তার অনেকদিন থেকেই ছিল। কিন্তু ডাইরেক্ট খুন নয়। এমনভাবে মারতে চেয়েছিল যাতে করে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। এর মধ্যে হঠাৎ কালবোসবাবু এক সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করে ফেললেন। একজনকে সরালে যে কাজটা হয়ে যেত, এখন এসে গেল দুজন। বোঝার ওপর শাকের আঁটি। শুধু তাই নয়, শেক্সপীয়রের গল্পের মতোই এখানে আবার ক্যাসিও এসে জুটলেন। উজ্জ্বল এক যুবক। তার গুণও আছে। ভাল গান করেন। ডেসডিমোনের সঙ্গে তার বিশেষ সখ্যতা। আমাদের ইয়াগো চেয়েছিলেন পুরনো ম্যানেজার দীনেশবাবু রিটায়ার করলে সেই জায়গাটি তিনি দখল করবেন। কিন্তু হল না।

এখান থেকেই শুরু হল ইয়াগোর চাল। সে চাইল এক ঢিলে তিনপাখি মারতে। সে চালটি কী? ডেসডিমোন আর ক্যালিসওর অবাধ মেলামেশা নিয়ে ওথেলোর কান ভারী করে তোলা। সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া। আর ওথেলোর অজ্ঞাতে তাঁর খাদ্যে, ধীরে ধীরে মৃত্যু হবে এমন একটি বিষপ্রয়োগ করা। স্বাভাবিক ভাবেই ওথেলোবাবু দিন দিন শারীরিক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু ক্যাসিওকে তো বধ করা চাই।

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন কর্মচারিরা সকলেই একটু আধটু আমেজ করার জন্য মদ্যপান করেন। ইয়াগোবাবু এ সুযোগটা হাতছাড়া করলেন না। কর্মচারীদের মধ্যেও ক্যাসিওর বিরুদ্ধে আগে থেকেই বিষোদকার করছিলেন। ইয়াগোর অতি বিশ্বস্ত, একটু গুণ্ডা প্রকৃতির ইয়াসিনকে সে টাকা দিয়ে বশ করে আনছিল। ইয়াসিনের সব বিষয়ে সর্দারি করার টেন্ডেন্সির জন্যে লোকটাকে অনেকেই সুনজরে দেখতো না। যাদব মাহাতোর সঙ্গে ইয়াসিনের একটা প্রচ্ছন্ন বিবাদ লেগেই থাকতো। দুজনেই কাজের লোক। কিন্তু দুজনের কেউই কাউকে সহ্য করতে পারতো না। একটা ইগো কমপ্লেক্স। ইয়াগো সেদিন সকাল থেকে দুজনের বিরুদ্ধে দুজনকে ক্ষেপিয়ে রেখেছিলেন। মদ খেতে খেতে উত্তেজনা ওঠে চরমে। সামান্য একটা বচসা থেকে লেগে যায় দুজনের ক্ষিপ্ত বচসা।

ইয়াগো বাবু কিন্তু স্পটে নেই। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে আমাদের ওথেলোবাবু সেদিন কারখানায় যাননি। বিষক্রিয়ার প্রভাবে তিনি নিস্তেজ। গৃহবন্দী। এ সবই কিন্তু ইয়াগোর প্ল্যান। ওথেলোবাবু সেদিন তাঁর ম্যানেজার ক্যাসিওর ওপর কারখানার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াগো কব্জা করে ফেললেন ক্যাসিওকে। অফিস ঘরে বসে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাইয়ে ক্যাসিওকে প্রায় নেশাবৃত করে ফেললেন। আর ওইদিকে ঠিক সময় বুঝেই যাদবকে উস্কানি দিতেই সে একটা মদের বোতল ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াসিনের ওপর। কিন্তু শারীরিক শক্তিতে ইয়াসিন অনেক বেশি বলবান। যাদবেরই বোতল তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তারই পেটে আমূল বসিয়ে ইয়াসিন পালালো। কলকাতা শহরে ইয়াসিনের ডেরা একটাই। হঠাৎ রাগের মাথায় কাজটা করে ফেলে ইয়াসিন তার বস্তির ঘরে গিয়ে উঠল।

তারপর পুলিস এলো। তাদের কাজ মেটালো। বডি চলে গেল হসপিট্যালে। কারখানা বন্ধ করতে করতে বেজে গেল রাত সাড়ে দশটা।

ভুজুং ভাজুং দিয়ে ক্যাসিওকে ওথেলোর বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। সমস্ত ঘটনাটা ফোনে নিজের ঘরে বসে শোনার পর ওথেলো দুজনকেই বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাত সওয়া দশটার মধ্যে ক্যাসিও চলে আসে ওথেলোর সামনে। সমস্ত ঘটনার জন্যে ওথেলো ক্যাসিওকেই দায়ি করেন। ডেসডিমোনের সামনেই তাকে সাসপেণ্ড করেন। এবং সামনেই তার পদন্নোতির বিষয়টি প্রায় নাকচ করে দেন।

ইয়াগোর কাজ আংশিক সফল হল। কিন্তু এখনও দুটি কাজ বাকি। তার প্ররোচিত দুষ্কর্মের প্রধান হাতিয়ার যে জীবিত। যদি কোনদিন সে সব কিছু ফাঁস করে দেয় সেদিন ইয়াগোর আর বাঁচার পথ থাকবে না। ওথেলোর সম্পত্তি তো দূরের কথা চাকরিটাই থাকবে না। জেলেও যেতে হতে পারে।

কারখানা বন্ধ করার পরই হাসপাতালে যাদবের খবর নিতে যাবার অছিলায় সে সোজা চলে গেল ইয়াসিনের ঘরে। দরজার দিকে পিছন ফিরে সবে সে খেতে বসেছে। নেশাসক্ত অবস্থায়। এরপর আমার অনুমান, ইয়াগো দরজায় কড়া নাড়ে। ইয়াসিন দরজা খুলে ইয়াগোকে দেখে। তার মনে কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ এর আগেও ইয়াগো বেশ কয়েকবার ইয়াসিনের ঘরে গেছে। তাছাড়া যাদবকে খুন করার জন্যে তার টাকাও পাওনা আছে ইয়াগোর কাছে।

দরজা খুলে ইয়াসিন যে মুহূর্তে পিছন ফিরেছে, সেই মুহূর্তেই অতর্কিত আক্রমণ। ইয়াসিন শক্তিশালী। কিন্তু আমাদের ইয়াগোও গায়ে বেশ শক্তি ধরে।

বলতে ভুলে গেছি, ক্যাসিওকে মদ খাওয়ানোর সময়, তারই অজান্তে ইয়াগো ক্যাসিওর রুমালটি হস্তগত করে। সবুজ রঙের একটি রুমাল। ডেসডিমোনের স্নেহের উপহার। রুমালের কোণে সুতো দিয়ে লেখা ছিল 'ডি' অক্ষরটি।

ইয়াসিনকে খুন করার পর রক্তাক্ত ছুরিটা ওই রুমাল দিয়েই মোছে এবং ইয়াসিনের ডেডবডির পাশে সেটিকে সে ফেলে রাখে। যাতে করে পুলিসের সন্দেহ 'ডি' আদ্যাক্ষরধারী ব্যক্তির ওপর পরে এবং তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়।

ক্যাসিও বধের পরিকল্পনা সাঙ্গ করে সে চলে এল নিজের বাড়িতে প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ। কিন্তু ফেলে এল কয়েকটা মোক্ষম সূত্র। যাদবের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া এবং তাকে আহত করার জন্যে সম্ভবত হাজার চার কী পাঁচের একটা আর্থিক বোঝা পড়া হয়েছিল। হাজার আড়াই অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছিল একটা চিরকুট মাধ্যমে। তাতে লেখা ছিল 'এটা পাঠালাম। বাকিটা পড়ে।' অনেকেই বলবেন ইয়াসিন তো মুসলমান। সে কী বাংলা পড়তে পারে? পারে। ওর নাম ইয়াসিন মল্লিক। বাঙালি মুসলমান। ওর স্ত্রীর লেখা কয়েকটা চিঠি আমি পেয়েছি। সেগুলোও বাংলায় লেখা।

এইখানেই আমাদের ইয়াগোর মোক্ষম ভুল। চিঠি দিয়ে টাকা পাঠালো কেন? এমনি হাতে হাতেই তো টাকাটা দিয়ে দিতে পারতো। আসলে সব ক্ষেত্রেই দেখেছি, অপরাধী একটা না একটা সূত্র ফেলে আসেই। ছোটখাটো একটা ভুল সে করবেই। আরও একটা ভয়ংকর সূত্র সেইঘরেই রেখে এসেছিল। ইয়াগোবাবু। অতবড় শরীরের একটা মানুষকে কাবু করতে গিয়ে একটু ধস্তাধস্তি তো হবেই। ফলে ইয়াগোবাবুর এক পাটি চটি চলে যায় ইয়াসিনের খাটের নীচে। পুলিস হয়তো ওটা দেখেনি। অথবা অগোছাল ঘরে কোথায় খাটের তলায় একটা চটি পড়ে আছে তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। কারণ ওই ঘরে আরও দুজোড়া জুতো এলোমেলো অবস্থায় পড়েছিল। পুলিস হয়তো ভেবেছিল ওটাও ইয়াসিনের পরিত্যক্ত একপাটি চটি।

নীল একটু থামল। সামনেই গ্লাসে জল ছিল। একটু জল খেল। একটা সিগারেট ধরাল। ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। গভীর মনোযোগ দিয়ে সবাই কথা শুনে যাচ্ছিল।

নীল আবার বলতে শুরু করল, —আমি এবার আসি আমার গল্পের শেষ পর্যায়। এবার ওথেলোবাবুর মগজ ধোলাই পর্ব। বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরেই কালবোসবাবু একটা সূক্ষ্ম কমপ্লেক্সে ভুগতেন। তাঁর স্ত্রী অতীব সুন্দরী। তাঁর মতো একজন কদাকার ব্যক্তিকে বিয়ে করা থেকেই সূক্ষ্ম হীনম্মন্যতা তাঁকে ব্যথিত করে রাখত। ইয়াগো এটা ভাল করেই পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছিল। চতুর ইয়াগো কখনোই নিজেকে কোন কাজে জড়িয়ে রাখতো না। একমাত্র ইয়াসিন হত্যা ছাড়া। এটা নিয়েও আমি ভেবেছি। ইয়াসিনকে নিজের হাতে সরিয়ে না দিয়ে উপায়ন্তর ছিলনা তার। কারণ অন্য কোন লোককে দিয়ে অর্থাৎ ভাড়াটে খুনি নিয়োগ করা তার পক্ষে দুটি কারণে সম্ভব ছিল না।প্রথমত অর্থ। সে তো আর দুপাঁচ হাজারের কাজ নয়। অত টাকা জোগাড় করা ইয়াগোর পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, যে প্রমাণ সরানোর জন্যে ইয়াসিন হত্যা সেই একই কারণে তো আরও একজনকে সরাতে হবে। ভাড়াটে গুণ্ডা, যেটা ইয়াগোর পক্ষে সম্ভব নয়।

যাই হোক, এবার শেষ চালের জন্যে ইয়াগো নিযুক্ত করল এমিলিয়াকে। তার অনুগত এবং নির্বোধ স্ত্রীকে। ওথেলোর দুর্বল জায়গায় আঘাত করা। কানে বিষ উগড়ে দিয়ে এল আমাদের এমিলিয়া। সাতকাহন করে শুনিয়ে এল ডেসডিমোন আর ক্যাসিও তাঁরই অজান্তে অর্থাৎ ওথেলোকে লুকিয়ে অবৈধ প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে। ওথেলোর দুর্বল মন অতি সহজেই বিশ্বাস করে নিল এই প্রেম কাহিনি। তাঁর মনে হল, এটাই বাস্তব। পূর্ব পরিচিত দুই সুন্দর যুবক যুবতী পরস্পরের প্রতি তো আসক্ত হবেই। যেখানে সেই সুন্দরী দেবী এক কদাকার স্বামী নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত।

ইয়াগো ভেবেছিল এখানেই কিস্তিমাত হয়ে যাবে। রাগের মাথায় ঈর্ষা জর্জরিত ওথেলো ডেসডিমোনকে খুন করে আত্মঘাতী হবেন। ব্যস, তাতেই তার সব আকাঙক্ষা পূর্ণ হবে।

কিন্তু হোল না। কালবোসবাবু একদিন ফোনে আমায় জানালেন নিজের অসহায় অবস্থার কথা। আমিই তাঁকে ওইভাবে চিঠি লিখে সোজা আমার বাড়ি চলে আসতে বলি। ব্যস, আমার গল্প শেষ।

কালবোসবাবু এই বার মুখ খুললেন, —কিন্তু ইয়াগো?

—ইয়েস, ইয়েস, বিকাশবাবু, আপনার কাজ আপনি করতে পারেন। জটিল চক্রান্ত ছেড়ে দিলেও ইয়াসিন হত্যার জন্যে আপনি আমাদের ইয়াগো আই মিন রূপম দাসকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

রূপম চিৎকার করে উঠল, —আপনার এইসব নাটকীয় কচকচানির কোন মানেই হয় না। ইয়াসিনকে আমি খুন করেছি তার প্রমাণ কী?

—প্রমাণ? প্রমাণ আপনার ফেলে আসা চটি।

—কার না কার চটি, বললেই হোল ওটা আমার চটি?

—চটির ফুট প্রিন্ট আর আপনার ফুটপ্রিণ্ট মেলালেই মিলে যাবে। আপনার হাতের লেখা আর চিরকুটের হাতের লেখা, হ্যাণ্ড রাইটিং এক্স্‌পার্টকে দিলেই তিনি সত্যি মিথ্যেটা বলে দেবেন। এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। মনে আছে তোমার, ঝুমা, একবাটি পায়েস আমি তোমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম, যেটা তোমার মামাকে খাওয়াবে বলে রেখে দিয়েছিলে, তার মধ্যেও অল্প পরিমাণে সেঁকোবিষ পাওয়া গেছে। প্রায় তো শেষ করে এনেছিলে, আর কয়েকদিন খাওয়াতে পারলেই কাম ফতে। তাই না ঝুমারানী?

হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে ঝুমা, —তা আমি কি করব? ওর কথা না শুনলে তো আমাকে পিটিয়ে ছাতু করে দেবে। তখন কে আসবে আমায় বাঁচাতে। ওই তো শাশুড়ির ছিরি? ওই তো হাঁড়িমুখো ননদ। ছ্যা ছ্যা, কেন যে মরতে এ ঘরে বিয়ে করেছিলুম?

হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই রূপম ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝুমার ওপর। তারপরই বেপরোয়া ঘুষি। ওরে বাপরে মারে বলে ঝুমা মাটিতে আছড়ে পড়ল। রূপমের মুখে তখন অশ্লীল ভাষা,—শালী খান্‌কি মাগী, তোর হ্যানো ত্যানো চাইদা মেটাতেই তো আমাকে এই সব

করতে হয়েছে। এখন সব দোষ আমার, বলেই ক্যাৎ করে এক লাথি। তারপরেই কোমরের গেঁজ থেকে বেরিয়ে এল ধারালো ন্যাপলা, শালী তোকে নিয়েই আমি মরব।

ব্যাপারটা এমন নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। সবাই হতচকিত। তবে বিকাশ তালুকদারের তৎপরতায় আর একটা খুন হবার আগেই রূপম তাঁর তালুবন্দী। বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরেছেন রূপমের চুলের মুঠি। ডানহাতে রিভলবার। বিকাশ তালুকদার ওই অবস্থা থেকেই বললেন, —ব্যানার্জি সাহেব, আমার পকেট থেকে বাঁশীটা নিয়ে একটু বংশীধ্বনি করে দিনতো। কনস্টেবল দুটো নীচে বসে আছে।

রূপমকে নিয়ে ওরা চলে গেল। তালুকদারও চলে গেলেন। ঝুমা তখনও কেঁদে চলেছে। নীল ওর কাছে গিয়ে বলল, —যাও, এখন নীচে যাও। এখন আর কান্নাকাটি করে কোন লাভ নেই।

—বাবু, ও মিনসের তো ফাঁসী হবে। আমার কী হবে?

—আইনে যা আছে, তাই হবে। স্বামীর কথায় তুমি অনেক কিছুই করতে পার, তাই বলে একটা মানুষকে দিনের পর দিন জেনে শুনে বিষ খাওয়াতে পার না। এটা অপরাধ। তার শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। পালাবার চেষ্টা কোর না। তাহলে শাস্তি আরও বেড়ে যাবে।

কাঁদতে কাঁদতে ঝুমা নীচে চলে গেল। অনুপমা দেবীও কাঁদছিলেন। নীরবে। নীল ওর কাছে গিয়ে বলল, —ছেলের জন্যে মায়ের কান্নাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন্ ছেলের জন্যে অনুপমা দেবী?

অনুপমার কিছুই বলার ছিল না। নীল আবার বলল, —মেয়েটিকে তো এবার পার করতে হবে। বৈশালী আপনার খুবই ভাল মেয়ে।

কোনরকমে অনুপমা বলতে পারলেন,—ওই ছেলের বোনকে জেনে শুনে কে বিয়ে করবে বাবা? লজ্জায়, ঘেন্নায় আর যে আমার কালুর বাড়িতে থাকতেও ইচ্ছে করছে না।

এতক্ষণে কালবোস বললেন,—তুমি কিছু ভেবোনা দিদি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো আছি।

কুড়ি

সেদিনই, অনেক গভীর রাতে। অসুস্থ কালবোসের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সম্প্রীতি বলল, —তুমি কী গো? কেমন করে তুমি ভাবতে পারলে আমি আর একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করব, সম্পত্তি লোভে তোমায় আমি বিষ খাইয়ে মারব?

বিবশ গলায় কালবোস বললেন, —বড় ভুল হয়ে গেছে প্রীতি। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

—ক্ষমা নয়। এ আমার দুঃখ। শুধু এইটুকু জেনে রেখ, পৃথিবীর কোন মানুষকেই আমি তোমার থেকে বেশি ভালবাসতে পারব না। তোমার মতো স্বামী পাওয়া যে আমার অনেক ভাগ্যি।

—প্লীজ প্রীতি, ও সব কথা থাক। আমাকে মনে মনে অনুতপ্ত হতে দাও। সেটাই আমার অন্যায় বিচারের ঠিক শাস্তি হবে।

তারপর, বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কালবোস আবার বললেন, —একটা কথা বলব প্রীতি, যদি তুমি কিছু মনে না করো। মানে অন্যভাবে না নাও—

অস্ফুটে সম্প্রীতি বলল, —বল।

—দিগন্ত ছেলেটার তো নিজের বলতে কেউ নেই।

—তো?

—আমাদের বৈশালীর সঙ্গে যদি দিগন্তর বিয়েটা দেওয়া যায়, কেমন হয়?

—খালি পড়ে পড়ে বউয়ের আদর খাব আর সারাদিন ব্যবসা করব, এই যাদের মনোভাব, জগৎ সংসারে তারা অন্ধ হয়েই থেকে যায়। একটু আগে কী শুনলে?

—না মানে, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আসলে আমি ভাবতে পারিনি রূপম আর ঝুমা এমন কাজ করতে পারে!

—ওরা দুটিতে যে প্রেম করছে গো, সেটাও নজরে পড়েনি?

—সত্যি?

—তোমার বন্ধু নীলাঞ্জনবাবুকে জিগ্যেস করে নিও, আজ সকালে তোমার চিঠি পাবার পর এ নিয়ে একচোট আলোচনা হয়ে গেছে।

—তাহলে তো শুভকাজ আর দেরি করা উচিত নয়।

—কিন্তু তুমি তো ওকে চাকরি থেকে বসিয়ে দিয়েছ।

—ওকে এবার আমি আমার ডেপুটি করে নোব। খুশি তো?

আর কিছু না বলে সম্প্রীতি আস্তে আস্তে মাথা রাখল কালবোসের বুকে।



চক্ষুশূল

অবশেষে সদানন্দকে সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। এক ঝাঁপিতে যেমন সাপ আর নেউল থাকতে পারেনা ঠিক তেমনই সদানন্দ আর সুশীলার পক্ষে একই ছাদের নীচে থাকা সম্ভব নয়।

সদানন্দ বরাবরই শান্তিপ্রিয় লোক। ছোটবেলা থেকে সে পড়াশুনো নিয়ে থাকতো। আর ক্বচিৎ কখনো খেলার মাঠ। তাও নিরীহ সব খেলা। হয় ব্যাডমিন্টন নয়তো টেবিলটেনিস। ইনডোর গেম বলতে ক্যারাম নয়তো লুডো। আর একটা খেলা সে জানতো, দাবা। সদানন্দ এই খেলাতে ছিল বিশেষ পারদর্শী। তবু পড়াশুনোতেই বিশেষ মনোযোগ থাকায় কোন পরীক্ষাতেই সে প্রথম ডিভিশন থেকে নেমে আসেনি।

সদানন্দ দেখতে সুপুরুষ। সাধারণ বাঙালির হাইট হলেও তার চেহারায় এমন একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে যা সহজেই আর পাঁচজনের থেকে তাকে মুহূর্তে আলাদা করে নেওয়া যায়। একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল। টিকোল নাক, চাপা ঠোঁট, গ্রীসিয়ান চিবুক। ধবধবে ফর্সা আর ছিপছিপে শরীরে সে বহু কুমারীর হৃদয় জয় করেও নিজের গোবেচারা গতিবিধির জন্যে কোন কুমারীর হৃদয়ে বেশিদিনের জন্যে জায়গা করে নিতে পারেনি।

এর জন্যে তার কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া ছিল না। কারণ মেয়েদের সম্বন্ধে তার তেমন বিশেষ কোন আগ্রহ বা দুর্বলতা ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো ডিগ্রি কবজায় আনার পর যথারীতি সে একটি ভালো চাকরি পায়। মনোযোগী ছাত্রের মতো নিষ্ঠাবান চাকুরে হওয়ার দৌলতে, এবং দক্ষতা দেখিয়ে সে একসময় এক বড় মাপের মালটি ন্যাশনাল ফার্মের হাই একজিকিউটিভের চেয়ারটিতে বেশ জাঁকিয়ে বসে।

এ তাবৎ সব যেন ঘড়ির কাঁটার মাপে চলেছিল। কিন্তু ভাগ্য বোধহয় সব কিছুই এক ব্যক্তির বরাতে ঢেলে দেয় না। সদানন্দকেও দিল না। তার শান্ত, মসৃণ গতিতে গড়িয়ে চলা জীবন বড়ো সড়ো একটা পাথুরে ধাক্কায় প্রায় এলোমেলো হয়ে গেল।

বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করার পর নিরীহ নির্বিবাদী সদানন্দকে ডিসিশন নিতে হোল সুশীলাকে তার জীবন থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তার মসৃণ জীবনে জগদ্দলের মতো মূর্তিমান বিভীষিকা সুশীলাকে সরিয়ে দেওয়ার একটাই মাত্র পথ। পথটি খুবই জটিল এবং ঝুঁকি সাপেক্ষ। কিন্তু পথ ঐ একটাই। সুশীলাকে খুন হ'তে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাকেই সব কিছু ছেড়ে কোথাও চলে যেতে হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। প্রথমত সোনায় মোড়া চাকরি, দ্বিতীয়ত, সে যেখানেই থাকুক না কেন, ধরা সে পড়বেই। সুশীলা এমনই এক মহিলা তার পক্ষে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে নিজেকে লুকিয়ে রাখুক না কেন সুশীলা তাকে সেখান থেকে খুঁজে বার করে আনবে। এবং চূড়ান্ত হেনস্তা করবেই। অতএব সুশীলার হাত থেকে নিস্তার পেতে গেলে ওকে খুন করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই।

বিয়ের আগে, সুশীলাকে দেখাদেখির সময় বেশ ভালোই লেগেছিল। অধিকাংশ যুবকের মতো অন্য সব কিছুর আগে সে ট্যারা চোখে দেখে নিয়েছিল তার শরীরের মাপ আর মুখশ্রী।

হতাশ হওয়ার মতো কিছুই ছিল না। মুখের মধ্যে অসাধারণ কোন দ্যুতি না থাকলেও এক নজরে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো লাবণ্য ছিল। সারা মুখে ছিল যৌবনের সুষমা আর ছিল ভারী মিষ্টি মিষ্টি একটা ভাব। যা একবার দেখলেই নিজের করে পেতে ইচ্ছে করে। পানপাতার মতো মুখ। কোঁকড়ানো চুলের ঢল পানপাতাকে আরও সজীব আর প্রাণবন্ত করে ধরে রেখেছে। গায়ের রঙটি মিঠে কড়া। ঐ মুখ দেখার পরই সদানন্দ ঠিক করে নেয় এই মেয়েকেই সে বিয়ে করবে।

খেতে না পাওয়া ছিপছিপে নয় আবার দুধ ছানা ঘিয়ের দৌলতে চর্বি তরঙ্গ তাকে স্থূলকায়া করেনি। এক কথায় প্রথম দর্শনেই সদানন্দের চোখে সুশীলার 'কনে-পাশ' হয়ে গিয়েছিল।

সদানন্দের প্রাণের বন্ধু, শ্যামলকান্তিকে সঙ্গে নিয়েই সে প্রথম পাত্রী মনোনয়নে যায়। শ্যামলকান্তি কী একটা কথা তোলার চেষ্টা করেছিল। সম্ভবত লেখাপড়ার প্রসঙ্গ টানতেই চেয়েছিল। কে জানে কোত্থেকে কী বাগড়া পড়ে। সদানন্দ সেই সময়ে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ঐ প্রসঙ্গ ধামাচাপা দিয়ে দেয়।

শুভবিবাহ কার্য নির্বিঘ্নে মিটে যাবার পর সদানন্দ প্রথম তিক্ততার স্বাদ পায় ফুলশয্যার রাতেই। সবাই চলে গেছে। নিমন্ত্রিত এবং রসিক বন্ধুরাও। এখন ঘরে কেবল মাত্র সদানন্দ আর সুশীলা। এমন কী আড়ি পাতা তুতো বৌদি আর বোনেরাও যে যার ঘরে ফিরে গেছে।

সদানন্দ স্বাভাবিক কারণেই সংকোচের মধ্যে ছিল। তার জীবনে প্রথম নারী সান্নিধ্য। প্রাকবিবাহিত জীবনে অনেকেই আসতে চেয়েছিল। স্বভাব লাজুকতায় সে সব টেঁকেনি। এমন কী বাসরঘরে সদানন্দের এক পড়শির বউ শিখা একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছিল। ফস করে বলে দিয়েছিল, লোকলজ্জার বালাই না রেখে, —বৌদি, আমার বরের সঙ্গে তোমার বরটিকে পাল্টাপাল্টি করে নেবে?

সুশীলা কটমটিয়ে তাকিয়ে ছিল কিনা জানা যায়নি। কিন্তু শিখা তারপর থেকেই নীরব প্রতিমা।

যাইহোক অতীব সংকোচ নিয়ে সে বিছানার এক পাশে গিয়ে প্রায় জড়দগবের মতো চুপ করে বসে বসে ভাবছিল কীভাবে কথা শুরু করা যায়। বেশিক্ষণ ভাবতে হয়নি, নিজেই নিজের ঘোমটা সরিয়ে প্রায় আক্রমণের ভঙ্গীতে সুশীলা প্রশ্ন করেছিল, —ঐ মেয়েটা কে?

হকচকিয়ে সদানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, —কোন্ মেয়েটা?

—ন্যাকামি কোর না। ঐ ঠোঁট কাটা বাসর মাতানো চুলবুলে মেয়েটা। নির্লজ্জের মতো যে বলল বর পাল্টাপাল্টির কথা।

সদানন্দ সত্যিই তাকে তেমন চিনতো না। একই পাড়ায় থাকে। রমেনের বউ। তার সঙ্গে কোনদিন কোন কথাবার্তাও হয়নি। মুখচেনা আলাপ মাত্র। ও সহজ ভাবেই বলল, —আমি ঠিক চিনিনা। বোধহয় রমেনের বউ। তবে শুনেছি বিবাহিত মহিলারা ঐ ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে। ঠাট্টা ইয়ার্কিও করে। ওতো কথার কথা।

—চুপ করো, প্রায় দাপানো আদেশ, কথার একটা মাত্রা থাকা দরকার। সত্যি বলছ তুমি ওকে চেননা, নাকি আগে থেকে কিছু লটঘট পাকিয়ে রেখেছ?

সদানন্দের ফুলশয্যার ফুল তখন শুকিয়ে যাবার দাখিল। এসব কী বলছে তার সদ্যবিবাহিত পত্নী! কিন্তু নতুন বউ, বিশেষ কিছু বলাও যায় না। আর সেটা সদানন্দের স্বভাববিরুদ্ধ। প্রসঙ্গ পাল্টাবার কারণে বলেছিল, —আমি সত্যিই ঐ মহিলার সঙ্গে এর আগে কোন কথাও বলিনি। কোন আলাপও নেই।

—ভণ্ডামি অন্য জায়গায় করবে, তাই যদি হয় তাহলে ও বাসর ঘরে এলো কেমন করে?

—তুমি ভুল ভাবছ। এ পাড়ার অনেকেই বরযাত্রী গিয়েছিল। ও হচ্ছে রমেনের বউ। রমেনের সঙ্গে ওর বউও বরযাত্রী গিয়েছিল।

—পাড়া জ্বালানি মেয়ে। ছ্যাঃ। আর কোনদিন যেন এ বাড়িতে ওকে না দেখি।

সদানন্দ তখনই প্রমাদ গুণেছিল। এ মেয়ের মনের জটিলতার তল পাওয়া তার পক্ষে খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার হবে না।

যাইহোক হুলের দংশন নিয়েই ফুলশয্যার রাতটা কেটে গিয়েছিল। তারপর ভালোয় মন্দয় আরও একটা মাস।

তারপর। বাড়িতে কাকচিল বসারও কোন সুযোগ ছিল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই নববধূ একটি তালিকা ফেলে দিয়েছিল তার সামনে। অফিসের গাড়ি আসে নটার মধ্যে, অতএব নটায় অফিস গমন। সাড়ে দশটায় বাড়িতে ফোন করতে হবে। দেড়টায় সুশীলা ফোন করে জানবে টিফিন খাওয়া হয়েছে কিনা। পাঁচটায় ছুটি, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় অফিসের গাড়িতে বাড়ি ফিরে আসতে হবে।

এ রুটিনের হেলদোল না থাকলেও, একমাত্র সাড়ে দশটায় ফোন করা ছাড়া আর সবগুলোই সদানন্দ করে আসছিল এতদিন। সদানন্দ ভাবল, এর জন্যে আবার রাজকীয় ফরমান দেবার কী হ'ল? তবু সে মিষ্টি হেসে সুশীলাকে কাছে টেনে আদর করে কিছু বলতে গিয়েছিল।

কিন্তু সর্প দংশনে তাকে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। খ্যানখেনিয়ে সুশীলা বলেছিল, —এত বেহায়াপনা কেন, অ্যাঁ? লোকলজ্জার বালাই পর্যন্ত জানো না? ঝি-চাকরদের সামনে আহ্লাদ না করলে বুঝি চলছে না। লেখাপড়া জানা মানুষের যে এত নিলাজ প্রবৃত্তি হয় তা আমার জানা ছিল না।

বলেই দুপদাপ শব্দ তুলে সুশীলা অন্যত্র চলে গিয়েছিল।

আর একদিনের ঘটনা। সদানন্দ সবে অফিস থেকে এসে সোফায় পরিপাটি করে বসেছে। অফিসের ড্রেসটা তখনও ছাড়া হয়নি। ভেবেছিল একেবারে চা খেয়ে, চেঞ্জ করবে। ইতিমধ্যে কাজের মেয়ে অষ্টাদশী এক তরুণী, কি কারণে বৈঠকখানায় এসেছিল, ওকে দেখে সদানন্দ চা আনতে বলে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সুশীলা ওপর থেকে নেমে আসছিল। তারও হাতে চায়ের কাপ। কোথা থেকে কী? এক ঝটকায় হাতের কাপ ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেঝের ওপর। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে কাপডিস টুকরো। তারপরই কণ্ঠস্বরের ঝনঝনানিতে বৈঠকখানা গরম, —কেন, কচি মেয়ের হাতের চা না খেলে বুঝি আমোদ হয় না? আমার হাতের চা কী এরই মধ্যে তেতো লাগতে শুরু করে দিয়েছে?

সদানন্দের তখন ইচ্ছে করছিল ছাদ ফুঁড়ে আকাশে উড়ে যেতে। কোন বাক্য ব্যয় না করে ও সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছিল। আবার কণ্ঠনিনাদ, —বলি, কথার উত্তর দেবার কোন ইচ্ছে হয় না বুঝি? না দরকার নেই?

ইচ্ছে এবং দরকার কোনটাই ছিল না। তবু সে বলেছিল, —সুশীলা, তুমি মাঝে মাঝে কী যে বলো তা তুমি নিজেই না জেনে বল। দেরি হচ্ছিল বলেই ওকে আনতে বলেছিলাম।

—কেন? ঘোড়ায় কী জিন চড়িয়ে আসা হয়েছে? নাকি আর কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

—তুমি তো জানোই সন্ধের পর আমি সোজা বাড়ি চলে আসি। কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখি না।

—কিতার্থ করে দিয়েছ।

তারপরই আগাপাছতলা ধুলো ঝাড়া শুরু হয় মেয়েটির। কিন্তু সেও তুখরা। সেই বা ছাড়বে কোন সুবাদে? ঝাঁঝিয়ে ওঠে, —ও ভালোমানুষের বউ, অত ঝাঁঝ দেখাচ্ছ কারে? দাদাবাবু কী আমার হাত পা ধরে টেনেছে নাকি? চেয়েছে তো এক কাপ চা। তার জন্যে এত কথা শোনাবার কী হল?

—ওরে হতচ্ছারি, দাদাবাবু সোহাগী, বড় দরদ দেখি। তোকে কী চা করার জন্যে রাখা হয়েছে?

—তুমি কোথাকার হিংসুটে মেয়ে গা। এককাপ চা করে দিলে কী দাদাবাবুর চরিত্তিরে শ্যাওলা ধরে যাবে? পুরুষমানুষকে এত সন্দেহ কোরনি। মিন্‌সে তখন বারমুখো হয়ে যাবে।

আর যায় কোথা? সুশীলা ক্রমশ দুঃশীলা হয়ে উঠতে থাকে। গলার পর্দা তিনশ ডেসিব্‌ল চড়িয়ে বলে, —বলি কদিন, অ্যাঁ, কদিন ধরে এই সব চলছে?

—কিসের কী চলছে?

—পীরিত। যা করতে এ বাড়ি ঢুকেছিস।

গঙ্গা নামের কাজের মেয়েটি এরপর নিজমূর্তি ধারণ করতে তিন সেকেণ্ড সময় নেয়। খনখনিয়ে বলে ওঠে, —পোকা পড়বে গো, পোকা। যে মুখ দিয়ে অমন শিবতুল্য মানুষের নিন্দে কর সে মুখ আর কোন ভদ্দরলোক দেখবে নি। ছি, ছি, বলে কী গো! হ্যাঁগা বড় মানুষের বউ, আমার কী ভাতার নেই? না সে মরদ নয় যে তোমার বরের পেছনে হেংলির মতো ঘুরে বেড়াব? যাক অত সাত কথায় কাজ নেই, আমার মাইনে পত্তর মিটিয়ে দাও, এ বাড়িতে আর এক দণ্ড নয়।

গঙ্গাকে রাখা যায়নি। আজকালকার কাজের মেয়েদের তরিবত করে চলতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই, চললুম। আসলে এখন বোঝাই যায় না কে মনিব কে ঝি?

সদানন্দ কিন্তু নির্বিকারই ছিল। ঝি চলে গেলে অসুবিধা সুশীলারই। শেষ পর্যন্ত অনেক টাকা মাইনে দিয়ে ময়না নামের এক বিগত যৌবনাকে রাজি করানো হয়। সদানন্দ ঠিক করেই নিয়েছিল কাজের লোকজনের ব্যাপারে সে কোনদিনও নাক গলাবে না। চা কেন এক গ্লাস জল পর্যন্ত চাইবে না।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে সদানন্দর সেই আনন্দিত ভাবটাই চলে যাচ্ছিল। চেহারার মধ্যে একটা শুকনো ভাব ফুটে উঠতে লাগল। তবু সে নিজের মনেই থাকবার চেষ্টা করতো। কিন্তু সেখানেও নিস্তার পেল না। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একদিন ঠিক সন্ধের মুখেই বাড়ি ফিরেছে, সুশীলা চেপে ধরল,

— তোমায় আজকাল কী দশায় ধরেছে?

সদানন্দ প্রথমে বুঝতে পারেনি। বোকার মতো মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

—হাঁ করে দেখছ কী? ভাজা মাছ ওল্টাতে জানোনা মনে হচ্ছে?

—তুমি এখন ঠিক কী ব্যাপারে কথা বলছ সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে চাইছ না বল। এতো রুখু শুখু ভাব কেন?

—এমনিই। শরীরটা ঠিক নেই।

—শরীর না মন?

—কী বলতে চাইছ?

—শুনতে চাইছি।

সেই প্রথম সদানন্দ প্রতিবাদ জানিয়েছিল, —সুশীলা নিজেকে একটু স্বাভাবিক করার চেষ্টা কর।

—তার মানে, তুমি কী মনে কর আমি পাগল?

—না, পাগল নও, তাহলে অন্য ব্যবস্থা করা যেত। তবে এভাবে নিজের মনটাকে যদি ক্রমাগত নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে যেতে থাক তাহলে পাগল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

—ও, তার মানে তুমি এখন থেকে আমায় পাগল করার চেষ্টায় আছো। আর

আমাকে পাগল প্রমাণ করতে পারলেই নিজের কার্যসিদ্ধি হবে, তাইতো?

—কার্যসিদ্ধি মানে?

—আর একজন মনের মতো কাউকে নিয়ে আসবে।

সদানন্দ উঠে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ সুশীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে,

—এ রকম কোন ভাবনা আমার মাথার মধ্যে ছিল না। আজ থেকে সেটাই তুমি ঢুকিয়ে দিলে।

—কী বললে? তার মানে তুমি সত্যি সত্যিই আমাকে পাগল করতে চাইছ?

সদানন্দ খানিকটা সময় নেয়। তারপর ধীরে ধীরে সুশীলার কাছে গিয়ে তাকে বলে,

—সুশীলা, আমি একটু সুখী হ'তে চেয়েছিলাম। লোকে সেই জন্যেই বিয়ে করে। কিন্তু তোমার অকারণ সন্দেহ, তোমার জটিল ভাবনাচিন্তা, সত্যি বলছি, আমার লাইফটাকে হেল করে দিচ্ছে। বাড়ির একটা কাজের মেয়ে, ভাল করে আমি তার মুখটাও কোনদিন দেখিনি, তাকে নিয়ে এমন সব কথা বললে, মেয়েটা তোমারই নিন্দে করে এ বাড়ি থেকে চলে গেল। অফিসের পরও আমার কিছু কাজ থাকতে পারে, কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয় তোমার অকথা কুকথার ভয়ে। আজ অকারণে তুমি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করেছ। এগুলো কী সুস্থতার লক্ষণ?

—বাজে জ্ঞান দেবার চেষ্টা কোর না সদানন্দ। এসব কথার জোড়াতালি দিয়ে অন্য মেয়েদের ভুলোবে। সুন্দর দেখতে ছেলেদের আমি একদম বিশ্বাস করি না।

—তাহলে কুৎসিত কাউকে বিয়ে করলেই তো পারতে।

—কেন করব? দেখতে রূপবান হলেই তাকে চরিত্রহীন হতে হবে?

—এটা তোমার ভুল ধারণা। এ ধারণা পাল্টাও। নইলে,

—নইলে?

—দেখতেই পাবে।

দেখাতেই চেয়েছিল সদানন্দ। একটা হেস্তনেস্তই করতে চেয়েছিল। করেনি। কারণ সদানন্দর ধৈর্য্য অসীম। যথারীতি সে অফিস করে। অফিসের পর বাড়ি ফিরে কোনদিন বই পড়ে। কোনদিন টিভি দেখে। সেখানেও বিপত্তি শুরু। সুশীলা তখন ঘরে ছিল না। সদানন্দ টিভি খুলে বসেছিল। টিভিতে তখন আবেগঘন একটা সীন চলছে। নায়ক নায়িকাকে কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেগে চুম্বন করতে যাবে, হঠাৎই টিভির সুইচ অফ। সদানন্দ মুখ ঘুরিয়ে দেখে সুশীলা সুইচ অফ্ করে রোষনেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিছু বলার আগেই সুশীলা খ্যানখেনিয়ে উঠেছে,

—লজ্জাও করে না। আধ দামড়া বুড়ো, এখনও মন থেকে নোংরামি গেল না। বসে বসে ওই সব রসের দৃশ্য দেখছ? ছ্যা ছ্যা...।

সম্ভবত সদানন্দ মৌনী নিয়েছিল। সেদিন সে চুপ করে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে

সারা সন্ধে কাটিয়ে দিয়েছিল।

না, বই পড়ারও উপায় নেই। টিভি দেখা ছেড়ে দেবার পর সন্ধে কাটাবার জন্যে বইপড়া শুরু করল। কোথায় যেন ছিল সুশীলা। হঠাৎই ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে বইটা তুলে নিয়ে প্রথম পাতাটা দেখে মুখ বেঁকাল।

—কী হোল, বইটা হাত থেকে নিয়েই বা নিলে কেন? আর ওভাবে মুখই বা বেঁকালে কেন?

—চরিত্রহীন। শরৎচন্দ্র। কেন আর কোন বই ছিল না? ছেলেমেয়ের কেচ্ছাকাহিনি না পড়লে চলে না বুঝি? যেমন নিজে তেমনি তার বই পড়ার ঢং। ছ্যা ছ্যা।

একদিকে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন হন করে অন্যত্র চলে যায়। হাঁ করে কিছুক্ষণ ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সদানন্দ ভাবতে থাকে সে এখন যায় কোথায়?

ওর আবাল্যের বন্ধু শ্যামলকান্তি। সদানন্দ অনেকদিন থেকেই ভাবছিল ওর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। শ্যামলকান্তি ব্যাঙ্কে চাকরি করে। একদিন ডেকে পাঠাল ওকে ওর নিজের অফিসে। খুলে বলল সব কিছু। সব শুনে শ্যামল কিছুক্ষণ ধরে মাথা চুলকোল। তারপর সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, —তুই মরেছিস।

—হ্যাঁ। একেবারে জলজ্যান্ত মৃত্যু। কিন্তু একটা সহজ উপায় বল। এভাবে চললে একদিন আমার নয়তো ওর মৃত্যু সংবাদ পাবি। মানে ফিজিক্যাল ডেথ।

—একটা কাজ কর। ছেলেপুলে না হলে মেয়েরা অনেক সময় এরকম বাতিকগ্রস্ত হয়। তুই একটা বাচ্চা পয়দা কর।

—কর বললেই হয় নাকি? এইতো দ্যাখনা, দেখতে দেখতে তিনবছর হয়ে গেল। কোথায় বাচ্চা, কোথায় কী?

—ডাক্তার দেখিয়েছিস?

—দেখাবে না। ওর লজ্জা করে।

—তুই শালা পুরুষমানুষ না কী রে? বাচ্চা হচ্ছে না এটা তো একটা প্রবলেম। তার জন্যে তো ডাক্তার দেখাতেই হবে। ঠিক আছে লেডি গাইনির কাছে যা।

—লেডিদের চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান কম।

—কে বলল?

—সুশীলা। ও এখন তন্ত্রমন্ত্র তুকতাক শুরু করে দিয়েছে।

—তোকে বাঁচায় কার বাপের সাধ্যি।

—কদিন ধরে আমি একটা কথা ভাবছি।

—কী?

—আমি খুন করব।

—সুশীলাকে?

—হ্যাঁ। কিন্তু কোন সহজ প্রক্রিয়া খুঁজে পাচ্ছি না।

—তোর মাথাটাও গেছে।

—তোরও যেতো।

—না, বলে কিছুক্ষণ ধরে পেপার ওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করে শ্যামল বলল, —এক কাজ কর, রোজ ছটার মধ্যে বাড়ি ফিরিস তো। এবার থেকে বেশ রাত করে বাড়ি ফেরা শুরু কর।

—তুই কী বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ শুরু করাতে চাস?

—এদিকটা ভাবিনি। ঠিক আছে। রিভার্সটা কর।

—যেমন?

—চেনা জানা সব বন্ধু আর বন্ধু পত্নীদের রোজ সন্ধেবেলা বাড়িতে ইনভাইট কর। আর সেই দলে ওকেও নিয়ে বসা। আমার মনে হয় পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করলে ওর মনের এই সব জড়তা কেটে যেতে পারে।

কথাটা সদানন্দর মনে ধরে। বিশিষ্ট বন্ধুদের ফোনে ফোনে নিজের প্রবলেম জানিয়ে তাদের সস্ত্রীক ইনভাইট করে। সুশীলার সঙ্গে সবার আলাপ টালাপ করিয়ে দেয়। সদানন্দ সর্বদাই তটস্থ হয়ে ছিল ওদের সামনেই না আবার কিছু সীন তৈরি করে বসে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সুশীলা আশ্চর্যরকম ভাবে অত্যন্ত সুশীল বালিকার মতো তাদের সঙ্গে গল্প আড্ডায় মেতে গেল। এমন কী তাদের ঘনঘন চা পরিবেশনেও তার কোন বিকার নেই। সদানন্দ নিজেকে ধিক্কার দিল, ছিঃ এতদিন এমন সহজ প্রক্রিয়াটা কেন তার মাথায় আসেনি। সেদিনের সান্ধ্য আসর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলকান্তিকে জানিয়ে দিল, ওষুধ ধরেছে।

পনের দিন। বিবাহিত জীবনের এই পনের দিনের স্বর্গসুখে যখন সদানন্দর মনে এবং চেহারায় বিকশিত ভাব এসেছে, তাকে আরো নধর এবং উৎফুল্ল দেখাচ্ছে, ঠিক তখনি, এ্যাটাচি রেডি করে একদিন অফিস বেরুবার মুখে, মনে হল কানের কাছে যেন বোমা ফাটল, —বলি, আর কত নষ্টামি দেখব তোমার? অ্যাঁ?

সদানন্দ চমকে উঠেছিল। আমতা আমতা করে, —নষ্টামি মানে? কী বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না।

—এতো জেল্লা বেরুচ্ছে কেন? মুখে চোখে? নিত্যি পাটভাঙ্গা জামাকাপড়? গায়ে গলায় সেন্ট মাখা? দামি দামি আফটার শেভ, ডিয়োডোর‍্যান্ট, আমি কিছু বুঝি না, না ?

সদানন্দর শান্ত এবং সদ্য আনন্দময় মেজাজে কে যেন পিন ফুটিয়ে দিল। অহেতুক বাক্যবাণে এবার সে সত্যিই ধৈর্য্যচ্যুত হল। গলায় রুক্ষতা এনে সে বলল, —কিসের কী বোঝ তুমি?

—প্রতি দিন এত সাজের বহর কেন? কে জুটেছে?

—আচ্ছা সুশীলা, তোমার মনে কী আর কোন চিন্তা আসে না? একটু ঠাকুর দেবতার কথাও তো ভাবতে পার?

—তা তো বটেই। নাহলে তোমার সুবিধে হবে কেমন করে? আমি ঠাকুর নিয়ে মেতে থাকব। যোগিনী হব, আর সেই তালে উনি মেয়ে মানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করবেন। রোজ সন্ধেবেলা বন্ধু আর বন্ধুর বউদের নিয়ে আড্ডা আরও জমে উঠবে। বলি কার বউকে দেখাবার জন্যে এত সাজের বাহার? অ্যাঁ?

হঠাৎ কী যেন হয়ে যায় সদানন্দর। মাথা দপদপিয়ে ওঠে। চোখের কোনে উপচে পড়ে রক্তরাগ। শরীরের সমস্ত জোর এক সঙ্গে করে ঠাস করে একটি চড় কষায় সুশীলার গালে। এতটার জন্যে তার কোন প্রস্তুতি ছিল না। সুশীলাও কোনদিন ভাবতে পারেনি সদানন্দ তার গায়ে হাত তুলতে পারে। চড়ের প্রচণ্ডতায় সুশীলা একদিকে ছিটকে পড়েছিল। সে দিকে তাকিয়ে সদানন্দ বলেছিল, —এর পর আর কোনওদিন যদি এ ধরণের কথা বল, সেদিন আমার হাতে তুমি খুন হয়ে যাবে।

অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা দিল সুশীলার মধ্যে। এরপর থেকে সে প্রায় নির্বাক হয়ে গেল। কারোর সঙ্গে আর কোন বাক্যবিনিময় নয়। এমন কী কাজের মাসি ময়নার সঙ্গেও নয়। কেতোর সঙ্গেও না। কেতো কাজের লোক। জিনিষ পত্তর কেনা, বাজার করা, এসব সেই করে।

সদানন্দর খুব খারাপ লেগেছিল। অতীষ্ঠ হয়ে সে অনেকবারই সুশীলাকে মনে মনে খুন করেছে। করেছে তার হাত থেকে নিষ্কৃতির কামনা। কিন্তু সত্যি সত্যিই সে মেরে বসবে এমনটা ভেবে উঠতে পারেনি।

স্বামী স্ত্রীর কথা বন্ধ। সুশীলা আর কোন ব্যাপারে নাক গলায় না। সে তার শোবার ঘর আলাদা করে নিয়েছে। সদানন্দ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেও ভাবে, এই ভাল। অন্তত বাক্যযন্ত্রণাটা কমলেও ঘরে শান্তি ফিরে আসে।

জোড়াতালি দিয়ে ভাববাচ্যে দিন কাটছিল। হঠাৎ সদানন্দ-গৃহে আবির্ভাব ঘটে লেখা বসুর। সুশীলার মামাতো বোন। মহিলার বয়েস বত্রিশ তেত্রিশ। থাকতেন দিল্লীতে। ওখানেই বরণ্ অ্যাণ্ড ব্রটাপ। অবিবাহিতা এক অধ্যাপিকা। কলকাতায় একমাত্র আত্মীয়া ঐ সুশীলা। কারণ সুশীলার পিতৃকূলে একটি মাত্র ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। সেই ভাইও বিদেশে চাকরি নিয়ে সেটেল্ড্। অতএব ওঠার জন্যে একমাত্র সুশীলার বাড়ি ছাড়া লেখার অন্য কোন স্থান নেই। সদানন্দর সঙ্গে লেখার আলাপ বিয়ের সময়। সেই সময় লেখা কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় আসে।

লেখা খুব একটা সুন্দরী নয়। কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। উদগ্র না হলেও তার যৌবন সৌন্দর্য হেলাফেলা করার মতো নয়। সোনালি ফ্রেমের চশমায় মুখখানিকে বেশ চটকদার মনে হয়।

লেখা শিক্ষিত এবং মার্জিত।

লেখা সরাসরি বাড়ি না গিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে তাদের বাড়িতে ফোন করে। সদানন্দই ফোনটা ধরে। প্রথমটায় চিনতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরে ময়নাকে ডেকে বলে যায়, তোমার দিদিমণিকে ডেকে দাও। ওনার বোনের ফোন।

অফিসে বসে সদানন্দ ভাবতে থাকে তার শালীটির এ বাড়িতে আসা কতটা সৌভাগ্যের অথবা দুর্ভাগ্যের। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা নেই, এসব ক্ষেত্রে জোড়া দেওয়ার কাজে তৃতীয় ব্যক্তির সংযোগ মাধ্যম বেশ ফলপ্রদ হয়। আবার তার স্ত্রীর স্বভাবটির কথা চিন্তা করে মন বিষিয়ে ওঠে। কারণ শেষ পর্যন্ত হয়তো শালীটিকে নিয়েই নতুন উৎপাত শুরু হবে।

এ ক্ষেত্রে দুটি ঘটনাই ঘটে গেল। লেখা আসার পর জীবনযাত্রা মোটামুটি স্বাভাবিক হ'তে শুরু করে। সুশীলাও কথা বলার লোক পেয়ে মোটামুটি সহজ হ'তে থাকে। সদানন্দ প্রথম প্রথম শালীটির সান্নিধ্য থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লেখা অন্য জল হাওয়ায় মানুষ। তার মধ্যে কোন সঙ্কোচের গুমোট কিছু ছিল না। নারীপুরুষের স্বাভাবিক মেলামেশার মধ্যে যে কোন জটিলতার জন্ম হ'তে পারে এমন সঙ্কীর্ণতা তার মধ্যে ছিল না। ফলে শালী জামাইবাবুর মধ্যে অচিরেই একটু মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল।

লেখা বুদ্ধিমতী মেয়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল তার দিদিটির মধ্যে একটি মারাত্মক জটিল রোগ আছে। তার নাম সন্দেহ। সে প্রাণপণ চেষ্টায় থাকলো দিদিকে স্বাভাবিক করার জন্যে। কিন্তু হঠাৎ একদিনের ঘটনায় আবার তোলপাড়।

সন্ধে বেলা ছাদে বসে লেখা আর সদানন্দ সুশীলাকে নিয়েই আলোচনা করছিল। সদানন্দ তার বিষম জীবনের সব কিছুই লেখাকে জানিয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল কোন মানসিক চিকিৎসক দিয়ে সুশীলাকে সারিয়ে তোলা।

সন্ধ্যার অন্ধকার। নির্জন ছাদ। একপুরুষ এক নারী গভীর আলোচনায় মগ্ন।

এহেন দৃশ্য দর্শককেও অন্য কিছু ভাবতে সাহায্য করে। সুশীলা নামক নারীটি যদি এ হেন দৃশ্য অবলোকন করে তার ফল কী হ'তে পারে তা সকলেরই অনুমেয়।

এ তাবৎকাল সুশীলা তার ক্ষুরধার বাক্যবাণে সদানন্দকেই অস্থির করে এসেছে। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় যে বাক্য প্রয়োগ করে তা শোনার মতো কান সম্ভবত সদানন্দরও তৈরি ছিল না। লেখার তো নয়ই।

—তুই কী এ বাড়িতে খানকিগিরি করতে এসেছিস? দিল্লীতে বুঝি আর কোন বাবু ছিল না? এখন বুঝতে পারছি কেন ওই লোক আমায় কথায় কথায় খুন করার হুমকি দেয়!

সদানন্দর মনে হল সেই মুহূর্তে ভূমিকম্পে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে সকলেরই মঙ্গল। আর লেখা আকাশ থেকে পড়ে। সে ভাবতেও পারে না কোন ভদ্রবংশীয় মহিলা এ হেন শব্দ বেশ চিৎকারের সঙ্গেই উচ্চারণ করতে পারে।

ইদানীং সদানন্দ প্রতিবাদ করা ছেড়ে দিয়েছিল। সে কোন কথা না বলে নীচে নেমে আসে।

লেখার বাংলা বলাটা খুব ফ্লুয়েন্ট নয়। হিন্দী, বাংলা ইংরাজীর জগাখিচুড়ি মিশ্রিত ভাষায় লেখা কেবল বলে, —ছিঃ দিদিজি! ক্যায়সা লেড়কি হো তু। তোর মুখে কী কুছুই আটকায় না? আয়সা গন্ধি বাত্?

—না আটকায় না। কালই তুই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। তোর ঐ পরের ভাতার খেকো মুখ যেন আমায় আর দেখতে না হয়।

সদানন্দ প্রথমে ডিভোর্সের কথা ভাবে। কিন্তু উকিলমশাই এ ধরনের কেসে চট্ করে ডিভোর্সের আশ্বাস দিতে পারেন না।

অগত্যা সদানন্দকে খুনের ডিসিশনই নিতে হয়। আর, ঠিক তারপর পাঁচদিনের দিন সুশীলাকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। হাউস ফিজিসিয়ান ডাক্তার প্রণবেশ রুদ্র সুশীলাকে ভাল করে পরীক্ষা করার পর সদানন্দকে জানান, —মিস্টার ঘোষ, আপনার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান হিসেবে আপনার স্ত্রীর জন্যে কোন ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারছি না। আই থিঙ্ক দিস ইজ নট আ নরম্যাল ডেথ। প্লীজ রিপোর্ট টু লোকাল পুলিস স্টেশন।

দুই

—ইজ ইট ভবানীপুর পুলিস স্টেশন?

—ইয়েস, স্পিকিং।

—মে আই স্পীক টু অফিসার ইন চার্জ?

—জাস্ট হোল্ড অন।

একটু পরেই অন্য স্বর ভেসে এলো, —ওসি বিকাশ তালুকদার স্পিকিং।

—নমস্কার স্যার। আমার বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি বাড়ি ফিরে দেখি আমার স্ত্রী আনকনসাস অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছেন। আমাদের হাউস ফিজিসিয়ান ডিক্লেয়ার করেন, সি ইজ ডেড। এবং তিনিই আমাকে লোকাল থানায় রিপোর্ট করতে বলেন।

—আপনার নাম?

—সদানন্দ ঘোষ।

—বাড়ির ঠিকানাটা বলুন।

বিকাশ তালুকদার সদানন্দ প্রদত্ত ঠিকানা লিখে নেন। তারপর বলেন, বডি রিমুভ করার চেষ্টা করবেন না। কোথাও কোন কিছুতে হাত দেবেন না। বাড়ির কোন লোককে বাইরে যেতেও দেবেন না। আমরা অসাছি।

প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নীল ব্যানার্জি তখন থানাতেই বসে। বিকাশের কথাবার্তা শুনে একবার তার দিকে তেরছা দৃষ্টি ফেলে আবার সেদিনের টেলিগ্রাফটা ওল্টাতে শুরু করল। বিকাশের নজর এড়ায় না। ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলেন,—এমন একটা ভাব দেখালেন ব্যানার্জি সাহেব যেন খুন খারাবির ব্যাপারে আপনার কোন ইন্টারেস্ট নেই। ও সব কথা যেন শোনাও পাপ।

নীল নিরুত্তর পূর্ববৎ।

—আপনাকে আমি অনেকদিন দেখছি, কেন ভাই ভনিতা করছেন?

—আমি কিছুই করিনি, কেবল টেলিগ্রাফের পাতা ওল্টাচ্ছি, বেশ গম্ভীর স্বরে নীলের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—বেড়াল যদি বলে তার মাছে অ্যালার্জি হয়েছে সেটা কী কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য?

—আমায় কী করতে বলছেন?

—খবরের কাগজটা মুড়ে রেখে আমার সঙ্গে চলুন।

—আমি তো পুলিসে চাকরি করি না। পুলিসের কেউ নই।

—খাতায় কলমে তাই। কিন্তু,

—নো কিন্তু। কেসটা পুলিসের। দায়িত্ব আপনার। আমি যাব কোন ঠ্যাকায়?

—দেখুন ব্যানার্জি সাহেব, জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেসে আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি তার জন্য সারাজীবন আপনার কাছে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ।

—অতি বিনয় হয়ে যাচ্ছে। এক কাজ করুন। বধূহত্যা। চোখ কান বুজিয়ে কেসটা ফর্মূলায় ফেলে দিন। শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদ, হাজব্যাণ্ড যাকে যাকে সামনে পাবেন সোজা নিয়ে গিয়ে গারদে পুড়ুন। তারপর বাঁধা গতে ফেলে দিন। অসহায় বধূকে সকলে মিলে হত্যা করেছে। এখন আইন বধূর ফরে। বধূর দোষ থাকুক আর নাই থাকুক। বধূ হত্যার মতো সহজ কেস আর হয় না।

—ঠাট্টা করুন, ব্যঙ্গ করুন, সব মেনে নিচ্ছি। এর পেছন একটা বিশাল চক্র কাজ করে তাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু কখনও কখনও তো ব্যতিক্রম ঘটে। আপনি কী বলতে চাইছেন সব সময়েই বধূরা নির্দোষ আর স্বামীর গুষ্ঠিবর্গকে আদালত জেলে পুড়ে দেয়?

—আমার এখন তর্ক ভাল লাগছে না।

—তাহলে উঠুন। আপনার চোখ বাজ পাখির মতো। একটা ছোট্ট সূত্রও আপনার চোখ এড়ায় না। প্লীজ চলুন। দেরি করে গেলে অনেক ইম্পর্ট্যান্ট ক্লু হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। আপনার শেখানো বুলিই কপচালাম। উঠুন ভাই, একটু নয় আমাকে হেল্প করলেন। বুড়ো হয়েছি, আর কটা বছর পর রিটায়ারমেন্ট। আর জ্বালাব না কথা দিচ্ছি।

নীল হেসে ফেলে ওর কথা শুনে। তারপর কাগজটা মুড়ে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে বলে, —এই জন্যেই আমি থানায় আসা ছেড়ে দিয়েছি। বিশেষ করে আপনার সঙ্গ, চলুন।

তিন

সদানন্দর বাড়িটা হিউম রোডের কাছে। সাবেকি বাড়ি, দোতলা। ছাদ আছে। বেশ প্রশস্ত ছাদ। বাড়িটাও বেশ ঝকঝকে। দোতলায় সামনে দিকে টানা লম্বা বারান্দা।

জীপ থেকে নেমে তালুকদার একবার আপাদমস্তক বাড়িটাকে জরিপ করলেন। কোথাও কোন লোকের চিহ্ন নেই। মেন গেট ভেতর থেকে বন্ধ। নীলের দিকে তাকিয়ে তালুকদার বললেন, —আসুন ব্যানার্জি সাহেব।

সঙ্গে দুজন কনস্টেবল ছিল। তাদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে তালুকদার কলিং বেলে চাপ দেন। মিনিট খানেকের মধ্যে মাঝ বয়েসী একটি কাজের লোক এসে দরজা খুলে দাঁড়ায়।

—এটাই কী সদানন্দ ঘোষের বাড়ি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাড়িতে আছেন তিনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গিয়ে বল আমরা থানা থেকে আসছি।

লোকটি মানে কেতো খবর দিতে যাবার আগেই দেখা গেল সদানন্দ নীচে নেমে এসেছে।

—আসুন স্যার, আমি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ওপরে যেতে হবে।

—হ্যাঁ, চলুন।

বিশাল মাপের ঘর। নানান রকমের আসবাবে ঘর প্রায় ভর্তি। খাট, সোফা, টিভি, বুকসেলফ, আলমারি, কী নেই? সবই আছে কিন্তু সবেতেই অযত্নের ছাপ। একটা ঘরের সাজগোজ দেখে বোঝা যায় সে ঘরের মালকিনের স্বভাব। পুরুষরা একটু অগোছালো হয়। কিন্তু বেশির ভাগ মহিলা, নিতান্ত অলস প্রকৃতির না হলে মোটামুটি ঘরটিকে সুন্দর করে রাখার চেষ্টা করে। তাছাড়া ঘরের আসবাব বলে দেয় মালিকের স্বচ্ছলতা কেমন? বিকাশ তালুকদার একবার নজর চালিয়ে দেন সব কিছুর ওপর। তারপর বলেন, —বডি কোথায়?

—আজ্ঞে পাশের ঘরে।

—তাহলে এ ঘরে নিয়ে এলেন কেন?

—না, মানে, প্রথমেই একটা মৃত্যুদৃশ্য দেখানো,

—আপনার বাড়িতে আমরা নেমন্তন্ন খেতে আসিনি। চলুন ওঘরে।

পাশের ঘরটা বড় ঘরটির লাগোয়া ঘর। দুই পার্টিশন ওয়ালের মাঝে বন্ধ দরজা। এ ঘরটি কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট। ঘরের একপাশে সিঙ্গল খাট। খাটে এক মহিলার নিষ্প্রাণ দেহ। পা থেকে বুক পর্যন্ত চাপা চাদর। খাটের পাশে একটা ছোট্ট টিপয়। অন্যান্য আসবাব

বলতে একটি ড্রেসিংটেবিল। কিছু প্রসাধন সামগ্রী। তাও এমন কিছু নয়। পাউডার, সুগন্ধী তেল, সিঁদুর কৌটো। আধ টিউব বোরোলীন। মাথার কাঁটা, চিরুনী ইত্যাদি। অন্যদিকে ওয়ার্ডরোব। টানতেই খুলে গেল। ঠাসা কাপড়। সবই মেয়েদের শাড়ি। ঘরের এক কোণে ছোট্ট টুলের ওপর একটি অ্যারিস্ট্রোক্র্যাট স্যুটকেশ। ছোট্ট টেবিলে দামি ট্রানজিস্টার। একটা কলম।

নীল আর বিকাশ তালুকদার এগিয়ে গেলেন সুশীলার দিকে। মহিলার বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ। কোঁকড়ান কালো চুলের ঢাল ছড়িয়ে আছে বালিশের ওপর। মুখখানি অনেকটা প্রতিমার মুখের মতো। পান পান ধাঁচ, টানা টানা বড় চোখ। চোখ বোজানো থাকলেও তা বোঝা যায়। সিঁথি উপচানো সিঁদুর। কিন্তু মুখের মধ্যে বিরক্তির ছাপ। দুই ভ্রুর ভাঁজে ভ্রূকুটির কুটিল রেখা। ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক। চাদর চাপা থাকলেও মহিলা যে স্বাস্থ্যবতী সেটা বোঝা যায়। বডি দেখতে দেখতে বিকাশ জিজ্ঞাসা করেন, —তাহলে ইনিই আপনার স্ত্রী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হঠাৎ নজর পড়ে ঘরের সংলগ্ন ঝুল বারান্দায় এক মহিলা আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে।

—উনি কে? বিকাশ প্রশ্ন করেন।

—আমার শ্যালিকা। সুশীলার পিসতুতো বোন, লেখা বসু।

—হুঁ।

—তাহলে আপনি বলছেন আপনার হাউজ ফিজিসিয়ান এঁর মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলছেন?

—হ্যাঁ। ওনারই পরামর্শ মতো আপনাদের ফোন করি।

—আপনার নিজের কোন সন্দেহ হয়নি?

—কিসের?

—ওঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হ'তে পারে।

—নাতো।

—উনি কী কোন অসুখ বিসুখে ভুগছিলেন?

—না।

—আপনার বাড়িতে, আচ্ছা তার আগে বলুন, এটা কী আপনার নিজের বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—আপনিই করিয়েছেন?

—না। বাড়ি আমার ঠাকুরদার। আমার বাবা ছিলেন ঠাকুরদার ওনলি সন। এবং আমিও আমার বাবার ওনলি সন।

—বুঝলাম। কতবছর আপনাদের বিয়ে হয়েছে?

—ছ বছর।

—আপনাদের ইসু কটি?

—আমাদের কোন ইসু ছিল না।

—ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?

—না।

—হোয়াই?

—কি করব বলুন, আমি অনেক করে সুশীলাকে গাইনির কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে রাজি হয়নি। তাবিজ মাদুলি মন্ত্রতন্ত্রতেই ও বিশ্বাস করতো।

—সিলি এক্স্‌কিউজ।

—হ্যাঁ। আমিও তাই বলি।

—আপনাদের মধ্যে কোন কমপ্লিকেশন গ্রো করেনি? আই মিন আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল?

চট্ করে এ প্রশ্নের উত্তর জোগালো না সদানন্দর মুখে। সে চুপ করেই রইল।

—মিস্টার ঘোষ। মনে করবেন না যেন আপনার প্রাইভেট জীবন সম্বন্ধে আমাদের অহেতুক কোন কৌতূহল আছে। এটা ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থেই করছি।

মুখটা একটু কাঁচু মাঁচু করে সদানন্দ বলে, —আমাদের মধ্যে ওটারই অভাব ছিল।

—কীরকম?

—সুশীলা আমাকে সহ্যই করতে পারতো না।

—কেন?

—ও প্রচণ্ড রকমের সন্দেহপ্রবণ মহিলা ছিল। সত্যি কথা বলতে কী বিবাহিত জীবনে ফুলশয্যার রাত থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোন শান্তি ছিল না।

বিকাশ এবং নীল নিজেদের মধ্যে একবার তাকাতাকি করে নেয়। বিকাশ প্রশ্ন করেন,

—এর কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন?

—আগেই বলেছি ও ছিল বড় জেলাস। প্রচণ্ড রকমের সন্দেহবাতিক। ওর সর্বদাই ধারণা ছিল আমি কোন না কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছি।

—সত্যি সত্যি করতেন নাকি?

—না। ওনার করে দেওয়া রুটিন ছাড়া আমার কোন ব্যক্তিগত জীবন ছিল না।

—এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন?

—আমরা দুজন। দুটি ঝি চাকর এবং

—থামবেন না বলে যান।

—আমার শ্যালিকা। তাও উনি বেশিদিনের জন্যে আসেননি। কলকাতায় আর কোন

আত্মীয়স্বজনের বাড়ি না থাকায় উনি দিন পনেরো হল আমাদের এখানে এসে উঠেছেন।

—এটা বিশ্বাসযোগ্য?

—এ কথা কেন বলছেন?

—না, এমনি। তা কী ভাবে উনি মারা গেলেন সে সম্পর্কে কোন ধারণা কী আপনার আছে?

—ঠিক বলতে পারব না, কেবল,

—কী কেবল?

—আজ দুপুরে আমার অফিসে একটা ফোন গিয়েছিল।

—তখন কটা?

—দুটো বেজে পাঁচ-এ।

—কে করেছিলেন?

—অপারেটর বলল আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর।

—আপনার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কী আপনার অপারেটর জানেন?

—হ্যাঁ। সুশীলা আগে প্রায়ই আমাকে ফোন করত। আসলে ও আমায় সব সময় চোখে চোখে রাখার প্ল্যানে চলতো।

—বুঝেছি, তারপর ফোন পেয়ে আপনি কী করলেন?

—আমি তো ফোন পাইনি। কারণ আমি একটু অফিসের কাজে বেরিয়েছিলাম।

—তাহলে খবরটা পেলেন কী ভাবে?

—ঐ যে বললাম অপারেটরের কাছে। ফিরে আসার পর।

—তারপর?

—অপারেটরের মুখে শুনলাম আমার স্ত্রী নাকি অসুস্থ। ফোন পেয়েই আমি বাড়ি ফিরে আসি।

—তখন কটা?

—প্রায় সাড়ে চারটে। কারণ অফিসে ফিরে আসি চারটে নাগাদ। হাতের কাজগুলো পি একে বোঝাতে লেগেছিল মিনিট দশেক। তারপর বাড়ি ফিরতে, হ্যাঁ ঐ রকম সময়ই লেগেছিল।

—এসে কী দেখলেন?

—সুশীলাকে সবাই ঘিরে আছে। আর ডাক্তার রুদ্র গম্ভীর মুখে বসে আছেন। সম্ভবত আমার অপেক্ষাতেই।

—সেই সময় সুশীলা দেবীর আশে পাশে কারা ছিলেন?

—কেতো, ময়না, পিসিমা, লেখা আর পাশের বাড়ির রমলা বৌদি।

—আপনার পিসিমা কোথায় থাকেন?

—আমার ঠিক দুটো বাড়ির পরেই। পিসিমার সঙ্গে সুশীলার বেশ ভাবটাব ছিল।

এই সব কথা চলাকালীন নীল একমনে সুশীলার মৃতদেহ এবং আশপাশের যা কিছু দর্শনীয় তা দেখে নিচ্ছিল। হঠাৎ ও মৃতার আঙুলগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে আরম্ভ করল। তারপর নিজেই একসময় প্রশ্ন করল, —মিস্টার ঘোষ, আপনার স্ত্রী কী খুব ভাগ্যেটাগ্যে বিশ্বাস করতেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু ভাগ্য কী বলছেন, তুকতাক জড়িবুটি এসবেও অগাধ বিশ্বাস ছিল। দেখছেন না সব আঙুলেই একটা করে পাথর।

—হুঁ। ওপর হাতেও অনেক তাগাতাবিজও আছে। কিন্তু একটা আঙুলে, আই মীন বাঁ হাতের অনামিকায় কিছু নেই। কিন্তু আংটি পড়ার দাগ আছে। ওটা কী খুলে রেখেছেন?

—তাতো বলতে পারব না। কারণ সুশীলার সঙ্গে আমার প্রায় মাস তিনেক কোন কথাবার্তা নেই। আমি জানিও না ও কখন কী করে।

—মাস তিনেক কথা বন্ধ? ঝগড়া টগড়া হয়েছিল নাকি?

লজ্জিত মুখ সদানন্দ বলে, —হ্যাঁ স্যার। এ সব বলতেও খুব খারাপ লাগে। সবই ঐ সন্দেহ জাত কারণে।

—কী রকম?

—সন্ধের পর আমি যদি কোন কারণে রাত করে বাড়ি ফিরি, সেদিন অশান্তির শেষ থাকতো না। অথচ বাড়ি ফিরে যদি টিভি বা কোন বইটই পড়ি, সেখানেও একটা না একটা অজুহাতে ঝগড়া শুরু করতো। বাধ্য হয়ে ঠিক করেছিলাম বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে সন্ধেটা বাড়িতেই ওর সঙ্গে কাটাব। তা সেটাও হতে দেয়নি। আমার বন্ধুপত্নী আর আমাকে নিয়ে সন্দেহ করে, যা নয় তাই গাল দিতে শুরু করে। ফলে আমিও আর রাগ সামলাতে না পেরে ওকে একটা চড় মেরেছিলাম। সেই থেকে,

—এ রকম চড় চাপড় কী আপনি প্রায়ই মারতেন?

—না, না, সেই প্রথম সেই শেষ। তারপর লেখা আসার পর বেশ কয়েক দিন নিজে থেকেই আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। আবার সেই লেখাকে আর আমাকে জড়িয়ে একদিন ছাদে অকথা কুকথা শুনিয়ে দিল। তারপর থেকে আর আমি ওর ব্যাপারে কোন খবরই রাখতাম না।

—তার মানে, আংটির ব্যাপারটা আপনার অজানা। ঐ আঙুলে কী আংটি ছিল সেটা কী খেয়াল করতে পারেন?

—একটা হীরের আংটি ছিল সেটা জানি। তবে সেটা কোন্ আঙুলে পড়তো বা আদপেই পড়তো কিনা বলতে পারব না।

নীল কিন্তু সুশীলা দেবীর হাতটা তখনও ছাড়েনি। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঙুলগুলো পরীক্ষা করছিল। একবার নাকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কিছু একটা ঘ্রাণ নেবার

চেষ্টাও করল।

—আপনার কী মনে হচ্ছে ব্যানার্জি সাহেব, কানের কাছে মুখ এনে তালুকদার জিজ্ঞাসা করলেন, হোমিসাইড অর সুইসাইড?

—কোন একটা সাইড তো নেবেই। তবে নরম্যাল নয় এটুকু বলা যায়। তারপর নিজেই এগিয়ে গেল ডাক্তার রুদ্রর কাছে। উনি একদিকে একটা চেয়ারে বসেছিলেন।

নীল জিগ্যেস করল,—ডাক্তার রুদ্র, আপনি তো এদের পারিবারিক চিকিৎসক?

—হ্যাঁ, বলতে পারেন।

—বলতে পারেন এ কথা বলছেন কেন?

—কারণ ছোট খাটো ব্যাপার হলে এঁরা অবশ্যই আমায় কল দেন। কিন্তু তেমন বড় ধরনের কিছু হলে সেই বিষয়ে স্পেশালিস্টের কাছেই তো যাবেন।

—হুঁ। তা মিসেস ঘোষের কী তেমন কোন বিশেষ অসুখ ছিল?

—ছিল। ওঁর হার্ট খুবই উইক। যার জন্যে মিস্টার ঘোষকে আমি সাজেস্ট করেছিলাম কোন হার্ট স্পেশালিস্ট দেখাতে। তার ওপর,

—কী?

—ওনাদের কোন ইস্যু নেই। অনেকবার বলেও ছিলাম কোন গাইনির সঙ্গে পরামর্শ করতে, কিন্তু ওঁরা সেটাও করেননি।

হঠাৎ সদানন্দ বলে ওঠে, —আমি তো আগেই বলেছি আমার স্ত্রী কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে চাইতো না। একমাত্র ডক্টর রুদ্র ছাড়া।

—এ ধরনের মানসিকতার কারণ যা দেখিয়েছেন সেটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। অন্য কোন কারণ কী আপনার জানা আছে?

এতক্ষণ লেখা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সদানন্দকে দোনামোনা করতে দেখে সেই এগিয়ে এসে বলে, —একটা কারণ দিদিজি আমার কাছে বলেছিল। পহেলা দিনই।

—কী?

—আমার দিদিজির একটা আইডিয়া হয়ে গিয়েছিল কি সদানন্দদা ওকে মার্ডার করতে চায়। আগর কোই আনজানে ডাক্তার যদি ওকে পয়জন খাইয়ে মেরে ফেলে, দিস ওয়াজ হার মেইন টেরর।

নীল বা বিকাশ লক্ষ্য করলেন লেখার বাংলাভাষায় কিছু গলদ আছে। ব্যাপারটা নেগলিজিব্‌ল্। নীল আগের কথার জের টেনে বলল। —তার মানে ডাক্তার রুদ্রর দেওয়া ওষুধ ছাড়া উনি অন্য কোন ওষুধই খেতেন না। আচ্ছা ডাক্তার রুদ্র, আপনি কী মিসেস ঘোষকে কোন মালিশ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন?

—নাহ্, তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।

—ওয়েল, নীল একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা করল, আপনার কেন সন্দেহ

হ'ল যে মিসেস ঘোষের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়? কেনই বা আপনি পুলিসকে ইনফর্ম করাতে বললেন?

ডাক্তার রুদ্র খানিকটা সময় নীলের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন, —এই মুহূর্তে কোন সাইনটিফিক অ্যাণ্ড ডেভিনিট রিজন্ হয়তো দিতে পারব না। বলতে পারেন আমার সিক্স্ সেন্স। কিছুটা অভিজ্ঞতা।

—সেটাই তো জানতে চাইছি।

আবার কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। কিছু একটা ভাবতে ভাবতে বললেন,—দেন ইউ হ্যাভ টু কাম টু মাই চেম্বার। কিছু কিছু কথা আছে যেগুলো বোধ হয় সবার সামনে বলা উচিত নয়। অ্যাট লীস্ট আপনাদের তদন্তের স্বার্থে তো নয়ই। তা এবার কী আমি যেতে পারি?

তালুকদারই বললেন, —অনেক ধন্যবাদ ডক্টর রুদ্র। প্রয়োজন পড়লে আমরা আপনার চেম্বারে আসব।

—অলওয়েজ ওয়েলকাম, বলে ডাক্তার রুদ্র চলে গেলেন।

নীলের দিকে তাকিয়ে তালুকদার বললেন, —ব্যানার্জি সাহেব, আমরা কী এবার বডি পোস্ট মর্টেমের জন্যে পাঠাতে পারি?

—পুলিস তার কাজ নিশ্চয়ই করবে। মোটামুটি আমার যা দেখার তা দেখা হয়ে গেছে। তবে আমি পার্সোন্যালি এ বাড়ির সকলকে একটু ইন্ট্যারোগেট করতে চাই।

—ওহ্ সিওর।

তারপর বিকাশ সদানন্দর উদ্দেশ্যে বলেন, —মিস্টার ঘোষ। ডাক্তার রুদ্রের সঙ্গে একমত হয়েই আমরা আপনার স্ত্রীর মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলে মনে করছি। এক্ষেত্রে বডি পোস্টমর্টেম করাতেই হচ্ছে। আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনি আইনমাফিক বডি ফেরত পাবেন। উনি আমাদের তরফ থেকে আপনাদের কিছু প্রশ্ন করবেন। আশাকরি এ ব্যাপারে আপনারা এঁকে কোঅপারেট করবেন।

পাশের ঘরে গিয়ে নীল প্রথমেই ডাকল সদানন্দর পিসিমাকে। ভদ্রমহিলার বয়েস হয়েছে। নিদেন পক্ষে পঁয়ষট্টি তো হবেই। ছোট খাটো চেহারা। ধবধবে। একদা উজ্জ্বল রঙ ছিল। এখন সেখানে বয়েসের কিঞ্চিৎ মালিন্য। মহিলার চোখে সোনালী গোল ফ্রেমের বাই ফোকাল।

—বসুন মাসিমা।

—কিন্তু বাবা, এ সব কী শুনছি। বৌমার নাকি অপঘাত মৃত্যু হয়েছে?

—পুলিস আর ডাক্তার সেই রকমই সন্দেহ করছে।

—তুমিও তো পুলিসের লোক।

—না। তবে পুলিসের বন্ধু বলতে পারেন।

—ঐ একই কথা। তা বাবা আমি এ ব্যাপারে কী বলব বল?

—আপনি যেটুকু জানেন তাই বলবেন। আপনি তো দু তিনটে বাড়ির পরই থাকেন।

—হ্যাঁ।

—সদানন্দবাবুর সঙ্গে ওর স্ত্রীর কী খুব ঝগড়া হোত?

—তা হোত।

—ঝগড়াটা কী নিয়ে?

—ঐ যা হয়। নিজের ভাইয়ের ছেলে বলে বলছি না, সদুর বাপু স্বভাব চরিত্তির তেমন সুবিধের নয়। মেয়েদের সঙ্গে একটু ঢল ঢল ভাব বরাবরই। তা কোন্ বউ আর সে সব সহ্য করে? তাই নিয়ে চলত দিন রাত।

—ইদানীং তো কথাও বন্ধ ছিল।

—ঐ লেখা ছুঁড়ির আসার পর থেকেই। তা শালীই হোক আর যা-ই হোক, সোমত্ত মেয়ে। তার সঙ্গে এত গদ গদ হবার কী দরকার?

—আপনি নিজে তেমন কিছু দেখেছেন?

—না। আমি আর কতটুকুই বা এ বাড়িতে আসতুম। ঐ বৌমাই যা বলতো।

—আপনি কী কোন মলম ব্যবহার করেন?

—হ্যাঁ, হাজার মলম।

—সদানন্দবাবু নাকি প্রায়ই বলতেন ওর স্ত্রীকে খুন করবেন। সে রকম কিছু শুনেছেন নাকি?

—সদানন্দ নিজেই তো আমার কাছে গিয়ে বলেছিল, বৌমা নাকি এমন ব্যবহার করছে একদিন রাগের মাথায় বৌকে খুন করেও ফেলতে পারে। তা বাবা বৌমা কী সত্যিই খুন হয়েছে?

—আমরা এখনও জানিনা। তবে সত্যি মিথ্যে ধরাটাই তো আমাদের কাজ। ঠিক আছে, আর আপনাকে বিরক্ত করব না। আপনি বরং এ বাড়ির কাজের মেয়েটিকে একটু পাঠিয়ে দিন।

বৃদ্ধা চলে যাবার পর নীল বড় ঘরটা একটু ভালোভাবে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। সম্ভবত ও কোন একটা বিশেষ কিছু খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিল। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা বিসদৃশ দৃশ্যে ওর দৃষ্টি আটকে গেল। এ রকমটা হবার কথা নয়। কিন্তু হয়েছে। যদিও পুরো ঘরখানা অগোছাল তবুও দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি অনেকখানি বেঁকে কাৎ হয়ে আছে। ঘরে আরো অনেক ছবিই আছে। সেগুলোর মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। কৌতূহল বশত ছবিটার নীচে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো ছবি এবং দেওয়ালের মধ্যবর্তী ফাঁকে কিছু একটা বস্তু আটকে আছে। তখনও ময়না এসে পৌছয়নি। নীল চটপট ছবিটা সরাতেই একটি ছোট্ট শিশি মাটিতে পড়ে গেল। মাঝারি আকারের একটা ছোট্ট

শিশি। তার গায়ে লেখা আছে, পয়জন—নট টু বী টেক্‌ন্ ওরালি। বাইরে পায়ের আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীল শিশিটি পকেটস্থ করে নেয়। ময়না এসে ঘরে ঢোকে। নীল একবার ময়নাকে আপাদমস্তক দেখে নেয়।

পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের মতো বয়েস। সারা মুখে বসন্তের দাগ। রঙ কালো। রোগা ডিগডিগে। মাথার চুলে পাক ধরেছে। এক কথায় কদাকার। ওকে দেখে নীল আপন মনে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, হুঁ।

—তোমার নাম ময়না?

—হ্যাঁ বাবু।

—বোসো, তোমায় কটা কথা জিজ্ঞেস করি। এ বাড়িতে তোমায় কে এনেছে?

—আজ্ঞে বৌদিমণি।

—আগে একটি কম বয়েসী মেয়ে কাজ করত। সে কেন চলে গিয়েছিল জান?

—বাবু তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করত, তাই বৌদি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তুমি জানলে কী করে?

—বৌদি বলতো।

—তোমার বাবুকে কী তোমার সেইরকম মনে হয়?

—তেমন কিছু তো দেখিনি। তবে বাবুর এক বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে দাদাবাবুকে দেখতুম খুব হাসি ঠাট্টা করতো। আর, না থাক।

—থাকবে কেন?

—দাদাবাবু অনেক রাত পর্যন্ত তেনার ঐ শালীটিকে নিয়ে ছাদে বসে বসে গল্প করতো।

—তোমার বৌদি সে কথা জানতেন?

—না। তিনি তো ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন।

—ঘুমের ওষুধ কী রোজই খেতেন?

—তা বলতে পারবুনি।

—আচ্ছা তোমার দাদাবাবু কী কোনদিন তোমার বৌদিকে খুন করবেন এমন কথা বলেছিলেন?

—একবার যেন বলেছিলেন মনে হচ্ছে।

—তুমি এ বাড়িতে কী কাজ কর?

—রান্না বাদে আর সবই করি।

—রান্না কে করে?

—বৌদিমণি নিজেই করতেন।

—আজ সকাল থেকে কী তোমার বৌদিকে অসুস্থ দেখেছিলে?

—সকাল থেকে একটু যেন আনমনা মনে হচ্ছিল। তবে রান্নাবান্না করার পর উনি তেনার খাতা নিয়ে বসলেন কী সব লিখতে। তারপর একটু গরম দুধ খেতে চাইলেন।

—দাঁড়াও। খাতায় লিখতে বসলেন বলছ? কী খাতা?

—তাতো বলতে পারবুনি। যখনি সময় পান, তেনার একটি খাতা আছে, তাতেই কী সব লিখতেন।

—সে খাতাটা কোথায়?

—বলতে পারবুনি।

—গরম দুধ খেতে চেয়েছিলেন কেন? রোজই খেতেন নাকি?

—না। আমাকে ডেকে বললেন, শরীরটা দুর্বল লাগছে তাই একটু গরম দুধ খাবেন।

—তুমি দুধ দিয়েছিলে?

—হ্যাঁ বাবু। এক গেলাস।

—সেই গ্লাসটা কোথায়?

—সেতো ধুয়ে আবার তুলে রেখে দিইছি।

—দুধ খাবার পর উনি দুপুরে কখন ভাত খেয়েছিলেন?

হঠাৎ ময়না ফুঁপিয়ে ওঠে।

—কী হ'ল, কাঁদছ কেন?

—আমার কাছে দুধ চাইলেন তখন সাড়ে বারোটা কী একটা হবে। তারপর আমি দুটোর সময় তিনাকে ডাকতে গিয়ে দেখলুম তখনও ঘুমুচ্ছেন। ভাবলুম আর একটু পরে ডাকব। তারপর আড়াইটের সময় ডাকতে গিয়ে দেখি,

ময়না আবার মড়া কান্না শুরু কল। নীল হাল্কা ধমকের সুরে বলল,

—এখন আর কেঁদে কী করবে। বরং কী দেখলে সেটাই বল।

—বড় বিভৎছ দৃশ্য বাবু। দেখি বৌদিমণি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। মুখটা কেমন কালচে মেরে গেছে। আর ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে রক্ত আর ফেনা গড়াচ্ছে। চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেইরে আসছে।

—হুঁ। তুমি তারপর কী করলে?

—লেখা দিদিকে ডেকে আনলুম।

—কিন্তু আমরা এসে দেখলুম মুখে কোন রক্ত বা ফেনা লেগে নেই। ওগুলো কে পরিষ্কার করল?

—সেটি তো বলতে পারবুনি বাবু কে পোষ্কার করল?

—হুঁ। তা লেখা দিদি আসার পর তুমি কী করলে?

—লেখা দিদি সব দেখে আমায় পিসিমাকে খবর দিতে বললেন। আমিও চলে গেলুম।

—তোমার দাদবাবু কখন এসেছিলেন?

—জানি না বাবু। আমার তখন মাথার ঠিক ছেলনি। আমি তখন এ বাড়ি সেবাড়ি খবর দিতে গেছি।

—আচ্ছা তুমি এবার যেতে পার। তোমাদের ঐ কাজের ছেলেটা, কী যেন নাম?

—কেতো।

—ওকে ডেকে দাও।

ইতিমধ্যে বিকাশ তালুকদার ঘরে এসে ঢুকেছেন।

—বডি পাঠাবার ব্যবস্থা করে এলাম। তা কী বুঝছেন?

—সম্ভবত মার্ডার কেস! আপনাকে দুটো জিনিস খুঁজে বার করতে হবে।

—বলুন।

— মিসেস ঘোষের ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। ওটা পাওয়া খুবই প্রয়োজন। আর ওনার হাতের হীরের আংটিটা কোথায় সেটিও জানা দরকার।

—ওক্কে, আমি নিজে খোঁজ নিচ্ছি।

বিকাশ তালুকদার যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেতোর প্রবেশ। বছর পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়েস। রোগা রোগা চেহারা। টেরির বাহার আছে। পরণে শার্ট আর পাজামা।

—আমায় ডেকেছেন স্যার?

—হ্যাঁ, তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, কার্তিকচন্দ্র বারিক। সবাই আমায় কেতো বলে ডাকে।

—এ বাড়িতে কদিন আছো?

—সে অনেকদিন।

—তবু, কদিন?

—তা ধরুন গিয়ে আঠারোয় এসেছি। এখন আটত্রিশ। মানে বিশবছর। বড়বাবু তখন বেঁচে ছিলেন।

—তার মানে তুমি আসার পর তোমার বাবু বিয়ে করেন?

—হ্যাঁ। সে আমার ওপরই সব দায় দায়িত্ব তখন।

—তোমার বৌদি লোক কেমন ছিল?

—আর বলবেন না স্যার। টেঁসে গেছে। তার সম্বন্ধে কুকথা বলতে নেই। কিন্তু মাইরি বিশ্বাস করুন ওর জন্যেই তো আমার লাভারকে হারাতে হল।

—লাভার? ও আচ্ছা, সেই আগে যে মেয়েটি এ বাড়িতে কাজ করতো? তার সঙ্গে তোমার বুঝি,

কথা কেড়ে নিয়ে কেতো বলল, —কী বলব স্যার, গঙ্গা তো প্রথম প্রথম পাত্তাই দিত না। দেখতে ডাঁসা বলে খুব রোয়াব ছিল। ওর নাকি কে আবার একজন বর ছিল। বর না

বর্বর কে জানে। শালা মাতাল। হেভি পেটাতো। তবে, আমার নামও কার্তিকচন্দ্র। শালী একদিন গেঁথে গেল। সবে বে থার কথা পাড়বো, দিল মাল গেঁজিয়ে,

—কী রকম?

—একদিন বাবু অফিস থেকে ট্যাড্ হয়ে ফিরে গঙ্গাকে এককাপ চা চেয়েছিলেন, ব্যাস, যেই না চা বলা, কোত্থেকে বৌদি ছুটে এসে মারলো ফোঁস। বাবুকে যাচ্ছেতাই খিস্তি। বাবু তো মাথা নীচু করে দে দৌড়। আর গঙ্গাকে যেই না আন্সান্ বকতে শুরু করেছে, ওর নাম গঙ্গা, দিল তুলো ধোনা করে, বৌদির মুখের ওপর বলে দিল, রইল তোর কাজের পিণ্ডি, আমার টাকা মিটিয়ে দাও, আমি চল্লুম। গঙ্গাও গেল, আর আমারও কপাল পুড়ল। আর কি কোনদিন বিয়ে হবে?

—তা তুমি বিয়ে থা করনি?

—কে আর বে দিচ্ছে বলুন? আহা গঙ্গা বলেছিল।

নীল বুঝল কেতোকে এত কথা জিজ্ঞাসা করা মানে নিজের সাতকাহন ফিরিস্তি শোনাবে। তাই ছোটখাট কয়েকটা প্রশ্ন করে ওকে ছেড়ে দিল। যার মর্মার্থ হচ্ছে, সদানন্দ মহাদেব তুল্য লোক এবং সুশীলাই পায়ের ওপর পা তুলে ঝগড়া আরম্ভ করতো। অর্থাৎ সদানন্দের বিপক্ষে দুই, পক্ষে এক। এমন সময় লেখার আগমন। পরনে সবুজ রঙ সালোয়ার কামিজ, হলুদ ওড়না।

—আসুন লেখা দেবী। আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম। বসুন।

লেখা একটা চেয়ারে গিয়ে বসে। তারপর খুব ধীর এবং শান্ত স্বরে বলে,

—আপনি জরুর আমাকে কুছু প্রশ্ন করতে চান। জানি এটাই তরিকা। আই মিন ইনভেস্টিগেশনকা নিয়ম। তো পহেলে মেরা ভি কুছ কহনা হ্যায়।

—বলুন।

—আমি দিল্লীতে বর্ণ্ অ্যাণ্ড ব্রটাপ। তাই আমার ল্যাঙ্গুয়েজ মে কুছ সময়ে হিন্দী আ জায়গা।

—ঠিক আছে, আপনি বলুন। আমি বুঝতে পারব।

—উস্ টাইমমে ম্যায় নে কুছ না বোল পায়া।

—কখন?

—দিদিজির হাতে একটো আঙ্গুঠি ছিল। আ ডায়মণ্ড রিং।

—হ্যাঁ আমার সেই রকমই অনুমান।

লেখা নিজের হাতটা তুলে ধরে বলে, —এই সেই আঙ্গুঠি।

—সেকী, এটা আপনার কাছে এলো কেমন করে?

—দিল্লীসে আনেকা বাদ, দিদিজি নিজেই হাত থেকে খুলে আমার হাতে লাগিয়ে দিয়েছিল। র‍্যাদার ইট ওয়াজ আ গিফ্ট্ অফ্ মাই এলডার সিস্টার।

—তা সে সময়ে আপনি কিছু বললেন না কেন?

—কিঁউ কি ঐ টাইমে আমি কুছু বললে আপলোগ সামথিং উল্টাপাল্টা মানে করবেন। কোই মিস্ আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। হামি ভি কুছুই বুঝতে পারছিলাম না। এনিওয়ে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক দিস ব্যাক, আহ্যাভ নো ফ্যাসিনেশন অ্যাটঅল।

—না, মিস্ বোস। আমার বা পুলিসের কোন দরকার নেই ঐ আংটির। কিন্তু ব্যাপারটা চোখে লেগেছিল তাই প্রশ্নটা তুলেছিলাম। আচ্ছা এবার আমি আপনাকে কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব।

—পার্সোন্যাল? কিজিয়ে, আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট টু স্যাটিসফাই ইউ।

—ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনি বিয়ে থা করেননি?

—নো স্যার। আভিতক কোই ফুরসত নেহি মিলা।

—আপনি হঠাৎ দিল্লী থেকে এখানে এলেন কেন?

—দিল্লী আমার কাছে খুব বোর করছিল। তাছাড়া আফটার দ্য ডিমাইজ অব মাই পেরেন্টস্, ম্যায় নে বহুত এলোন হো গয়ি। উসি লিয়ে আই ওয়াণ্টেড টু মেক আ চেঞ্জ অব প্লেস। তো, কলকাত্তায় দিদিজি আউর সদানন্দদা ছাড়া মেরা কোই রিলেটিভ ইধার নেহি হ্যায়, উসিলিয়ে। আগর আপনি যদি আমার জান পয়ছান হন, কী রিলেটিভ, দিল্লী এলে আপনাকে আমার বাড়িতেই রাখব। ইস্মে গলতি কেয়া?

—না, না, ভুলের কিছু নেই। এটাই তো হওয়া উচিত। তা আপনি একজন টিচার?

—ইয়েস। লেকচারার অব আ কলেজ। এই টাইমে দিল্লীতে বহুৎ গরমি আছে। অ্যাণ্ড মেরা ছুটি ভি বহুৎ যাদা পড়াহুয়া হ্যায়। সো আই হ্যাভ কাম হিয়ার টু স্ট্যে ফর টু মান্থস্। লেকিন,

—লেকিন?

—আফটার দ্য স্যাড ডিমাইজ অব দিদিজি, আমি ভাবছি কী ফিন দিল্লী অর এনি আদার প্রভিন্সে ব্যাক করব।

—তা নয় যাবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

—হোয়াই?

—কারণ আপনার দিদির মৃত্যু ইজ নট নরম্যাল। আই থিঙ্ক দেয়ার আর সাম মিস্টিরিয়াস রিজন্স। যতদূর শুনেছি মহিলার হার্টের অসুখ ছিল। হার্টের পেশেন্ট যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারেন, কিন্তু—

—এনিথিং রং? আর ইউ সিওর দ্যাট হার ডেথ ওয়াজ এবনরম্যাল?

—ইয়েস ম্যাডাম। আচ্ছা, ময়নাই তো আপনাকে সুশীলা দেবীর মৃত্যু সংবাদ দেয়?

—হ্যাঁ। অ্যাণ্ড, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওই ঘরে গিয়ে পৌছই।

—আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

—গ্রাউণ্ডফ্লোরে। আমার বেডরুমে। সবে বাইরে থেকে ফিরেছি।

—কোথায় গিয়েছিলেন?

—বাইরে একঠো আর্জেন্ট এপয়েন্টমেন্ট ছিল।

—ফেরেন কটায়?

—উইদিন ফোর।

—এসে কী দেখেন?

—দিদিজি স্ট্রেইট শুয়ে আছে। অ্যাণ্ড—

—অ্যাণ্ড?

—সারা মুখ ভেরী পেইনফুল মনে হচ্ছিল। অ্যাণ্ড আ মিক্সচার অব ব্লাড অ্যাণ্ড হোয়াইট ফোম ওয়াজ কামিন আউট ফ্রম হার লিপ্‌স্‌।

—কিন্তু আমরা এসে দেখেছি সে সব কিছুই ছিল না। তা সেগুলো কে পরিষ্কার করেছিল?

এ প্রশ্নে লেখাকে সামান্য বিব্রত দেখায়।

—মিস্‌ বোস, আপনি যা জানেন, ফর দ্য সেক অব ইনভেস্টিগেশন, সত্যি কথা বলুন।

—সদানন্দদা ফিরে এসে প্রথমেই একটু শোর মচালেন। তারপর নিজেই ভিজে রুমাল দিয়ে দিদিজির মুখটা ক্লীন করে দিলেন।

—তারপর?

—তারপর উনি ডাক্তার রুদ্রকে কল দেন।

—আপনার দিদির সঙ্গে আপনার জামাইবাবুর রিলেশন, সম্ভবত ভালো ছিল না।

—রিলেশন, লেখা দেবী ম্লান হেসে বললেন, র‍্যাদার ইউ কুড সো, দে ওয়্যার অলওয়েজ ইন দ্যা ফিল্ড্‌ অব বিটার আর্থ।

—হোয়াই? জানেন কিছু?

—ইট ওয়াজ মাই দিদিজ ফল্ট। আই মাস্ট সো। সি ওয়াজ ভেরী মাচ্‌ জেলাস অ্যাণ্ড সাসপিসাস। সদানন্দদাকে ভীষণ সন্দেহ করতো। ইভন্‌ আমাকে নিয়েই একদিন বহুৎ বুড়া কথা বলে দিল। হুইচ ইনসাল্টেড মী লাইক এনিথিং। আমি ডিসিশন নিই, আই হ্যাভ টু কুইট দিস হাউস ভেরী সুন।

—সদানন্দ বাবু লোক কেমন?

—ভেরী গুড পার্সন। জেন্টেলম্যান, পোলাইট অ্যাণ্ড গুড হার্টেড।

—তাহলে আপনার দিদি তাকে সহ্য করতে পারতেন না কেন?

একটু নীরবতার অবকাশ কাটিয়ে লেখা বলে, —আমার জিয়াজি আই মীন সদানন্দদা, আপনারা তো দেখেছেন ভেরী নাইস লুকিং পারসন। ওম্যান্‌ কিলারের মতো ফিগার। সেই

হিসেবে দিদিজি ওয়াজ নট হিজ ম্যাচিং পার্টনার। অ্যাণ্ড আই থিঙ্ক দিস ওয়াজ আর মেইন কমপ্লেক্স। দিদিজির ধারণা সদানন্দদা ইভ্‌ন্‌ আমার সঙ্গেও প্রেম করে।

—ইজ ইট রং?

—কী ব্যাপারে?

—সদানন্দবাবুর আপনার ওপর কিছু দুর্বলতা আছে?

—মাইট বী। এর কারণও একটাই, হি ইজ নট হ্যাপি উইথ হিজ ওয়াইফ।

—সদানন্দবাবুর পক্ষে তাহলে ওঁর স্ত্রীকে হত্যা করার বাসনা হতেই পারে। ওনলি টু গেট রীড অব হার।

লেখা চমকে তাকায় নীলের দিকে। তারপর আমতা আমতা করে বলে,—এ আপনি কী বলছেন? আই ডোন্ট থিঙ্ক্ সো। হি ইজ নট আ ম্যান অব দ্যাট টাইপ।

—কিন্তু বিপাকে পড়লে, বা নিজের ক্ষত বিক্ষত জীবনে আপনার উপস্থিতি সম্ভবত তাঁকে শান্ত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তাই, মানুষের পক্ষেই তো যে কোন অন্যায় কাজ করা সম্ভব।

—আই ডোণ্ট বিলিভ সো।

—আপনার দিক থেকে কোন দুর্বলতা? এনি উইকনেস?

—ইয়ে মেরা নিজি মামলা। প্লীজ ডোণ্ট আস্‌ক্ মী এনিথিং লাইক দ্যাট। লেকিন ম্যায় ইয়ে ভি বোল্ সকতি, হি ওয়াজ ভেরী মাচ আন হ্যাপি ইন হিজ কনজুগ্যাল লাইফ। ভেরী বোর্ডাম অ্যাণ্ড টিডিয়াস।

—থ্যাঙ্কস, আর আপনাকে কিছু প্রশ্ন নেই। আপনি যেতে পারেন। বাট ডোণ্ট লীভ দিস সিটি উইদাউট পোলিস পারমিশন।

লেখা চলে যাচ্ছিল।

—মিস বোস, ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন। আপনার দিদি কী কোন ডায়েরি লিখতেন?

—মাইট বী, সম্ভবত লিখতেন।

—সে ডায়েরিটা খুঁজে পাওয়া দরকার। ক্যান ইউ হেল্প আস?

—আমি মাত্র কদিন এ বাড়িতে এসেছি। আমার পক্ষে তো সব প্লেস অব হাইডিং, চিনাও সোম্ভব নয়। এনিওয়ে, আপনি যখন বলছেন, আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট্।

লেখা চলে যাবার পর নীলের ভ্রূর ভাঁজে কয়েকটা ট্যারাবাঁকা দাগ ফুটে উঠল।

চার

জীপে উঠে বিকাশ তালুকদার বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকলেন। যেটা আদপেই ওর স্বভাবের মধ্যে পড়ে না। ত্যারচা দৃষ্টিতে বিকাশকে একবার দেখে নীল বলল, —সবাইকে সবকিছু মানায় না তালুকদারবাবু।

—কী রকম?

—যেমন উটের মুখে হাসি মানায় না তেমনি আপনার মুখে উটের গোমড়াপনা মোটেই সুখদৃশ্য নয়।

—অন্য সময় হলে আপনার কথায় প্রাণ খুলে হাসতাম। কিন্তু এখন পারছি না।

—তাইতো জিজ্ঞেস করছি, এনি ক্লু?

তালুকদার একবার শুধু হাতেই মুখটা মুছলেন। গলায় একটা খুকখুক শব্দ করে বললেন, —সদানন্দ ঘোষকে আমার অ্যারেস্ট করা উচিত।

—কেন? সেরকম কিছু ডেভিনিট কনক্লুশনে পৌছেছেন?

—আমি দুটো বস্তু আবিষ্কার করেছি মিসেস ঘোষের ঘর থেকে।

—কী?

—ব্যাকসীটে রাখা একটা খাম তুলে এনে তার থেকে একটা ফোটো অ্যালবাম বার করলেন। তারপর নীলের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, —ভালো করে একবার ভেতরের ছবিগুলো দেখুন।

প্রথম দু তিনটে পাতায় কেবল মিসেস ঘোষের ছবিই ছিল। কোনটা ছেলেবেলার, কোনটা কলেজের বান্ধবীদের সঙ্গে। চতুর্থ পাতায় এসে দেখা গেল কনের সাজে। কিন্তু ছবির ওপর আলতা বা অন্য কোন লালরঙ দিয়ে এলোপাথাড়ি আঁচড় কাটা। মনে মনে হুঁ বলে পাতা উল্টোল। স্বামী-স্ত্রী দুজনের ছবি। কিন্তু সেখানে কেবল মাত্র সদানন্দেরই ছবি ছিল। মিসেস ঘোষের ছবি থেকে মুখটা কেটে বার করে নেওয়া হয়েছে। পরের পাতা থেকে যেখানে যেখানে দুজনের ছবি থাকার কথা সেখান থেকেই মিসেস ঘোষের ছবি অদৃশ্য। সব শেষের পাতায় কেবলমাত্র মিসেস ঘোষের ছবি। তার ওপর লেখা আছে, ও চায়না আমি ওর জীবনে থাকি। তাই নিজেকে বাদ দিয়ে দিলুম।

অ্যালবামটা ফেরৎ দিতে দিতে নীল বলল, —বুঝলাম। তা আর কী প্রমাণ পেলেন? এটা কিন্তু কিছু প্রমাণ করবে না?

ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ফুটিয়ে তালুকদার বললেন, —এবার দেখুন এই চিঠিটা। বডি রিমুভ করার সময় মৃতার বালিশের নীচে পাওয়া যায়।

নীল চিঠিটা মোড়া অবস্থায় একবার দেখল। সাধারণ প্যাডের কাগজ নয়। মনে হচ্ছে কোন ডায়েরির পাতা থেকে খুলে নেওয়া অংশ। হ্যাঁ ঠিক। তাই। মোড়া খুলতেই তারিখ এবং সাল পাওয়া গেল। পুরনো সালের ডায়েরি। সতেরই জুন উনিশশো নব্বই। চিঠি, তবে কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয়।

নীল পড়তে শুরু করল, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি ও আর আমাকে চায় না। বোধহয় আমাকে খুন করতে চাইছে। দুদিনের দুটো ঘটনায় আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। একদিন মাঝরাতে ও আমার মুখে বালিশ চেপে ধরে ছিল। আমি ঝট্‌কা দিয়ে উঠে বসতেই দেখলুম ও পাশ ফিরে শুচ্ছে। এমন একটা ভাব দেখালো যেন নিজের অজান্তেই

এ রকম একটা কাণ্ড করে বসেছে। পরদিন জিজ্ঞেস করতেই ও যেন আকাশ থেকে পড়ল। সেই থেকে আমি আমার শোবার ঘর আলাদা করে নিয়েছি। আর একদিন রান্নাঘরে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তখন আনাজ কাটছিলুম। জিজ্ঞাসা করাতে, 'কিছু না' বলে বেরিয়ে গেল। তার কয়েক মিনিট পরই গ্যাসের বিশ্রি গন্ধে টের পেলুম সারা রান্নাঘরে গ্যাসের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি করে উঠে দেখলুম হাই অবস্থায় ওভেনের দুটো নবই ওপেন করা। তার মানে আমি যে মুহূর্তে গ্যাস জ্বালাতে যাব সেই মুহূর্তেই আমার সর্বাঙ্গে আগুন লেগে যাবে। সদানন্দকে আমি আর বিশ্বাস করি না।'

পাতা শেষ। নীল ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, —একটা ব্যাপার বোঝা গেল। অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের কাছে সাপে-নেউলের পর্যায় পৌঁছে গিয়েছিল। কারণ সদানন্দর এবং লেখার ভারশনে ঐ সন্দেহপ্রবণ মহিলাকে নিয়ে সদানন্দ অতিষ্ঠ আর এই লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে মহিলাও তার স্বামীকে বিশ্বাস করতেন না এবং আশঙ্কা করতেন স্বামীর হাতেই তার মৃত্যু হ'তে পারে।

—ইয়েস, প্রায় সোল্লাসে তালুকদার বলেন, দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। আশঙ্কা করতেন স্বামীর হাতে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। নাও ইউ সী দিস পেপার।

তালুকদার ঠিক ঐ একই ধরনের আর একটি ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন। এটার তারিখ পাঁচই আগস্ট উনিশসো নব্বই।

আর একবার নীলের ভ্রূ কোঁচকাল। ভাব প্রকাশ না করে ও লেখাটা পড়তে শুরু করল, 'সকাল থেকে আমার শরীর আর মন দুটোই খুব খারাপ। কিছুই ভাল লাগছে না। বুঝতে পারছি না লেখা কী চায়? সদানন্দকে? আমাকে বলছে না কেন? তাহলে নিজে থেকেই সরে যাব। কিন্তু আমার চোখের সামনে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা এক ঘরে এক খাটে রাত কাটাবে তা আমি কেমন করে সহ্য করব?

এখন দুপুর বারোটা। শরীর খুব খারাপ লাগছে। বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হচ্ছে। ময়নাকে রান্না সামলাতে বলে শুয়ে আছি। কত কী সব মনে আসছে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ চোখ খুলে দেখি ওরা দুজন, মানে লেখা আর সদানন্দ আমার বিছানার দুপাশে বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি উঠতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু ওরা বাধা দিল। অনেকদিন পর সদানন্দ আমায় জিগ্যেস করল, আমি কেমন আছি? আমার কী হয়েছে? সদানন্দের মিষ্টি কথাও আমার কাছে সাপের নিঃশ্বাস বলে মনে হয়। ডাইনিটাও তাই জিগ্যেস করল। আমি কোন উত্তর দিইনি। একটু পরে সদানন্দ লেখাকে বলল এক গ্লাস গরম দুধ আনতে। লেখা চলে গেল, সদানন্দ আমার মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎই ও আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। বাধা দিতে গিয়েছিলুম, পারিনি। ঘেন্না করেছিল। কারণ ঐ একই ঠোঁটে ও আরও অনেক মেয়েকে চুমু খেয়েছে। লেখাকেও খেয়েছে।

একটু পরেই লেখা দুধ নিয়ে এল। দুধের রঙটা দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হ'ল।

তবে কী ওরা বিষ মেশানো দুধ খাইয়ে আমায় মারতে চাইছে? আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। একটা মেয়েকে পাবার জন্যে নিজের স্ত্রীকে খুন করতেও সদানন্দর হাত কাঁপছে না। আর লেখাও পারল বোনের স্বামীকে কেড়ে নেবার জন্যে বিষ মেশানো দুধ তুলে দিতে। তাহলে এ জীবন আর রেখে লাভ কি?

লেখার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে সদানন্দ আমার মুখের কাছে ধরল। আমি একবার সদানন্দর চোখের দিকে চাইলাম। ভাবলেশহীন পশুর মতো চাহনি। লেখা অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল।

তবু আমি বাঁচতে চেয়েছিলুম। কিন্তু সদানন্দ জোর করে আমরা মুখটা হাঁ করাল। আর লেখা সদানন্দর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে আস্তে আস্তে সব দুধটা আমার গলায় ঢেলে দিল।

আমার গলা জ্বলে যাচ্ছে। গলা থেকে পেট পর্যন্ত সব জ্বলে যাচ্ছে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি চিৎকার করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না। আচ্ছা আমি কী মরে যাচ্ছি? ওরা কী সত্যিই আমায় বাঁচতে দিল না?

লেখা শেষ। পাতাটা মুড়ে তালুকদারের হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে নীল বলল, —অ্যাবসার্ড?

—কী অ্যাবসার্ড?

—না, কিছু না। তাহলে আর কী, সদানন্দ আর লেখাকে অ্যারেস্ট করুন।

—আপনার গলার স্বরে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনার মনঃপুত নয়।

সে প্রশ্ন এড়িয়ে নীল বলে, —আচ্ছা মিস্টার তালুকদার, আপনি মিসেস ঘোষের ঘরখানা ভালো করে তল্লাশি করেছেন?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—আমার একটা ডায়েরি খুঁজে পাওয়া দরকার।

—ডায়েরি? কী ডায়েরি?

—সেই খাতাটা, যাতে সুশীলা দেবী নিয়মিত কিছু লিখতেন। নিজের কথা, অন্যের কথা।

—না! তেমন কোন কিছু পেলাম না।

—আমি লেখা দেবীকে বলে এসেছি। খোঁজ করার জন্যে।

—লেখা দেবীকে? তিনি নিজেই তো কালপ্রিট। পেলেও আপনাকে দেবে কেন?

—দেবে। তার আগে আপনি সদানন্দকে অ্যারেস্ট করুন।

—এই মাত্র ঠাট্টা করলেন। আবার বলছেন,

—আমি সিরিয়াসলি অ্যারেস্ট করতে বলছি। আর একটা ব্যাপার খোঁজ নিন। আজ দুপুরে ঠিক কখন সদানন্দবাবু অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন এবং ঠিক কটায় অফিসে ফিরে এসেছিলেন। আর লেখা দেবীই বা তখন কোথায় ছিলেন?

পাঁচ

এর মধ্যে একটা সপ্তাহ কেটে গেছে। সদানন্দকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও পাওয়া গেছে। সুশীলাকে দুধের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড দেওয়া হয়েছিল। দেওয়ালে টাঙানো ফটোর পিছন থেকে পাওয়া ছোট্ট শিশির মধ্যেও পাওয়া যায় নাইট্রিক অ্যাসিডের নমুনা। বিকাশ তালুকদার নানাভাবে ইন্ট্যারোগেট করেও সদানন্দর কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি। সদানন্দ কেবলি বলেছে স্ত্রীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সে মনে মনে তাকে খুন করার কথা ভেবেছিল। কিন্তু কোন ভাবেই সে খুনি নয়। খুন করার মতো সাহস বা মানসিক শক্তি তার নেই। মৃতার কষের গা বেয়ে গড়িয়ে আসা রক্ত মিশ্রিত ফেনা কেন মুছে ফেলা হয়েছিল সে প্রশ্নের জবাবে সদানন্দ জানায় ঐ বীভৎস দৃশ্য অনেকেই সহ্য করতে পারবে না বলেই সে ওই কাজ করেছে। সদানন্দর অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল সদানন্দ তখন সত্যিই অফিসের কাজে বাইরে যায়। এবং ফেরে চারটে নাগাদ। অফিসে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে লেখার ফোন পায়। সেই মতো সে সাড়ে চারটের মধ্যে বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী মৃত।

*   *   *

গলদঘর্ম বিকাশ তালুকদার হাঁফাতে হাঁফাতে নীলের বৈঠকখানায় এসে ঢোকেন। নীল তখন ক্রাইম ডিটেকসনের ওপর লেখা মডার্ণ একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। তালুকদারকে দেখে নীল বলল, —আসুন, মিস্টার তালুকদার। এবার বলুন আপনার মহামান্য ক্রিমিন্যালকে কতটা ফাঁসাতে পারলেন? চার্জশীট তৈরি?

টাকের ঘাম মুছতে মুছতে তালুকদার বললেন,

—ফাঁসানোর কথা বলছেন কেন? আপনার কী মনে হচ্ছে আমি কোন নিরপরাধকে ধরেছি এবং জুলুম করছি? তাছাড়া আপনিও তো সেদিন বললেন মিস্টার ঘোষকে অ্যারেস্ট করতে?

—আমি কেন বলেছি সে প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই দোব। কিন্তু তার আগে বলুন সদানন্দ ঘোষ যে অপরাধী এটা প্রমাণ করার জন্যে আপনার হাতে কী কী অস্ত্র আছে?

—সুশীলা দেবীর লেখা কাগজগুলোই কী যথেষ্ট নয়? জানেন তো মৃত্যুকালে সাধারণত কোন মানুষই মিথ্যে কথা বলতে চায় না। তাও কিনা তার স্বামীর বিপক্ষে?

—ওই কাগজগুলো ছাড়া আমাদের কাছে আর কী প্রমাণ আছে?

—তার পিসিমা বলছে তার চরিত্র ভালো নয়। বাড়ির ঝি বলছে সদানন্দ নিজের মুখেই চিৎকার করে বলেছে সে তার স্ত্রীকে খুন করবে। এমন কি ভদ্রলোক নিজেও তাই বলেছেন।

—খুন করার মোটিভ কিছু খুঁজে পেয়েছেন?

—খুব সোজা। সুশীলাদেবী সদানন্দবাবুর মহিলা প্রীতিতে ক্ষুব্ধ। তার ফলে উভয়ের মধ্যেও কোন সদ্ভাব ছিল না। খিটির-মিটির লেগেই থাকতো। সদানন্দবাবু মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন। এমন সময়ে ঘটনাস্থলে হাজির লেখাদেবী। আই থিঙ্ক ওদের মধ্যে কোন অ্যাফেয়ার্স তৈরি হয়েছিল। মিলনে বাদ সাধছিল সুশীলা দেবী। অতএব তাকে সরিয়ে দাও। এটাই কী মোটিভের পক্ষে জোরালো নয়।

—বাট, সদানন্দ হ্যাজ আ সলিড অ্যাণ্ড কংক্রীট অ্যালিবি।

—হ্যাঁ। সেটাই তো ধন্দে ফেলছে। পি এম রিপোর্ট বলছে আড়াইটে নাগাদ মিসেস ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সদানন্দবাবুর সে সময় ছিলেন আপিসের কাজে।

—তাহলে নিশ্চয়ই কোন যমজ সদানন্দ আছে।

—না তা নেই। তবে ময়না আবার বলছে কেন, তার দাদাবাবু দুপরে এসেছিল।

—আইদার ময়না সময়ের গণ্ডগোল করছে অথবা কারো শেখানো কথা বলছে।

—শেখানো কথা? কার?

—যে খুনটা করেছে তার।

—তাহলে খুনি কী লেখাদেবী?

—না, লেখাদেবী দুপুর বারোটা থেকে বিকেল পৌনে চারটে পর্যন্ত ওই বাড়িতেই ছিলেন না।

—আপনি এত ডেফিনিট হচ্ছেন কী ভাবে?

—লেখাদেবী তাঁর অ্যালিবি প্রমাণ করেছেন আমার কাছে।

—কী রকম?

—তাহলে শুনুন। লেখাদেবী কলকাতা এসেছিলেন হলিডে মুডে। কিন্তু এখানে এসে তিনি তাঁর দিদির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সদানন্দবাবুর প্রতি তাঁর কোন দুর্বলতাই ছিল না। সম্ভবত তখনও পর্যন্ত সদানন্দরও না। লেখাদেবীকে হাতের সামনে পেয়ে নিজের বিবাহিত জীবনের করুণ কাহিনী শোনাতেন। এবং সেটা সুশীলা দেবী ঘুমিয়ে পড়লে। ছাদে দাঁড়িয়ে। তারপর একদিন ছাদে ওদের দুজনকে এক সঙ্গে পেয়ে অকথ্য ভাষায় দুজনকেই গালাগাল করেন সুশীলা দেবী। লেখা দেবী সেদিনই ঠিক করেন কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। কিংবা দিল্লীতেই ফিরে যাবেন। কিন্তু সদানন্দবাবুর কাতর মিনতিতে লেখা দেবী আরও দেড়মাস কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

—হিয়ার ইজ মাই পয়েন্ট, তালুকদার বাধা দিয়ে বলেন, একটি মেয়ের মধ্যে যদি দুর্বলতা না থাকে, তার ওপর উনি একজন এডুকেটেড মহিলা, তাঁর পক্ষে কী পরপুরুষের কথায় নোংরা ভাষায় গালাগালি খাবার পরও কলকাতায় থেকে যাবার কথা ভাবতে পারেন, না পারা সম্ভব?

—আপনার এই আর্গুমেন্ট আমি অস্বীকার করছি না। মেয়েদের মন কখন কীভাবে

কার ওপর ডাইলুটেড হয় আপনার আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। লেখাদেবী আমার কাছে নিজেই স্বীকার করেছেন সদানন্দবাবুর করুণ দাম্পত্য জীবনই সদানন্দবাবুর প্রতি তাঁর দুর্বলতার জন্ম দেয়। কিন্তু,

—কিন্তু?

—উভয় উভয়ের প্রতি দুর্বল হলেও, পরস্পরের প্রতি ইনফ্যাচুয়েশনের ব্যাপারটা লেখাদেবী দিল্লী ফিরে গিয়েই শেষ করে দিতেন। সেটা উভয়েই স্বীকার করেছেন। লেখাদেবী কখনোই চাননি সুশীলাদেবীর সংসার ভেসে যাক।

—হুঁ। কিন্তু লেখাদেবীর অ্যালিবি কী? উনি তখন কোথায় ছিলেন?

—দুটোর একটু আগে অফিস থেকে বেরিয়ে সদানন্দবাবু গিয়েছিলেন কোম্পানির এক পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। কিছু প্রোডাকশনের মধ্যে সেকেণ্ড গ্রেডেড মাল ঢুকে গিয়েছিল। তাতে সেই পার্টির কিছু লস্ হয়। অর্থাৎ নিজের কোম্পানির গুড উইল বাঁচাতেই সদানন্দবাবুর সেখানে যাওয়া। দিন দুয়েক ঘোরাঘুরি করে আমি নিজে এ তথ্য সংগ্রহ করে এসেছি।

—বেশ তারপর?

অফিসের কাজ শেষ করতে বেজে যায় বিকেল তিনটে। কিন্তু বিকেল সওয়া তিনটের সময় সদানন্দবাবুর সঙ্গে লেখাদেবীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

—কিসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

—ওনলি ফর আ শেলটার অব লেখা বসু। হ্যাঁ, ঠিক তাই। সদানন্দবাবুর বিশেষ বন্ধু শ্যামলকান্তি বাবু একটি লেডিজ হস্টেলে লেখা দেবীর দেড় মাসের মতো থাকার ব্যবস্থা করেন। হস্টেলটা শ্যামলকান্তিবাবুর বাড়ির দু তিনটে বাড়ির পরেই। ওঁরা দুজনে সাড়ে তিনটের সময় শ্যামলকান্তিবাবুর বাড়ি পৌঁছন। শ্যামলকান্তিবাবু সেদিন বাড়িতেই ছিলেন। ছুটিতে। সদানন্দবাবুর সঙ্গে গাড়ি ছিল। ওঁরা যে ওই সময়েই পৌঁছন সেটা স্বীকার করেছেন শ্যামলবাবু এবং তার স্ত্রী ও সদ্য স্কুল থেকে ফেরা ওদের মাত্র সাত বছর বয়সের মেয়ে টুম্পা। ওই টুকু মেয়ে আমার জেরার কাছে মিথ্যে বলতে পারে না। এরপর ওঁরা হস্টেলে যান। টাকা জমা দেন। রসিদ নেন। সে রসিদ লেখাদেবীর কাছেই আছে। পরের দিন থেকে লেখাদেবীর ওখানে চলে যাবার কথা। তারপর লেখাদেবীকে ভবানীপুরের মোড়ে নামিয়ে দেন সদানন্দবাবু। অফিসে ফিরে আসেন চারটে নয়, চারটে দশ। আসার পরই লেখাদেবীর ফোন পান। ডালহাউসী থেকে হিউম রোডে পৌঁছে যান সাড়ে চারটে নাগাদ।

—তাহলে ছাতার মাথা দাঁড়ালোটা কী?

—কিছু মনে করবেন না মিস্টার তালুকদার। কোথাও কোন গৃহবধূ খুন হলেই, আমি আপনাদের কাছের লোক হয়েও বলছি, পুলিস প্রথমেই পাকড়াও করে তার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ননদ দেওরকে। তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে উত্তম-মধ্যম। তলিয়ে দেখার ব্যাপারগুলো

আসে পরে। আপনার কী মনে হয় যে-সব গৃহবধূ হত্যা হয়েছে তাদের কারো কোন দোষ ছিল না। গৃহবধূরা কী অন্যায় করতে পারে না? আমি একজনকে জানি, বুড়ি শাশুড়িকে উঠতে বসতে খেঁতো করে, নব্যযুবতী বধূমাতা। আর তাতে সায় দেয় বধূ সোহাগে স্বামীজি। ক্যান ইউ ডিনাই ইট?

—ঠিক আছে, এটা তর্কের ব্যাপার। আপাতত সদানন্দকে ক্লীয়ার করুন। আপনার মতে সদানন্দ নয়, লেখা নয়, তবে কী ময়না নাকি তার পিসিমা, নাকি যে কাজের মেয়েটাকে একদিন মিসেস ঘোষ যাতা বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই এসে রিভেঞ্জ নিয়ে গেছে?

নীলের ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। সে একটা সিগারেট ধরায়। তারপর ঘাড় নীচু করে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, —সুশীলাদেবীর ডেডবডিটা আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম। প্রথম যেটা চোখে পড়ে, কষের গায়ে তখনও রক্তের হাল্কা দাগ। দ্বিতীয়ত, সারা মুখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাওয়ার চিহ্ন। এবং মুখটাও কালচে লাগছিল। কেন? তার হার্টের প্রবলেম ছিল। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মরলে মুখে যন্ত্রণার ছাপ থাকতে পারে। কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর রকমের কিছু একটা যন্ত্রণার প্রতিফলন। কী হতে পারে তাই ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার নজরে আসে মৃতার সব আঙুলেই আংটি আছে, কিন্তু সাধারণত যে আঙুলে লোকে আংটি পড়ে অর্থাৎ অনামিকা ফাঁকা। এবং সেখানে আংটির দাগও রয়ে গেছে। কেউ কী খুলে নিয়েছে মৃত্যুর পর ? হতেও পারে। হীরের আংটি বলে কথা। এবং আংটি দেখতে গিয়েই নজরে এলো আঙুলে স্পষ্ট কালো দাগ। মিস্টার তালুকদার, আমার সিগারেটে এখন অনেকটা ছাই জমেছে। তাই না?

—হ্যাঁ, ওটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিন।

—না। সেজন্যে জমাইনি। একটা প্রমাণের জন্যে ধরে রেখেছি। আপনার তর্জনী মধ্যমা আর বুড়ো আঙুলটা একটু এগিয়ে দিন।

বিকাশ তাই করে। নীল আলতো করে তিন আঙুলের মিলনক্ষেত্রে খুব সাবধানে ছাইটা রাখে। তারপর বলে, এবার ঐ ছাই রঙা ছাইটা আঙুলে ঘষুন।

ঘষার পর দেখতে দেখতে আঙুলের চামড়াগুলো এক ধরনের কালচে দাগে পরিণত হল।

—হ্যাঁ, এই তো ঘষলাম। তাতে, হলোটা কী?

—ওটাই হোল। জায়গাটা কালো হয়ে গেল। আর মিসেস ঘোষের ঠিক এই তিনটে আঙ্গুলেই ঐ রকম দাগ স্পষ্ট হয়েছিল।

—অনেক সময় মেয়েরা ডুমুর থোড় কাটলেও ঐ রকম দাগ হতে পারে।

—সে খোঁজও নিয়েছি। সেদিন ও বাড়িতে কোন থোড় বা ডুমুর রান্না হয়নি। তাছাড়া সেদিন সুশীলাদেবী রান্না ঘরেই যাননি। শরীর ও মন খারাপ ছিল বলে। সেদিন রান্না করে

ময়না। ময়না তা স্বীকার করেছে।

—হাল ছেড়ে দিতে দিতে বিকাশ বলে, তাহলে দাগটা কিসের?

—পোড়া ছাইয়ের।

—আবার ছাই পেলেন কোত্থেকে?

—সদানন্দবাবুর টানা ড্রয়ারের মধ্যে থেকে।

—ড্রয়ারের মধ্যে ছাই? কিসের ছাই?

—কোন কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়ার শেষ চিহ্ন।

—মাথায় কিছু ঢুকছে না।

—লেখাদেবীকে সেদিন আমি আসার সময় অনুরোধ করে এসেছিলাম, একটা ডায়েরি উনি কোথাও খুঁজে পান কিনা। এ কেসে ডায়েরিটা ভেরী এসেনসিয়াল টু ফাইণ্ড ইট আউট। আর সেটা সম্ভবত ঐ ড্রয়ারেরই আশেপাশে কোথাও হবে।

—ডায়েরি পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ, আধ পোড়া একটা ডায়েরি। উনিশশো নব্বই সালের। যার সতেরই অক্টোবর আর বারই আগস্টের পাতা দুটো টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছিল। ডায়েরিটা ছিল আলমারির পেছনে। স্বল্পপরিসরে ঠেসে রাখা হয়েছিল। এবং ত্বরিৎ গতিতে।

—কোথায় সে ডায়েরি? কী আছে তাতে?

—খুনির জবানবন্দী। স্বীকারোক্তি। কিছু কিছু জায়গা পুড়ে গেছে তবে আসল কথাগুলো উদ্ধার করা গেছে।

—একবার দেখতে পারি?

—অফকোর্স, ওটা তো পুলিসের সম্পত্তি। বলে নীল উঠে গিয়ে পেছনের শেলফ্ থেকে প্লাস্টিকে মোড়া সযত্নায়িত একটি ছোট মাপের ডায়েরি বের করে আনে। তারপর বলে, —সদানন্দকে অ্যারেস্ট করতে বলেছিলাম একটাই কারণে, যাতে করে সদানন্দকে জেলমুক্ত করে আনার ব্যাপারে ডায়েরির অবদান যে অনেক এবং তার জন্যে লেখার চেষ্টায় কোন ফাঁক না থাকে, সেই জন্যেই। নিজে এবার পড়ুন ডায়েরিটা। আমি বরং আপনার জন্যে চিনি ছাড়া চা করে নিয়ে আসি।

নীল বেরিয়ে যায়। মিনিট পনেরো পর ফিরে আসে। ততক্ষণে বিকাশের মুখ ঝুলে গেছে। বোকা বোকা অভিব্যক্তি। চোখ ছানাবড়া।

—শেষ?

—এটা কী হ'ল মশাই?

—খুনিকে ধরতে পারলেন?

—পেরেছি। কিন্তু তাকে তো ধরার উপায় নেই।

—হ্যাঁ কারণ এখানে নিহত নিজেই তো খুনি। নিজেই নিজেকে খুন করে সদানন্দ

আর লেখাকে সারাজীবনের মতো জেলে পাঠাতে চেয়েছিল। যাতে তারা ইহজীবনে আর কেউ কারো সঙ্গে মিলিত হতে না পারে।

—এ তো ডেঞ্জারাস সাইকো পেশেন্ট। নিজেই নিজের দুধে অ্যাসিড মেশালো। তারপর এমন ভাবে চিঠি লিখল,

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলল, —দ্যাট লেটার ইজ দ্য মেইন টার্নিং পয়েন্ট অব দিস মিস্‌চিভাস গেম। সুশীলাদেবীর চিঠিটা আরো একবার পড়লে বুঝতে পারবেন মৃত্যুর আগেই সেটা লেখা হয়েছিল। কিন্তু নাইট্রিক অ্যাসিড খাবার পর কেউ ওভাবে চিঠি লিখতে পারে না। তার তখন গলা জ্বলছে, বুক জ্বলছে, চোখে অন্ধকার দেখছে, তারপর কী আর হাত চলতে পারে?

—তাই বুঝি আপনি সেদিন বলেছিলেন, অ্যাবসার্ড।

—ইয়েস স্যার।

ছয়

লেখাদেবীর আর দিল্লী ফেরা হয়নি। ওখানকার প্রফেসারি ছেড়ে দিয়েছেন। বাংলাটাও বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। কলকাতাতেই একটা কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেছেন। সদানন্দকে নিয়ে তাঁর এখন সুখী দাম্পত্য জীবন।



বিকাশ তালুকদার বললেন, —ব্যানার্জি সাহেব, আপনার কী মনে আছে, আজ থেকে প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে, পর পর পেশ কিছু নামি দামি মানুষ মারা যাচ্ছিলেন? তার মধ্যে ছিলেন অভিনেতা, গায়ক, খেলোয়াড়। আমি নাম দিয়েছিলাম সেলিব্রিটি প্রয়াণ পর্ব।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে নীল বলল, —হ্যাঁ, অনেকদিন হয়ে গেল। তা হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তোলার কারণ? ওখানেও কী কোন রহস্য আছে?

বিকাশ বললেন, —না। মহম্মদ রফি, কী কিশোরকুমার বা আমাদের উত্তমকুমারের মৃত্যুর মধ্যে আপনার আমার কোন খোরাক নেই। কিন্তু সেই সময়ের একটা খবর হঠাৎ আমার মনে পড়ল। বোধহয় সেদিন উত্তমকুমার মারা গিয়েছিলেন। সেদিনের যেকোন দৈনিক কাগজে উত্তমকুমার ছাড়া আর কোন খবর ছিল না।

—খুবই স্বাভাবিক। ওঁর আগে এতবড় মাপের ম্যাটিনি আইডল, বিশেষ করে বাঙালিদের কাছে আর কেউ বোধহয় ছিলেন না।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার গিন্নির তো সেদিন শোকের দিন। ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন হঠাৎ ওর প্রেমিকের মৃত্যু হয়েছে। সেদিন তো আর রান্নাঘরেই ঢুকলো না।

নীল সামান্য হাসল। তারপর বলল, —শুধু আপনার গিন্নি কেন? অনেক বৃদ্ধাকেও দেখেছি শোকে মুহ্যমান। কিন্তু এটা তো গৌরচন্দ্রিকা। আসল কথাটা কী?

বিকাশ বললেন,—হ্যাঁ, সেটাই বলছি। উত্তমকুমার মারা যাবার তিন চারদিন আগে নামকরা এক দৈনিক পত্রিকার সম্ভবত পাঁচের পাতার তৃতীয় কি চতুর্থ কলামের নীচের দিকে ছোট্ট করে একটা সংবাদ বেরিয়েছিল। এক রাঁধুনির নৃশংস মৃত্যু নিয়ে। মেয়েটির বয়স তখন সাতাশ আটাশ। ঘরে বছর সাত আটের একটি সন্তানকে কাছে নিয়ে মেয়েটি ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ তার মাথায় পরপর কয়েকবার কাটারি দিয়ে আঘাত করে। আঘাতজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়। খবরটা নিশ্চয়ই আপনার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে নীল বলল, —আসলে ঐ সময় আর একটা রোমহর্ষক ঘটনা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বোধহয় সেই কারণেই এ খবরটা চোখ এড়িয়ে, রাদার বলতে পারেন মন থেকে স্লীপ্ করে যায়।

—আপনি কোন্ ঘটনার কথা বলছেন?

—সেই যে কল্যাণী সীমান্তের একটা গ্রামে এক পরিবারের পাঁচ জন একই দিনে খুন হন। মানে কেউ তাদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। এই ব্যাপারে সম্ভবত ওই পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ একজন যুক্ত ছিল।

—ইয়েস ব্যানার্জি সাহেব, আপনি ঠিক সময়টাই ধরেছেন।

—কিন্তু সে কেস তো ধামাচাপা পড়ে গেছে। দু-এক দিনই হইচই হবার পরই

ইন্দ্রপতন। শুনেছিলাম, মানে কাগজে যা পড়েছিলাম, সেই লোকটিকে নাকি অ্যারেস্ট করাও হয়েছিল। তারপর তো ঘটনার মহাসমুদ্রে ছোট একটা জলবিন্দুর মতো এ ঘটনা হারিয়ে গেছে। তা এতদিন পর এক অতি অখ্যাত রাঁধুনি মহিলা আপনার মগজে নড়াচড়া শুরু করল কেন?

—সেই রাঁধুনি মেয়েটির ছেলে এখন বত্রিশ তেত্রিশ বয়েসের যুবক। আমাদেরই থানার কনস্টেবল র‍্যাঙ্কে কাজ করছে। ছেলেটি আমায় খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আমাকে কাকু বলে ডাকে।

—কী চায় ছেলেটি?

—তার চাওয়াটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু চাওয়াটাই তো হাস্যকর।

—তবু শুনি।

—সে নাকি একটা ডিটারমিনেশন নিয়ে পুলিসের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

—ডিটারমিনেশনটা কী?

—তার মাকে যে খুন করেছে তাকে সে খুঁজে বার করতে চায়। ব্যাপারটা হাস্যকর নয় কী?

কোন উত্তর না দিয়ে নীল চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল। পোড়া সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিতে দিতে বলল —ছেলেটির নাম কী?

—বিজয় সামন্ত। তা আপনি কী এখন বিজয়কে নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিলেন নাকি?

নীল ওর মিষ্টি হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, —আপনি তো আমাকে ভাবাবার জন্যেই গল্পটা শুরু করলেন। তাই না কী?

বিকাশ বললেন, —ঠিক তা নয়। কে এক বিজয় সামন্ত। চালচুলোহীন এক কনস্টেবল। তার অবাস্তব প্রতিজ্ঞা। অনেকটা গল্পের বইয়ে যেমন থাকে। চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে কেউ একজন তার মাকে খুন করেছিল। আজ কী তার কোন হদিশ পাওয়া যায়? যায় না। অতএব আপনাকে অহেতুক ভাবনার মধ্যে ফেলার কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই। বিজয়কে আমিও বুঝিয়েছি। কিন্তু ও তো নাছোড়বান্দা।

—ছেলেটিকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবেন?

—আপনি ক্ষেপেছেন? প্রথম কথা তার কোন ট্যাকের জোর নেই। দ্বিতীয় কথা অকারণে যখন তখন আপনাকে বিরক্ত করবে।

—ঠিক আছে তবু একদিন বিজয়কে নিয়ে আসুন। দেখি না আমি কতটা বিরক্ত হই। আমি কেবল জানতে চাই, কোন সূত্র ধরে একটা হারিয়ে যাওয়া ঘটনার কাছে সে পৌঁছতে চাইছে?

কথা বলতে বলতেই বাইরে গাড়ি বন্ধ করার আওয়াজ। নীল বলল, নন্দিনী এল।

—খুব ভাল হল। অনেকদিন বউঠানের সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনার ভাগ্য দেখলে

আমার হিংসে হয়।

—হঠাৎ আমার ভাগ্যির প্রতি ঈর্ষান্বিত কেন?

—এই বয়সে এমন একজন সুন্দরী গৃহিণী পাওয়া, কম ভাগ্যের কথা? আমার তো খুবই দুশ্চিন্তা ছিল. আপনার শেষ বয়সে কে আপনার পাশে থাকবে।

—মিস্টার তালুকদার, আমাদের বিয়েটা অনেক পরে হলেও প্রেমটা অনেকদিনের। পোস্ট অফিসের গাফিলতি না হলে অনেক আগেই আমাদের বিয়েটা হয়ে যেতো।

—হ্যাঁ। আপনি ভাগ্য মানেন না। কিন্তু আমি মানি। ভাগ্যই আপনাদের বিচ্ছিন্ন করেছিল। আবার ভাগ্যই আপনাদের মিলিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বর আছেন, বুঝলেন ঈশ্বর আছেন।

নীল কিছু উত্তর দেবার আগেই নন্দিনী ঘরে এল। বিকাশের পাশে অনেকটা জায়গা ফাঁকা ছিল। সেইখানে বসতে বসতে নন্দিনী বলল, —দুই বুড়ো আবার এক জায়গায়? আবার কে খুন হল?

বিকাশ বললেন—না ভাবিজি, একটু আগেই বললেন না, দুই বুড়ো এক জায়গায়। আপনি দেখবেন দু তিনজন বুড়ো এক জায়গায় হাজির হলেই তাদের নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসে। আমাদেরও তাই। একটা খুনের ব্যাপার নিয়েই অতীতচারণ হচ্ছিল।

নন্দিনী বলল—তা ভাল। স্মৃতি সততই সুন্দর।

প্রবলভাবে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বিকাশ বললেন, —না ভাবিজি, স্মৃতি সর্বদাই সুখের হয় না। অনেক দুঃখের কথাও স্মৃতিতে ভেসে থাকে। সেগুলো ভাবায়, কাঁদায়।

নীল নন্দিনীকে বলল, —হোল তো? পাগলকে সাঁকো নাড়াতে বারণ করলে পাগল আরও বেশি করে সাঁকো নাড়াবে। বিকাশবাবু এর পর সোজা ঢুকে যাবেন ফিলসফিতে। তখন ফিরিয়ে আনতে গেলে দরকার হবে দীপুকে। তো সেও তো এখন নেই।

নন্দিনী প্রসঙ্গ পাল্টে জিগ্যেস করল, —দীপু কী ফোন করেছিল?

—কই না তো? আর ওর ঘাড়ে যে বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ, ও তো এখন দম ফেলার সময় পায় না।

নন্দিনী বলল, —সাইকেল হাউস নিয়ে ও যত মেতে থাকবে ততই ভাল। ওরও ভাল। আমাদেরও ভাল। তুমি চা খেয়েছ?

নীল বলল—হ্যাঁ দেবী, তবে মাত্র এক কাপ। তাও বিকাশবাবু এসে পড়লেন, তাই।

নন্দিনী উঠে পড়ল, বলল, —ঠিক আছে, তোমরা গল্প কর। বিকাশদা আপনি চলে যাবেন না। আমি চা জলখাবারের ব্যবস্থা করছি।

বিকাশ বললেন, —ঠিক হ্যায় ভাবিজি। আমরা ততক্ষণ বুড়োমি করি। আপনি আসুন। আপনাদের এদিকে একটা মিষ্টির দোকান আছে। বেশ বিগ সাইজ সিঙ্গাড়া তৈরি হয়—

কিছু না বলে নন্দিনী হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

দুই

দিন চারেক পর একদিন সকালে দীপু এসে বলল, —কোথাও কোন অপকর্ম করেছ নাকি? একজন পুলিস তোমার খোঁজ করছে।

নীল কাগজ পড়ছিল। খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলল, —যা ডেকে নিয়ে আয়।

—এই ঘরে? একমাত্র বিকাশদা ছাড়া আর তো কোন, অবশ্য তোমার জামাইবাবু আছেন, তবে তিনি তো এখন এক্স।

—তুই বড্ড বাজে বকিস। যা ডেকে নিয়ে আয়।

—যথা আজ্ঞা, বলে দীপু চলে গেল। মিনিট তিনেক পর বিজয় সামন্তর প্রবেশ। সপ্রতিভ যুবক। রঙটা একটু মাজা। স্বাস্থ্যটাও বেশ ভাল। ট্রেনিং নেওয়া শরীর। দেখলেই বোঝা যায়। পুলিসের ইউনিফর্ম পরেই এসেছে।

নীল বলল, —বোস। তুমিই বিজয় সামন্ত?

বিজয় বিগলিত কণ্ঠে বলল, —হ্যাঁ স্যার। বিকাশকাকু আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

—ঠিক আছে। আগে তুমি বোস তো? তারপর সব শুনব।

—আপনি বলুন স্যার। আমার দাঁড়ানোর অভ্যাস আছে।

নীল বলল, —শোন বিজয়, আমি কিন্তু তোমার বস্ নই। তোমার মুখ থেকে কিছু কথা শুনব বলে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি রিল্যাক্স করে বোস। কোন সংকোচের কারণ নেই।

বিজয় সামনের সোফায় বসে। একটু আড়ষ্ট ভঙ্গীতে। নীল দীপুকে বলল,

—নয়নাকে বলতো চা দিতে। বিজয় তুমি চা খাও তো?

—হ্যাঁ স্যার। খাই। তবে—

—বললাম না, সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।

দীপু চলে গেল। নীল একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিগ্যেস করল,

—তুমি এখন কোন থানায় আছ?

—ভবানীপুর। বিকাশকাকুর আণ্ডারেই আছি।

—তোমার ডিউটি কী থানায় না ট্রাফিকে?

—থানাতেই।

—কদ্দুর পড়েছ?

—গ্র্যাজুয়েশন করেছি।

—তার মানে পরীক্ষা দিয়ে আরও এগোতে পারবে।

—হ্যাঁ স্যার। বিকাশকাকুও আমাকে খুব উৎসাহ দেন।

—তা, গ্র্যাজুয়েশন করেও পুলিস লাইনে এলে কেন, মানে কনস্টেবল হয়ে এলে কেন?

প্রশ্নটা শুনে বিজয় কিছু সময় চুপ করে রইল। তারপর বলল, —প্রথম কথা আজকের দিনে সামান্য গ্র্যাজুয়েশনে কোন ভাল চাকরি পাওয়া যায় না। পরীক্ষা দিয়ে কনস্টেবল-এর চাকরিটা পেয়ে যাই। তারপর এগিয়ে যাবার রাস্তা তো খোলাই আছে।

—ঠিক আছে। তুমি ঠিকই করেছ। কিন্তু বিকাশবাবুর কাছে তোমার এ লাইনে আসার আসল উদ্দেশ্যটা আমি শুনেছি। আমি ঠিক বলছি তো?

—হ্যাঁ স্যার। বিকাশকাকু আমার মনোবাসনার কথা শুনে উনি আপনার কাছে আসার পরামর্শ দেন। তাছাড়া, আপনি একজন সফল গোয়েন্দা এটা আমি জানি।

—কিন্তু বিজয়, আজ থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে কেউ একজন তোমার মাকে খুন করেছিল এটা তুমি আন্দাজ করলে কী ভাবে? তখন তোমার কত বয়স ছিল? বড়জোর সাত আট।

—হ্যাঁ স্যার। আপনি ঠিকই ধরেছেন। তখন সাত কী আট হবে।

—সাত আট বছর বয়েসের কতটুকু তোমার স্মরণে আছে?

সামান্য সময় চিন্তা করে বিজয় বলল, —সেই রাতের ভয়ংকর ব্যাপারটা এমন ভাবে আমার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে যেটা আমি আজও ভুলিনি।

—বেশ, তাহলে আগে বল কী তোমার মনে আছে?

—বিকাশকাকুর কাছে আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমরা খুবই গরীব ছিলাম। আমার বাবা আমার জন্মাবার পর ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান। আমাদের দেখার মতো কেউ ছিল না। মাকে বাধ্য হয়ে কয়েকটা বাড়িতে রান্নার কাজ নিতে হয়। বাবার রোজগার তেমন ছিল না। আমাদের থাকতে হত রেললাইনের ধারে একটা ঝুপড়ি ঘরে। বাবা মারা যাবার পর মাকে খুব ভোর ভোর বেরিয়ে যেতে হত। পাঁচ বাড়ি রান্না সেরে মা অনেক রাতে কিছু খাবার টাবার নিয়ে বাড়ি ফিরতো। তাতেই আমাদের চলে যেত।

বাধা দিয়ে নীল জিগ্যেস করল—অতটুকু ছেলেকে একলা রেখে সারাদিনের মতো তোমার মা বেরিয়ে যেতেন? তুমি থাকতে কোথায়?

—আমাদের ঝুপড়ির পাশের ঝুপড়িতে থাকতেন মনুমাসি। ওনার কোন ছেলে মেয়ে ছিলনা। প্র্যাকটিক্যালি মনুমাসি আর কমল মেসো না থাকলে আমি হয়তো রাস্তার ছেলে হয়ে যেতাম। গুণ্ডা মস্তানদের দলে চলে যেতে পারতাম।

—ওয়েল, সেটা হওনি সেটাই তোমার ক্রেডিট। এখন বল, তোমার মায়ের মৃত্যুর রাতের কিছু ঘটনা নিশ্চয়ই তোমার স্মরণে আছে?

—আছে। অন্যান্য দিনের থেকে মা সেদিন একটু সকাল সকালই ফিরেছিলেন। তখনও বিকেলের আলো ছিল। আমি তখন ঝুপড়িরিই কিছু ছেলের সঙ্গে বল খেলছিলাম। মাকে জিগ্যেস করেছিলাম তাড়াতাড়ি আসার কী কারণ?

—কী বলেছিলেন?

—মা সন্ধেবেলা যেতেন ঘোষেদের বাড়ি। সন্ধের রান্না সেরে ফিরতে ফিরতে নটা বেজে যেত। তা বিকেল বেলায় বাড়ি ফিরে মা বলল, ঘোষবাবুরা নাকি কোথায় বেড়াতে গেছেন দিন পনেরোর জন্যে। দরজা জানলা বন্ধ দেখে ফিরে এসেছে।

নীল একবার বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, —তোমার মাতো রোজই ঘোষবাবুদের বাড়ি রান্না করতে যেতেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—তা যে বাড়িতে রোজের ডিউটি, তারা পনেরো দিন থাকবে না, সে খবরটা তো তোমার মায়ের আগেই পাওয়া উচিত ছিল।

বিজয় বলল, —পরে বড় হয়ে এটা আমি নিজেও চিন্তা করেছি। মা কেন জানল না ওরা দিন পনেরোর জন্য বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে?

—হুঁ। তারপর?

—সেদিন আর ঘোষবাবুদের বাড়ি থেকে কিছু খাবারদাবার না পাওয়ার জন্যে মা দোকান থেকে কচুরি আর মিষ্টি কিনে এনেছিল। সেই সব খেয়েই মায়ের কোলের কাছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর রাত কত জানি না, 'উরি বাবারে মারে' বলে একটা চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম চোখে অন্ধকার ঝুপড়ির মধ্যে আমি একজন ঝাঁকড়া চুলের লোককে ঝাঁপ ঠেলে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখি। মায়ের চিৎকার শুনে আশপাশ থেকে সবাই ছুটে এসেছিল। আলো জ্বেলে দেখা গেল মায়ের মাথাটা কাটারির আঘাতে ফালা ফালা, আর রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। সবাই বলল মা আর বেঁচে নেই। এরপর পুলিস আসে। দু'তিনদিন পর বডি পাওয়া যায়।

—তার মানে, যে লোকটা এই কাজ করেছিল, একমাত্র তার মাথার ঝাঁকড়া চুল ছাড়া আর কিছুই দেখনি?

—না।

—আর কোন সূত্র তুমি পেয়েছ? মানে লোকটা কে এমন আন্দাজ তুমি কী কারো কাছ থেকে জোগাড় করতে পেরেছ?

—না। কেউই কিছু বলতে পারল না। কমল মেসো বা মনুমাসি তারাও কিছু বলতে পারেনি।

—তোমার মাকে খুন করতে পারে, মানে তার শত্রু ছিল কিনা কিছু খবর নিয়েছ?

—আমাদের না ছিল টাকাকড়ি, না ছিল সামাজিক কোন স্টেটাস। আমাদের লোকে বলত ঝুপড়িবাসী। এ রকম লোকের শত্রু থাকে?

নীল হাসল। তারপর বলল, —নিজের অজান্তেই কত মানুষ কত শত্রু তৈরি করে ফেলে, পুলিসে যখন চাকরি করছ এটা নিশ্চয় এতদিনে অল্পস্বল্প বুঝতে পারছ?

—হ্যাঁ স্যার, আপনি যেটা বলছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি। একটা ব্যাপার হতে

পারে, যেটা বড় হয়ে বুঝেছি, আমি বা আমার মা না থাকলে আমাদের ঝুপড়ি ঘরটা খালি হয়ে যাবে। আরসাদ বলে আমাদের ঝুপড়ি-বস্তিতে একজন বাংলাদেশি লোক থাকত। এটা অবশ্য আমার মনুমাসির মুখেই শোনা, মা মারা যাবার পর কমল মেসো আর মনুমাসি আমাকে তাদের ঝুপড়িতে নিয়ে যায়। ঝুপড়িটা ফাঁকা হয়ে যেতেই আরসাদ তার বাংলাদেশ থেকে আসা মেয়ে জামাইকে ওই ঘরে ঢুকিয়ে দেয়।

—এ নিয়ে কেউ কোন প্রতিবাদ করেনি?

ম্লান হেসে বিজয় বলল, —স্যার, রেললাইনের ধারে যে সমস্ত ঝুপড়িবস্তি আছে, সেগুলো কারোরই কোন ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তি নয়। ওটা রেলের নিজস্ব জমি। যে যেমন পেরেছে ঝুপড়ি বানিয়ে বসে পড়েছে। এখানে লোকাল পার্টির একটা ভূমিকা আছে। পার্টির দাদাদের হাত করে নিতে পারলেই একটা বেওয়ারিশ ঝুপড়ির দখল নিতে কতক্ষণ? আরসাদও তাই করেছিল।

—তোমার কী আরসাদকে সন্দেহ হয়? মানে সে লোকটা একটা ঝুপড়ির জন্যে একটা মানুষকে খুন করতে পারে?

—স্যার, ঘটনাটা আজ থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর আগের। আরসাদ পুরনো কাগজ কুড়িয়ে সংসার চালাতো। এখন সে বুড়ো হয়েছে। আমরা যতদিন ওখানে ছিলাম, আরসাদকে কোনদিনও তেমন ভাবে কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতে দেখিনি। হিংস্র প্রকৃতির লোক বলেও মনে হয়নি।

—হুঁ। বলে নীল খানিকক্ষণ মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে জিগ্যেস করল, —বিজয়, তোমরা কী এখনও এই ঝুপড়িতেই থাক?

—না স্যার। ঝুপড়িতে থাকলেও কমল মেসো আমায় স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। আমি যখন ক্লাশ ফোর ফাইভে পড়ি, কমল মেসো হঠাৎই একটা কারখানায় চাকরি পেয়ে যান। ঝুপড়ি ছেড়ে আমরা উঠে আসি কলকাতার খুব কাছাকাছি আগরপাড়ায়। সেটাও বস্তি অঞ্চল। সেখান থেকেই পড়াশুনো করি। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ওখান থেকেই। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর, আমি বেশ কিছু টিউশন পড়ানোর কাজ পেয়ে যাই। মনুমাসিকেও আর বাইরে কাজ করতে পাঠাইনি। তারপর গ্র্যাজুয়েশনের পর পুলিসের চাকরি। মেসো অবশ্য এখনও কাজ করছেন। তবে বস্তির বাড়িটা ছেড়ে এখন আগরপাড়াতেই থাকি। একটা পাকাবাড়ির একতলায়।

—অর্থাৎ লোয়ার ডেপ্‌থ্ থেকে একটি ছেলের উঠে আসার কাহিনি। কিন্তু তোমার মায়ের মৃত্যু রহস্য রহস্যই থেকে গেল। তাইতো?

—কিন্তু স্যার, এ রহস্য যে আমায় ভেদ করতেই হবে। সাত আট বছর বয়েসে দেখা মায়ের রক্তাক্ত মরা মুখ আমাকে এখনও তাড়া করে বেড়ায়। সেই জন্যেই তো বিকাশকাকুকে—

নীল ওকে থামাল। তারপর বলল, —সমুদ্রের তল থেকে একটা বিশেষ মুক্তো তুলে

আনা যে কী ব্যাপার সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?

—স্যার, আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু—

—বল।

—আপনার পারিশ্রমিক তো আমার পক্ষে দেওয়া এখনই সম্ভব নয়।

—পারিশ্রমিকের কথা থাক। আমি তোমার ডিটারমিনেশনের প্রশংসা করছি। চব্বিশ পঁচিশ বছরে অনেক লিঙ্ক মিসিং। আমাদের সেই সময়টায় ফিরে যেতে হবে।ঠিক সেই সময় ওই বিশেষ জায়গায় আর কী কী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল সেটা জানা একান্তই দরকার। ওই সময়ের কোন বিশেষ ঘটনা কী তোমার স্মরণে আছে?

—এই ব্যাপারে কমল মেসো আপনাকে হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারবেন। যদি বলেন তাহলে তাকে একদিন আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি।

—না, তাকে আনার দরকার নেই। আমিই যাব। তাছাড়া তোমরা প্রথম যে অঞ্চলে থাকতে সে জায়গাটায় বিশেষ করে যাওয়া দরকার। কিন্তু তোমাকে যে আমার সঙ্গে একটু থাকতে হবে। ছুটি পাবে?

—বিকাশকাকু সাহায্য করলেই পাব। আফটার অল এটা তো একটা ইনভেস্টিগেশন কেস। যত পুরনোই হোক না কেন, একটা আনসলভ্‌ড্ কেস। অথরিটি কী তার এক কর্মীর মায়ের খুনের তদন্ত করতে দেবে না?

—ঠিক আছে। আমি বিকাশবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব।

তিন

আগরপাড়া স্টেশন রোড ধরে কিছুটা হাঁটা পথ গিয়েই বিজয়দের একতলার ভাড়াবাড়ি। বাড়িটা দোতলা। ছাদ নেই। অ্যাসবেসটরের চাল। আগে থেকেই বলা ছিল। বিজয়ের মেসো কমল হাঁসদা বাড়িতেই ছিলেন। নীল যেতেই কমল তো প্রায় ভূলুণ্ঠিত এবং গদগদচিত্ত। কমলবাবুর বয়েস প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। রোগা। গায়ের রঙ কালোর ওপরেই। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। পরনে সাদা ফতুয়া আর লুঙ্গি। দেড়খানা ঘর। রান্নাঘর আর বাথরুম। বসার ঘর বলে আলাদা কিছু নেই। রাস্তার ওপরই ঘর। দরজা খুললেই আধখানা ঘর। আসবাবপত্র দিয়ে ঘরটা ভরাট করার চেষ্টা চলছে সেটা বোঝাই যায়। বিজয় বলল, —স্যার এটাই আমার ঘর। পাশেরটা এর থেকে বড়। মেসো মাসি ওখানেই থাকেন।

কমলবাবু একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন,—বসেন বাবু, এটাতেই বসেন। আমাদের তো আর আপনার মতো মানুষকে আপ্যায়ণ করার তেমন যোগ্যতা নাই। আপনে যে পায়ের ধুলো দিয়েছেন এতেই আমরা কেতার্থ।

একটু অস্বস্তি নিয়ে নীল বলল, —দেখুন কমলবাবু—

জিভ কেটে কমলবাবু বললেন,—না বাবু, আমারে কমলবাবু টাবু বলবেন না, শুধু

কমল বললেই হবে। কারখানার মিস্তিরি। সবাই কমল বলে ডাকে। ছেলুম রেললাইনের ধারে একখানা ঝুপড়ি ঘরে। এই ছেলের দৌলতে এখেনে এসে উঠতে পেরেছি। সবই ভগবানের দয়া।

নীল বলল, —আপনাকে আমি কমলবাবুই বলব। মানুষ হিসেবে আপনি কারোর থেকে ছোট নন। আপনার সব থেকে বড় কৃতিত্ব বিজয়কে মানুষ করে তোলা। তাই মানুষ হিসেবে আমার কাছে আপনি খুব উঁচু দরের মানুষ। থাক ওসব কথা। আজ আমি কেন এসেছি নিশ্চয়ই বিজয়ের কাছে শুনেছেন।

—হ্যাঁ বাবু, সেটা শুনেছি। তবে অনেকদিনের কথা। সব কী মনে আছে? ছেলেটা বড় জেদি। তাই আমি ওরে না করতে পারিনি। তবে বাবু বিজয় যা করতে চাচ্ছে সেটা তো বুনো হরিণের পেছু ছোটা। ওর মারে কে মেরেছে তা কী আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে?

—জানি। কাজটা বেশ শক্ত। তবু, ওর যখন একান্ত ইচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক না।

হাল ছাড়া ভঙ্গীতে কমল বললেন, —আপনি যা ভাল মনে করেন।

—বেশ। তাহলে আমার কটা প্রশ্নের জবাব দিন।

ইতিমধ্যে বিজয়ের মনু মাসি একথালা মিষ্টি আর সিঙারা নিয়ে হাজির। বিজয়ও পেছনে চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। নীল বলল, —বিজয়, এসব কিন্তু আমি আগেই বারণ করে দিয়েছিলাম।

মনু মাসি বললেন, —তা কেমন করি হয় বাবু! এই পেত্থমবার কোন ভদ্দরনোক আমার ঘরে পা দেলেন। তারে কী কিছু না খাওয়ায় ছাড়তি পারি। খান বাবু। নইলে আমরা ভারি কষ্ট পাব।

অগত্যা। খেতেই হল। খেতে খেতেই নীল প্রশ্ন করল, —বিজয়ের মাকে যে নৃসংশভাবে খুন করা হয়েছিল, আপনাদের কী মনে হয় তার কোন শত্রু ছিল?

মনু মাসি বললেন,—না গো, দাদাবাবু। মেয়েটা আমারে দিদি বলত। খুবই দুঃখী মেয়ে। পাঁচ বাড়িতে আম্না করে দিন চালাতো। না দাদাবাবু, তারে আমি কারো সঙ্গে ঝগড়া করতি দেখিনি।

—আমি শুনেছিলাম, যেদিন বিজয়ের মা খুন হয়, সেদিন ঘোষবাড়ির কাজ না করে চলে এসেছিল। তারা নাকি দিন পনেরোর জন্যে দেশভ্রমণে গিয়েছিল।

নীলের কথা থামিয়ে দিয়ে কমল বললেন, —এইটাই তো সব থেকে বড়ো মিথ্যে কথা বাবু।

—মিথ্যে কথা? কেন?

—তারা তো কোথাও যাননি। বিজয়ের মা যেদিন খুন হল তার তিন দিন পরই খবর পাওয়া গেল ঘোষবাড়ি থেকে মড়াপচা গন্ধ পাওয়া যেতিছে। তারপর কত কাণ্ড। পুলিস

এল। দরজা ভাঙা হল। এক ঘরে ঘোষবাবু তেনার বউ আর মেয়ে। আর এক ঘরে তেনার বুড়ি মা আর বছর দশ বারোর একটি ছেলে। ঘোষবাবুরই ছেলে। পচা দুগ্গন্ধো ছাড়ছিল। আমরা তো কাছে যেতেই পারিনি।

—একই দিনে পাঁচজন মারা যায়। খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। তা আপনাদের কী মনে হয়েছিল। আত্মহত্যা?

কমল বললেন, —না না বাবু। আত্মহত্যি হবে কেনো? সবাইরে তো দা দিয়ে কুপানো হয়েছিল। রক্তারক্তি কাণ্ড। আমরা অবিশ্যি রক্তটক্ত দেখিনি। কাপড় চাপা দিয়ে লাশগুলি নে গেছিল।

—পুলিস কাউকে অ্যারেস্ট করেনি?

—ঘোষবাবুদের লাগোয়া বাড়িতো একটাই ছেল। ন্যাপেন সাহার বাড়ি। ন্যাপেন সাহারে ধরি নে গেছিল বটে। কিন্তু বাবু, বড়নোকদের ব্যাপার। তিনি আবার পার্টি করতেন। কদিন পর তেনারেও ছেড়ে দেওয়া হল।

—আই সি, নীল ভাবতে ভাবতে বলল, —হ্যাঁ, কল্যাণী সীমান্তে এক বাড়িতে পাঁচজনের খুন হওয়ার কথা কাগজে পড়েছিলাম। এবং সেই সুবাদে সন্দেহবশত একজনকে অ্যারেস্ট করাও হয়েছিল। তারপরই খবরটা ধামাচাপা পড়ে যায়। আসলে সেই সময় একজন বিখ্যাত অভিনেতার মৃত্যু হয়। আসলে সেই কারণেই সম্ভবত কাগজে এই নিয়ে বেশি হইচই করেনি।

হঠাৎ বিজয় জিজ্ঞাসা করল, —কিন্তু স্যার, ঘোষবাড়ির হোল ফ্যামিলির খুন হওয়ার সঙ্গে আমার মায়ের খুন হওয়ার কী সম্পর্ক? হ্যাঁ, মা ও বাড়িতে রান্নার কাজ করতো। বাড়ি বন্ধ দেখে ফিরেও আসে। আমি তো দুটো ঘটনার মধ্যে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না।

—সম্পর্ক আছে এ কথা তো আমি একবারও বলিনি। আমার জিজ্ঞাস্য, ওই সময়ে এই এলাকায় কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল কিনা? আর কোন ঘটনা কী আপনার স্মরণে আছে কমলবাবু?

—কই না? তেমন করি তো কিছু মনে পড়ে না। তবে মাঝে একবার রেলবাবুরা তেনাদের জমি ছেড়ে দেবার জন্যি উঠে পড়ে লেগেছিল। অবিশ্যি অনেক শোরগোল হয়েছিল। পার্টির বাবুরা মিছিল মিটিং করল। তারপর ফের যেই কে সেই। আর তো তেমন কিছু মনে পড়ছেনি বাবু।

নীল উঠে পড়ল। মনু মাসি জিগ্যেস করল, —তা দাদাবাবু, এই সব করতি গিয়ে আমার বিজয়টার কোন ক্ষেতি হবে না তো?

—কিসের ক্ষতি?

—না, তাই বলছিলুম কী, এত বছর আগে যা সব কাণ্ডকারখানা ঘটি গিছিল, সেটি আবার টানা হেঁচড়া—বিজয় আমার প্যাটের সন্তান না হলেও ওটি তারও বাড়া। ও ছাড়া আমাদের দুই বুড়াবুড়ির আর তো কেউ নাই।

হাসতে হাসতে নীল বলল, —আপনার ছেলে পুলিসে চাকরি করছে। মোটামুটি তার পেটে বিদ্যে আছে। পরীক্ষা দিতে দিতে আরও ওপরে উঠবে। তখন হয়তো আরও ভাল বাড়িতে আপনারা চলে যাবেন। ওর অপর আশা রাখুন। ভরসা রাখুন। বিজয়কে দেখছি না। গেল কোথায়?

মনু মাসিই বললেন, —আপনার জন্যি বোধহয় সিরগেট আনতি গেছে।

—আবার এসব কেন, আমার পকেটে তো সিগারেট আছে।

—এটুকুন করতি দেন বাবু, নইলে আমাদের মনে শান্তি আসবেনি।

—মনুদি, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করব।

—কয়েন বাবু।

—বিজয়ের মা যেদিন খুন হয়, সেদিন তো ও একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিল। তা সেদিন কী তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল? একটু মনে করার চেষ্টা করুন।

মনু মাসি বলল, —হয়েছিল বাবু। সেদিনটা আমি চ্যাস্টা করেও ভুলতে পারিনি বাবু। খুব আহ্লাদ করি এক ভাঁড় অসগোল্লা আনছিল। তার থিকে আমাকে চারটি অসগোল্লা দেছিল। আমি জিগেস করেছিলুম হঠাৎ অসগোল্লা পেলি কোথা থ্যেন? তো আমারে বলেছিল, দিদি তোমারে আমি সব পরে বলব খন। তা বাবু মেয়েটা যে কী বলত তা আর শোনা হোলনি।

ইতিমধ্যে বিজয় চলে এসেছিল। পুরা প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, —স্যার, আমাকে দোষ দেবেন না। মেসোর অর্ডার।

কিছু বলার নেই। নীল বেরিয়ে এল। সঙ্গে বিজয়ও। একসঙ্গে কিছুটা এগোবার পর বিজয় বলল,—স্যার আপনার কী সত্যিই মনে হয় আমার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে ঘোষ ফ্যামিলির খুনগুলোর মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে?

—আমি তো তোমায় আগেই বললাম, আমি জাস্ট খবরাখবর নিচ্ছি। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তার কোন হদিশ আমার জানা নেই। ও হ্যাঁ আর একটা কথা, সব সময় তুমি আমায় 'স্যার স্যার' কোর না তো? আমার কান ওই শব্দটা শুনতে অভ্যস্ত নয়।

আমতা আমতা করে বিজয় বলে, —ওটা তো স্যার চাকরি করতে গিয়ে রপ্ত করে ফেলেছি। তার ওপর আপনি সম্মানিত মানুষ। ঠিক আছে আপনাকে যদি আমি নীলকাকু বলি, তাহলে—

—ওক্কে তাই বোল। ঠিক আছে, তুমি কী এখন কলকাতায় ফিরবে?

—না কাকু, এবেলাটা অফ্ আছে।

—ওয়েল, তোমাকে আর এগোতে হবে না। আমি ঠিক চলে যাব।

চার

বাড়ি ফিরে নীল ভবানীপুর থানায় ফোন করল বিকাশ তালুকদারকে, —সন্ধের দিকে তেমন কোন কাজ আছে নাকি?

—এই মুহূর্তে তো ঠিক বলতে পারছি না ব্যানার্জি সাহেব। কোন বিশেষ দরকার?

—সেটা আপনার সঙ্গে দেখা হলেই বলব।

—ঠিক আছে। সেরকম কিছু ফেঁসে না গেলে চলে আসছি।

সন্ধে সাতটা নাগাদ বিকাশ তালুকদার এসে গেলেন। নীল নন্দিনীর সঙ্গে গল্প করছিল। শনিবার বলে দীপুও তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। বাইরে পায়ের শব্দ পেয়েই দীপু বলল, —নীলদা, তোমার ভটভটি এসে গেছে।

নন্দিনী হেসে ফেলল, বলল, —ভটভটি কে?

—তোমার হাজব্যাণ্ডের বাহন। এসেই দেখো না মিনিট চারপাঁচ সময় নেবেন শুধু টাক পালিশ করার জন্যে। তারপরই বলবেন—

কথা শেষ হলো না। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তালুকদার বললেন, —ওহে ডেঁপো ছোকরা, তারপরের ডায়লগটা আমিই বলে দিচ্ছি, ভাবিজি চায়ে।

দীপু বলল, —এরপরের ডায়লগটা কী আপনি দেবেন না আমি দোব?

—তুমিই দাও। বুদ্ধিতে মরচে ধরেছে কিনা সেটা একবার টেস্ট করে নিই।

গলাটা ভারী করে, খানিকটা বিকাশ তালুকদারের ভঙ্গীতে দীপু বলল, —দীপুবাবু, মোড়ের দোকান থেকে কিছু গরম সিঙারা আর রসে টইটম্বুর কিছু জিলিপি নিয়ে এসো তো...অ্যাম আই রং মিস্টার তালুকদার দাদা?

বিকাশবাবু বললেন, —সবটা না হলেও একটুখানি ভুল হয়েছে। 'দীপুবাবু' বলতাম না। বলতাম—

—থাক, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি চললাম।

দীপু বেরিয়ে গেল। নন্দিনীও উঠে পড়ল। বিকাশ বললেন, —কী হল ভাবিজি, আপনি আবার উঠলেন কেন?

—আপনাদের তো এখুনি খুন জখমের গল্প আরম্ভ হবে। আপনারাই গল্প করুন। আমি বরং চায়ের জোগাড়টা সেরে ফেলি।

নন্দিনী বেরিয়ে যেতে বিকাশ বললেন, —এবার বলুন ব্যানার্জি সাহেব, এত জরুরী তলব কেন?

নীল নিজের মনে কিছু ভাবছিল। হঠাৎ ধ্যান ছুট্ ভঙ্গীতে বলল, —একবার কল্যাণী সীমান্তে যাওয়া দরকার।

—হঠাৎ? কোন নতুন কেস নাকি?

—হ্যাঁ, নতুনই বটে। পুরনো পাঁক ঘেঁটে নতুন কিছু আবিষ্কার।

—আই সি। তার মানে বিজয়ের মায়ের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি বেশ ভাবছেন?

—জানেনই তো। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোটাই তো আমার একটা বিরাট নেশা।

—ওভাবে বলছেন কেন ব্যানার্জি সাহেব? আপনাকে তো আর আজ দেখছি না।

রহস্য পাগল মানুষ আপনি। রহস্যের সন্ধান পেলে আপনি মানুষটাই তখন পাল্টে যান। সে কথা থাক। আমার মনে হচ্ছে একটা কিছু সূত্র আপনি পেয়েছেন।

—না, সেভাবে কিছু পাইনি। আপনাকে তো সেদিনই বললাম, আজ থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে কল্যাণী সীমান্তে এক বাড়ির পাঁচজন সদস্য খুন হয়েছিলেন।

—বলেছিলেন বটে কিন্তু ঠিক ডিটেলসে মনে পড়ছে না। আসলে ইদানীং এত বেশি খুন জখম বেড়ে গেছে, সব ঠিকমতো মনে রাখাই যায় না। এই তো কিছুদিন আগে খোদ কলকাতায় টালিগঞ্জ রোডে বাবা মা ভাই বউ ছেলে মেয়ে সব কটাকে খুন করে নিজে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল। অক্সিটাউনের কেসটাই দেখুন না। ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করে তাদের ফ্যামিলিকে ফ্যামিলিই লোপাট করে দিল।

—কল্যাণী সীমান্তেও প্রায় একই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। এবং সেটা ঘটেছিল বিজয়ের মা যেদিন মারা যায় হয়তো সেদিন কী তার আগের দিন।

—কিন্তু তার সঙ্গে এটার কী সম্পর্ক?

—সেটার জন্যেই তো যাওয়া। আসলে মিসিং লিঙ্কটা আমি খুঁজছি।

—তাহলে এক কাজ করুন, সীমান্তের থানার ওসি আমার ভায়রাভাই। মানস চৌধুরী। আপনি মানসের সঙ্গে দেখা করুন।

—তাহলে বেশ ভালই হয়। কিন্তু আমি তো মানসবাবুকে চিনি না।

—আপনাকে ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি মানসের সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা বলে রাখছি। আপনি কবে যাবেন বলুন?

—রবিবার। মানে কালই। দীপুর কাল সাইকেল হাউস নেই। ওকে নিয়েই যাব।

—ঠিক আছে। আপনি চাইলে বিজয়কেও আপনার সঙ্গে দিতে পারি।

—না, এখুনি বিজয়কে আমার দরকার নেই। আমি আগে নিজে একটু এগোই। তারপর অন্য কিছু ভাবা যাবে।

—উইস ইউ বেস্ট অব লাক। দেখুন সূঁচটা খুঁজে পান কিনা।

ইতিমধ্যে দীপু চলে এসেছিল। তারপর কিছুক্ষণ চলল দীপু আর বিকাশবাবুর লেগ পুলিং। চা জলখাবার শেষ করে বিকাশবাবু চলে গেলেন।

নীলও দীপুকে জানিয়ে দিল রবিবার সকালেই ওরা কল্যাণী সীমান্তে যাচ্ছে।

পাঁচ

মানস চৌধুরী ভদ্রলোকটি বেশ ভাল। নতুন করে পরিচয় দেবার দরকার ছিল না। নীল নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিতেই ভদ্রলোক বললেন, —আমি তো আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। গতকাল রাত্রে বিকাশদা আমায় ফোনে সব কিছুই বলেছেন। আরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

নীল আর দীপু বসতেই ভদ্রলোক একজন কনস্টেবলকে চা আনতে বলে দিলেন। তারপর বললেন, —এখন বলুন, আমি আপনাকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারি। আসলে ঘটনাটা ঘটেছিল অনেকদিন আগে। আমি তখন এখানে পোস্টেডও নই। তবে রেকর্ড বুক ঘাঁটলে ডিটেল্‌স্‌ পাওয়া যেতে পারে।

নীল বলল, —হ্যাঁ। আমি একটু ডিটেল্‌স্‌ই চাচ্ছি।

—ঠিক আছে। একটু চা জলখাবার খান। যদিও কলকাতা থেকে মাত্র ঘন্টা দেড়েকের জার্নি। তবু তো জার্নি। আমি ততক্ষণে রেকর্ড বইটা নিয়ে আসি।

চা আর গরম কচুরি এসেছিল। খেতে খেতেই মানসবাবু রেকর্ড বইটা খুঁজে এনে চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন। তারপর বলতে থাকলেন—ঘটনাটা ঘটেছিল ঘোষপাড়ায়। এমনিতে ঘোষপাড়াটা বেশ শান্তশিষ্ট এলাকা। ওখানে বেশির ভাগই বৈষ্ণব ধর্মের মানুষ। এরা সব কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মানুষ। ঘোষপাড়াটা ওদেরই শ্রীক্ষেত্র। কিন্তু সেখানেও এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। ভাবা যায় না।

বাধা দিয়ে নীল বলল, —আর ইউ সিওর যে পুরো ফ্যামিলি মেম্বারকেই মার্ডার করা হয়েছিল? মানে আমি বলতে চাইছি রিসেন্টলি ঘটে যাওয়া টালিগঞ্জ কেস নয়তো? ফ্যামিলির সবাইকে মেরে একজন সুইসাইড করেছিলেন।

—না। রিপোর্টে বলছে সবকটাই মার্ডার।

—হাউ? মার্ডারগুলো কীভাবে হয়?

—ফোরেনসিক রিপোর্ট বলছে প্রথমে সরবতের সঙ্গে বিষ দেওয়া হয়। তারপর প্রত্যেকের গলায় আর ঘাড়ে কাটারি বা ওই জাতীয় কোন ধারালো এবং ভারী অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। তবে অ্যাকচুয়াল মৃত্যুটা হয় বিষক্রিয়াতেই। ধুতরা ফল বেটে তার রস মিশিয়ে দেওয়া হয় সরবতে। মৃত্যুটা ডেফিনিট করার জন্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে দেওয়া হয়।

— মোটিভ?

—মোটিভটাই তো ক্লীয়ার নয়। যার জন্যে পাশের বাড়ির একটি লোককে সাসপেক্ট করে অ্যারেস্ট করার পরও ছেড়ে দিতে হয়। নব্বই দিনের মধ্যে চার্জশীট তৈরি করা সম্ভব হয়নি। কোর্টে প্রমাণও করা যায়নি নৃপেন সাহাই দোষী। নৃপেন সাহা এখন বহাল তবিয়তে বসবাস করছে।

—এই নৃপেন সাহা লোকটি কে? অবনী ঘোষের সঙ্গে তাদের রিলেশনটা কী?

—তার আগে বলি, যাঁরা খুন হয়েছিলেন তাঁরা হলেন অবনী ঘোষ। তাঁর স্ত্রী মায়া ঘোষ, মেয়ে শর্মিষ্ঠা ঘোষ। এদেরকে পাওয়া যায় বসার ঘরে। আর সেকেণ্ড বেডরুমে পাওয়া যায় নিভাননী ঘোষ, মানে অবনীবাবুর মা আর শমীক ঘোষ, অবনীবাবুর ছেলে। একই প্রসেসে সবাইকে খুন করা হয়।

—তার মানে সবার অলক্ষ্যে কেউ একজন সরবতে বিষ মিশিয়েছিল। আপনার

রিপোর্টে সেরকম কিছু হিন্ট্স্ আছে?

মানসবাবু কয়েকটা পাতায় চোখ বুলিয়ে বললেন, —তখনকার ওসি, মিস্টার রথীন সরকার তার নোটে লিখেছেন এ কাজটি করতে পারে ঘোষবাড়ির রাঁধুনি মেয়েটি।

—রাঁধুনি? তার নাম কী?

—বেম্পতি সামন্ত।

—বিজয়ের মা নয়তো?

মানস জিগ্যেস করলেন—বিজয় কে?

—পরে বলব। তা বেম্পতিকে পুলিস কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেনি?

—মজার ব্যাপার। বেম্পতি সেই রাতেই খুন হয়ে যায়। ওই একই ওয়েপন দিয়ে।

—স্ট্রেঞ্জ।

—হঠাৎ স্ট্রেঞ্জ বললেন কেন?

—আপনার লিখিত স্টেটমেন্টের সঙ্গে আমার শোনা বিবরণের হিসাব মিলছে না।

—কী রকম?

—একটু আগে বিজয়ের কথা বলছিলাম। এই বিজয় হচ্ছে বেম্পতির ছেলে। বেম্পতি সাধারণত সব বাড়ির কাজকর্ম মিটিয়ে বাড়ি ফিরে আসতো প্রায় রাত আটটা নটা নাগাদ। কিন্তু সেদিন সে ফিরে এসেছিল আরও আগে। মানে সন্ধের আগেই।

—কেন?

—রোজকার মতো নির্দিষ্ট সময়ে ঘোষবাড়িতে ঢুকতে গিয়ে সে দেখে মেইন গেটে তালা ঝুলছে। পাশের বাড়িতে মানে নৃপেন সাহার বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে অবনী ঘোষ সপরিবারে পনেরো দিনের জন্যে বাইরে বেড়াতে গেছেন।

—তা যেতেই পারেন।

নারাজ মাথা দুলিয়ে নীল বলল, —না মানসবাবু, রহস্যটা এখানেই ঘোঁট পাকিয়েছে।

—কীরকম?

—প্রথম কথা বেম্পতি ঘোষবাড়ির নিয়মিত রাঁধুনি। তাকে প্রতিদিনই রান্না করে দিতে হতো। গৃহকর্তারা যদি বাইরে যাবার প্ল্যান করেই থাকেন, সে কথাটা আগের দিনই জানাবার কথা। অথচ তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউই, বিশেষ করে অবনীবাবুর স্ত্রীর তো কথাটা জানিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। হিসেব তো তাই বলে।

—ইয়েস। নরম্যালি এটাই হয়। অবশ্য একটা কথা থেকে যাচ্ছে, হয়তো ঘোষবাড়ির লোকেরা কথাটা জানাবার প্রয়োজন মনে করেনি।

—নাহ, তা হতে পারে না। তাহলে ধরে নিতে হবে কিছু একটা উদ্দেশ্য ছিল না জানাবার।

—হুঁ। ব্যাপারটা গোলমেলে। তারপর?

—বেম্পতিরা খুবই গরীব। এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে খাবার সংগ্রহ করে তাদের মা

ছেলের পেট ভরাতে হত। সেই মেয়ে ঠিক সেইদিনই ছেলের জন্যে এক ভাঁড় রসগোল্লা কিনে নিয়ে গিয়েছিল। টাকাটা পেল কোত্থেকে?

—একটা দুটো রসগোল্লা কিনতেই পারে। হয়তো কারো বাড়ি থেকে মাইনে পেয়েছিল।

—আমি আগেই বলেছি এক ভাঁড় রসগোল্লা। যে রসগোল্লার ভাঁড় থেকে চারটে সে পাশের ঝুপড়ির কমল হাঁসদার স্ত্রীকে দিয়ে এসেছিল।

—সেটা কী কমল হাঁসদার স্ত্রী স্বীকার করেছে?

—হ্যাঁ।

—টাকা কোথা থেকে পেয়েছিল তা জেনেছেন?

—তখনই কিছু জানায়নি। বলেছিল পরে জানাবে। খট্‌কা সেখানেই। সামান্য রসগোল্লা। তা জানাবার জন্যে সময় নেওয়াটা দুর্বোধ্য ঠেকছে।

—আচ্ছা, কোন বাড়িতে হয়তো সেদিন কোন উৎসব ছিল, হতে পারে না?

—এক ভাঁড় শুধুই রসগোল্লা তুলে দেবে? আর অন্য কিছু দেবে না? সেটা বোধহয় বাস্তব চিন্তা নয়।

—তা এ দিয়ে আপনি কী অনুমান করেন?

—অনুমান কিছুই করছি না। ভাবছি। রসগোল্লা সে কিনেছিল। কিন্তু কেনার টাকাটা বেম্পতি পেয়েছিল কোথা থেকে? আসলে কী জানেন মানসবাবু, ব্যাপারটা এতদিনের পুরনো, কোন প্রশ্নের উত্তরই বোধহয় আজ আর পাওয়া যাবে না।

টেবিলের ওপর ডট্‌পেনের টক্‌টক্ আওয়াজ করতে করতে কিছুটা সময় নিলেন মানস চৌধুরী। তারপর একসময় বললেন, —জগাই দাস বলে এই থানায় একজন সিনিয়র কনস্টেবল আছে। রিটারমেন্টের মুখে। এই কেসের তদন্তের সময় সে কিন্তু এক্‌স্ ওসি রথীন সরকারের সঙ্গে ছিল। ডাকব একবার? যদি কিছু তার মনে থাকে?

—মনে তো হয় না কোন লাভ হবে। তবু একবার ডাকুন।

বেল টিপতেই একজন বয়স্ক কনস্টেবল এসে দাঁড়াল। মানস বললেন,

—এই হচ্ছে জগাই দাস।

জগাই দাস স্যেলুট ঠুকল। মানস জিগ্যেস করলেন, —আচ্ছা জগুদা, অনেক দিন আগে, ধরো চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে ঘোষপাড়ায় এক বাড়িতে একসঙ্গে পাঁচজন খুন হয়েছিল। তদন্তের সময় সরকার সাহেবের সঙ্গে তুমি তো ছিলে?

—হ্যাঁ সাহেব।

—তখনকার কথা কিছু মনে আছে?

—জিগ্যেস করুন। যদি মনে থাকে তাহলে বলব।

এবার নীল প্রশ্ন শুরু করল, —আচ্ছা জগাইবাবু, একটু মনে করে বলুন তো, ঘোষবাড়ির অবস্থাটা সেদিন কী রকম ছিল?

—আজ্ঞে সঠিক মনে না থাকলেও, এটা মনে আছে, আমাদের বাড়িতে ঢুকতে

হয়েছিল দরজা ভেঙে। কারণ দরজায় তালা লাগান ছিল। ভেতর থেকে পচা গন্ধ আসছিল। তারপর তালা ভেঙে ভেতরে গিয়ে দেখা যায় এক ঘরে তিনজন অন্য ঘরে দুজন মরে পড়ে আছে।

—আর বিশেষ কিছু?

—দুটো ঘরেই মোট ছটা গ্লাস পড়েছিল। বিছানায়, সোফায় রক্তের শুকিয়ে যাওয়া দাগ ছিল। যদ্দুর মনে আছে সবাই বোধহয় বমি করেছিল। মেঝেয় সেই সব চিহ্নও পাওয়া যায়।

—কোন ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন?

—না। সেভাবে কিছু চোখে পড়েনি। মনে হচ্ছিল সবাই যেন ঘুমচ্ছে। কেবল কারো ঘাড়ে কারও গলায় ধারালো অস্ত্রের কাটা দাগ। কিন্তু কারো মুখেই কোন যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না।

—পাশের বাড়ির নৃপেনবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কেন?

—এটা তো স্যার আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে শুনেছিলাম ওদের বাড়ির কর্তার মেয়েটাকে নিয়ে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছিল নৃপেনবাবুদের।

—গণ্ডগোলটা কী নিয়ে?

—সব থেকে ভাল হয় আপনি যদি সরকার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। তিনিই তো কেসটা দেখভাল করছিলেন।

—হঠাৎ কেসটা ধামাচাপা পড়ে গেল কেন সে সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ আছে?

—না স্যার। আমরা আদার ব্যাপারি, কী দরকার বড় বড় ব্যাপারে মাথা গলাবার। তাতে তো আর আমার কোন প্রোমোশন হবে না।

—একশোবার। আর একটা প্রশ্ন করব জগাইবাবু। এই বডিগুলো পাবার দিন তিনেক আগে রেল লাইনের ধারে এক ঝুপড়িবাসী মহিলা, যে নাকি ওদের বাড়িতে রান্নার কাজ করতো, সেও খুন হয়েছিল। সেটার তদন্তও তো এই থানা থেকে হয়েছিল।

খানিকক্ষণ মাথা চুলকে জগাই বলল, —হ্যাঁ স্যার, মনে পড়েছে। তবে সেটা নিয়ে তেমন কোন হইচই কিছু হয়নি। ঝুপড়ি পট্টিতে ওরকম খুনোখুনি, মারামারি তো লেগেই থাকে। এটাও স্যার আপনি সরকার সাহেবের কাছ থেকে খবর পেতে পারেন।

হঠাৎ নীল মানস চৌধুরীকে জিগ্যেস করল,—বেস্পতি মার্ডারের কোন রেকর্ড নেই? মানে কোন ফাইল?

—থাকা উচিত। যদি বলেন বার করতে পারি। কাছাকাছি ঘটনা তো। ফাইলও পাশাপাশি থাকবে। জগুদা দেখতো, রেকর্ড রাখার আলমারির তিন নম্বর র‍্যাকের ফাইল নাম্বার দুশো তিরিশ বা দুশো আটাশ যে কোন একটা হতে পারে। দেখতো একবার।

কিছুক্ষণ পরেই ধুলোময়লা ঘেঁটে জগাই দুটো ফাইলই নিয়ে এল। পাওয়া গেল দুশো আটাশ নাম্বার ফাইল। বেস্পতি সামন্তর হত্যা তদন্তের রিপোর্ট।

নীল জিগ্যেস করল, —দেখুন তো মিস্টার চৌধুরী বেস্পতির ঘর থেকে কী কী পাওয়া গিয়েছিল। নিশ্চয় সীজার লিস্টের একটা চার্ট আছে?

—হ্যাঁ আছে। একটা টিনের কমদামি বাক্স। তালা ছিল না। দু তিনটে ব্যবহৃত শাড়ি, ব্লাউজ, বাচ্চা ছেলের শার্ট প্যান্ট। বেশি বয়েসের লোকের শার্ট লুঙ্গি, পাজামা। একটা নতুন শাড়ি, ব্লাউজ সায়া ছাড়াও বাচ্চার শার্ট প্যান্ট। এগুলোও নতুন। ঘরের মধ্যে ছিল একটা তোলা উনুন, কয়েকটা অ্যালুমিনিয়ামের থালা, গেলাস, লোহার কড়াই, হাতা খুন্তি।

বর্ণনা দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে মানস বললেন, —আশ্চর্য তো?

—কী হল?

—আরে মশাই, এই রকম একটা ঘরে, নতুন ট্যালকম পাউডার, তখনও খোলা হয়নি, এক শিশি কম দামের পারফিউম। এটাও খোলা হয়নি। অ্যাগু—

—অ্যাণ্ড?

—লিপস্টিক?

মাথা নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —যুবতী মেয়ে। মাথার ওপর কেউ নেই। নিশ্চয় কারো ট্র্যাপে পড়েছিল। বেশ, আর কিছু? মানে কোন রসগোল্লার ভাঁড়?

—জাস্ট আ মিনিট।

পাতা উল্টিয়েই মানস বললেন,—আছে। আপনার রসগোল্লার ভাঁড়ও আছে। তখনও চারটে রসগোল্লা ছিল। আরও আছে মিস্টার ব্যানার্জি। একটা ক্যাডবেরি চকোলেট।

—টাকাকড়ি কিছু পাওয়া গিয়েছিল?

—মাই গড। বারশো সাতান্ন টাকা সাতচল্লিশ পয়সা। টিনের বাক্সর মধ্যে কাপড়ের ভাঁজে? হাউ?

ভাবতে ভাবতে নীল বলল, —অর্থাৎ বেস্পতি নিঃসন্দেহে কারো ট্র্যাপে পা দিয়েছিল। এর দুটো দিক আছে। হয় ও সেক্সুয়ালি কারো সঙ্গে ইনভলভড় হয়ে পড়েছিল অথবা কেউ ওর দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ওকে নিজের কাজে ব্যবহার করেছিল। যেগুলোর প্রমাণ পারফিউম, নতুন পাউডারের কৌটো। মিষ্টির ভাঁড়। ওক্কে, এবার বলুন তো, যে প্রশ্নের উত্তরটা তখন পেলাম না। নৃপেন সাহা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

মানস বললেন, —টু স্পীক ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, নৃপেন সাহা সম্বন্ধে পুলিস রেকর্ডে কোন কিছু ব্যাড অ্যালিগেশন নেই। লোকটা অবনী ঘোষের লাগোয়া পাশের বাড়িতে থাকে। সন্দেহের বশে পুলিস ওকে থানায় নিয়ে আসে।

—সন্দেহটা কী?

—শোনা কথা। কোন প্রমাণ নেই। ও নাকি অবনী ঘোষের মেয়ে শর্মিষ্ঠা ঘোষের সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার্সে যুক্ত ছিল। সেটা থাকতেই পারে। কিন্তু তার জন্য ও কেন মার্ডার করবে? তাও একজন নয়। পুরো ফ্যামিলিকেই! প্রমাণ অভাবে পুলিস তাকে ছেড়ে দেয়।

—ভদ্রলোক কী করেন?

—এই ঘটনার আগে নৃপেন সাহা ব্যবসা করতেন। এখনও করেন। কিছুদিন একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন কিন্তু ভদ্রলোক ব্যক্তি জীবনে একেবারে বদলে গেছেন। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গোঁড়া ভক্ত। বাড়িতে কীর্তনের আসর বসান। অনেক সময় দূরদূরান্ত থেকে আসা বাউলদের নিয়ে নিজের বাড়িতে বাউল গানের আসর বসান। এক কথায় উনি আউলচাঁদের একনিষ্ঠ ভক্ত। পুলিসের খাতায় উনি নির্বিবাদী বৈষ্ণব। নিজের ধর্ম আচ্চা নিয়েই থাকেন।

দীপু এতক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়েই ছিল। ও হঠাৎ জিগ্যেস করল, —আউলচাঁদ কে?

সামান্য হেসে মানস বললেন, —এখানকার মানুষের বিশ্বাস, স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ঘোষপাড়ায় আউলচাঁদের বেশে ফিরে এসেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আউলচাঁদই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। এদের ধর্ম মন্ত্র একটাই, মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন তফাৎ নেই। সব মানুষকেই ভাই বলে নিজের বুকে টেনে নাও।

দীপু বলল, — বাহ্, এতো খুবই ভাল ব্যাপার। কিন্তু এই পরিবেশেও খুনোখুনি?

মানস হাসতে হাসতে বলল, —কিন্তু সর্ষের মধ্যেই তো ভূত লুকিয়ে থাকে। ওই নীতিটা যদি সবাই মানতো তাহলে তো আমাদের দরকারও ফুরিয়ে যেত। বসে বসে সরকারি মাইনে গোনা ছাড়া আর তো কিছুই করার থাকতো না।

নীল বলল, —এই নৃপেন সাহা লোকটির সঙ্গে কী মীট্ করা যায়? আপনি চেনেন ওঁকে?

—নাহ, ঠিক চিনি না। আসলে চেনার তো কোন দরকার পড়েনি। চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে একবার উনি সাসপেক্টেড হয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন, শুনেছি অতি সজ্জন ব্যক্তি। আপনি যদি চান আমি ওঁর সঙ্গে আপনার মোলাকাৎ করিয়ে দিতে পারি। বলুন, কবে দেখা করবেন? আজ?

—হ্যাঁ। আজও হতে পারে। আজ তো রোববার। আশা করা যায় ভদ্রলোক বাড়িতেই থাকবেন। ব্যবসা করেন বললেন না?

হ্যাঁ। কলকাতায়। তবে সব দিন যান না। সপ্তাহে দু একদিন। এটাও অবশ্য শোনাকথা।

—তাহলে চলুন। অসুবিধা হবে নাতো?

—অসুবিধা একটাই। আমার এই উর্দিটি। পুলিসের উর্দি দেখলেই লোকে তিলকে তাল দেখে। ঠিক আছে। একটু বসুন। আমার কোয়ার্টার কাছে। একটু চেঞ্জ করে আসি। ও হ্যাঁ, আরও একটা কথা। ফেরার পথে আমার এখানে মধ্যাহ্নভোজ সেরে তবেই ফিরতে পারবেন। আফটার অল আপনি হচ্ছেন বিকাশদার বিশেষ সম্মানিত বন্ধু। মনিদীপাদির বোন আই মিন বিকাশদার শ্যালিকার সঙ্গেও আলাপ হয়ে যাবে। কী রাজি তো?

নীল কিছু বলার আগেই দীপু বলে উঠল, —ওহ্ সিওর। বিকাশদার শ্যালিকার সঙ্গে তো আলাপ করতেই হবে। যান মশাই তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে ঘুরে আসুন।

ছয়

একই জায়গায় সামান্য দূরত্বে দুটো বাড়ি। একটা বাড়ি ঝকঝক তকতক করছে। দোতলা বাড়ি। যদিও এ অঞ্চলে মাঠকোঠার সংখ্যাই বেশি। কিন্তু পাকাবাড়িও অনেক। নৃপেন সাহার বাড়িটা জনালয় থেকে সামান্য একপেশে। সামনে পেছনে অনেকটা জায়গা জুড়ে গাছপালা রয়েছে। পুকুরও আছে। ইঁট বাঁধানো সীমানা পাঁচিলও আছে। নৃপেন সাহার বাড়িটা এখন বেশ শান্ত আর নির্জন। একটা বোগেনভিলিয়ার গাছ মাটি থেকে বারান্দা পর্যন্ত উঠে গেছে। বাড়িটার চারপাশে ফুলের গাছ রয়েছে অনেক। বেশ বোঝা যায় সেগুলোর পিছনে মানুষের যত্নের ছোঁয়া আছে। আর ঠিক কিছুটা দূরেই আর একটা বাড়ি। বাড়ি নয়। খণ্ডহার। বট আর অশ্বত্থ মিলেমিশে বাড়িটাকে যেন আঁকড়ে ধরে আছে। পলেস্তারা কবেই যেন খসে গেছে। জানলা দরজা সব ভেতর থেকে বন্ধ। সন্ধেবেলা এলে ভূতের বাড়ি বলে মনে হত। বাড়িটা দেখতে দেখতে দীপু বলল, —তাহলে এই সেই ঐতিহাসিক বাড়ি?

মানস বললেন—হ্যাঁ, ঐতিহাসিকই বটে। চব্বিশ পঁচিশ বছর ধরে একান্ত অযত্নে পড়ে আছে।

দীপু বলল, —কতদিন এভাবে পড়ে থাকবে?

—জানি না। এ বাড়ির আর তো কোন ওয়ারিশ নেই। একসময় ধুলো হয়ে মাটিতে মিশে যাবে। দেখুন না অশ্বত্থ আর বটগাছের কী জমাট আলিঙ্গন। যেন মনে হচ্ছে গাছটাই বাড়িটাকে ধরে রেখে দিয়েছে।

নীল কোন কথা বলছিল না। একমনে বাড়িটা দেখে যাচ্ছিল। দেখল বাড়ির মেইন গেটে একটা তালা ঝুলছে। নৃপেন সাহার বাড়ি না গিয়ে ও গিয়ে অবনী ঘোষের দরজার ফটকের সামনে দাঁড়াল। তালাটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। তারপর বাড়িটাকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল। বন্ধ দরজা জানলাগুলোও আর অক্ষত ছিল না। সম্ভবত রোদ বৃষ্টি আর উইপোকার দংশনে জায়গায় জায়গায় ভেঙে গর্ত তৈরি করেছে। তারই ফাঁক দিয়ে বট আর অশ্বত্থের ডাল বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এ বাড়িরও পিছন দিকে একটা পুকুর আছে। মজা না হলেও থিকথিকে পানা আর পুকুর পাড়ের বাঁশঝাড়ে জায়গাটা প্রায় ভূতুড়ে করে তুলেছে। বুনো আগাছার জঙ্গলে চারদিক ছেয়ে আছে।

দীপু বলল, —নীলদা, আর বেশি এগিও না। সাপটাপ থাকা বিচিত্র নয়।

মানসও তাই বললেন, —এ বাড়ি থেকে পুরনো কোন রহস্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় মিস্টার ব্যানার্জি।

হাসতে হাসতে নীল বলল, —মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পা খুঁড়েও তো অনেক কিছু পাওয়া গেছে মানসবাবু। সেখানেও সম্ভবত সাপটাপ বেরিয়েছিল। ইতিহাস কিন্তু সাপেদের কথা কিছু জানায়নি। তবে এদিকে কিন্তু লোকের যাতায়াত আছে।

মানস বললেন, —কী করে বুঝলেন?

—পুকুরটার ঘাটে দেখুন। এক পাটি হাওয়াই চটি।

মানসও দেখলেন। তারপর বললেন, —থাকতেই পারে। নৃপেনবাবুর বাড়িতে তো লোকজনের যাতায়াত আছে। তাদেরই কেউ হয়তো কোনদিন এদিকে এসেছিল।

—হতে পারে। কিন্তু এক পাটি কেন? আর এক পাটি কোথায়?

—হয়তো চটিটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। স্ট্র্যাপ ছেঁড়া পাটিটা হয়তো পুকুরেই ফেলে দিয়েছে।

—হ্যাঁ। তাও হ'তে পারে। কিন্তু চটিটা সম্ভবত কোন মহিলার।

—ছোট সাইজ দেখে বলছেন?

—এটা কী মাস?

—কেন? ফাল্গুনের শেষদিক।

—দু চারদিন কী দু এক মাসের মধ্যে কোন ঝড়বৃষ্টি কী হয়েছিল এদিকে?

—নাহ্ তা হয়নি।

—তাহলে একটু ভাল করে দেখুন তো চটিটা।

মানস আর দীপু ঝুঁকে পড়ে চটিটা দেখল। তারপর নীলের কাছে এসে মানস বললেন, —আপনার নজর আছে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। চটির বুকে হাল্কা আলতার দাগ।

নীল জিগ্যেস করল—রক্তের দাগ নয়তো?

একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে মানস বললেন, —রক্ত? নাহ্, রক্তের শুকনো দাগ তো এই রকম হবে না।

—তাহলে আলতা পরা পায়ের ছাপ হতেই হবে।

—আপনি কী চটিটা কালেক্ট করতে চান?

—আমি নই। আপনি ইচ্ছে করলে কালেক্ট করতে পারেন। কারণ অকুস্থলটা আপনার এলাকার। যদি কোনদিন প্রয়োজন পড়ে তখন হয়তো কালেক্ট না করার জন্যে আফশোষ করতে হতে পারে।

কিছু একটা ভেবে নিয়ে মানস পকেট থেকে রুমাল বার করে চটিটা মুড়ে নিতে নিতে বললেন, —আপনি ঠিকই বলেছেন। চটিটা প্রায় নতুন। এত পুরনো জায়গায় এমন নতুন চটি অবহেলায় পড়ে থাকার কথা নয়। আলতার দাগটাও খুব একটা ফেইড্ হয়ে যায়নি। থাক। দরকারে লাগতেও পারে। তাহলে এবার নৃপেনবাবুর বাড়ি যাবেন তো?

—হ্যাঁ চলুন। তবে আর একবার মেইন গেটের কাছে যাব। আসুন।

আবার ওরা সদর দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তালাটার দিকে তাকিয়ে রইল নীল।

মানস জিগ্যেস করলেন, —তালাটা অত করে দেখছেন কেন মিস্টার ব্যানার্জি?

—তালাটা কতদিনের পুরনো বলে মনে হয়?

—মিনিমাম চব্বিশ পঁচিশ বছর। পুলিসই লাগিয়ে দেয় তালাটা।

—পুলিস যখন তালা লাগায় সীল করে দেয়। কোথায় সেটা? তাছাড়া তালাটার গায়ে মরচে ধরে যাবার কথা। এবং দীর্ঘদিন ধরে একটা তালা যদি খোলা না হয় তার লিভারেও মরচে পড়ে যাবে।

—সেটাই তো যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা। তবে তালার গায়ে কিন্তু মরচে ধরে গেছে।

—হ্যাঁ ধরেছে। কিন্তু মরচের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জিনিসের যে থাকার কথা।

—কী?

—ধুলো, ঝুল কিম্বা মাকড়সার জাল। যেমন পড়েছে অন্য দরজা জানলার গায়।

মানস বললেন, —আপনি ঠিক কী মিন্ করতে চাইছেন মিস্টার ব্যানর্জি?

—না কিছু না। চলুন যাওয়া যাক।

অতঃপর নৃপেন সাহার প্রধান ফটকে যাওয়া হল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মানসই দরজার কড়া নাড়লেন। বার তিনেক পর একজন মাঝ বয়েসী লোক দরজা খুলে দাঁড়াল। বেশ গাঁট্টাগোট্টা। গায়ে সাদা ফতুয়া। কাপড় ভাঁজ করে লুঙ্গির মতো করে পড়া। কপালে সাদা ফোঁটা। মাথাটি নেড়া।

জিগ্যেস করল,—আপনারা? কোথা থেকে আসছেন?

উত্তরটা নীলই দিল, —কলকাতা থেকে। নৃপেনবাবু কী আছেন?

—আছেন। দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষে তিনি সামান্য বিশ্রাম করছেন।

—ডাকার কী অসুবিধা আছে?

—নাহ্। অতিথি এলে উনি কাউকেই নিরাশ করেন না। আপনারা ভেতরে আসুন। আমি কর্তাকে ডেকে দিচ্ছি।

নীল জিগ্যেস করল, —আপনি কী এ বাড়ির—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি কর্তার সঙ্গেই কাজ করি। আপনারা বৈঠকখানায় বসবেন চলুন।

বৈঠকখানাটি অতি সাধারণ ভাবে সাজানো। মামুলি তক্তাপোষের ওপর সাদা চাদর বিছানো। সাদা খোলের বিশাল একটি তাকিয়া। বিছানায বেশ সাজানো অবস্থায় দুটি ধর্মগ্রন্থ। দেওয়ালে মহাপ্রভুর অতি পরিচিত বিশাল একটি ছবি। বড় আকারের মালাও ঝুলছে। তক্তাপোষের চারপাশে বেশ কয়েকটা কাঠের চেয়ার সাজানো রয়েছে। একদিকের দেওয়ালে দেওয়াল আলমারি। অধিকাংশই ধর্মগ্রন্থ। আছে নিমাইচরিত। বৈষ্ণব সাহিত্যের ওপরও কিছু বই রয়েছে।

তিনজনে তিনটি চেয়ার টেনে বসল। মানস জিগ্যেস করলেন, —এখানে কী পরিচয় দেবেন? নৃপেনবাবু সম্ভবত আমাকে চেনেন। উল্টোপাল্টা কিছু বললে ধরে ফেলবেন।

নীল বলল, —দেখিনা কীভাবে শুরু করা যায়।

ইত্যবসরে আগের লোকটি তিন গ্লাস কাঁচা আমের সরবৎ এনে হাজির করল।

নীল বলল, —মনে হচ্ছে আমের সরবৎ?

লোকটি বলল, —আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন। আজ কর্তার জন্যে কাঁচা আমের

সরবৎ করা হয়েছিল। সবই প্রভুর ইচ্ছে। আপনারা এসে পড়লেন। আসলে যার যেখানে যা অন্ন মাপা।

—হ্যাঁ। এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। তা আপনার নামটি কি জানতে পারি?

—আজ্ঞে ঘনশ্যাম দাস। যদিও আমি এ বাড়িতে গৃহকর্ম করি। তবু কর্তা আমাকে দাস ভাবেন না। ওনার কাছে সবাই সখা। উনি আমার সঙ্গে সেই মতোই ব্যবহার করেন।

—তা ঘনশ্যামবাবু, এ বাড়িতে কী আপনি আর আপনার কর্তা একাই থাকেন?

—আজ্ঞে তা কেন? কর্তা থাকেন, কর্তামা থাকেন। কর্তার পুত্র, পুত্রবধূ থাকেন। কর্তার একটি নাতি আছে। তিনিও থাকেন। তবে সে বালকমাত্র।

—কর্তার কোন মেয়ে নেই?

—আছেন। তেনার তো বিবাহাদি সম্পন্ন হয়ে গেছে। তিনি শ্বশুরালয়েই থাকেন। কলকাতায়।

দীপু ফুট কাটল, —বাহ্, আপনি তো কথার মধ্যে শুদ্ধ বাংলা পাঞ্চ করতে পারেন। নিশ্চয়ই লেখাপড়া করেন?

লজ্জিত হাসি হেসে ঘনশ্যাম বলল, —কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আউলচাঁদ বলে গেছেন, যে যে কর্মই করনা কেন, নিত্য শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। বই পড়বে। ধর্মগ্রন্থ পড়বে। ওতে মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

নীল আর মানস পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার মুহূর্তেই বাইরে থেকে বেশ গুরুগম্ভীর স্বর ভেসে এল, —ঘনশ্যাম আছ নাকি?

ঘনশ্যাম বলল, —ওই কর্তা এলেন। আপনারা বাক্যালাপ করুন। আমি আসি।

ঘনশ্যাম বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ দীর্ঘকায় এক ব্যক্তির প্রবেশ। গায়ে সিল্কের সাদা ফতুয়া। নিম্নাঙ্গে সাদা সিল্কের লুঙ্গি। পায়ে সাদা কাপড়ের স্ট্র্যাপ লাগানো কাঠের চটি। কপালে এবং নাকে রসকলি। সযত্নে কামানো দাড়ি গোঁফ। মাথায় ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ কাঁচা পাকা চুল। গলায় কণ্ঠি। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে। তীক্ষ্ণ নাক। দীর্ঘায়ত চোখ। দৃষ্টিটাও বেশ প্রসন্ন। গায়ের রঙটি ঈষৎ শ্যামবর্ণ। বয়েস কালে হয়তো কেষ্টঠাকুরের দ্বিতীয় সংস্করণ ছিলেন। এখন সেটি না হলেও বেশ সুপুরুষ এটি বলা যায়। নৃপেন সাহাকে ঢুকতে দেখেই তিনজনে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

জলদগম্ভীর অথচ মোলায়েম কণ্ঠে নৃপেন সাহা বললেন, —একী কথা? গাত্রোত্থানের কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা আমার অতিথি। উপবেশন করুন।

তিনজনেই বসে পড়ল। নৃপেন সাহা গিয়ে বসলেন তক্তাপোষে। বিশাল তাকিয়ায় পিঠ ঠেকিয়ে বললেন, —সে সব তো কবেই চুকেবুকে গেছে। তাহলে মাননীয় ওসি সাহেবের পুনরাগমন কেন?

আবার চোরাদৃষ্টি বিনিময় নীল আর মানসের। উত্তরটা মানানসই দিলেন, —তাহলে আপনি আমাকে চেনেন?

—বিলক্ষণ। আপনারা হলেন শাসক। শান্তির প্রতিভূ। আপনাদের চেনা তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অতীব প্রয়োজন। কখন কী প্রয়োজন পড়ে তার কী কিছু ঠিক আছে? কিন্তু এনাদের তো ঠিক চিনলাম না? অবশ্য কিঞ্চিদধিক কাল পূর্বে অবনী ঘোষের পরিত্যক্ত গৃহের সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। তা মহাশয়দের কী সেই কারণেই আগমন?

আর পরিচয় লুকোবার কোন কারণ নেই। উত্তরটা এবার নীলই দিল,

—হ্যাঁ, নৃপেনবাবু। আপনার অনুমানটা ঠিকই। তার আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে দিই। আমি একটু রহস্যজনক বিষয় পেলে সেটি নাড়াচাড়া করে দেখতে ভালবাসি। আমার নাম নীল ব্যানার্জি। আর আমার পাশে যিনি বসে আছেন, ও দীপু। দীপঙ্কর। আমার সহকর্মী। মানস চৌধুরীকে তো আপনি আগেই চেনেন।

নৃপেন সাহা সামান্য সময় চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,

—তার অর্থ আপনি গোয়েন্দা। এবং কোন তদন্তে এসেছেন।

—আপনার এই অনুমানও ঠিক।

—কিন্তু স্মরণযোগ্য সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলে কোন অপরাধমূলক কাজ ঘটেনি। আমার অনুমানে সারা ভারতবর্ষে এমন শান্তিপ্রিয় স্থান খুব কমই আছে। তাছাড়া আমাদের এই ঘোষপাড়া, অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত। তারা অহিংসায় বিশ্বাসী। তাহলে?

—আমি কিন্তু আজ থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটি হত্যাকাণ্ডের রহস্য সন্ধানে এসেছি। পুলিস সে হত্যাকাণ্ডের ফাইল ক্লোজ করে দিয়েছে। কিন্তু তা দিয়ে তো আসল সত্যটুকু চিরদিনের জন্যে চাপা দিয়ে রাখা যায় না। সত্য একদিন প্রকাশ পায়ই।

নৃপেন সাহা মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, —কিন্তু বাঁড়ুয্যেমশাই, একটু আগেই তো বললাম, সে সব চুকেবুকে গেছে। আবার কেন অতীতকে তার গহ্বর থেকে তুলে আনা। যে ঘুমিয়ে আছে তাকে নিদ্রিত থাকতেই দিন না!

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীল জিগ্যেস করল, —ঘটনাটা ঘটেছিল আপনার পড়শির বাড়িতেই। এবং এ তল্লাটে আর কেউ এত কাছাকাছি থাকতেন না। এখনও নেই।

—হ্যাঁ। সে কথা এখানকার কাকপক্ষী সকলেই জানে। এই যে পাঁচিল ঘেরা অংশটি দেখছেন আমি আর অবনীদা একই সঙ্গে ক্রয় করেছিলাম। অবশ্য সেই নৃশংস ঘটনাটির পর এদিকটা তো শুনশান।

—পুলিস আপনাকে সন্দেহ করেছিল। এবং গ্রেপ্তারও করেছিল।

—করতেই পারে। পুলিসের হাতে আছে শাসনদণ্ড। তাদের সন্দেহমহিমা অপার। বিনা দোষে আজও অনেক নিরীহ প্রাণী কারান্তরালে দিনানিপাত করে। এমনও দেখা গেছে দশবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার পর জানা যায় সে আদপেই দোষী নয়। তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া দশটি বছর ফিরিয়ে দেবার কোন ক্ষমতাই আইনের হাতে নেই। যারা তাদের নির্বুদ্ধিতাই বলুন বা স্বেচ্ছাকৃত জালে ফাঁসানোই

বলুন, মানবতার কাছে সেই নির্বোধরাও তো এক ধরনের খুনি। তার শাস্তি কে দেয়? দিতে পারবে আপনাদের সমাজ? আপনাদের আইন?

নীল বলল, —খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। আর সেই কারণেই তো আপনার কাছে আসা। বিনা দোষে আপনাকেও তো বেশ কিছুদিন হাজতবাস করতে হয়েছিল। এটা আপনারও তো একটা সামাজিক দায় আসল অপরাধীকে খুঁজে বার করে আইনের হাতে তুলে দেওয়া। যাতে একই ভুল বারবার না ঘটে।

—কী জানতে চান আপনি?

—কী ঘটেছিল সেদিন?

—অতি অসম্ভব একটি প্রশ্ন করলেন। এ প্রশ্নের জবাব আমি কেমন করে দেব?

—একমাত্র আপনিই তো অবনী ঘোষের নিকট প্রতিবেশী?

—হ্যাঁ। নিকট প্রতিবেশী তো বটেই। কিন্তু আমার পক্ষে তো তাদের গৃহের দিকে সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

—আপনি কিন্তু একটু আগেই আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছিলেন।

—সেটা অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার প্রতিফল মাত্র। আমার শয়নকক্ষটি এই কক্ষের ঠিক ওপরেই। দ্বিপ্রাহরিক আহারাদির পর আমি আমার কক্ষে একটু পায়চারি করি। খোলা জানলা দিয়ে অকস্মাৎই আপনাদের দেখে ফেলি।

—তার মানে, পাঁচ পাঁচজন লোক পাশের চৌহদ্দির মধ্যে খুন হয়ে গেলেও আপনি তার বিন্দুবিসর্গ টের পাননি?

—এ কথা বারবারই আমি পুলিসকে জানিয়েছি। আমি ধর্মভীরু মানুষ। অহিংসায় বিশ্বাসী। এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ আমি এবং আমার গৃহের কারোপক্ষেই করা সম্ভব নয়। বৈষ্ণব ধর্মে হিংসার কোন স্থান নেই।

—অবনী ঘোষ মানুষটি কেমন ছিলেন? নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?

—ছিল বৈকি। অবনী ঘোষ প্রায় আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন।

—ওনার বাড়িতে আপনার যাতায়াতও ছিল।

—ছিল।

—বাড়ির অন্যান্যরা, যেমন ওনার স্ত্রী, ওনার মেয়ে, ছেলে বা ওনার মা, এঁরা কেমন লোক ছিলেন?

—কারো দুর্নাম করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে মায়াদি মানে অবনীদার স্ত্রী একটু মুখরা স্বভাবের মহিলা ছিলেন। সন্দেহপ্রবণাও বটে। এমন কী আমার স্ত্রীকেও উনি সন্দেহ করতেন।

—আপনার স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন? কেন?

—কারণ আমার স্ত্রী অত্যন্ত প্রিয়দর্শিনী মহিলা। এবং মিশুকে প্রকৃতির। ও গৃহের সকলের সঙ্গেই আমার স্ত্রী খুব আন্তরিক ভাবেই মেলামেশা করতেন। যেহেতু উনি

অবনীদার সঙ্গে একটু বেশি কথাবার্তা বলতেন, ফলে মায়াদির ধারণাই জন্মে গিয়েছিল অবনীদার সঙ্গে আমার স্ত্রীর নিশ্চয়ই কোন গোপন সম্পর্ক আছে। এই নিয়ে বেশ অশান্তিরও সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে আমার স্ত্রী ও গৃহে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

—কিন্তু আপনি তো অবনীবাবুর মেয়েকে পড়াতেন।

—হ্যাঁ। তখন আমার হাতে সময়ও ছিল। তাই—পড়াতাম তাকে।

—মায়াদেবী এত সন্দেহপ্রবণ মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে আপনার মতো এক রূপবান যুবকের কাছে পাঠাতে কোন দ্বিধাবোধ করতেন না? মানে আপনাকে উনি কোনরকম সন্দেহ করতেন না?

—তেমন মনোভাব তো কোনদিন নজরে পড়েনি। তাহলে নিজেই আমি ইস্তফা দিতাম।

—শর্মিষ্ঠা কী আপনার কাছে পড়তে আসতো, নাকি আপনিই তাকে পড়াতে যেতেন?

—তার কোন নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ছিল না। কোনদিন সে আসতো, কোনদিন আমিই যেতাম।

—শর্মিষ্ঠা আপনার কাছে কী পড়তো?

—বাংলা। বাংলায় ওর অনার্স কোর্স ছিল। আমিও বাংলা নিয়ে এম.এ. পাশ করেছিলাম। মানবজীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এবং প্রয়োজন কতটা এটাই প্রধানত আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল।

—ওই পরিবারের ওপর রাগ ছিল, এমন কেউ কী আপনার জ্ঞানে আছে?

নৃপেন সাহা বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন,

—শর্মিষ্ঠার সঙ্গে এক যুবকের অন্তরঙ্গতা ঘটেছিল। যুবকটি ওদেরই এক আত্মীয়। সম্ভবত মামাতো দাদা। সেই অন্তরঙ্গতা চূড়ান্ত স্থানে গিয়ে পৌঁছয়।

—তার মানে?

—হ্যাঁ ব্যানার্জিবাবু, কথাটা লজ্জাজনক হলেও এটাই সত্য। শর্মিষ্ঠা অন্তঃস্বত্বা হয়ে পড়ে। তাই নিয়ে তুমুল অশান্তি। অবনীদা ছেলেটিকে শাসায়। পুলিসে অভিযোগ জানানোর কথাও বলেন। সেই ছেলেটিও পাল্টা শাসায়। কোর্ট পুলিস করলে হেস্তনেস্ত করার হুমকিও দেয়। ঝাড়ে বংশে নির্মূল করে দেবার শাসানিও দেয়।

—থানা পুলিস কী হয়েছিল?

—জানি না। আর এই ঘটনার পর স্বাভাবিক কারণেই আমি আর শর্মিষ্ঠাকে পড়ানোর উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। সম্ভবত আর আমাদের কোন সাক্ষাৎ ঘটেনি।

—আপনার কী মনে হয় সেই ছেলেটিই যে ঝাড়ে বংশে ঘোষ পরিবারকে বিনাশ করার হুমকি দিয়েছিল, সেই এ কাজ করতে পারে?

—এটি বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনুসন্ধানের কাজ আপনাদের।

—ছেলেটি কোথায় থাকে?

—আমার অজ্ঞাত।

—আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কী একটু কথা বলা সম্ভব?

ম্লান হাসলেন নৃপেন সাহা। বললেন, —কার সঙ্গে কথা বলবেন? এক অপ্রকৃতিস্থ মহিলার সঙ্গে?

—অপ্রকৃতিস্থ? মানে—

—পাশের বাড়িতে পাঁচ পাঁচটি জলজ্যান্ত মানুষ নৃশংসভাবে খুন হওয়ার সংবাদ পাওয়া এবং পরপর চোখের সামনে দিয়ে তাদের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া, এ দৃশ্য প্রতিমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি। তার পর থেকে ধীরে ধীরে ওর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে থাকে। এখন তো বদ্ধ উন্মাদ।

—উনি কী সর্বদাই ঘরে থাকেন?

—রাখতে আর পারি কই? বর্তমানে আমার পুত্রই আমার ব্যবসা দেশাশুনো করে। আর বউমা আমার দুষ্টু নাতিকে সামলাতেই ব্যস্ত। আর আমার পক্ষে এই বয়সে একমাত্র ধর্মাচরণ ছাড়া কিছুই করার নেই। তবে সবার অজ্ঞাতে গৃহ হতে নির্গত হলেও বেশিদূর কোথাও যায় না। ফিরে আসে অল্পক্ষণের মধ্যেই। এই কারণেই তো সর্বক্ষণ গৃহের সদর দরজাটি ভিতর থেকে তালাবন্ধ থাকে। আর ঘনশ্যামকেও বলা আছে তার মা জননীকে একটু চোখে চোখে রাখতে।

হঠাৎ একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করল নীল, —আপনার স্ত্রীর পায়ের মাপ কী চার? মানে উনি কী চারনম্বর সাইজের জুতো বা চটি পরেন?

বোকা বোকা মুখে নীলের মুখের দিকে তাকিয়ে নৃপেন সাহা বললেন,

—ভারী অদ্ভুত প্রশ্ন তো? চার কী পাঁচ জানা নেই? তবে আমার স্ত্রীর পদযুগল অতীব সুন্দর এবং ছোটখাটো মানুষ। স্বাভাবিক কারণেই পায়ের মাপটিও ছোট। কিন্তু হঠাৎ এই অদ্ভুত প্রশ্ন কেন?

—কি জানি কেন, হঠাৎ মনে হল তাই প্রশ্নটা করলাম। উনি সম্ভবত একটু সেকেলে ধরনের, তাই না?

—এটিও অদ্ভুত প্রশ্ন। তবু বলি, হ্যাঁ খুবই প্রাচীনপন্থী। এখনও সিঁথি ভরাট করে সিঁদুর পড়েন। কস্তাপাড় শাড়ি পড়েন। শাঁখা লোহা পড়েন। পূজা পার্বণে উপবাস করেন।

—পায়ে আলতাও পড়েন নিশ্চয়ই?

—অনেকদিন প্রতিমার পায়ের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। তবে পড়ে। কারণ আগেও নিত্য আলতা পড়ত। অবশ্য আলতা পায়ে মহিলাদের আমারও বেশ লাগে। পদযুগল একটা অন্য মাত্রা পায়।

—ঠিক আছে নৃপেনবাবু, আপাতত আর একটি প্রশ্নই করার আছে। স্মরণ করে বলতে পারবেন কী, বেস্পতি নামে কোন রাঁধুনি আপনার বাড়িতে কোনদিন রান্না করতে আসতো কী? এই নামে কাউকে চিনতেন নাকি?

—নাম বেস্পতি কিনা জানি না। একটি রান্নার মেয়ে ছিল। তবে আমার বাড়িতে তো নয়। রন্ধনকার্যটি বরাবরই আমার স্ত্রীই করতেন। মেয়েটি অবনীদার বাড়িতে আসতো। অবনীদার রান্নাবান্না সব ওই করতো।

—কিন্তু সেই মেয়েটি ওই একই দিনে নিহত হয়।

—শুনেছিলাম। কিন্তু সেটিতো একটি ভিন্ন ঘটনা।

—তাইতো। তাইতো। ঠিক আছে, আপনার দুপুরের বিশ্রামটা নষ্ট করে দিলাম। সত্যিই আমি দুঃখিত। আজ আসি।

—কিছু জলগ্রহণ করে যাবেন না?

—আপনার ঘনশ্যাম সে পর্বটি সম্পন্ন করে দিয়েছে। আমপোড়ার সরবৎ। খুবই সুস্বাদু। আজ তাহলে আসতে আজ্ঞা দেওয়া হোক।

—বিলক্ষণ বিলক্ষণ।

—দরকার হলে আবার যদি বিরক্ত করি—

—বিলক্ষণ। বিলক্ষণ। গরীবের আস্তানা সর্বদাই খোলা থাকবে। সামনেই দোল পূর্ণিমা। একটু মহাপ্রভুর নামকীর্তন করি। এলে বাধিত হব।

—কারো আমন্ত্রণ আমি চট্ করে প্রত্যাখ্যান করি না। আসব।

সাত

বাইরে তখন ঠা ঠা রোদ। ফাল্গুনের দুপুর। চারদিকে পলাশ আগুন ছড়িয়েছে। কলকাতায় কোকিল ডাকে না। এখানে ডাকে। মাঝেমাঝেই ডাকছে। বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ। একদিক ক্ষেতি জমি তারই পাশ দিয়ে পা চলার পথ। দীপু কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। মানস বললেন,

—না মিস্টার দীপু, এখন আর কোন প্রশ্ন নয়। মাথার চাঁদি ফেটে যাচ্ছে। আগে বাড়ি চলুন। এতক্ষণে শ্রীরূপার রান্না শেষ হয়ে গেছে। আগে জম্পেশ করে খাওয়া তারপর যে যার প্রশ্ন।

তাই হোল। দ্রুত মেঠোরাস্তা ভেঙে ওরা চলে এল মানসের বাড়িতে। শ্রীরূপা মহিলাটিও বিকাশপত্নী মণিদীপার মতোই। সহজ সরল। ওইটুকু সময়ের মধ্যে অনেক কিছু রেঁধে ফেলেছেন। সরু চালের ভাত। মাছের মাথা দিয়ে ডাল। কুমড়ো ফুলের বড়া। ইঁচড়ের ডালনা। পোনামাছ ভাজা। বড় বড় ট্যাংরা মাছের ঝাল। শেষ পাতে কাঁচা আমের চাটনি আর দই।

বহর দেখে নীল বলল, —বিকাশবাবুর স্ত্রীকে আমি বৌঠান বলি। অবশ্য দীপু বলে মাসিমা। কিন্তু শ্রীরূপা, তুমি আমার থেকে অনেক ছোট। আপনি টাপনি বলতে পারছি না। নাম ধরেই ডাকব। আপত্তি নেই তো?

শ্রীরূপা বেশ সপ্রতিভ। বলল, —বেশ তো, দাদা, আপনার যা ইচ্ছে তাই বলে ডাকবেন।

—তাহলে প্রথম কথাটাই বলব, —তুমি কী দশভূজা?

—একথা কেন বলছেন দাদা?

—কখন করলে এত সব? মণি বৌঠানও এই রকম। খাওয়াতে পারলে আর কিছু চান না। কিন্তু এত তো খেতে পারব না।

—তা বললে তো চলবে না দাদা। তবু একটা জিনিস মিস্ হয়েছে। একটু মিষ্টি আনা গেল না।

—দোহাই শ্রীরূপা, ভাগ্যিস ওটি করনি। ফেলা যেত। বয়স বাড়ছে। মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করে দিতে বলেছে ডাক্তার। আর এ ব্যাপারে আমার স্ত্রী খুবই স্ট্রিক্ট্।

মানসের দিকে তাকিয়ে শ্রীরূপা বলল, —শুনেছ দাদার কথা। বৌদির হুকুমে দাদা কীরকম খাওয়ার ওপর কন্ট্রোল করেছেন। তোমার যা খাবার বহর এবার আমাকেও বেত হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

দীপু বলল, —দিদিভাই। দাম্পত্য কলহটা এখন যদি উহ্য রাখেন তাহলে খুব ভাল হয়। মানসদা খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ছেন। উনি হয়তো আধপেটা খেয়ে উঠে যাবেন।

খাওয়া পর্ব শেষ হবার পর নীল পালাতেই চাইছিল। কিন্তু মানস ধরে বসালেন, —মিস্টার ব্যানার্জি, আমার যে অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল। আপনার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনার মগজে কিছু ব্যাপার ঘুরপাক খাচ্ছে। একটু আলোকপাত করুন। আর কিছু না হোক চব্বিশ পঁচিশ বছর ধরে ধামাচাপা একটা রহস্য যদি উদঘাটিত হয়, এবং আমার থানা এলাকায়—

নীল একটু হেসে বলল, —সেভাবে এখনও কিছু ভেবে উঠতে পারিনি। তবে দু একটা প্রশ্ন একটু ভাবাচ্ছে।

—যেমন?

—চটিটা ঠিক করে রেখেছেন তো?

—বলতে?

—প্রথম প্রশ্ন চটিটা কার?

—আপনার কী মনে হয়?

—নৃপেন সাহার স্ত্রী, যদিও আমরা তাঁকে দেখিনি, কিন্তু তিনি, অ্যাকর্ডিং টু নৃপেন সাহাজ ভার্সন, মিসেস সাহা পাগল। মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যান। কোথায় যান? ঘোষ বাড়ির জংলা পুকুরের ঘাটে পাওয়া চটিটা যদি মিসেস সাহার হয়, তাহলে তাঁর ওখানে যাতায়াত আছে।

—ধরুন, যাতায়াত আছে। পাগলের খেয়াল। যেতেই পারেন। এবং নিজের চটি ফেলেও আসতে পারেন। পাগলের বোধবুদ্ধি কম। তা দিয়ে কী প্রমাণ হতে পারে?

—প্রমাণ এখন কিছুই করা যাচ্ছে না। এখন কেবল প্রশ্ন ঘোষবাড়ির প্রধান ফটকের কড়ায় লাগানো তালাটা এত পরিষ্কার কেন? ওটা পুলিসের লাগানো তালা নয়। আই অ্যাম সিওর। তারওপর দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকলে অবশ্যই চাবির গর্তে ময়লা জমবে। না, জমেনি। তার মানে কী ওটা ব্যবহার করা হয়? বা হচ্ছে? যদি হয় সেটা করছে কে? নৃপেন সাহার বাড়ির কেউ? যদি আমার মনে হওয়াটা স্বাভাবিক হয় তাহলে সে একাজটা করছে কেন? ও বাড়ির মধ্যেও কী কোন রহস্য লুকিয়ে আছে?

মানস বললেন, —ওরে বাবা, আপনি তো প্রশ্নের ঝড় তুলে দিলেন।

—প্রশ্নগুলো নিজের কাছেই করুন। উত্তরগুলো পাবার চেষ্টা করুন। হয়তো অনেক জট খুলে যেতে পারে।

মানস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, —আর কিছু?

—হ্যাঁ, আরও একটা প্রশ্ন আছে। কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

—প্রশ্নটা কী?

—বিজয়ের মা, আই মিন বেস্পতি, সেদিন বিকেলে কাজ করতে এসেছিল। কিন্তু তার যাবার কথা সন্ধের পর। এ ছাড়াও, সত্যিই কী তালাবন্ধ দেখে ফিরে গিয়েছিল? ভাঁড়ভর্তি রসগোল্লা? কী কেউ তাকে দিয়েছিল? নাকি সে ময়রার দোকান থেকে কিনেছিল? ক্যাডবেরি চকোলেট নিয়ে গিয়েছিল ছেলের জন্যে? কেনা? না কারো দেওয়া? কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছিল, পাওয়া গিয়েছিল কিছু প্রসাধনের সামগ্রী। নিজেই কিনেছিল, নাকি কেউ দিয়েছিল? যুক্তিবাদী মন নিয়ে চিন্তা করলে একটা জিনিসই পরিষ্কার হয়, সেদিন সে দমকা কিছু টাকা হাতে পেয়েছিল, যা দিয়ে আমি ধরে নিচ্ছি সে ওই সমস্ত জিনিস নিজেই কিনেছিল। তার মানে কেউ তাকে টাকা দিয়েছিল।

মানস বললেন, —সেটাই সম্ভব।

—আরও একটা ব্যাপার ভেবে দেখুন, আজ থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে বারশো সাড়ে বারশো টাকার মানি ভ্যালু কিন্তু খুব একটা কম নয়। আজকের দিনে একজন রাঁধুনির মাইনে মিনিমাম পাঁচশো টাকা। কিন্তু বিশ পঁচিশ বছর আগে সেটা ভাবা যেত না। ওইরকম একজন ঝুপড়িবাসীর ঘরে অতগুলো টাকা আসে কীভাবে?

—ইউ আর কারেক্ট।

—টাকাটা সে কোথায় পেল? পাঁচ বাড়ির কাজ করে সে কত টাকা রোজগার করতো? হঠাৎ বিলাসিতা করার মতো টাকা নিশ্চয় সে জমাতেও পারতো না।

—কিন্তু এসব উত্তর আজ তো আর পাবার উপায় নেই। মেয়েটাই তো মারা গেছে।

—ইয়েস। হিয়ার ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট। ওই একই দিনে বেস্পতি নিজের ঘরে খুন হয়। একই ধরনের অস্ত্রে। তার মানে খুনি একজনই। কিন্তু সে বেস্পতিকে খুন করবে কেন? তবে কী বেস্পতির সঙ্গে এই পাঁচ পাঁচটি হত্যাকাণ্ডের কোন যোগসূত্র আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে এমন কারো সঙ্গে থাকবে, যার সঙ্গে বেস্পতির কোন লেনদেনের সম্পর্ক ছিল।

—সেটা কী হতে পারে?

—বলা খুব মুশকিল। যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতো তাকে আর কোনদিন পাওয়া যাবে না।

—হুঁ, মানস বললেন, —আপনি কী কিছু সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন?

—নাহ্। কারণ সব ক্ষেত্রেই উত্তর পাবার মতো কোন মিশিং লিঙ্ক নেই।

—তাহলে তো রহস্য যে তিমিরে সে তিমিরেই। ইনভেস্টিগেট করে লাভ?

ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি টেনে নীল বলল, —নীল ব্যানার্জির কোষ্ঠিতে একটা কথাই লেখা আছে, ছাই দেখলেই উড়িয়ে দেখ। অরূপরতন মিললেও মিলতে পারে।

—আপনার তাই বিশ্বাস?

—ঈশ্বরে আপনার নিশ্চয়ই বিশ্বাস আছে?

—আছে।

—কোন অলৌকিক তত্ত্বে আমার বিশ্বাস নেই। আমার বিশ্বাস যুক্তির চুলচেরা অঙ্কে। সেটা মিলে গেলেই বুঝতে পারবেন আমার বিশ্বাস ঠিক পথে এগোচ্ছে কিনা।

—তার মানে রহস্যকে আপনি উন্মুক্ত আলোয় নিয়ে আসবেনই।

—চেষ্টা তো করব।

মানস বলল, —উইস ইউ বেস্ট অব লাক।

—কিন্তু আপনার সাহায্য আমার যে দরকার।

—আমি কথা দিচ্ছি যে কোন প্রয়োজনেই আমি আপনার পাশে থাকব।

—তাহলে আপনার প্রথম কাজ একটিই। আপনি তালার গায়ে লেগে থাকা হাতের বা আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করুন। ল্যাব বলে দেবে সে ছাপ পুরুষের না মহিলার। সে ফিঙ্গার প্রিন্ট কত দিনের পুরনো? এটা জানতে পারলে কাজটা কিন্তু অনেকটাই এগোবে।

—আপনি যা চাইছেন সেটা কয়েকদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। আর কিছু?

—এখানে কোন হোটেল, আই মিন কোন থাকা খাওয়ার জায়গা পাওয়া যাবে?

—এটা কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি প্রকারান্তরে আমায় খাটো করে দেখা। আমার এলাকায় আপনি এসেছেন একটা পুরনো রহস্যের সমাধান করতে। প্র্যাকটিক্যালি রহস্যভেদ হলে আমিও তো কিছু উপকৃত হব। আমাকে একটা রেসপনসিবিলিটি নিতে দিন। তার ওপর আপনি বিকাশদার বন্ধু। কেন, আমার গরীবখানায় আপনাকে একটু থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারব না?

—আপনার স্ত্রীর ওপর একটু জুলুম হয়ে যাবে না?

—না। আমার স্ত্রী মণিদীপাদির বোন। সমান অতিথিবৎসল। সে বরং খুশিই হবে। বলুন, কবে থেকে আপনি আসছেন?

—তালার ব্যাপারটা আগে মেটান। আর রথীন সরকারের ঠিকানা আমার চাই। পাওয়া যাবে কী?

—চলুন। আমি দিয়ে দিচ্ছি। থানার রেকর্ডবুকেপুরনো ওসিদের সব ঠিকানা আছে। তবে রথীন সরকার কিন্তু রিটায়ার করেছেন। কলকাতায় নাও থাকতে পারেন।

—তবু। ঠিকানাটা পেলে একবার চেষ্টা করে দেখব।

আট

রজনী ভট্টাচার্য লেনের বাড়িতেই পাওয়া গেল রথীন সরকারকে। প্রায় পঁয়ষট্টি ছেষট্টির মতো বয়েস হবে। বয়েস হলেও চেহারাটা এখন বেশ মজবুত। নীলের পরিচয় পেয়ে রথীনবাবু বললেন, —হ্যাঁ। আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনি তো রীতিমতো বিখ্যাত লোক। তা হঠাৎ এই অধমের কাছে কেন?

—একটা বিশেষ দরকারে আপনার যে একটু সাহায্য চাই মিস্টার সরকার।

—কিন্তু, রথীনবাবু বললেন, —আমি তো প্রায় বছর ছয় হোল রিটায়ার করেছি। আর মনে প্রাণে চেষ্টা করি চোর ছ্যাঁচোড়, খুনি গুণ্ডাদের কার্যকলাপ নিয়ে কিছু না ভাবতে। পুলিস হিসেবে সৎ থাকার চেষ্টা করেও সবসময় সৎ থাকতে পারিনি। অনেক সময় বাধ্য হয়ে ঘুষের ভাগ নিতে হয়েছে। না হলে আমাকে কোন সূদূর গ্রামান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হত। অথবা আমার লাশটা খুঁজে পাওয়া যেতো কোন এঁদো জঙ্গলে। এখন পাপস্খলনের চেষ্টা করছি। ধর্মকর্ম নিয়ে সময় কাটাই। আর রবীন্দ্রনাথ পড়ি। অত বড় মাপের ফিলসফার খুব কম জন্মেছেন। সে যাক, এরপর বলুন, আপনাকে আমি কী ভাবে সাহায্য করতে পারি।

—একটি বিশেষ রহস্যময় ঘটনা, একই পরিবারে একই দিনে পাঁচজন খুন হয়েছিলেন। কল্যাণী সীমান্তে থাকাকালীন যার তদন্ত আপনি শুরু করেছিলেন, মনে আছে কী সে কেসটার কোন কথা?

সরকার মশাই নীলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, —আপনি কী আবার কেঁচো খুড়তে চাইছেন? সাপটি কিন্তু অনেক গভীরে।

—সাপটিকে চেনেন আপনি?

—চিনি। বেদের হাতটা সেখানে পৌঁছেও ছিল। কিন্তু কোথাও একটা অদৃশ্য সুতো আছে। শেষ পর্যন্ত ফাইলটা ক্লোজ করে দিতে হয়েছিল।

—আপনারা তো নৃপেন সাহাকে অ্যারেস্ট করেছিলেন?

—কিন্তু প্রমাণ কোথায়? সেই একই রাতে আসল প্রমাণটাকেই তো শেষ করে দেওয়া হল।

—আসল প্রমাণ মানে?

—বেম্পতি বলে একটা মেয়ে। সেই রাতে তাকেও তো খুন করা হয়েছিল।

—তার মানে আপনি বলতে চাইছেন বেম্পতিও ঘোষবাড়ির খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিল?

—না। বেম্পতিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। এটা আমার অনুমান। বেম্পতি ঘোষ

বাড়িতে রান্নার কাজ করতো।

—হ্যাঁ সেটা জানি। কিন্তু বেম্পতি যে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল এটা আপনি অনুমান করছেন কী ভাবে? বেম্পতিকে ইন্ট্যারোগেট করার সময়ই তো আপনি পাননি।

—মিস্টার ব্যানার্জি, চার্জশিট আমি তৈরি করতে পারিনি। কারণ অনেক লিঙ্ক মিসিং। তবে আমি দুজনের নাম বলতে পারি। তাদের একটু নেড়ে চেড়ে দেখুন। রিয়েল স্টোরিটা পেয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ কেন ঘোষবাড়ির পাঁচজনকে খুন করা হোল? কেন বেম্পতি সে রাতে মার্ডার হোল? খুনির মোটিভটাই বা কী?

—মোটিভটা আপনি জানতে পারেননি?

—একটু আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। সুত্রগুলো আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। অবনী ঘোষের একটা পাস্ট ছিল। উনি রাজনীতি করতেন। এম এল এও হয়েছিলেন। নৃপেন সাহাও অবনী বাবুর দলের লোক। অবনী ঘোষের জুনিয়র। অবনী ঘোষের একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। শর্মিষ্ঠা ঘোষ। নৃপেন সাহা লোকটি সুবিধের লোক নন। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে একটা ইললীগ্যাল অ্যাফেয়ার্সও ছিল। মেয়েটি নাকি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছিল। অবশ্য ফোরেনসিক রিপোর্ট তাই বলেছে।

কিন্তু এর মধ্যে শর্মিষ্ঠার এক প্রণয়ী জোটে। নৃপেনের তখন দুটো অশান্তি। এক নম্বর মিসেস সাহা এটা ভাল চোখে মেনে নেননি। আবার প্রণয়ী জোটার জন্যে শর্মিষ্ঠার মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। নৃপেন সাহাকে সন্দেহ করার তিনটি কারণ ছিল। প্রথম দুটো তো বললাম। গৃহ অশান্তি, প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ভাইট্যাল যেটা সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল পাওয়ার জিলাসি। হয়তো সবগুলো নিয়ে একটা মোটিভ, অথবা এর যে কোন একটা মেইন মোটিভ।

—বেশ তাই যদি হয়, নৃপেন সাহার রাগ থাকবে অবনী ঘোষ আর শর্মিষ্ঠা ঘোষের ওপর। বাট হোয়াই অবনী ঘোষের স্ত্রী, মা এবং বছর বারোর একটা ছেলের ওপর?

—এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে কয়েকজনকে নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে।

—তারা কে কে?

—নৃপেন সাহার বাড়িতে একজন কাজের লোক আছে। বাইরের পরিচয় কাজের লোক। হ্যাঁ ওই কাজের লোকটিই হচ্ছে ওর ডানহাত।

—আর?

—শর্মিষ্ঠা একটি ছেলেকে ভালবাসতো। খুব সম্ভবত তার নাম ছিল পলাশ। পলাশ সম্বন্ধে এর বেশি কিছু জানা যায়নি। ঘটনার পর থেকে সে নিপাত্তা। কলকাতার এই জনঅরণ্যে কে এক পলাশ তাকে কী আর খুঁজে পাবেন? যাই হোক, সেটা আপনার ব্যাপার।

—তারপর?

—নৃপেন সাহার মেয়ে। মেয়েটি সম্ভবত বাপের বিরুদ্ধে কিছু স্টেটমেণ্ট দিয়েছিল। প্র্যাকটিক্যালি ওই স্টেটমেণ্টের ওপর নির্ভর করে আমরা নৃপেন সাহাকে অ্যারেস্ট করি।

কিন্তু মেয়েটি পরে উল্টোপাল্টা বকা শুরু করে।

—উল্টোপাল্টা মানে?

—যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল সেটা নাকি সে পুলিসের জুলুমে বলতে বাধ্য হয়েছিল।

—হুঁ। মহিলা এখন কোথায় থাকেন?

—নৃপেন সাহা ছাড়া পাবার পর তড়িঘড়ি মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দেয়। কলকাতারই কোন এক ডাক্তারের সঙ্গে।

—ঠিকানা জানেন না।

—আমি আর জানার চেষ্টা করিনি।

—আর কে আছেন?

—নৃপেন সাহার স্ত্রী।

—কিন্তু উনি তো পাগল।

—সত্যিই কি উনি পাগল?

—পাগল নয় বলছেন?

—বাজিয়ে দেখুন।

—আর একটা ইনফরমেশন দিন। ঘোষবাড়িতে মার্ডারগুলো হয় কখন?

— পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে দুপুর তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে।

—নৃপেন সাহা তো পরম বৈষ্ণব। শুনলাম বাড়িতে প্রায়ই কেত্তনের আসর বসে।

—ফাইলটা ক্লোজ হয়ে যাবার পর লোকটা হঠাৎই বদলে যায়। কে জানে এটা ওর ভেক কিনা? তবে ও যে পার্টিতে বিলঙ করতো সম্ভবত পার্টি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এটাও আমার কাছে একটা রহস্য। যে কোন পলিটিক্যাল পার্টিতে এ ধরনের কিছু লোক থাকে। এখনও আছে। পার্টি সেখানে চোখ বুজিয়ে থাকে। কিন্তু নৃপেন সাহাকে পার্টি শুধু এক্সপেল করে ছেড়ে দিল কেন সেটা আমার জানা হয়নি। আপনি যখন নতুন করে তদন্তে নামছেন এটারও খোঁজ নিন।

নীল উঠে পড়ল। —মিস্টার সরকার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিছু মূল্যবান তথ্য আমায় দিলেন। দরকার হলে আবার বিরক্ত করব। আজ চলি।

বেরবার মুখে সরকার বললেন, —লোকটা কিন্তু কালসাপ। যা করবেন সাবধানে। ওর ছোবল কিন্তু মারাত্মক।

হাসতে হাসতে নীল বলল, —আপনার সতর্ক বাণীর জন্যে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি অ্যালার্ট থাকব।

নয়

দিনকয়েক পর একদিন সন্ধের দিকে বিজয় এসে হাজির। ওকে দেখে নীল বলল, —বোস।

মনে মনে আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সোফায় বসতে বসতে বিজয় বলল, —কাকু, আমিও কয়েকদিন ধরে আসার চেষ্টা করছি। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন পুলিসের চাকরি। যখন তখন তো আসা যায় না। শুনলাম আপনি কল্যাণী সীমান্তে গিয়েছিলেন। তা কদ্দুর কী হল সে জানার খুব ইচ্ছে করছে।

—সেটা ঠিক সময়েই জানতে পারবে। কিন্তু কয়েকটা ইনফরমেশন দিতে, হয় তুমি ভুলে গেছ, নয়তো তোমার স্মরণে নেই।

—বলুন কাকু, তখন আমি খুব ছোট। হয়তো আমার মনে নেই এমনও হতে পারে। আপনি প্রশ্ন করুন, আমি মনে করার চেষ্টা করছি।

—খুব ভাল করে মনে করার চেষ্টা কর, তোমার মা যেদিন খুন হন, সেদিন কখন বাড়ি ফিরেছিল, বিকেলে না সন্ধের পর? খুব ভাল করে চিন্তা কর।

—রেল লাইনের ধারে কিছুটা জায়গা ফাঁকা ছিল। আমারই সমবয়েসি কিছু ছেলে মিলে রবারের বল নিয়ে খেলছিলাম। তারপর বাড়ি ফিরে আসি। কে একজন বোধহয় খবর দিয়েছিল আমার মা ঘরে ফিরে এসেছে। আমাকে খুঁজছে। তখনই খেলা ফেলে চলে আসি। তখনও সন্ধে হয়নি।

—বেশ, তুমি ঘরে ফিরে আসার পর...তোমার মা কী তোমায় কিছু খেতে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ কাকু। হ্যাঁ মনে পড়ছে। মা অনেকগুলো রসগোল্লা এনেছিল। ভাঁড়ে করে।

—এর আগে কী কোনদিন এতগুলো রসগোল্লা এনেছিল?

—না তো। যে বাবুদের বাড়িতে রান্না করতো, সেখান থেকে রাতের খাবারটা হয়ে যেতো। কিন্তু এত মিষ্টি...মানে বড় ভাঁড়ে, নাহ্। মাঝে মাঝে এক আধদিন দু'একটা মিষ্টি কী লজেন্স কিনে আনতো।

—আরও একটা জিনিস এনেছিল। সেটাও খাবার জিনিস। মনে কর, কী সেটা?

—আরও একটা? নাহ্, ঠিক মনে পড়ছে না।

—ছোটছেলেদের খুব প্রিয় খাদ্যবস্তু?

বিজয় খুব গভীরভাবে চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, —আপনি নিশ্চয়ই কিছু হিন্ট্‌স্ পেয়েছেন। একটু ধরিয়ে যদি দেন।

—কোন চকোলেট?

—ওহ্ মাই গড, চকোলেটের কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিল না। মা সেদিনও চকোলেট এনেছিল। আমার হাতে চকোলেটটা দিয়ে মা বলেছিল, একদিনে সবটা খেও না। আজ অর্ধেক খাও, বাকিটা কাল খাবে।

—জাস্ট আ মিনিট। তুমি বললে মা সেদিনও চকোলেট এনেছিল। তার মানে এর আগেও তোমার জন্যে তোমার মা চকোলেট আনতো।

—ওই যে বললাম। মাইনে পেলে মা প্রতিমাসেই আমার জন্যে টফি নিয়ে আসতো।

আসলে আমি তো খুব বায়না করতাম। কিন্তু অতবড় চকোলেট এর আগে তো কোনদিন আনেননি।

—কিন্তু তোমার মায়ের মার্ডারটা হয়েছিল মাসের আঠারো তারিখ। পুলিসের খাতায় সেই হিসেবই লেখা আছে। এবং সেই দিনে দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে ঘোষবাড়িতে মার্ডারগুলো হয়। যদিও লাশ পাওয়া যায় তিনদিন পর।

—আপনি ঠিক কী মিন করছেন কাকু?

—পরদিন পুলিস তোমাদের ঘর সার্চ করে কয়েকটা জিনিস পায়, যেগুলো প্লীজ ডোণ্ট মাইন্ড, তখন তোমাদের যা লিভিং স্টেটাস ছিল, তাতে করে ওই সব বস্তু পাবার কথা নয়।

—সেগুলো কী?

—কিছু কসমেটিকস্, একটা পারফিউমের বট্ল্, নতুন শাড়ি, ব্লাউজ, তোমার একটা নতুন শার্ট এবং নগদ টাকা। প্রায় সাড়ে বারশো টাকা। তোমার কী মনে হয় এই টাকাটা তোমার মা জমিয়েছিলেন?

—কাকু, এই মুহূর্তে আমার যেটুকু মনে আছে, মায়ের একটা পয়সা জামাবার ভাঁড় ছিল। কিন্তু দু তিন সপ্তাহ আগে সেটা ভাঙা হয়েছিল।

—ঠিক মনে আছে, ভাঙা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। সেটা আমার জন্যেই। সম্ভবত আমার খুব জ্বর হয়েছিল। জ্বরটা কিছুতেই ছাড়ছিল না। সবাই বলল, কোন ভাল ডাক্তার দেখাতে। তা সে সময় কমল মেসো কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তাতেও হয়নি। তখন মা বাধ্য হয়ে ভাঁড় ভেঙেছিলেন।

এত ডিটেল্সে মনে থাকার কারণ আমি ঘুড়ি লাটাইয়ের বায়না করার জন্যে মা বলেছিলেন আমার জ্বর সেরে গেলে ওই ভাঁড় ভেঙে আমার জন্যে ঘুড়ি লাটাই কিনে দেবেন। জ্বর থেকে সেরে ওঠার পর আমি ফের ঘুড়ি লাটাইয়ের বায়না করায় মা বলেছিলেন আবার ভাঁড় কিনে এনে পয়সা জমিয়ে ঘুড়ি লাটাই কিনে দেবেন।

—তার মানে ওই সময় তোমার মায়ের কাছে সাড়ে বারশো টাকা থাকতে পারে না।

বিজয় বলল, —হ্যাঁ কাকু। সেটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে মা অত টাকা পেয়েছিলেন কোথা থেকে?

নীল বলল, —এটা তো মিলিয়ান ডলার কোশ্চেন। আচ্ছা বিজয়, এই পাঁক ঘাঁটতে গিয়ে যদি অনাকাঙ্খিত কিছু সত্য উঠে আসে, সেটা সহ্য করতে পারবে তো?

—আপনি কী আমার মায়ের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইছেন?

—আমার এই মুহূর্তে যেটা মনে হচ্ছে, তোমার হয়তো সেটা শুনতে খারাপ লাগবে। বাট ট্রুথ ইজ ট্রুথ। অপ্রিয় হলেও সেটা সত্যি।

—আপনি বলুন কাকু। আমি সব সহ্য করতে পারব।

—হয় তোমার মা কারোর দ্বারা ট্র্যাপ্ড্ হয়ে পড়েছিলেন। অনটনের সংসার। কিছু

টাকার লোভে কোন দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়ে এমন কিছু কাজ করেছিলেন, অথবা কারো দুষ্কর্মের সাক্ষী হয়ে পড়েছিলেন যার পরিণাম তার মৃত্যু।

—আমি তো সেই লোকটাকেই খুঁজে পেতে চাইছি কাকু।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নীল বলল, —বড় হয়ে তুমি কী কোনদিনও ঘোষবাড়ির দিকে গিয়েছ?

—দু একবার গিয়েছি। কিন্তু সেটাই তো হন্টেড্ হাউস। পোড়োবাড়ি হয়ে আছে।

—নৃপেন সাহার বাড়ি গেছ কোনদিন?

—নাহ্। কিন্তু ওই দুটো বাড়িতে যাওয়ারও তো আমার কোন ইচ্ছে বা কারণ নেই। এর সঙ্গে কী আমার মায়ের মৃত্যুর কোন যোগসূত্র আছে?

—থাকতেও তো পারে। তোমার মাকে ঘোষবাড়িতে রোজ যেতে হত।

—আমি তো এদিকটা ভেবেই দেখিনি।

প্রসঙ্গ পাল্টে নীল জিগ্যেস করল, —পলাশ, এই নামটা কোনদিন শুনেছ? না পলাশ নামে ফুল নয়, একজন লোকের নাম?

—আমাদের ওদিকে মানে কল্যাণী সীমান্তে পলাশ নামে কারো নাম শুনিনি। অবশ্য কল্যাণীতে তারপর আর কতদিনই বা ছিলাম? বছর দু আড়াইয়ের মধ্যে কমলমেসো চাকরি পেয়ে যান। আমরা চলে আসি আগরপাড়ায়।

—ঠিক আছে। পলাশ নামটা খুব একটা কমন্ নাম নয়। এই নামে বছর পঞ্চাশের মধ্যে যদি কোন লোকের সন্ধান পাও জানিও। যদিও এভাবে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু—। লোকটা খুব ইমপট্যান্ট্। অন্তত এই কেসে।

—অলরাইট কাকু। আমার মনে থাকবে। কোন সারনেম?

—নাহ্ পাইনি।

—নীলকাকু আমি খুবই লজ্জিত। আমার জন্যে আপনাকে এত ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে? আর আমার চাকরিটা এমন যে আপনার সঙ্গে থেকে আপনার পরিশ্রম একটু লাঘব করতে পারব, তারও কোন জো নেই।

হাসতে হাসতে নীল বলল, —তোমার বিব্রত হবার কোন কারণই নেই। এটা ঠিকই যে একজন সঙ্গী পেলে আমার একটু সুবিধেই হত। ইদানীং দীপু একটু অন্যভাবে ব্যস্ত হয়ে গেছে। ঠিক আছে তুমি এসব নিয়ে চিন্তা করো না।

বিজয় চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপু চলে এল। নীল হাত ঘড়িতে দেখল আটটা বেজে গেছে। নীল জিগ্যেস করল, —তোর ব্যবসা কেমন চলছে?

—ওহ্ ফাইন। বউদি ফেরেনি?

—হ্যাঁ। বিশ্রাম করছে বলে আর ডাকিনি ওকে। কেন নন্দিনীর সঙ্গে খুব দরকার নাকি?

—একটু দরকার তো ছিলই। আসলে কী জান, এ দরকারটা তোমাকেও জানানো উচিত।

—কী রকম?

—প্রভাতবাবুর কিন্তু অনেক বয়স হয়ে গেছে।

—প্রভাতদা কিছু বলছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ। উনি এবার ছুটি চাইছেন। গত সপ্তাহেই আমাকে বলছিলেন। আসেন তো সেই বারাসত থেকে। প্রায় সত্তরের কাছে বয়েস। তার ওপর হাইসুগার। প্রেসারও আছে। সংসার বলতে তো কর্তা গিন্নি। মেয়ে তার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে কাঁহাতক বাপ মাকে সঙ্গ দিতে পারে?

—বাবা, তুই দেখি কদিনেই প্রভাতদার হাঁড়ির খবর নিয়ে ফেলেছিস।

—তোমার সঙ্গে থেকে থেকে ও ব্যাপারটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছি।

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —প্রভাতদা, আমার বাবার আমলের লোক। খুবই বিশ্বস্ত। উনি না থাকলে সাইকেল হাউস উঠেই যেত। দেখি নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলে। সত্যিই ওনাকে এবার অবসর দেওয়া দরকার।

—আমাদের তো কোন প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যাপার নেই।

—টাকার কথা বলছিস? প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের হয়তো সিস্টেম নেই। আমাদের কজনই বা কাজ করে। তোরা যদি ব্যবসা বাড়াতে পারিস, তখন লোকও বাড়বে। আর ওসব ব্যাপার নিয়েও ভাবা যাবে। তবে প্রভাততাকে একেবারে খালি হাতে যেতে হবে না। একটা বড় অ্যামাউন্টের এল আই সি করা আছে ওনার নামে। তার পেমেন্ট কোম্পানিই দেয়। ম্যাচিওর করার টাইমও হয়ে গেছে। এছাড়া কোম্পানিও কিছু টাকা তো দেবেই। ঠিক আছে, ও নিয়ে তুই চিন্তা করিস না। তুই বরং একজন কর্মঠ লোক দেখ। প্রভাতদার সাবস্টিটিউট হয়তো হবে না। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে যে তোকে অ্যাসিস্ট করতে পারবে।

—হ্যাঁ গুরু, এটা তুমি ঠিক বলেছ। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট হলে মাঝে মাঝে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, বুঝতেই তো পারছ, তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করার থ্রীলটাই আলাদা।

—নন্দিনী ছাড়বে?

—আরে তুমি বললে জরুর ছাড়বে। তা কল্যাণী সীমান্তের খবর কী বল? মানস চৌধুরীর কাছ থেকে কোন রিপোর্ট এল?

—হ্যাঁ ফোন করেছিল। সামনের রবিবারই যাব। কলকাতায় দুজন লোকের সঙ্গে আমায় মীট্ করতে হবে। অথচ দুজনের কারোরই কোন ঠিকানা জানি না।

—তারা কারা?

—পলাশ বলে একজন। সে নাকি শর্মিষ্ঠা ঘোষের প্রেমিক ছিল। অবশ্য সে যে কলকাতাতেই আছে তার কোন গ্যারাণ্টি নেই।

—আর একজন কে?

—নৃপেন সাহার মেয়ে। কোন এক ডাক্তারের বউ।

—বোঝ ঠ্যালা। কলকাতা শহরে কিছু না হলেও বোধহয় লাখখানেক ডাক্তার আছে।

কোন ডাক্তারের বউ নৃপেন সাহার মেয়ে জানতে গেলে তো তোমার নৃপেন সাহাকে জিগ্যেস করতে হয়। তা নৃপেন সাহা কী তার মেয়ের ঠিকানা দেবে?

—সোজা আঙুলে ঘি তোলা খুবই শক্ত ব্যাপার। আঙুল তো বেঁকাতেই হবে।

—আচ্ছা নীলদা, লোকটার নাম তুমি কী বললে, পলাশ? টিভিতে একজন অভিনয় করেন। পলাশকুসুম। একবার টোকা দিয়ে দেখবে নাকি?

কপালে হাত বোলাতে বোলাতে নীল প্রায় নিজের মনেই বলল,

—রবিবারেই আমাকে কল্যাণী সীমান্তে যেতে হবে। আসল জটটা ওখানেই। জট খুলতে গেলে ওখানেই যেতে হবে।

—রবিবার? তাহলে আমি তোমার লেজুড় হচ্ছি।

—যদি আমায় থেকে যেতে হয়?

—থাকবে। আমি কী নাবালক? একা ফিরতে পারব না?

—ঠিক আছে। চল।

দশ

মানস চৌধুরী বললেন—ইওর অ্যাসামসান ইজ রাইট স্যার। তালার গায়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে। ছোট ছোট আঙুলের ছাপ। আমার যতদূর মনে হচ্ছে তালাটা বোধহয় কেউ খোলে।

নীল বলল, —তার মানে, এ তালা পুলিসের নয়।

—হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। পুলিসই সেই সময় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর বুঝতেই পারছেন, ফাইল বন্ধ তো সবই বন্ধ। এর মধ্যে কোন ওয়ারিশন ক্লেইম নেই। কে আর খোঁজ রাখছে। বিশেষ করে আমাদের পুলিস! সরকারেরই কোন নিয়ম নীতি নেই। এদ্দিন যে ও বাড়িটা কেউ দখল করে নেয়নি এই ঢের।

দীপু বলল, —যা বলেছেন। ছিল পুকুর। হয়ে গেল মাঠ। তারপর একদিন সেখানে বাড়ি উঠতে আরম্ভ হয়ে গেল। এবং আসল যে পুকুরের মালিক সে তখন নেংটি পড়ে রাস্তায় ঘুরছে। আইনকানুন সব শিকেয় উঠে গেছে।

—দীপুবাবু, প্লীজ, থানায় বসে এসব বলবেন না। এসব আমাদের শুনতে নেই।

—সরি মানসবাবু, মাঝে মঝে মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়।

কাজের কথায় ফিরে এল নীল, —তাহলে মানসবাবু, আপনি বলছেন তালাটা মাঝে মাঝে কেউ খোলে।

—ডেফিনিট হয়ে কিছু বলছি না। আমার তাই মনে হচ্ছে।

—আপনাদের চাবিটা কোথায়?

—আপনি কোথায় আছেন মিস্টার ব্যানার্জি? পুরনো রেকর্ড কপি পেয়েছেন এই না

কত? তা বলে একটা চাবি? চব্বিশ পঁচিশ বছর আগের। নাহ্ ওটা আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না। সেরকম হলে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে তালা খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

—সে তো অনেক সময় লেগে যাবে। কোর্ট অর্ডার ছাড়া তো তালা ভাঙা বা খোলা যাবে না?

—হ্যাঁ। তাই।

—কিন্তু আমায় যে ওই বাড়িটায় ঢুকতে হবে।

—তালা না খুলে ঢুকবেন কি করে?

—সেদিন আমি দেখে এসেছি পুকুরের দিকে খিড়কির দরজাটা প্রায় ভাঙা অবস্থায়। আপনাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। আমি আজ রাতেই একবার চেষ্টা করব।

মানস বললেন, —সেকী? রাত্রে ওই পোড়োবাড়িতে আপনি একা যাবেন? দিনের বেলা গেলেই তো হয়।

—কেন? ভয়টা কিসের? ভুতের?

—না। ভূত নয়। আমার ভয় সাপের। বিষাক্ত বিছেও থাকতে পারে।

—আমার পায়ে আছে নর্থস্টার। মোটা জিন্‌সের প্যান্ট। আপনি কেবল আমায় একটা জোরালো টর্চ দেবেন।

—তবু মিস্টার ব্যানার্জি একটু ভেবে দেখুন। কাল সকালে গেলেও তো হয়।

—না। নৃপেন সাহার শোবার ঘর থেকে ঘোষবাড়ির সব কিছু দেখা যায়। আমি চাই না ও বাড়িতে আমার ঢোকাটা নৃপেন সাহার চোখে পড়ুক।

—আপনার সঙ্গে তাহলে একজন কনস্টেবল দিয়ে দিই।

—দরকার হবে না। আমি রাতের মধ্যেই ফিরে আসব। একটু জেগে থাকবেন। সারারাত বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না, প্লীজ।

মানস হেসে বললেন, —আমি আপনার সঙ্গে যাব। বিপদের মুখে আপনাকে একা ঠেলে দিতে পারি না।

—ঠিক আছে। তাহলে ওই কথাই রইল। দীপু, তুই বিকেলেই ফিরে যাস। নন্দিনীকে বলে দিস আমি কাল সকালে ওকে ফোন করব।

রাত দশটা নাগাদ নীল আর মানস ঘোষবাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নৃপেন সাহার মেইন গেটে একটা মাত্র আলো জ্বলছিল। যে আলো খুব একটা আলো ছড়াতে পারছিল না। এদিকটা প্রায় জনবসতিহীন। তায় রাত হয়েছে। অবশ্য নৃপেন সাহার দোতলার ঘরে আলো জ্বলছিল।

নীল আর মানস যতটা সম্ভব গাছগাছালির পাশ দিয়ে নিজেদের আড়াল করে ধীর ধীরে গিয়ে পৌছল ঘোষেদের বাড়ির পেছনের পুকুরে। ওদের বেশ সাবধানে এগুতে হচ্ছিল। ঝোঁপঝাড় ডিঙিয়ে ওরা গিয়ে পৌছল খিড়কির দরজার কাছে। নীল ঠিকই দেখেছিল। একটা পাল্লা প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় কোনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। নীল গিয়ে আলতো করে

পাল্লায় ঠেলা দিল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ। জায়গাটা নির্জন বলে আওয়াজটা কানে লাগে। কিন্তু উপায় নেই।

নীল বলল, —মানসবাবু, আমি কপাটটা আস্তে আস্তে তুলে ধরছি। আপনি ঢুকে যান।

তাই হল। তারপর ভেতর থেকে মানস একটু চাগিয়ে ধরতেই নীল ঢুকে গেল ভেতরে। দুজনের হাতেই দুটো টর্চ ছিল। সামান্য সময়র জন্যে একবার টর্চটা জ্বালিয়ে আশপাশ দেখে নিল। একদিন হয়তো অনেকটা ফাঁকা জমি ছিল। কিন্তু এখন আগাছার জঙ্গল। পথ বলতে কিছু নেই। মানসের হাতে ছোট্ট একটা ব্যাটন ছিল। তাই দিয়ে আগাছা সরাতে সরাতে ওরা মূল বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। আকাশে চাঁদ ছিল। কিন্তু ম্রিয়মান আলো। এই মুহূর্তে ওই আলোই যথেষ্ট।

মূল বাড়িতে ঢুকতে গিয়েও সমস্যা। জানলাগুলো সব বন্ধ।

মানস জিগ্যেস করল, —মিস্টার ব্যানার্জি, এবার ঢুকবেন কি করে?

প্রশ্নটা নীলেরও ছিল। ও প্রত্যেকটা জানলা টেনে টেনে দেখল। সব জানলাই ভেতর থেকে বন্ধ। হঠাৎ ওর নজরে এল ছাদের ওপর থেকে একটা বটের শেকড় সোজা নীচে নেমে এসেছে।

নীল বলল, —মানসবাবু, আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি ছাদে গিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে এসে যে কোন একটা দরজা খুলে দিচ্ছি।

মানস অবাক হয়ে বললেন, —আপনি ছাদে যাবেন মানে? হাউ?

—ওই দেখুন, বটের ঝুড়িটা ছাদ থেকে সোজা নেমে এসেছে। কোন চিন্তা করবেন না। আমি উঠে যাচ্ছি। এককালে এসব অনেক করেছি।

মানসকে আর কোন কথা বলার অবসর না দিয়ে নীল অদ্ভুত কৌশলে গাছের শিকড় বেয়ে ছাদে পৌঁছে গেল। ছাদের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। বটের শেকড় সমস্ত ছাদটাকে প্রায় ফাটিয়ে দিয়েছে। এখন আর টর্চ ফেলার অসুবিধা ছিল না। টর্চের আলো ফেলে খুব সাবধানে এগোতে এগোতে সিঁড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ছাদের দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। সিঁড়ির অবস্থাও বেশ ভয়াবহ। চারদিকেই ফাটল। পা টিপে টিপে ও দোতলায় চলে এল। টর্চের আলো ছড়ালো চারদিকে। চারদিকেই বট আর অশ্বত্থের এলোমেলো বিস্তার। দোতলায় বারান্দা। বারান্দার লাগায়ো খান চারেক ঘর। খুব সাবধানে এগোতে এগোতে দরজাগুলোয় ঠেলা দিল। সব দরজাই খোলা।

সাবধানে একতলায় নেমে এসে একটা ঘরে ঢুকলো। টর্চের আলো ফেলতেই কয়েকটা বাদুড় বা চামচিকে এলোমেলো উড়তে শুরু করে দিলো। ঘরটার একদিকে একটা দরজা। খিল লাগানো। খিলটা খোলার চেষ্টা করল। জমাট হয়ে বসে আছে। বেশ কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর খিল খুলল।

মানস আন্দাজ করেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দরজা খুলতেই মানস ঢুকে

পড়লেন। তারপর বললেন, —এরপর কী মিস্টার ব্যানার্জি?

—জহুরীর চোখ দিয়ে সব তন্ন তন্ন করে দেখুন। আপনি নীচের ঘরগুলো দেখুন। আমি ওপরে যাচ্ছি।

নীল ওপরে চলে এল। প্রথম ঘরটায় তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। ছোট্ট খাট। টেবিল চেয়ার। কিছু বই। সবই ধূলি ধূসরিত। চারদিকে মাকড়সার জাল। বইগুলোর ওপর টর্চের আলো ফেলল। ক্লাশ এইটের বই। খাতাগুলোর কোনটা অংকের কোনটা বাংলা। এ ঘরের মধ্যেও বটের শিকড় আর ডালপালা ঢুকে গেছে। একটা কাঠের ছোট আলমারিও ছিল। কিন্তু সেখানেও স্কুলের কিছু বই। কিছু ছোটদের গল্পের বই।

চলে এল পরের ঘরটায়। ওই একই অবস্থা। ছোট পালঙ্ক। বিছানায় শ্যাওলা জমে গেছ। আসলে ফুটো ছাদ দিয়ে বৃষ্টির সময় জলপড়ে। একদিকে একটা বড় আকারের কাঠের তৈরি ঠাকুরের সিংহাসন। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। সম্ভবত পাথরের। সিংহাসনের সামনে পুজোর সামগ্রী। ঘট, কোশাকুশি। চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে হয়তো রাধাকৃষ্ণের গলায় মালা চড়ানো হয়েছিল। এখন সেটা দড়ি। কিন্তু একটা জিনিস ওর চোখে লাগল। একটা আধপোড়া মোমবাতি। কিন্তু পুরনো নয়। পাশে একটা দেশলাই। দেশলাইটাও বেশি পুরনো নয়। ভিতরে খুলে দেখল। খুব অল্প কাঠিই খরচ হয়েছে। মনে মনে বলল, দেশলাই আর মোমবাতি তো এত পুরনো নয়? তাহলে—জিজ্ঞাসা নিয়েই অন্য দিকে গেল। একটা দাঁড়ানো আলনায় কিছু থানকাপড় ঝুলছে। সবই প্রায় কালো হয়ে গেছে। ঘরের এককোণে একটা কাঠের সিন্দুক। নীল দু একবার টানাটানি করে দেখল। চাবিবন্ধ। দেওয়ালে একটা ছবি ঝুলছিল। টর্চের আলো ফেলেও বোঝা গেল না সেটা কার ছবি। আরও একবার খাটের কাছে গেল। ঝুল পরা কালো চাদরে কিছু এলোমেলো হাতের ছাপ। খাটের ঠিক নীচেই পোড়া মোমের মোটা অংশ। কিন্তু খুব পুরনো দাগ নয়। ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল চলে এলো পাশের ঘরে। এখানেও বটের উৎপাত। সিঙ্গল বেডেড খাট। নিভাঁজ শয্যা। এককালে চাদরের হয়তো রঙ ছিল। এখন সেটায় ঝুল আর মাকড়সার জাল ছেয়ে গেছে। বিছানার ওপর একটা খোলা বই উপুড় করা অবস্থায়। খুব আলতো করে বইটা তুলে দেখল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম পাতায় নাম লেখা রয়েছে, শর্মিষ্ঠা ঘোষ। লেখাটা প্রায় অপসৃয়মান।

যথাস্থানে বইটা রেখে দিয়ে ও চলে এল শর্মিষ্ঠার পড়ার টেবিলে। টেবিলের পাশেই একটা ঢাকা পড়ানো তানপুরা। পাশে ডাঁয়া বাঁয়া তবলা।

নীল মনে মনে বলল, —তার মানে মেয়েটি গানটান শিখতো। ও মনেযোগ দিল টেবিলে। একদিকে বেশ কয়েকটা বই। কিছু খাতা আর পেন ছড়ানো ছিল। খাতাগুলোও উল্টেপাল্টে দেখল। সবই পাঠ্য বিষয়ক লেখা। সবই উই ধরা

হঠাৎ ওর কী খেয়াল হল। টেবিলেরে ড্রয়ারটায় টান দিল। ড্রয়ার বেরিয়ে এল। দুটো কানের দুল। কয়েকটা সোনার চুড়ি। একটা লেডিজ রিস্টওয়াচ। এতক্ষণ ধরে যে জিনিসটা

ও খুঁজে পেতে চাইছিল সেটাই পেয়ে গেল হঠাৎ। একটা ডায়রি। পাতা ওল্টাতে গিয়েই বেরিয়ে এল একটা ফোটোগ্রাফ। হাস্যরত একটি ছেলের ক্লোজ আপ। পিছনে অস্পষ্ট কিছু লেখা। লেখাটা উঠে যায়নি। ডট্ পেনে লেখা। ডায়েরির প্রথম পাতায় শর্মিষ্ঠার নাম লেখা।

বিনাবাক্যব্যয়ে ধুলোটুলো ঝেড়ে সেটিকে জ্যাকেটের নীচে চালান করে দিল। একটা স্টীলের আলমারিও ছিল। সেটাও বন্ধ।

ইতিমধ্যে কখন একসময় মানস এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

—কী মিস্টার ব্যানার্জি, নৈশ অভিযানে কিছু পেলেন?

—আপনি কী পেলেন বলুন?

—নাথিং। থাকার মধ্যে একটা বৈঠকখানা। সম্ভবত তিনজন ওই ঘরেই খুন হয়েছিলেন। কিন্তু আজ আর তার কোন চিহ্ন নেই। সব ধুলো মাকড়সার জাল আর বট অশ্বত্থের ডালপালায় ঢাকা পড়ে গেছে। রান্নাঘরেও কিছু নেই। এলোমেলো কিছু থালা বাসন। কিছু কাঁসার। কিছু স্টীলের। আর একটা ঘরে একটা বড় খাট পাতা আছে। মেঝেতে একটা শতরঞ্চিগুটনো অবস্থায় পড়ে আছে। হ্যাঁ বিছানার ওপর একটা হারমোনিয়াম পড়ে আছে। আমি অবশ্য কিছুতেই হাত দিইনি। আর একটা বাথরুম। চৌবাচ্চার জল শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। মাকড়শার জালে ভর্তি। কোন মার্ডার ওয়েপন কিছু নেই। থাকলেও তখনকার পুলিস সেসব হস্তগত করে নিয়েছে।

সে সব কথার জবাব না দিয়ে নীল বলল, —এই আলমারির চাবিটা কোথায়?

—এত বছর পর কী আলমারির চাবি পাওয়া যাবে?

—যাবে। কারণ এটা শর্মিষ্ঠার নিজস্ব ঘর। আলমারির চাবি নিশ্চয়ই সে কোথাও রেখে দিয়েছিল। পুলিস সম্ভবত আলমারি বন্ধ দেখে আর খোলাখুলির মধ্যে যায়নি।

—কিন্তু পাবেন কোথায়?

—একটা ইয়াং মেয়ে। তার নিজস্ব আলমারি। সেটাই তার জগৎ। সেই চাবি সে যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে না। দেখুন তো খুঁজে, মেয়েটির কোন সাইড ব্যাগ এদিক ওদিক পাওয়া যায় কিনা।

খুব একটা বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। আলমারি পাশেই একটা পেরেকের গায়ে ঝুলছিল। চামড়ার ব্যাগ। ঝুল পড়ে প্রায় বিবর্ণ। আলতো করে নামিয়ে নিয়ে ব্যাকটা খুলে দেখল কিছু টাকাপয়সা, কিছু কাগজ, ওষুধের দোকানের বিল। আরো কিছু হাবিজাবি। সবকিছুই এত জীর্ণ যে মনে হচ্ছে একটু জোরে নাড়াচাড়া করলেই পাতাগুলো ঝুরঝুর করে খসে পড়বে। কিন্তু আলমারির কোন চাবি পাওয়া গেল না।

নীল ব্যাগটা দেখতে দেখতেই বলল, —চাবি নেই। তবু ব্যাগটা নেওয়া দরকার।

—দরকাল হলে নেবেন। এমনিতেই ওগুলোর প্রায় শেষ দশা। যদি কোন ক্লু মেলে। নিয়ে নিন।

—পাশেই আর একটা ঘর আছে। চলুন ওটা একবার দেখে নিই। সম্ভবত ওটাই

অবনী ঘোষের ঘর হবে।

এ ঘরটায় আসবাবপত্র একটু বেশি। খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল। এঘরেও একটা সিন্দুক আছে। আলমারিটা খোলাই ছিল। জামাকাপড়েই ঠাসা। সিন্দুকটা একবার টেনে দেখল। বন্ধ।

নীল বলল, —সিন্দুকটা খোলা পেলে ভালই হত। যদি কিছু ইমপট্যান্ট্ কাগজপত্র পাওয়া যায়।

—ছেড়ে দিন। তেমন দরকার পড়লে নয় আরও একবার অভিযান চালানো যাবে। তারপর রিস্টওয়াচ দেখে বলল, —ওরে বাবা প্রায় দুঘণ্টা আমরা এই বাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছি।

নীল বলল, —এ তো আর অপেক্ষার গড়ি নয় যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে? আমরা তো কাজ করতে এসেছি। সময় কখন বেরিয়ে গেছে।

এবার আর বটের শিকড় ধরে নামা নয়। যে দরজাটা খোলা হয়েছিল সেটা দিয়েই বেরিয়ে এল।

নৃপেন সাহার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ওরা দেখল দোতলার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

রাত বাড়তে বাড়তে আলোটাও বেড়েছে। পথ তো চেনাই ছিল। ওরা যখন মানসের বাড়ি এসে পৌছল ঘড়ির কাঁটা তখন পৌনে একটার দিকে।

সে রাতে আর কোন কথা হল না। নীলকে একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। শুতে যাবার আগে নীল মানসকে বলল,—দুজন লোক ও বাড়িতে যাতায়াত করে।

মানস জিগ্যেস করল, —তেমন কোন নমুনা পেলেন?

—কিছু ফুট প্রিন্ট, একটা বড় আর একটা ছোট মাপের পা। চারদিকেই ধুলো তো। ছাপগুলো বেশ প্রকট হয়েই আছে।

—সব ঘরেই পেয়েছেন?

—মোটামুটি সব ঘরেই আছে। কিন্তু নিভাননী দেবী আই মিন অবনীবাবুর মায়ের ঘরেই বেশি। লক্ষ্য করেননি?

—না। আমার তো প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল ফাটল টাটল দিয়ে সাপ বা বিছে না বেরিয়ে পড়ে। পোড়ো বাড়িতে বিষাক্ত পোকামাকড়ও থাকে। তায় রাতের অন্ধকার।

—ঠিক আছে। একটু নজরদারি করান তো কাউকে দিয়ে। প্লেন ড্রেসেই থাকতে বলবেন।

—ঠিক আছে। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চিন্তা করবেন না।

—আমি কালই কলকাতায় ফিরব। দুজন মানুষকে আমায় খুঁজে পেতেই হবে।

—কারা কারা?

—একজন হচ্ছেন পলাশ; আর একজন নৃপেন সাহার মেয়ে।

—নৃপেন সাহার মেয়ের ঠিকানাটা আমি যোগাড় করে দিতে পারব।

—থ্যাঙ্ক ইউ। পেলেই আমায় সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আর একজন লোকও সাসপেক্টেড।

—কে?

—নৃপেন সাহার গুরু ভাই কাম ডানহাত।

—ঘনশ্যাম দাস। তুলে নিয়ে আসব? আমাদের একজন গুণ্ডা কনস্টেবল আছে। তার হাতের জোড়া থাপ্পর খেলে—

—না, না, ওসব করতে যাবেন না। নৃপেন সাহাকে এখন কোন কিছুই জানতে দেওয়া চলবে না।

—ঠিক আছে। অনেক রাত হল। এবার শুয়ে পড়ুন।

—গুড নাইট।

এগার

নন্দিনী আর দীপু বেরিয়ে যাবার পর নীল গিয়ে বসল নিজের ঘরে। প্রথমেই ও খুলল শর্মিষ্ঠার ডায়েরিটা। বেরিয়ে পড়ল ছেলেটির ছবি। সুদর্শন এক যুবক। বছর পঁচিশ ছাব্বিশের মতো বয়েস। নায়কোচিত মুখ। ডায়েরির মধ্যে থাকার জন্য ছবিটা খুব বেশি ঝাপসা হয়নি। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট প্রিন্ট। এখন সিপিয়া টোন এসে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছবিটার পেছনে কী একটা লেখা ছিল। উল্টিয়ে দেখল। লেখাটা বেশ ঝাপসা হয়ে গেছে। কিন্তু পড়া যাচ্ছে। ডট্ পেনে লেখা। তবু ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পড়ল, লেখা আছে 'আমি তোমার কাছেই রইলাম' নীচে কোন নাম লেখা নেই।

ছবিটা পাশে সরিয়ে রেখে ও ডায়েরি নিয়ে পড়ল। প্রথম দিকটা প্রায় বালিকাসুলভ লেখা। কবে কোথায় কোন্ সিনেমা দেখেছে! কবে ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ছবি নামের কোন এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে সারাদিন হই হল্লা করেছে। কিছুদূর এগোবার পর হঠাৎ একটা পাতায় এসে থমকে গেল। নৃপেন সাহা প্রসঙ্গ এসে গেছে। শর্মিষ্ঠা লিখছে, 'নৃপেনকাকুকে দেখলেই আমার ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করে ওঠে। যেন মনে হয় বসন্তের হাওয়া এসে শীতের রুক্ষ্ম ডালপালায় শিহরণ তুলছে। কিন্তু এ এক অবাস্তব চিন্তা। প্রথমত নৃপেনকাকু বাবার বন্ধু। তার ওপর নৃপেনকাকু বিবাহিত। ওর একটা ছেলে আছে। আমার থেকে দু-এক বছরের ছোট একটি মেয়েও আছে। মনে মনে অনেকবার আমি প্রতিজ্ঞা করেছি নৃপেনকাকুর কথা ভাবব না, কিন্তু কখন যে ওর মধ্যে ডুবে যাই। বাবার সঙ্গে প্রায়ই নৃপেনকাকুর রাজনীতি নিয়ে তর্কাতর্কি হয়। আমার ভয় করে। তর্কাতর্কি থেকে যদি কোনদিন ঝগড়াঝাটি হয়ে যায়। যদি কোনদিন রাগ করে নৃপেনকাকু আর এ বাড়িতে না আসে। সেদিন যে আমি কী করব?

তারপর আর একটা পাতায় শর্মিষ্ঠা লিখছে—'এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটবে আমি

কদিন আগেও টের পাইনি। আমাকে রোজ ট্রেনেই যাতায়াত করতে হয়। এখানে তো তেমন ভাল কোন কলেজ নেই। একদিন বাড়ি ফিরছি। সন্ধের মুখ। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি বটতলায় এসে গেছি। হঠাৎ সামনে দেখি আমার কৃষ্ণঠাকুরটিকে। হ্যাঁ, নৃপেনকাকুকে তো আমার কৃষ্ণঠাকুরই মনে হয়। যেমন ছবিতে কৃষ্ণকে দেখতে। টানা টানা চোখ। দুষ্টু দুষ্টু মুখ। ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুলের ঢেউ। কেবল হাতে বাঁশিটি ধরিয়ে দিলেই হয়। সেদিন পড়েছিল একটা হলুদ রঙের পাঞ্জাবি আর ধুতি। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল। আমার কেষ্টঠাকুরটির কণ্ঠস্বর ভারি সুন্দর। কেষ্ট ঠাকুরটি বাঁশি বাজান না। তবে গানের গলাটি ভারী চমৎকার। নিজের ঘরে বসে যখন গান গায় আমি তো বিভোর হয়ে যাই। আমার অবস্থা এখন রাধার মতো। কৃষ্ণর বাঁশি শুনে রাধা যেমন ছুটে যেত আমিও বাড়ি থাকলে নৃপেনকাকুর গান শুনলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই শমীকের ঘরে। ওর ঘর থেকে সরাসরি দেখা যায় নৃপেনকাকুর ঘর।

সেই নৃপেন কাকু সামনে এসে দাঁড়াতেই আমার বুকটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। কেন এমন হল সেটা ভাবার আগেই নৃপেনকাকু বললেন, —তুমি বাংলায় অনার্স করছ?

আমার তখন জিভ শুকিয়ে গেছে। কোন রকমে বললাম, —হ্যাঁ।

নৃপেনকাকু জিগ্যেস করলেন, —কার কাছে পড়ছ?

বললাম—নিজেই পড়ছি।

—কিন্তু কারো কাছে টিউশন নিলে ভাল করতে। ওতে কোর্সটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

—এখানে আর কাকে পাচ্ছি বলুন? একে তো ট্রেন জার্নি করে কতটা সময় নষ্ট হয়ে যায়। তার ওপর—

—তুমি আমার কাছে পড়বে?

আকাশের চাঁদটাকে কেউ কী কখনও হাতের কাছে পেয়েছে? কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হল চাঁদ নিজে এসে যেন আমার কাছে ধরা দিল। আমি বললাম, —আপনি আমায় পড়াবেন? আপনার সময় কোথায়? দিনরাত তো রাজনীতি করেন নইলে গান নিয়ে বসেন। নয়তো ব্যবসা করতে চলে যান। নৃপেনকাকু উত্তর দিলেন,—বাবা, তুমি তো দেখি আমার সব খবরই রাখ। দুটো কাজ শখ করে করি। আর একটা পেট চালানোর জন্যে। তোমার জন্যে এটুকু করতে পারি। তবু তো মনে হবে একজনের জন্যে কিছু করতে পারলাম।

আর আমার কিছু বলারই ছিল না।'

এর পরের বেশ কয়েকটা পাতা জুড়ে কেবলি নৃপেন সাহার যশোগান। একদিনও তার পড়ানোয় কামাই নেই। কত সুন্দর তার পড়ানোর কায়দা। কী মধুর তার কণ্ঠস্বর। শর্মিষ্ঠার মোহিত হয়ে যাবার চমৎকার বর্ণনায় পাতার পর পাতা ভরিয়ে তোলার কাহিনী।

ডায়েরির মাঝামাঝি এসে শুরু হল ছন্দপতনের পালা। শর্মিষ্ঠা লিখছে, —আজ

একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল। নৃপেনকাকু বুঝতে পেরেছিল ওর প্রতি আমার দুর্বলতা। ও সেই সুযোগটাই নিয়ে নিল। আজ বাড়িতে বাবা মা কেউ ছিল না। থাকার মধ্যে ঠাকুমার আর শমীক। নৃপেনকাকু জেনেশুনেই দুপুরে এসেছিল। ওর এই ঘনঘন আসাটা আমাদের দুবাড়ির কেউ তেমন সুনজরে দেখছিল না। আমার মা তো ইতিমধ্যেই একদিন বলে দিল, আমার জন্যে অন্য টিউটর রাখা হবে। সব থেকে বেশি ঝঞ্ঝাট পাকালেন মায়া কাকিমা। একদিন সটান আমাদের বাড়ি চলে এসে যা নয় তাই বলে আমাকে তো গালাগাল দিলেনই আর নৃপেনকাকুর নামে যত কুৎসিত ভাষা আছে তা প্রয়োগ করে জানিয়ে দিলেন এর আগেও নাকি নৃপেন আরও অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে। অনেক মেয়েকে রূপে মজিয়ে তাদের নাকি পথে বসিয়েছে।

ব্যাস্ তারপরই বাবা নৃপেনকাকুকে বলে দিলেন ও যেন আর কোনদিনও আমাদের বাড়ির চৌকাঠ না ডিঙ্গোয়। নৃপেনকাকুর আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কাকিমার অভিযোগুগলো আমি মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল কোথাও যেন একটা ভুল হচ্ছে। কিন্তু কাকে বোঝাব এসব কথা? একটা কথা অবশ্য ঠিকই আমার দিক থেকে আমি যতই নির্মোহ থাকি না কেন, আমাদের এত ঘনঘন মেলামেশাটা লোকের চোখে তো খারাপ লাগবেই। কিন্তু মন তো মানে না।

বাড়ি থেকে আমি বেরোনই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কলেজ ছুটি ছিল। বেরনোর প্রশ্নই ছিল না। হঠাৎ আজ দুপুরে নৃপেনকাকু সটান চলে এল আমার বাড়ি। একেবারে আমার ঘরে। ও বোধহয় খবর রেখেছিল মা বাবা আজ কেউই বাড়ি নেই।

যে নৃপেনকাকুকে আমি মনে করতাম অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত এক সুন্দর পুরুষ, হঠাৎ তার এই নগ্ন চেহারাটা দেখে আমি চমকে উঠলাম। ওর মুখ দিয়ে তখন বিশ্রী মদের গন্ধ ছাড়ছিল। আমায় কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ঠিক লুঠেরা দস্যুর মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পরে আমাকে যেন ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে চাইল। তারপর যে কাজটা করল, উঃ...

আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক। আমি তো কোনদিনও এই নৃপেনকাকুকে চাইনি। ওকে আমার ভীষণ ভাল লাগতো। ভাল লাগতো ওর মধুর সঙ্গ। মিষ্টি কথা। দৈহিক প্রেম ছাড়াও তো একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আমার মনে তো রাধাকৃষ্ণের দেহহীন প্রেমের স্বপ্ন।

আসলে প্রথম ঘোরটা কাটতে আমি একটু সময় নিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ এর আগে কোনদিন তো কোন পুরুষের এহেন স্পর্শ পাইনি। কিন্তু নৃপেনকাকু যখন তার ধর্ষণ কর্ম শেষ করে ফেলেছে তখনই সম্বিত ফিরে পেয়ে আমি প্রাণপণে না না বলে চিৎকার করে উঠেছি। আমার চিৎকারটা বেশ জোরেই হয়েছিল। পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন আমার সত্তর বছরের ঠাকুমা। আর বারো বছরের শমীক।

ঠাকুমা তখন সমানে চিৎকার করে চলেছেন। এরই ফাঁকে শমীক ওর ব্যাডমিন্টন

র‍্যাকেটটা এনে সজোরে বসিয়ে দিল নৃপেনকাকুর মাথায়।

নৃপেনকাকু আমাকে ছেড়ে দিয়ে দড়াম করে একটা বিশাল ঘুষতে শমিককে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। তারপর যাবার সময় ঠাকুমাকে বলে গেল, —এসব কথা যদি কোনদিন কোথাও ফাঁস হয়, আমার নাম নৃপেন সাহা। ঝাড়ে বংশে ঘোষবংশকে উপড়ে ফেলে দোব।

এই প্রথম নৃপেনকাকুর নগ্ন চেহারাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তাহলে কাকিমা ওর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সব সত্যি। বাইরের রমণীমোহন সৌন্দর্যের আড়ালে একটা শয়তান জন্তু ওর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। ভালোবাসার নামে এ কী সর্বনাশ করে গেল?

কয়েকটা পাতার পর শর্মিষ্ঠা আবার লিখছে, 'আমার বাবা রাজনীতি করা লোক। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। একবার এম.এল.এও হয়েছিলেন। এমনিতে খুবই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। চট্ করে কোনদিন রাগতে দেখিনি। সব ঘটনা শোনার পর উনি কিন্তু রাগলেন না। কিন্তু মুখের চেহারাটা অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেল। বাবার মুখের পরিবর্তন দেখে আমার একটু ভয়ও হয়েছিল। আসলে রাজনীতি করা মানুষদের আমার খুব একটা বিশ্বাস হত না। এরা ঠাণ্ডা মাথায় অনেক জঘন্য কাজ করতে পারে। নৃপেনকাকুও রাজনীতি করে। ভয়টা ওখানেই। তার ওপর তো শাসিয়ে গেছে। বাবাকে দেখলাম অদ্ভুত নির্বিকার।

কিন্তু নৃপেনকাকু এটা কী করছে? চারদিকে রটিয়ে দিয়েছে আমি নাকি প্রেগন্যান্ট। আমি নাকি খুব খারাপ মেয়ে। আমি নাকি নৃপেনকাকুর চরিত্র নষ্ট করার মূলে। এমন কী আমাদের বাড়ির রাঁধুনি বেস্পতি, সেও ঠারে ঠোরে অনেক ঠেস দেওয়া কথা বলতে শুরু করল। মা একদিন এসে জিগ্যেস করলেন যা রাষ্ট্র হয়েছে তা কতটা সত্যি? মাকে একটি কথাই বললাম, মা তুমি বিশ্বাস কর, আমার মনে কোন পাপ ছিল না।

ছি ছি, মানুষ এত নীচে কী করে নামতে পারে? একবার মনে হয়েছিল নৃপেনকাকুকে সরাসরি গিয়ে চার্জ করি। কিন্তু বাবার বারণ। নৃপেনকাকুর সঙ্গে কোনরকম তর্ক বিতর্কের মধ্যে যাওয়া নিষেধ। কুকুর কামড়ালে কুকুরকে তো আর কামড়ানো যায় না। ভাবছি, এবার থেকে কোন হস্টেলে গিয়ে থাকব। কিন্তু তাতে তো আর গুজব রটানোর সুবিধে হবে।

কিল খেয়ে কিল হজম করেই যাচ্ছিলাম। একসময় নৃপেনকাকুর তিক্ত স্মৃতি আমার মন থেকে উবে যাচ্ছিল। তার কারণ পলাশ। ওর নামটার মতোই ও মিষ্টি। পলাশকুসুম রায়। আমার বন্ধু কথাকলির দাদা। সবে ডাক্তারি পাশ করেছে। এক একজন মানুষ আছে যারা খুব সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারে। পলাশ সেই রকমই। নৃপেনকাকুর ঘটনার পর ছেলেদের ওপর আমার একটা বিরূপভাব জন্মেছিল। পলাশ নিজে থেকে এসে ভাব করল। পলাশের সুদর্শন চেহারার জন্যে প্রথম প্রথম ওর কাছ থেকে দূরে থাকতাম। কিন্তু পলাশ আমায় দূরে থাকতে দিল না। ওর মেশার অন্তরঙ্গতা আমাকে ওর কাছে টেনে নিল। একটা বিশেষ আকর্ষণ আমাকে বারবার টেনে নিয়ে যাচ্ছে পলাশের বাড়ির দিকে। আমিও না গিয়ে থাকতে পারি না। পলাশের আন্তরিক হবার চেষ্টাটাকে আমি প্রথম প্রথম এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারলাম না। এবার আমি

সত্যিই প্রেমে পড়লাম। নৃপেনকাকু ছিল একটা ইনফ্যাচুয়েশন। একটা অবাস্তব মোহ। কিন্তু পলাশ যেন অন্য কিছু। দারুণ হ্যাণ্ডসাম, স্মার্ট। ও খুব স্বপ্ন দেখে। ভবিষ্যতে বড় অভিনেতা হবার স্বপ্ন। ও যখন ওর স্বপ্নের সঙ্গে আমার প্রতি ওর ভালবাসাকে মিশিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে তখনই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আবার ভয়ও করে। সত্যিই যদি ও কোনদিন বড় মাপের অভিনেতা হয়ে যায় তখন যদি আজকের সব কিছু ভুলে যায়? কেজানে যদি আমাকেই কোনদিন ভুলে যায়! এমন কী আমি ওকে নৃপেনকাকুর কথাও বলতে পারিনি। কি জানি, যদি ও আমায় খারাপ মেয়ে ভেবে আমার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়—তাহলে আমি বাঁচব কি নিয়ে? কিন্তু ওকে তো আমার সবকিছু বলতেই হবে।

এরপরের বেশ কিছু পাতা জুড়ে কেবল পলাশ। পলাশ ওকে কতটা ভালবাসে। ও পলাশকে কতটা ভালবাসে। পাতাগুলোয় চোখ বুলোতে বুলোতে প্রায় শেষের দিকে একটা পাতায় এসে থামল, শর্মিষ্ঠা লিখছে, 'পলাশ খুব সাহসী ছেলে। হঠাৎ একদিন আমার বাড়ি এসে হাজির। সরাসরি একেবারে আমার বাবার সামনে। পলাশের কথা আমি বাবা মা ঠাকুমা কাউকেই জানায়নি। নিজের পরিচয় দিয়ে পলাশ বাবাকে জানায় সে আমায় বিয়ে করতে চায়। বাবা মা দুজনেই একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন। তারপর পলাশের ফ্যামিলির পরিচয় পেয়ে খুব একটা আপত্তি করলেন না। কেবল বলেছিলেন, অভিনয়ের লাইনটা খুবই আনসার্টেন। তুমি তোমার বাবার মতো ডাক্তার হতে পারতে। তুমি তো ডাক্তারি পাশও করেছ? উত্তরে পলাশ বলেছল, প্র্যাকটিস তো আমি ছাড়িনি। তবে অভিনয়টা আমার একটা অ্যামবিশন। চেষ্টা করব। না যদি কিছু করতে পারি ডাক্তারিটা তো আছেই। এর পর বাবা দুদিন ভাববার সময় নিয়ে নিলেন।

এর পর শেষ পাতা। সেখানে লেখা আছে, 'হঠাৎ আজ দুপুরে ঘনশ্যামদা, নৃপেনকাকুর ডানহাত, আমাদের বাড়ির কড়া নেড়ে আমাকে একটা ছোট্ট চিঠি দিয়ে চলে গেল। লেখাটা পড়েই মাথাটা ঘুরে গেল। নৃপেনকাকুর হাতের লেখা, লিখছে, যে ছোকরাটার সঙ্গে ঢলাঢলি করছ, ওকে ভুলে যাও। ওকে যেন আর কোনদিন ত্রিসীমানায় না দেখি। তুমি ভেবোনা আমি তোমায় ভুলে গেছি। মনে রেখো আমার খাবারে অন্য কেউ হাত দেবার চেষ্টা করলে তার হাত পৃথিবী থেকেই লোপাট হয়ে যাবে। সঙ্গে তুমিও যাবে। বিয়ে টিয়ের ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। তুমি আমার। না হলে কারোরই নও। চিঠিটা বাবাকে দেখালাম। বাবা মুচকি দিয়ে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, দু একদিনের মধ্যে আমি পলাশের বাবার সঙ্গে কথা বলতে যাব। ওনারা রাজি থাকলে আমি এ মাসেই তোমার বিয়ে দোব। এর বেশি তুমি আর কিছু চিন্তা কোর না।

ডায়েরির লেখা শেষ। শর্মিষ্ঠা আর কিছু লেখেনি। ডায়েরিটা মুড়ে রাখতে রাখতে নীল নিজের মনেই বলল, মেয়েটা আর কিছু লেখেনি। তাঁর মানে এই ঘটনার পরই সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু পলাশের ঠিকানাটা কেন লেখেনি?

—কী গুরু? নিজের মনে কী বকছ বলতো? এর আগে একবার এসে দেখে গেলাম

তন্ময় হয়ে কিছু একটা পড়ছ। এখন এসে দেখি বিড়বিড় করছ। রহস্য খুব জটিল মনে হচ্ছে।

নীল জিগ্যেস করল,—কখন এলি?

—মিনিট পনের কুড়ি আগে। কিন্তু আমার কথার উত্তর দিলে নাতো?

—ডায়েরিটা পড়। শর্মিষ্ঠা ঘোষের ডায়েরি। অনেক কিছুই আছে। কিন্তু যা আছে তা নিয়ে কোন কিছুই প্রমাণ হবে না। এমন কী নৃপেন সাহার লেখা চিঠিটাও আজ আর পাবার উপায় নেই। কিন্তু শেষের সেই দিনটায় কে কোথায় ছিল? শুধু একটা মেয়ের কারণেই কী ঘোষ ফ্যামিলিকে শেষ করে দেওয়া হল? নাকি এর বাইরে আর কিছু আছে? খাওয়াদাওয়া করেছিস?

—না। বৌদি ফিরুক। একসঙ্গেই খাব।

—ঠিক আছে। তুই পড়। আমি আসছি।

নীল বেরিয়ে গেল। দীপু ডায়েরিটা পড়তে শুরু করে দিল। মুখেচোখে জল দিয়ে দু কাপ চা নিয়ে এসে দেখল দীপু তন্ময়। কিছু না বলে সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ নিজের মনে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ বলল, —হ্যাঁরে, দীপু তুই সেদিন বলেছিলি, টিভিতে কে একজন পলাশ নামে অভিনয় করে?

—হ্যাঁ। পলাশকুসুম। 'শেষ কোথায়' বলে একটা সিরিয়ালে নায়িকার বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন। আমি কয়েকদিন দেখেছি। বেশ ভাল অভিনয় করেন।

—শেষ কোথায়? কটার সময় হয়?

—রাত সাড়ে নটায়।

—কোন চ্যানেলে?

—আলফা বাংলা।

—ওই ফটোটো দেখতো? কিছু গেইস করা যায়?

বিছানার ওপর উল্টে রাখা ছবিটা তুলে নিয়ে দীপু অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, — কোন এক সুদর্শন যুবকের ছবি। কিন্তু টিভির পলাশকুসুমের সঙ্গে একমাত্র এই ধারালো নাকছাড়া তো —তবে হলেও হতে পারে। এতে অবশ্য মাথাভর্তি চুল আছে। ভরাট মুখ। কিন্তু পলাশকুসুমের মাথায় টাক। চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ। অবশ্য সেটা মেকাপে হতে পারে। ঠিক আছে। সন্দেহ যখন উঠেছে, তখন একবার নাড়াচাড়া করে দেখলেই হয়। তার আগে তুমি নিজে একবার আলফায় চোখ বুলিয়ে নিতে পার।

—সে তো নোবই। আর এরা দুজন যদি একই লোক হয় তাহলে ভদ্রলোকের ঠিকানা পাওয়া খুব একটা অসুবিধে হবে না।

—কিন্তু নীলদা, আমি শর্মিষ্ঠার ডায়েরি যতটা পড়লাম, আমার তো মনে হচ্ছে ওই ব্যাটা নৃপেন সাহাই আসল ক্রিমিন্যাল।

—হলেও। প্রমাণটা কোথায়?

—কেন, এই ডায়েরি।

—দ্যুর বোকা। ডায়েরিতে নৃপেন সাহার উচ্ছৃঙ্খলতার কথাই লেখা আছে। সে একবার থ্রেট করেছিল সেটার উল্লেখ আছে। কী হবে তা দিয়ে? নৃপেন যদি আসল খুনি হয়, সে বলবে এসব শর্মিষ্ঠার বানানো আজগুবি গল্প। শেষের সেই ভয়ংকর দিনটার কোন প্রত্যক্ষদর্শী নেই। ঠিক কী ঘটেছিল, কেনই বা এত রিভেঞ্জ, সেসব উত্তর কোথায় পাবি? ঠিক আছে তুই ওটা শেষ কর। আর ওই লেডিজ ব্যাগটা আমায় দেতো। ওটা একবার খুলে দেখি।

কিছু না বলে ব্যাগটা নীলের হাতে ধরিয়ে দীপু ডায়েরিতে মন দিল।

যে আশা আর উত্তেজনা নিয়ে নীল সেই ধূলিধূসরিত জীর্ণপ্রায় লেডিজ সাইড ব্যাকটি খুলল ক্রমে সেটি নিরাশায় পরিণত করল। কিন্তু টুকিটাকি কাগজ। কিছু সিনেমার কাউন্টার পার্ট। একটা শুকিয়ে যাওয়া লিপস্টিক। গোটা দুই পেন। একটা ডট পেন আর একটা ফাউন্টেন পেন। শুকনো একটা গোলাপফুলের জীর্ণাংশ। একটা ছোট্ট টেলিফেনের খাতা। কিন্তু কোন নাম্বারই বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত জলকালিতে লেখা হয়েছিল। সব ঝাপসা হয়ে গেছে। অতি কষ্টে পলাশ নামটা পাওয়া গেল। কিন্তু তার নাম্বার প্রায় ধুয়ে মুছে গেছে। একটা লেডিজ রুমাল। কিছু খুচরো পয়সা। বাসের টিকিট। ট্রেনের টিকিট।

ব্যাগের মধ্যে একটা চেনটানা অংশ ছিল। অনেক টানাটানি করেও চেনটা খোলা গেলনা। অবশেষে বাধ্য হয়েই ব্লেড দিয়ে চেনের অংশটা কেটে ফেলতে হল। চেনটানা পকেটটা সিল্ক কাপড়ের। ভেতর থেকে বেরলো খান চারেক চিঠি। সবই পলাশের প্রেমপ্রকাশ। এর মধ্যে একটা চিঠি ওর নজর কাড়ল। চিঠিটা পলাশের নয়। শর্মিষ্ঠার হাতের লেখা। কোন একটি মেয়ের উদ্দেশ্যে লেখা। সম্ভবত চিঠিটা পাঠানো হয়নি। ছোট্ট হাতচিঠি। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নীচে রেখে ধীরে পড়ল, —কাজটা তুই ঠিক করছিস না। তুই জানিস আমি পলাশকে ভালবাসি। এ এক ধরনের নোংরামি। এসব করিস না।

চিঠিটা ওইটুকুই। কার উদ্দেশে লেখা বোঝা গেল না। তবে প্রেমের ক্ষেত্রে কেউ একজন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কে? বোঝারও উপায় নেই। জানারও কোন সম্ভাবনা নেই।

ততক্ষণে দীপুর ডায়েরি পড়া শেষ। বিছানার ওপর শর্মিষ্ঠার ডায়েরিটা সযত্নে রেখে দিতে দিতে বলল—এই পলাশকুসুম কী আজকের অভিনেতা পলাশকুসুম? কারণ এখানেও লিখছে পলাশের অভিনেতা হবার ইচ্ছে ছিল।

নীল বলল, —কিন্তু সে আবার ডাক্তারিও পাশ করেছিল।

—একদিন যাবে নাকি পলাশকুসুমকে বাজাতে?

—হ্যাঁ যেতে হবে। যদিও একই নামের বহুলোক থাকতে পারে।

—আরে এতো আর অমল বিমল কমল নয়। নামটার মধ্যে একটা আনকমন ব্যাপার আছে। পলাশবরণ নয়, পলাশকুমার নয়, পলাশকুসুম। অবশ্য টিভিতে পলাশকুসুম কোন

টাইটেল ব্যবহার ট্যাবহার করে না। চলনা একদিন যাওয়া যাক। সামনের রবিবার চলো।

—রবিবার করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। ভাবছি একাই যাব।

—না গুরু। আমি তোমার সঙ্গে যাব। কারখানায় একদিন নাগা দিলে খুব একটা ক্ষতি হবে না। তাছাড়া প্রভাতদা তো এখনও আছে। ও তুমি চিন্তা কোর না। বউদিকে ম্যানেজ করে নোব।

—তুই নন্দিনীকে ভয় পাস?

—রামচন্দ্র। ভয় জিনিসটা আমার মধ্যে নেই। বউদিকে আমি দিদির চোখে দেখি। বউদিকে আমি ভালবাসি। তাছাড়া বউদিকে আমার বলাই আছে মাঝে মাঝে আমি দাদার সঙ্গী হব।

—কিন্তু আর একটা ফ্যাঁকরা আমায় নতুন করে ভাবাতে শুরু করল।

—কী?

নীল শর্মিষ্ঠার লেখা হাত চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, —এটা পড়।

চিঠিটা পড়ে দীপু বলল, বোঝ ঠ্যালা। তার মানে পলাশের কোন নতুন প্রেমিকা জুটেছিল। যেটা শর্মিষ্ঠা জানতে পেরে এই চিঠি লেখে। তা এ নিয়ে তোমায় নতুন করে ভাবনায় ফেলছে কেন?

—কী জানি কেন? একদিকে শর্মিষ্ঠাকে পাবার জন্যে নৃপেন সাহার হুমকি। অন্যদিকে পলাশের জন্য শর্মিষ্ঠার উদ্বেগ। কিন্তু ওকে খুনটা করল কে?

—গুরু, বহুৎ হচ্‌পচ্‌ কেস। এ শালা সল্‌ভ্‌ হবে না।

—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এমন সব বাঘা বাঘা গোয়েন্দা আছে যারা পঞ্চাশ একশো বছরের পুরনো জটিল রহস্যও ভেদ করে। ডিস্কভারি চ্যানেল তো দেখবি না। যতসব সস্তা চ্যানেলগুলোয় বস্তাপচা সিরিয়াল খুলে বসে থাকবি।

—আরে বাবা ওই বস্তাপচা সিরিয়ালের দৌলতেই তো তোমায় পলাশকুসুমের হদিস দিতে পারলাম। কোন কিছুই নেগলেক্ট করতে নেই।

—জ্ঞান দিচ্ছিস? দে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। নন্দিনীর ফোন। ওপাশ থেকে নন্দিনী তখন বলছে—

—নীল, তুমি আজ কোথাও বেরচ্ছ না তো?

—অন্তত আজ সন্ধেবেলা কোথাও বেরোব না। তা তুমি বাড়ি আসবে কখন?

—আমি গাড়ি থেকে তোমায় রিঙ্‌ করছি। এই যেতে যতক্ষণ। বেরিওনা। দরকার আছে।

নন্দিনী লাইন ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবার রিং টোন। এবার মানস চৌধুরী।

—মিস্টার ব্যানার্জি, আমি মানস চৌধুরী বলছি।

—হ্যাঁ বলুন। আমি তো আপনার ফোনের জন্যে উদগ্রীব।

—ঘন্যশ্যামকে আমার লোক দিনকতক ওয়াচ করছে। কিন্তু কোন নটোরিয়াস

অ্যাকটিভিটিজ নেই। কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আপনাকে জানানোর দরকার।

—হ্যাঁ সেটাই বলুন।

—মিসেস সাহা, আই মিন প্রতিমা সাহা,

—কী হয়েছে তাঁর?

—মহিলা এর মধ্যে একদিন ঘোষবাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলেন।

—গুড। হাউ?

—ওনার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। মেইন গেটের তালা খুলে উনি ভেতরে চলে যান।

—তারপর?

—প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদ বেরিয়ে আসেন। তালা বন্ধ করে নিজের বাড়ি ফিরে যান।

—আই সি। তা আপনার লোক ওনাকে কোন ডিসটার্ব করেনি তো?

—না।

—ওনাকে কী অ্যাবনরমাল বলে মনে হয়েছিল? মানে আপনার লোকের?

—অ্যাবনরম্যাল তো বটেই। নইলে ভরসন্ধেবেলা কেউ একা একা ও বাড়িতে যায়?

—তার মানে মহিলা প্রায়শই ও বাড়িতে যান। তাই অতগুলো তাজা পায়ের ছাপ। ঠিক আছে। আমি কলকাতার কিছু জরুরী কাজ মেটাই। তেমন প্রয়োজন পড়লে আমার মোবাইলে ফোন করবেন। নৃপেন সাহা কী করছে?

—কোন হেলদোল নেই। যথা পূর্বং তথা পরং।

—ঠিক আছে। খুব শীগগিরই দেখা হবে। দোল তো এসে গেল।

—দোল? আপনি এখনও দোল খেলেন নাকি?

—এবার খেলব। নৃপেন সাহার বাড়িতে।

ওপাশ থেকে হাসতে হাসতে মানস বললেন, —ও হ্যাঁ বুঝেছি। ছাড়লাম।

ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতেই দীপু দেখল নীলের ভ্রূ কুঁচকেছে।

—কী ব্যাপার গুরু? এনিথিং রঙ্?

—নীল বলল প্রায় স্বগতোক্তিতে, —হোয়াই?

—তার মানে?

—নৃপেন সাহার স্ত্রী একা একা ও বাড়িতে যান। এবং ওঁর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। কেন?

—পাগলের খেয়াল হ'তে পারে।

—পাগলের খেয়াল বলছিস? কিন্তু চাবি পেল কোত্থেকে? তাছাড়া নৃপেন সাহার তো চোখ এড়াবার কথা নয়। সেই বা কিছু বলে না কেন?

—সত্যিই নীলদা, এটা তোমার জীবনের সব থেকে বেশি জটিল কেস। যার আগা গোড়া কিছুই দেখা যায় না। কেবল ধোঁয়াশা ছাড়া।

নন্দিনী এসে পড়ল। ধপ্ করে সোফার ওপর বসে পড়ে বলল, —তুমি কী কাউকে আমার অফিসের ফোন নাম্বার দিয়েছিলে?

নীল একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, —অযথা তোমার ফোন নাম্বার দিতে যাব কেন?

—একটা লোক আমায় আচমকা ফোনে বলল, —মিসেস চ্যাটার্জি, আপনার হাজব্যাণ্ডকে বলুন এ কেস থেকে সরে দাঁড়াতে। নইলে ওর জীবনসংশয় দেখা দিতে পারে।

—তারপরই কে কী বৃত্তান্ত না জানিয়েই ফোনটা রেখে দিল, তাই তো?

—হ্যাঁ। ঠিক তাই।

—ডোণ্ট ওরি মাই ডিয়ার। এ রকম হুমকি ফোন আমার জীবনে অনেক পেয়েছি। আমার মনে হয় ভীমরুলের চাকেই নাড়া পড়েছে। ঠিক আছে, ও নিয়ে তুমি ভেবে না। আবার ফোন করলে বলে দিও আর হাজব্যাণ্ডকে যথারীতি জানিয়ে দিয়েছি।

—কিন্তু—

—আহ্ নন্দিনী। মনে রেখো তুমি নীল ব্যানার্জির সহধর্মিণী। আচ্ছা, শেষ কোথায় বলে একটা সিরিয়াল হয়। ডেইলি সোপ।

—হ্যাঁ, আলফা বাংলায়।

—তার মানে সিরিয়ালটা তুমি দেখ?

—প্রত্যেকদিন দেখা হয় না। হাতে কাজ না থাকলে দেখি। কেন বলতো?

—দীপু, ছবিটা একবার দেখাতো তোর বউদিকে।

দীপু ছবিটা এগিয়ে দেয়।

নীল বলল, —একটু মন দিয়ে দেখ তো?

—এতো পলাশকুসুমের ছবি বলে মনে হচ্ছে।

—একবার দেখেই বলে দিলে?

—পলাশকুসুম যে রোলটা করছেন, বাবার রোল। ফ্ল্যাশ ব্যাকে একবার মেকাপ দিয়ে ওর যৌবনকালের ঘটনা দেখিয়েছিল। একই রকম দেখতে। কেন এটা পলাশকুসুমের ছবি নয়?

—থ্যাঙ্ক ইউ নন্দিনী। তুমি আমার কাজটা অনেক হাল্কা করে দিলে। কীরে দীপু, তাই তো?

—বউদির আই সাইটটা ইদানিং দারুণ কাজ করছে। তোমার হবে বউদি।

—মারব একটি চড়।

—ঠিক আছে। সে মেরো। কাল আমি নীলদার সঙ্গে বেরোচ্ছি।

—তার মানে?

নীল বলল, —কালকের দিনটা ওকে একটু ছেড়ে দাও। আচ্ছা ক্যাজুয়াল লীভ বলেও তো একটা কথা আছে।

—চোরে চোরে মাসুততো ভাই হলে আমি আর কী করব? যা ভাল বোঝ কর।

বারো

এনটি ওয়ানে পৌঁছতে পৌঁছতে ওদের প্রায় দেড়টা বেজে গেল। মেইন গেটের সামনে গিয়ে দেখল বড় লোহার গেটটা বন্ধ। গেট লাগোয়া ছোট্ট একটা দরজা খোলা আছে। ওরা ভেতরে ঢুকে দেখল ভেতরটা বেশ গাছপালায় ভর্তি। একজনকে আসতে দেখে নীল জিগ্যেসকরল 'শেষ কোথায়' এর শুটিং কোথায় হচ্ছে।

লোকটা বলল, —এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। প্রথম যে ডানদিকের বাঁক ওখানে কাউকে জিগ্যেস করলেই বলে দেবে।

নির্দেশ মতো এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা ঘরের সামনে ছোট্ট একটা সাইন বোর্ডে লেখা আছে 'শেষ কোথায়'। এম. জি. প্রোডাকশন। মনে হল ওটাই অফিসঘর।

সরাসরি ভেতরে গিয়ে দেখল বেশ কিছু লোক বসে গল্প করছে। চা সিগারেট চলছে। নীল একজনকে জিগ্যেস করল, —পলাশকুসুম বাবুতো আপনাদের প্রোডাকশনে কাজ করছেন?

লোকটি বলল, —হ্যাঁ তা করছেন। তবে আজ তো ওনার কোন শ্যুটিং নেই। ওনার বাড়ি গেলে দেখা হতে পারে। তা আপনারা আসছেন কোথা থেকে?

নীল বলল, —সেটা বললেও আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। আচ্ছা ওনার বাড়ির নাম্বারটা পাওয়া যাবে?

লোকটি বলল, —আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজারের হুকুম ছাড়া আমরা কোন আর্টিস্টের হোম অ্যাড্রেস দিই না। আপনি বরং সুব্রতদা মানে প্রোডাকশনের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করুন।

—তিনি কোথায়?

—আপনারা বসুন। আমি দেখছি উনি কোথায় আছেন।

লোকটি চলে গেল। মিনিট পাঁচেক পর একজন হৃষ্টপুষ্ট টাকমাথার গুঁফো ভদ্রলোক এসে জিগ্যেস করলেন, —পলাশকুসুম বাবুকে কে খুঁজছেন?

নীল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, —আমি।

—ওঁকে কী দরকার?

—ব্যাপারটা পার্সোনাল।

—তা হতে পারে। কিন্তু উনি আজ নেই। ওঁর অফ ডে।

—সেটা শুনেছি। ওনার ঠিকানাটা যে দরকার।

—কিন্তু উনি তো আপনাদের কোন ডেট দিতে পারবেন না। উনি একসঙ্গে একটা বেশি দুটো সিরিয়ালে কাজ করেন না।

—আমরা যে কারণে ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই তার সঙ্গে সিরিয়ালের কোন সম্পর্ক নেই। আপনি নির্ভয়ে ওনার ঠিকানাটা দিতে পারেন।

—কারণটা জানতে পারলে খুবই ভাল হত।

—আমরা আসছি লালবাজার থেকে। এই আমার আই ডি কার্ড। এরপর নিশ্চয় আপনার অসুবিধা নেই ঠিকানা জানানোর।

ভদ্রলোর নীলের কার্ডটা একবার দেখে নিয়ে বলল, —কিন্তু উনি তো খুব রিজার্ভড আর নির্বিরোধী মানুষ। পুলিসের সঙ্গে তো—

অধৈর্য হয়ে নীল বলল, —আপনি ঠিকানাটা দিন। নইলে আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

এরপর ঠিকানা পেতে দেরি হল না। লেক গার্ডেন্সের একটা ঠিকানা। এন টি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওরা সোজা চলে এল লেকগার্ডেন্স। ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখল নেমপ্লেট। ডাঃ পলাশকুসুম রায়।

নেমপ্লেটটা দেখেই দীপু বলল, —নীলদা মিলে গেছে। শর্মিষ্ঠার ডায়েরিতেও লেখা ছিল পলাশ তখন সবে ডাক্তারি পাশ করেছে। এ একই লোক।

—দেখা যাক, বলে নীল বেল টিপল।

না কোন চাকর বা দারোয়ান নয়। একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মতো বয়েস হবে। বেশ শৌখিন চেহারা। দেখতেও সুন্দরী। মহিলা জিগ্যেস করলেন, —কাকে চাইছেন?

নীল বলল, —ডাক্তার পলাশকুসুম রায়কে।

—কারণটা আমায় বলতে পারেন। আমি ওনার স্ত্রী।

—নমস্কার। ব্যাপারটা একটু কনফিডেন্সিয়াল। আমরা ওনার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।

মহিলার একটু ভ্রূ কোঁচকালো। হঠাৎ ভেতর থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, —কে এসেছেন চন্দ্রা?

চন্দ্রা নামটা শুনেই নীল দীপু পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

দুম করে নীল জিগ্যেস করল, —আপনি মিসেস চন্দ্রা রায়। আই মিন নৃপেন সাহার মেয়ে?

চন্দ্রা একটু বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করল, —আপনি আমার বাবাকে চেনেন?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —তা একটু আধটু চিনি বৈকি।

ঠিক তখনই পলাশকুসুম এসে হাজির। অত্যন্ত সুপুরুষ। কাটাকাটা চোখ নাক চিবুক। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কিন্তু একটু বয়স্ক লাগে বিরল কেশের জন্যে। চন্দ্রা দেবী বললেন, —এঁরা তোমায় খুঁজছেন।

বলেই চন্দ্রাদেবী ভেতরে চলে গেলেন। বেশ ভারি আর গম্ভীর গলায় পলাশবাবু বললেন, —আ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর? হোয়াই? অ্যাম আই আ ক্রিমিন্যাল?

—কিন্তু আপনি জানলেন কী করে আমি একজন ইনভেস্টিগেটর?

—সুব্রত একটু আগে ফোন করেছিল। কিন্তু আমি তো অপরাধমূলক কাজ করিনি।

—না। আপনি ক্রিমিন্যাল কিনা সেটা আমি এখনও ডেফিনিট নই। কিন্তু একজন ক্রিমিন্যাল কে ধরার জন্যে আপনি আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারেন।

—আই সি। তা সাহায্যটা কী রকম?

—একটু বসতে পারলে আর আমাদের সামান্য কিছু সময় দিতে পারলে ভাল হত।

পলাশকুসুম কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, —বেশ আসুন আমার সঙ্গে।

পলাশকুসুম ওঁর সাজানো ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ভদ্রলোক যে শৌখিন আর বিত্তশালী সেটা ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়। ঘরের মধ্যিখানে একটা বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। চারদিকে প্রায় গোটা ছয়েক চেয়ার। দামি কাঠের। ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। এয়ার কুলার চলছে। চ্যাপলিনের একটা বিশাল ছবি। ওনার চেয়ারের পিছনে দিকে। অন্যদিকে শিশির ভাদুড়ি, উৎপল দত্ত, গিরীশ ঘোষ, নামিদামি আরও অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবি। রামকৃষ্ণের ছবিও আছে। র‍্যাকে বিস্তর বই। বেশির ভাগই নাটকের ওপর। ঘরের বাঁদিকে একটা ডিভান। সবুজ চাদর ঢাকা। ডিভানটা ইজি চেয়ারের মতো করে হাফ ফোল্ড করা আছে। ডিভানের পাশেই বেডসাইড টেবিল। একগ্লাস জল ঢাকা দেওয়া আছে।

পলাশকুসুম নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, —ঠাণ্ডা না গরম কোনটা নেবেন?

—নীল বলল, গরমে ঠাণ্ডাই ভাল। যদি না কোন অসুবিধা থাকে।

—নাহ, কোন অসুবিধা হবে না।

টেবিলের নীচে সম্ভবত বেল আছে। পুশ করতেই এবার একজন মধ্যবয়েসি চাকর এসে দাঁড়াল—পলাশ বললেন, দুটো পেপসি দিয়ে যা। আর আমার জন্যে—

—ঠিক আছে স্যার।

লোকটি বেরিয়ে যাবার পর দীপু সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল। পলাশকুসুম বলল, —সরি মিস্টার, আপাতত এই ঘরে সিগারেট খাওয়া যাবে না। তাছাড়া ও হ্যাবিট আমার নেই। প্যাসিভ স্মোকারও হতে চাই না।

দীপু সিগারেটটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখতেই পলাশকুসুম বললেন, —লেটআস কাম টু আওয়ার মেইন কনভারসেশন। বলুন, হাউ কুড আই হেল্প ইউ?

ভনিতা না করে নীল শুরু করল, — আপনার তো কল্যাণী সীমান্তে যাতায়াত আছে তাই না মিস্টার রায়।

—আমার শ্বশুরবাড়ি ওখানেই। তবে সেইভাবে যাতায়াত নেই।

—নেই? না করেন না?

—এটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ি যাওয়া না যাওয়া সেটা সম্পূর্ণ আমার নিজের ব্যাপার। সম্ভবত আপনি কোন তদন্তে এসেছেন। সেই অ্যাঙ্গেলেই প্রশ্ন করুন। জানা থাকলে উত্তর দোব।

—ঠিক আছে। তাহলে আপনাকে অন্য প্রশ্ন করি। শর্মিষ্ঠা ঘোষ, এই নামটা কী

আপনার স্মরণে আছে।

নীল আর দীপু দুজনেই দেখল এই একটা প্রশ্নে ভদ্রলোক বেশ বিব্রত হয়ে পড়লেন। নীরবে কিছুক্ষণ তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে থেকে পলাশকুসুম বললেন,

—এতকাল পরে আবার শর্মিষ্ঠা কেস? আপনি কি নতুন করে তদন্ত শুরু করেছেন।

—ধরুন তাই।

—কোন লাভ আছে কী? শর্মিষ্ঠা কী আর ফিরে আসবে?

—কারো মৃত্যু হলে সে আর ফেরে না। কিন্তু তার পেছনে থাকে একটা ইতিহাস। একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড। অকালে একটি মেয়েকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। সেই ঘৃণ্য লোকটাকে ডিটেক্ট করা তো একটা সামাজিক দায়িত্ব।

পলাশকুসুম আবার নিরুত্তর। সেই ফাঁকে নীল আবার প্রশ্ন করেন

—আমি জানি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আপনার একটা অ্যাফেয়ার্স তৈরি হয়েছিল। বোধহয় আপনাদের বিয়ের কথাও উঠেছিল, তাই না?

পলাশকুসুম তবু নিরুত্তর। নাকি কোন অতীতের কোন মর্মন্তুদ ঘটনাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন?

মানুষের এই দুর্বল মুহূর্তগুলোকে হাতছাড়া করতে নেই। নীল বুঝল এই মুহূর্তে সেন্টিমেন্টাল দাওয়াইটুকু একমাত্র অস্ত্র। ও বলল, —প্লীজ মিস্টার রায়। চুপ করে থাকবেন না। আমি জানি আপনি অনেক কিছু জানেন। শুধু মনে রাখুন, একটি নিষ্পাপ মেয়ে এবং তার পরিবার একই দিনে সামান্য সময়ের ব্যবধানে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। কেন? কী কারণে সেটা জানা কী দরকার নেই?

সোনালীরঙের বিয়ারে চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ বসে রইলেন পলাশকুসুম। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, —কেউ একজন চায়নি, শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক।

—কে সে?

—আমি ঠিক জানি না। কেবল মনে আছে রক্তাক্ত পরিণতিটা।

—কী রকম?

—সেদিন সন্ধেবেলা আমি গিয়েছিলাম ঘোষবাড়িতে। যাবার কথা ছিল বিকেলে। কিন্তু ট্রেনের গণ্ডগোলে যখন আমি গিয়ে পৌঁছই—

—কী দেখলেন?

—তখন প্রায় ছটা বাজে। গিয়ে দেখি সদর দরজা হাট করে খোলা।

—কী বললেন? দরজা খোলা ছিল।

—হ্যাঁ, একেবারে ওপন্।

—আশ্চর্য। তাহলে তালাটা কে দিয়েছিল?

—না। আমি কোন তালা দেখিনি।

—বেশ। তারপর?

—তারপর, সারা বাড়ি অন্ধকার। শর্মিষ্ঠার নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডেকেও ছিলাম। কোন শব্দ নেই। তারপর আলো জ্বালাতেই। উঃ কী বীভৎস দৃশ্য। একদিকের সোফায় বাবা মা অন্য দিকের সিঙ্গল সোফায় শর্মিষ্ঠা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। রক্তে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। আর দাঁড়াবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। আমি নিমেষে স্থান পরিত্যাগ করে সোজা ফিরে আসি কলকাতায়।

—সে কী? আপনি লোকাল থানায় ফোন করেননি?

—সরি। নিজেকে আমি কোন রকম ভাবেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়াতে রাজি ছিলাম না।

একটু চুপ করে থাকার পর নীল জিগ্যেস করল, —কিন্তু একটা ব্যাপার আমি ভেবে পাচ্ছি না, চন্দ্রা দেবীকে আপনি বিয়ে করলেন কীভাবে? এটাও কী লাভ?

—না, আমার দিক থেকে চন্দ্রার প্রতি কোন দুর্বলতা ছিল না। চন্দ্রা মাঝে মাঝে শর্মিষ্ঠার কাছে আসতো। শর্মিষ্ঠার থেকে চন্দ্রা কিছুটা জুনিয়র। বয়েসেও চন্দ্রা ছোট ছিল। চন্দ্রার তখন কতই বা বয়েস। সতেরো আঠারো। আমার প্রতি একটা দুর্বলতা চন্দ্রার গ্রো করেছিল সেটা আমি বুঝতে পারতাম। সেই কারণেই আমি শর্মিষ্ঠাকে বিয়ের জন্যে চাপ দিয়েছিলাম।

—তারপর?

—হঠাৎ একটা উড়ো চিঠি পাই। শর্মিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক নোংরা কথা লেখা ছিল সেই চিঠিতে।

—যেমন?

—ও নাকি এক কথায় ফ্লার্ট গার্ল। এর আগে অনেক ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। এমন কী নৃপেন সাহার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কেও লিপ্ত হয়েছিল। এবং প্রেগন্যান্ট।

—আপনি বিশ্বাস করেছিলেন?

পলাশকুসুম হাসলেন। তারপর বললেন, —ঈর্ষা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, এগুলো নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলা যায়। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে এগুলো আসবেই। আসেও। যারা অস্বীকার করে, যারা বলে সত্যিকার ভালবাসায় কখন অবিশ্বাসকে জায়গা দিতে নেই। তারা জানে না প্রেম কত বড় দুর্বল। একটুতেই সে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

—আপনি কী সেই কারণেই?

—না। চিঠিটা পাবার পর আমার মধ্যে তাৎক্ষণিক একটা রিঅ্যাকশন হয়েছিল। ভেবেছিলাম ওকে খোলাখুলি ব্যাপারটা জিগ্যেস করব। বোধহয় সেই কারণেই সেই সন্ধেতে আমার ওখানে যাওয়া। কিন্তু প্রশ্নটা প্রশ্নই থেকে গেল।

—কিন্তু চন্দ্রাদেবীকে বিয়ে করা?

—প্রায় তিনচারদিন পর খবরের কাগজে ঘোষবাড়ির মার্ডার কেসটা ফ্ল্যাশ হয়। তারপর নৃপেন সাহার গ্রেপ্তার হওয়া। ছাড়া পাওয়া। একসময় দেখলাম সব থিতিয়ে গেল।

প্রায় মাস ছয়েক পর একদিন প্রতিমা সাহা মানে আমার শাশুড়ি তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব রাখেন আমার মায়ের কাছে। আমার বাবা একটু উদারচেতা মানুষ। জাত ধর্মে তাঁর কোন ভেদাভেদ বিশ্বাস ছিলনা। তিনি রাজী হলেন। ছ মাসে শর্মিষ্ঠাও ধীরে ধীরে থিতিয়ে গেছে। তবু দোনামোনা করে বিয়েতে সায় দিয়ে দিলাম। হয়তো আমি সত্যিকার প্রেমিক নই। হয়তো সেই উড়ো চিঠি আমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। শর্মিষ্ঠা চলে যাবার পর নিজেকে খুব একা মনে হত। কী জানি, হয়তো সেদিনের মানসিকতা সব বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত চন্দ্রাকেই বিয়ে করেছিলাম। এক প্রেম ভুলতে বোধহয় আর এক প্রেমের দরকার হয়।

—এই খুনগুলো সম্বন্ধে আপনার কী কাউকে সন্দেহ হয়েছিল?

—তেমন ভাবে কিছু ভাবিনি। অবনী ঘোষ রাজনীতি করতেন। তাঁর রাজনৈতিক শত্রু থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে তো তিনি একা খুন হবেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে বা অন্যেরা কেন? শর্মিষ্ঠার, ধরে নিলাম তার কোন প্রাক্তন প্রেমিক ছিল, তাহলে তো শুধু তাকেই মারা হত। অন্যদের কেন? আসলে হয়তো কেউ চেয়েছিল পুরো পরিবারটাকে শেষ করে দিতে। সেটা কেন তা আমার পক্ষে তো বলা সম্ভব নয়।

—ভিসেরা রিপোর্টে পাওয়া যায় আগে ওদের সবাইকেই বিষ সরবৎ খাওয়ানো হয়েছিল। আসল মৃত্যুটা বিষ প্রয়োগেই ঘটে। আপনি তো ও বাড়িতে কয়েকবার যাতায়াত করেছিলেন। বাইরের কোন লোক গেলে কে আপনাকে চা বা অন্য কিছু সার্ভ করতো।

প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন পলাশকুসুম। তারপর ভাবতে ভাবতে বললেন, —ও বাড়িতে একটা কাজের মেয়েকে দেখেছিলাম।

—কী নাম?

—কে জানে?

—কেমন দেখতে মনে আছে?

—নাহ্, সেভাবে তো দেখা হয়নি।

—একটু মনে করার চেষ্টা করুন।

আবার ভাবনা। কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা। তারপর ঠোঁট উল্টে বললেন, —সরি, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

—ঠিক আছে, নীল বলল, —আপনাকে আর একটা অনুরোধ করব। যদি রাখেন।

—অসংগত না হলে নিশ্চয়ই রাখব।

—আপনার স্ত্রীকে সামান্য দুচারটে প্রশ্ন করব। যদি—

—ঠিক আছে। আপনি বসুন। পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পলাশকুসুম উঠে গেলেন। একটু পরে এলেন চন্দ্রাদেবী।

—বসুন ম্যাডাম।

বসতে বসতেই চন্দ্রাদেবী বললেন, —ওর কাছে শুনলাম আপনারা কী জন্যে এসেছেন।

কী জানতে চান বলুন?

—ঘোষ পরিবারে একদিনে পাঁচজন খুন হন। কোন আইডিয়া আছে, এতগুলো খুন কে করতে পারে?

—যে কেউ।

—মানে?

—অবনী জেঠু রাজনীতি করতেন। তাঁর আচার ব্যবহার নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই অসন্তোষ তৈরি করেছিল। এ ধরনের লোক যে কোন সময়ে খুন হয়ে যেতে পারেন। জেঠিমা অত্যন্ত মুখরা। যাকে তাকে যখন তখন অপমান করে দিতে তাঁর বাঁধতো না। শর্মিষ্ঠাদির অনেক ভাইসেস ছিল। আমার বাবাকে জড়িয়ে একসময় স্ক্যাণ্ডাল তৈরি হয়েছিল। টু স্পীক ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, আমার বাবা লোকটিও ভাল নয়। যে স্ক্যাণ্ডালটা হয়েছিল, তাতে আমার বাবা ইনভলভ্‌ড্ ছিলেন না সেটাও আমি হলফ করে বলতে পারিনা। বেম্পতির সঙ্গেও তো বাবার নোংরামির ইতিহাস আছে।

—তার মানে বেম্পতিকে আপনি চেনেন?

—ইয়েস, না চেনার তো কোন কারণ নেই। বেম্পতি ছিল ঘোষ জেঠুদের বাড়ির রাঁধুনি। তার কী দরকার পড়তো দুপুর বেলা নির্জনে আমার বাবার কাছে আসার?

—আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

—অন্যের মুখের ঝাল আমি খাইনা। কে চায় তার বাবার সম্বন্ধে নিন্দে করতে?

—তাহলে আপনি বলছেন সরবতে যে বিষটা মেশানো হয়েছিল সেটা বেম্পতির দ্বারাই হয়েছিল?

—ও মেয়ের দ্বারা সবই সম্ভব। টাকা দিয়ে ওই মেয়েকে যে কোন মুহূর্তে যেকোন লোক কিনে নিতে পারতো।

—কিন্তু বেম্পতির কোন ডাইরেক্ট মোটিভ ছিল না। তার মানে ধরা যেতে পারে কারো কথায় বেশ কিছু টাকার বিনিময়ে সেই সরবতে বিষটা মিশিয়ে দিয়েছিল।

—সেটাই আন্দাজ করা যেতে পারে। আই মিন অসম্ভব কিছু নয়।

—কিন্তু সত্তর বছরের বৃদ্ধা বা বারো বছরের ছেলেটি?

—জাতক্রোধ বলতে পারেন। অথবা প্রমাণ লোপ করা। দাঙ্গায় তো কত নিরপরাধও মারা যায়।

—আর একটা প্রশ্ন, বেম্পতি তো শুনেছিলাম রাতের খাবার তৈরি করে যেতো। তাহলে সে বিকেল বেলা কেন গিয়েছিল?

— বেম্পতি তো সর্বক্ষণই হয় ওদের বাড়ি নয়তো আমাদের বাড়ি পড়ে থাকতো। অবশ্য আমার মা, বেম্পতিকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু বাবার ভয়ে কিছু বলতে পারতেন না।

—আপনার মা আপনার বাবাকে ভয় করতেন?

—শুধু মা কেন, আমি আমার ছোট ভাই, সবাই বাবাকে ভয় করতাম।

—আপনার মায়ের পাগল হয়ে যাওয়ার কারণ কী সেটাই?

—আপনারা যে অর্থে একজনকে পাগল বলেন, আমার মা তা নন। উনি একটা অবসেশনে ভুগছেন। মাঝে মাঝে কিছু ইররেলেভেন্ট কাজকর্ম করে ফেলেন। আসলে আমার মা খুব অসুখী।

—সেটা আপনার বাবার জন্যে?

মাথা হেঁট করে চন্দ্রা বললেন, —বোধহয় তাই।

—আপনার স্বামী শ্বশুরবাড়ি যান না। আপনার কোন অনুযোগ নেই?

—আমি নিজেই যাই না। যেতে ইচ্ছে করে না। বোধহয় বছর দশেক ও বাড়ির ত্রিসীমানায় যাইনি। কেন, এই প্রশ্নটা করবেন না। প্লীজ।

—না। আর আপনাকে কোন প্রশ্নই করব না। আমার থেমে থাকা অনেক প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। বোধহয় আপনার সঙ্গে দেখা না হলে রহস্য রহস্যই থেকে যেতো। আজ চলি। পলাশকুসুমবাবুকে আমার আন্তরিক ধ্যনবাদ জানাবেন ফর হিজ কো অপারেশন।

তেরো

বাইরে বেরিয়ে নীল বলল, —চন্দ্রা দেবী জানেন।

সামান্য অবাক হয়ে দীপু বলল, —কী জানেন?

—ছটা খুনের পেছনে কার হাত আছে?

—কি করে বুঝলে?

—চন্দ্রা দেবী কেন বাপের বাড়ি যেতে চান না? সব বিবাহিতা মহিলারই বাপের বাড়ির দিকে একটা তীব্র আকর্ষণ থাকে। কিন্তু চন্দ্রাদেবীর নেই কেন? দশ বছর। কম কথা নয়।

—বোধহয় কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছে।

—কার সঙ্গে? বাবা, মা, নাকি ভাই ভায়ের বউ? ভাই বা ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে মেয়েরা বাপের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে না। কারণ বাবা মা বেঁচে আছেন।

—তাহলে হয়তো বাবা মায়ের সঙ্গে হতে পারে।

—নারে দীপু, ঠিক ঝগড়া নয়। অন্য কোন কারণ আছে। এবং কারণটা উনি বলতে নারাজ।

—তুমি কিছু গেইস করতে পারছ?

—বোধহয় পারছি। কিন্তু দুটো জায়গায় খটকা লাগছে।

—কী কী?

প্রায় নিজের মনে মনেই নীল বলল, —যদি তাই হয় তাহলে বেষ্পতিকে কে খুন করল?

—এই তো আবার হেঁয়ালি আরম্ভ করলে?

—হ্যাঁ হেঁয়ালি তো বটেই। এই পয়েন্টায় এসে আটকে যাচ্ছে। কাকে দিয়ে বেষ্পতিকে মারল?

—বুঝতে পেরেছি।

—কী বুঝেছিস?

—খুনিকে তুমি বোধহয় চিনতে পেরেছে। তাই এখন উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করেছ।

—উল্টোপাল্টা বকছি নারে। আমি ঠিক পথেই যাচ্ছি।

—আর একটা কী?

—নাহ্ এখন আর কোন কথা নয়। চল বাস এসে গেছে। এদিকে দোল পূর্ণিমাও এসে গেল। কালই আমি কল্যাণী সীমান্তে যাচ্ছি। কয়েকদিন থাকতে হবে।

—কলকাতার কাজ শেষ?

—মনে হচ্ছে।

আর কোন কথা হল না। নীল এখন অস্বাভাবিক গম্ভীর। বাস থেকে নেমে দীপু বলল, —শেষ মুহূর্তে আমাকে সঙ্গে নেবে না?

—নাহ্। সাইকেল হাউসটা কী ডকে তুলতে চাস? জানিস না তোর বউদি নতুন করে কত টাকা ইনভেস্ট করেছে?

ব্যাজার মুখে দীপু বলল, —খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে।

পরের দিনই নীল চলে এল মানস চৌধুরীর ডেরায়। মানস বললেন,

—কদ্দূর মিস্টার ব্যানার্জি?

—তার আগে বলুন, এদিকের খবর কী?

—কী খবর চান?

—প্রতিমা দেবী কী আর ও বাড়িতে গিয়েছিলেন?

—আর একদিন গিয়েছিলেন।

—সন্ধের দিকে?

—হ্যাঁ।

—কতক্ষণ ছিলেন?

—প্রায় ঘণ্টাখানেক।

—ঘনশ্যাম দাসকে কোন ইন্টারোগেট করেননি তো?

—না। আপনি তো বারণ করলেন।

—লোকটা বাইরে বেরোয়?

—হ্যাঁ। বেরোয়। বাজার টাজার ওই করে।

—লোকটাকে কিডন্যাপ করতে হবে।

—সে কী? আপনি বলছেন?

—শুধু জানতে হবে বেস্পতি খুনের দিন ও কোথায় ছিল? আমার যদ্দুর ধারণা খুনটা ওই করেছে।

—কিন্তু বিজয়ের কথা অনুসারে লোকটার মাথায় ঝাঁকড়া চুল ছিল।

—ঝাঁকড়া চুলে ন্যাড়া হওয়া যায়, কিন্তু বিকচ মাথায় তো ঝাঁকড়া চুল আনা যায় না। যদি না পরচুল পড়ে। আর পরচুল পড়ে মার্ডার করার রিস্ক নেবে না।

—ঠিক আছে। আমার কাজ আমি করব। একটা আলোড়ন হবে। নৃপেন সাহা তো চুপচাপ বসে থাকবে না।

—তা থাকবে না। সেটা কী ভাবে ম্যানেজ করবেন নিশ্চয় আপনাকে বলে দিতে হবে না।

—ওয়েল। আমি বুঝেছি। আর আপনি?

—ঠিক সময় ঠিক জায়গায় আমি থাকব।

—আপনার কোন লোকজন দরকার?

—প্রয়োজন হলে জানাব।

* * *

দোল পূর্ণিমার আগের সন্ধ্যা। একটা মাথা ঝাঁকড়া বাব্‌লা গাছের নীচে নীল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে। আজ ইংরেজী মাসের আঠারো তারিখ। আজ থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে আঠারো তারিখের বিকেলে ঘোষ বাড়ির পাঁচজনকে খুন করা হয়েছিল। ইচ্ছে করেই নীল আঠারো তারিখটাকেই টার্গেট করেছে। নীলের পাশে দাঁড়িয়েছিল বিজয়। বিকাশ তালুকদারকে দিয়ে স্পেশাল পারমিশন করিয়ে ওকে এখানে আনিয়ে নিয়েছে। ওর মাতৃহত্যাকীরকে তো ওর চেনা দরকার।

একসময় বিজয় জিগ্যেস করল, —আর ইউ সিওর নীলকাকু? কাল দোল। ওদের বাড়িতে উৎসব। সেই সব ছেড়ে—

—একটা চান্স নিয়েছি। আজকের তারিখ কতো? আঠারো?

—হ্যাঁ।

—তোমার মায়ের মৃত্যু এবং ঘোষ পরিবারের নিধন ওই আঠারো তারিখেই হয়েছিল?

—তাই?

—এমন একটা স্মরণীয় দিন। একটু ওয়েট করনা।

—আমার কোন অসুবিধা নেই। আপনার জন্যেই বলা।

নীল ওর কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, —কী দেখছ সামনে?

—আরে হ্যাঁ। তাই তো। নৃপেন সাহা! তার মানে?

—আর একটাও কথা নয়। শুধু দেখে যাও। তোমার সার্ভিস রিভলভার সঙ্গে আছে।

—হ্যাঁ কাকু।

—ওয়েল। এবার দেখে যাও কী হয়।

নৃপেন সাহা এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছড়াতে ছড়াতে সোজা এগিয়ে গেলেন ঘোষবাড়ির প্রধান ফটকের কাছে। এখন পূর্ণ জ্যোৎস্না। ঘন অন্ধকার সরে গেছে। একটু দূর হলেও অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দরজা ঠেলে দিতে খুলে গলে। নৃপেন সাহা ঢুকে যাবার পরই দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

বিজয় জিগ্যেস করল, —নৃপেন সাহার এখানে কী কাজ?

—আছে। আছে। রিস্ক্ নিয়ে কী কেউ সাপের কামড় খেতে আসে। চল, দেখি আবার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল কিনা কে জানে।

নাহ্, ভেজানোই ছিল। আগের দিনের মতো ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ করল না। খুব সতর্ক পদক্ষেপে ওরা ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ বিজয় বলল, —কে যেন কাঁদছে?

নীল বলল, —পরিতাপের কান্না। যতদিন বেঁচে থাকবেন ওঁকে এই কান্নাই কেঁদে যেতে হবে। এখন চল। সম্ভবত অবনী ঘোষের মা যে ঘরে থাকতেন আওয়াজটা সেই ঘর থেকেই আসছে। তবে খুব সাবধান। নানান পোকামাকড় তো আছে। সাপ বিছে থাকাও বিচিত্র নয়। গরমে আবার ওরা বেরিয়ে পড়ে। বাদুড় চামচিকেও পাবে। কিন্তু টর্চ জ্বালাতে পারবে না। সিঁড়ি ভাঙা। অনেক জায়গায় কয়েকটা ধাপ ধ্বসেও গেছে।

—ঠিক আছে নীলকাকু, আমি ঠিক এগিয়ে যাব। আপনি একটু সাবধানে চলুন।

নীলের অনুমানই ঠিক। ওরা গিয়ে অবনীবাবুর মায়ের ঘরের পাশে দাঁড়াল। ভেতর থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, —তুই নিজেও মরবি আমাকেও মারবি। ফের তুই এখানে এসেছিস কেন? জানিস না, একটা টিকটিকি সমানে আমার পিছু নিয়েছে।

যিনি কাঁদছিলেন তিনি সমানে ফুঁপিয়ে চলছেন।

—তোর এই ন্যাকা ন্যাকা কান্না থামাবি, নাকি একেবারে থামিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

হঠাৎ কান্না থেমে গেল। তারপর একটা হিস্ হিস্ শব্দ। কেউ যেন ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলছে—যা, যা এখান থেকে। তুই কে? কী করতে এসেছিস এই যমপুরীতে? যা বলছি, নইলে দেখেছিস, আমার হাতে কী আছে?

নীল আর বিজয় জানলার পাশে লুকিয়ে ছিল। খুব আলতো করে খড়খড়ি তুলে দেখল পিছন ফিরে নৃপেন সাহা দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতের টর্চের আলো পড়েছে এক মহিলার মুখে। লালপাড়া সাদা শাড়ি। রুক্ষ্ম এলোমেলো চুল। মহিলার চোখ যেন জ্বলছে।

বিজয় ফিসফিস করে বলল, —নীলকাকু, ইনি তো মিসেস সাহা। এর আগে আমি ওঁকে দেখেছি।

নীলও নিম্নস্বরে বলল, —আমি জানি। আর কোন কথা বোল না।

মহিলার ভঙ্গী তখন উদ্ধত। হঠাৎ হাতটা তুলতেই দেখা গেল হাতে একটা কাটারি। নৃপেন সাহার দিকে তেড়ে আসার ভঙ্গীতে বললেন, —এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন? দেখছিস আমার হাতে কী? সেদিনের মতো এক কোপে শেষ করে দোব। যা, যা বলছি।

নৃপেন সাহা বললেন, —ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। তুই চল।

মহিলা আগের মতোই ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন, —এঃ কে আমার এলো? ওর কথা শুনে আমায় যেতে হবে। আমি এখানে থাকব। তাদের জন্যে আমি কাঁদব। তুই কে রে? ও হ্যাঁ, এবার চিনেছি। তুই তো সেই শয়তানটা....যা ভালো চাস তো এখান থেকে যা, নইলে—

মহিলা এবার সত্যিই ধারালো কাঠারিটা তুলে এগিয়ে এলেন। নৃপেন সাহা ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসে বললেন, —নাহ্, তোর দিন শেষ হয়ে এসেছে। ঘনশ্যামটা যে কদিন ধরে কোথায় গেল। আসুক ঘনশ্যাম, পাশের পচা পুকুরে তোকে জ্যান্ত চুবিয়ে মারব।

নৃপেন সাহা খড়মের খট্ খট্ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন। বিজয় জিগ্যেস করল,

—কাকু এবার কী করবেন?

—কোন রকম শব্দ না করে শুধু দেখে যাও মহিলা কী করেন।

আগের মতোই খড়খড়ি সামান্য তুলে দুজনেই ঘরের মধ্যে চোখ ফেলল। দরজা খোলা থাকায় বাইরে থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। মহিলা তখন একা একা ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন। বিড়বিড় করে কী সব বকছেন। একসময় ঘরের একদিকে থাকা ঠাকুরে বড় সিংহাসনের সামনে গিয়ে বসলেন। তারপর সিংহাসনের পাশে থাকা সেই মোমবাতিটা নিয়ে জ্বালালেন। ধীরে ধীরে ফিরে এলেন অবনী ঘোষের মায়ের বিছানার কাছে। মোমবাতিটা পাশে রেখে আসন পীড়ি হয়ে বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ ভঙ্গীতে বসে রইলেন। তারপর হঠাৎই গুমরে কেঁদে উঠে বলতে থাকলেন, —মা, আমায় ক্ষমা কর মা। আমায় ক্ষমা কর। এ আমি চাইনি। বিশ্বাস কর এ আমি চাইনি।

—চাওনি যদি তাহলে আমার পরিবারটাকে শেষ করে দিলে কেন?

অদ্ভুত এবং অলৌকিক এক পুরুষ কণ্ঠস্বরে বিজয় পর্যন্ত চমকে উঠল। বিজয়ের মনে হল কে যেন বহুদূর থেকে কথাগুলো হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নীলকে ডাকতে গিয়ে দেখে নীল সেখানে নেই। বিজয় কিছুতেই বুঝতে পারল না এ রকম ভুতুড়ে কণ্ঠস্বর আসছে কোথা থেকে। বেশি ঔৎসুক্য না দেখিয়ে ও এরপরের ঘটনাটা লক্ষ্য করে চলল। আবার সেই কণ্ঠস্বর, —কী হল, চুপ করে আছ কেন?

তন্ময়ে আবিষ্ট ভঙ্গীতে প্রতিমা দেবী উঠে দাঁড়ালেন। চারদিক দেখতে দেখতে জিগ্যেস করলেন, —কে? কে তুমি?

—কণ্ঠস্বরটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে? মাত্র চব্বিশ পঁচিশ বছর তো কেটেছে।

—অবনীদা?

—তাহলে চিনতে পেরেছ? পাগলের ভান করে আছ কেন? তুমি তো পাগল নও।

—পাগলের ভান না করলে কবেই তো আমাকেও আপনাদের কাছে চলে যেতে হত।

—সেটাই তো ভাল হত। তাহলে আর আমার পোড়ো বাড়িতে বারেবারে তোমায় ছুটে আসতে হত না। কাঁদছ কেন? পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে?

—হ্যাঁ...হ্যাঁ...তাই। সারাজীবন কেঁদেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

—কিন্তু খুনগুলো করলে কেন?

—সে সব অনেক কথা। কী হবে সে কথা জেনে?

—জানতো স্বীকারোক্তিতে পাপস্খলন হয়। সব ধর্মে একই কথা বলে।

—অবনীদা, তুমি বলছ, আমার পাপমুক্তি ঘটবে?

—আমাকে কেন মেরেছিলে?

—তোমাকে আমি মারতে চাইনি। আমার স্বামী ওই নরপশুটা তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। তুমি ওর অনেক চুরি ধরিয়ে দিয়েছিলে পার্টির কাছে। আমার স্বামী একদিন আমার কাছে এসে বলেছিল অবনীকে সরিয়ে দিতে হবে। আর সে কাজটা করতে হবে আমাকে।

—তুমি তো এত স্বামীভক্ত কোনদিনও ছিলে না?

—অকথ্য অত্যাচার করতো। তার ওপর তোমার বউ। মায়া। তোমাকে আমাকে নিয়ে নানান কুৎসা ছড়াতে শুরু করল, সংসারে আমার ছেলে মেয়ে সবাই আমার দিকে বিষনজরে তাকাতো। আসল রাগটা ছিল আমার মায়ার ওপর। তোমাকে আমি দাদার চোখে দেখতাম। কিন্তু...তারপর আমার স্বামী একদিন সকালে বড় বোতলে কিছু থকথকে জিনিস এনে আমায় বলল ওটা বেম্পতিকে দিয়ে সরবতে মিশিয়ে দিতে... চারদিকে এত লোকের এত কথা, এত নিন্দে, আমার মাথার ঠিক ছিল না। লোকনিন্দা বড় ভয় করে।

—কিন্তু শর্মিষ্ঠা?

—ওই হতভাগীই তো সব নষ্টের মূল। বাপের বয়েসি একটা লোকের সঙ্গে তুই শোয়া বসা করছিস। তার সঙ্গে বেলেল্লাপনা করছিস? অবনীদা তোমার মেয়েটা ভাল ছিল না। তার ওপর ও যখন পলাশের দিকে নজর দিল, পলাশকে বিয়ে করতে চাইল তখন—

—কেন? পলাশের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার ভাব ভালবাসা আগেই হয়েছিল?

—মিথ্যে কথা। ওই নষ্টা মেয়ে ভালবাসার কী বোঝে? চন্দ্রার সঙ্গে পলাশের সম্পর্ক আছে জেনেই ও ইচ্ছে করেই নিজের রূপে পলাশকে বাঁধতে চেয়েছিল, এমন কী বিয়েটাও পাকা করে ফেলেছিল। না, শর্মিষ্ঠার জন্যে আমার কোন দয়ামায়া ছিল না। আজও নেই।

—ভাল কথা। কিন্তু আমার সত্তর বছরের বুড়ি মা। বারো বছরের একফোঁটা ছেলে? কী দোষ করেছিল তারা?

—পাপ। ওটাই আমার সব থেকে বড় পাপ। তাইতো আমি মায়ের ঘরে এসে সময় পেলেই কাঁদি। কিছুটা হাল্কা হবার চেষ্টা করি।

—সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পরও আবার কাটারির কোপ দেবার কী দরকার ছিল?

—সে আমি নইগো অবনীদা, সে সবব করেছে ওই নরপশুটা। বিষে যদি না মরে তাই ঘনশ্যামকে দিয়ে বাকি কাজটা করে নিয়েছিল।

—আর বেম্পতি? সেটাও কী ঘনশ্যাম?

—আর কে হবে? ওই তো ওর ডানহাত। ও আর একটা শয়তান। এখন মাথা মুড়িয়ে বৈষ্ণব হয়েছে।

—অর্থাৎ প্রমাণ লোপের জন্যেই বেম্পতিকে খুন করা হল?

—বোধহয় তাই। বেম্পতি তো ছিল আমার স্বামীর পড়ে পাওনা চোদ্দ আনা। কয়েক্টা টাকার বিনিময়ে নৃপেন সাহা তো ওকে নিয়ে আমার সামনেই...অবনী দা...অবনী দা...তুমিই বল না, সব পাপ আমার একার....অবনীদা...অবনীদা...কথা বলছা না কেন...তুমি কী আছো...অবনীদা....।

আর কোথাও কোন সাড়া নেই। সারা ঘরটা আবার ডুবে গেল নৈঃশব্দে। তারপরই একটা ধপাস শব্দ। বিজয় দেখল জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেছেন প্রতিমা সাহা। বিজয় ঠিক বুঝতে পারছিল না এই মুহূর্তে তার কী করা দরকার। হঠাৎ পিঠে আলতো ছোঁয়া অনুভব করে মুখ ঘুরিয়ে দেখল নীল। নীল বলল, —চল বিজয়। আমার কাজ শেষ। আর এখানে দাঁড়ানোর দরকার নেই।

ভাঙাচুড়ো দোতলা বেয়ে ওরা যখন ঘোষবাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল আকাশে তখন পূর্ণচাঁদের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সমস্ত ঘটনায় বিজয় হতচকিত। কোন মতে সে জিগ্যেস করল, —এতক্ষণ কী শুনলাম নীলকাকু? অবনী ঘোষের প্রেতাত্মা এলো কোত্থেকে? এরকম হয় নাকি?

নীল হেসে বলল, —এটা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। প্রেতাত্মা আবার কী? এসব আছে নাকি?

—তাহলে?

—গেম অব্ ভেনট্রিলোকুই। বৈজ্ঞানিক কৌশল। অনেকদিন আগে এক ম্যাজেশিয়ানের কাছে শিখেছিলাম। পাশ থেকে কথা বললেও মনে হবে কেউ যেন অনেক দূর থেকে কথাগুলো বলছে। আর হাতের কৌশলে কিছু ইকো এফেক্ট।

—তা নয় হল। কিন্তু এসব প্রমাণ করবেন কী করে? নৃপেন সাহা তো বলবেন ওর স্ত্রী পাগল। পাগলের কথা আইন তো মানবে না।

মৃদু হেসে নীল পকেট থেকে একটা ছোট্ট টেপ বার করল। তারপর বলল, বঙ্কিম বলে একটা ছেলে আজ থেকে বহুবছর আগে এই যন্ত্রটা আনিয়ে দিয়েছিল। জাপানি জিনিস। আজও সমানে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজিতে জাপান অনেক এগিয়ে গেছে। থানায় গিয়ে যখন টেপটা চালাব বুঝবে যন্ত্রটার মাহাত্ম্য কী?

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই বিজয় ঢিপ করে নীলের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

নীল বলল, —এর মানে?

বিজয় বলল—গুণী মানুষকে তো কিছু দেবার যোগ্যতা আমার নেই। নেবার আছে। আর কিছু না হোক পায়ের ধুলোটা তো আছে।

নীল বলল, —তুমি দীপুর থেকেও পাগল।

বিজয় বলল, —কিন্তু নীলকাকু, এরপর?

নীল বলল, —কাল তো দোল পূর্ণিমা। কীর্তনের আসর বসবে নৃপেন সাহার বাড়ি। বোধহয় কালও তোমার ফেরা হবে না। মানসের ওখান থেকে আমি বিকাশবাবুকে ফোনে সব বলে দেবো।

চোদ্দ

কীতনের আসর বসেছে নৃপেন সাহার বিশাল হলঘরে। এ ঘরটায় আগের দিন নীল আসেনি। মেঝেয় সাদা ফরাস পাতা। দোল উৎসবের দিন। অনেক গণ্যমান্য অতিথিও আছেন। সাদামাটা গ্রামবাসীঁও আছে। আসরের মধ্যিখানে তখন খোল আর খঞ্জনীর শব্দমাহাত্মে মুখর। মূল গায়েন আর দোহারদের সমবেত শব্দলহর শব্দদূষণের মাত্রা ক্রমাগত ছাপিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য সে সব নিয়ে ভক্তকূল মোটেও চিন্তিত নয়। ঘনশ্যাম আজ নেই। ভক্তকূলই সব কিছু ব্যবস্থা করেছেন। নৃপেন সাহার পুত্র আর পুত্রবধূকেও দেখা গেল অতিথি আপ্যায়নে।

আসরের এক প্রান্তে উজ্জ্বল আলোকবৃত্তের ঠিক নীচে একটি ছোট্ট মঞ্চ। তার পিছনে মহাপ্রভুর সেই বিশাল ছবিটি। মালা আর চন্দনে ভূষিত। তারই পদতলে, মঞ্চটির ওপর বসে আছেন স্বয়ং নৃপেন সাহা। ভক্তি গদগদ চিত্ত। অর্ধনিমীলিত নেত্র। দুই করলতলে তাল ঠুকে চলেছেন। পাশেই বসে আছে নীল। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি। নীলও ভক্তি গদগদ।

কীর্তন তখন তুঙ্গে। আসরের মধ্যে তখন ভক্তকূল আকুল আবেগে দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে নৃত্যরত।

ঠিক তখনই নৃপেন সাহা অনুভব করবেন তাঁর কোমরে কিসের যেন খোঁচা। বাঁদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন নীল তখনও ভক্তি রসে আপ্লুত। কিন্তু তার হাতে এমন কিছু আছে যেটি তার কোমরে আটকে আছে। মাথা নীচু করে দেখলেন, একটি আগ্নেয়াস্ত্র। রিভলবার।

নৃপেন সাহা কিছু বলতে চাইছিলেন। তার আগেই নীল বলল, —এখন যে গাত্রোত্থান করতে হচ্ছে সাহামশাই।

—এর অর্থ?

—একবার ওপরের ঘরে যেতে হবে।

—কারণ?

—সেখানে গেলেই বুঝবেন। না, এখানে চেঁচামেচি করলে ভক্তকূল আপনাকে নিয়ে

বিব্রত হয়ে পড়বেন। সেটি আপনার পক্ষে শোভনীয় হবে না। নিন, উঠে পড়ুন। সময় খু অল্প। তাছাড়া পুলিস সারা বাড়ি ঘিরে রেখেছে।

রোষকষায়িত নেত্রে একবার নীলকে দেখে নিয়ে বললেন, প্রায় বিড়বিড় করে, —ঘনশ্যামটাকে হাতের কাছে পেলে—

—পাবেন। সময় মতোই দেখা পাবেন। কেউ কেউ এদিকে তাকাচ্ছেন। ওদের কিছু বুঝতে না দেওয়াই ভাল।

অগত্যা নৃপেন সাহাকে আসর ত্যাগ করতেই হল। এরপর সোজা দোতলার ঘরে। মানস চৌধুরীও আসরে ছিলেন। সাদা পোশাকে। তিনিও চলে এলেন। বিজয়ও।

দোতলার ঘরেও আলো জ্বলছিল। ঘরে তখন কেউ ছিল না। ঘরে ঢুকেই নৃপেন সাহার ছদ্মখোলস খসে পড়ল। বললেন, প্রায় হুঙ্কারের ভঙ্গীতেই, —আমার জীবনে তোমার মতো অনেক টিকটিকি আমি দেখেছি। তোমার এসব নাটক করার মানে কী? কী চাও তুমি?

ওসব কথায় কর্ণপাত না করে নীল বলল, —চ্যাঁচামেচি করে কোন লাভ হবে না মিস্টার সাহা। আগেই বলেছি, সারা বাড়ি পুলিস ঘিরে রেখে দিয়েছে। বাড়িতে অতিথি সমাগমও প্রচুর। অন্তত তাদের সামনে নিজের মানটুকু বজায় রাখতে গেলে আমি যা বলি সেগুলো শুনুন।

—হ্যাঁ, সেটাই তো আমি জানতে চাইছি। বক্তব্যটা কী তোমার?

—প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করেন?

—ওসব আমার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। কোনদিন করিওনি।

—আমি প্ল্যানচেট করতে পারি। মৃত আত্মাকে এই ঘরের মধ্যে এনে তার স্বীকারোক্তি শোনাতে পারি।

—বোগাস। ওসব আবার হয় নাকি?

—হয়। এখুনি তার প্রমাণ পাবেন। মানসবাবু, ঘরের বাতিগুলো সব নিভিয়ে দিন। দরজা জানলাও সব বন্ধ করে দিন। কীর্তনের আওয়াজ আবার আত্মারা সহ্য করতে পারে না।

মানস তাই করলেন। অন্ধকার নেমে এল সারা ঘরে। নীল বলতে শুরু করল —আজ থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে অবনী ঘোষের বাড়িতে পাঁচটা খুন হয়েছিল আঠোরোই জুলাইয়ের দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে।

অন্ধকারেই নৃপেনসাহার গলা শোনা গেল—পুরনো কাসুন্দি। টকে গেছে।

—কিন্তু 'টক'টা থেমে যায়নি। জানেন তো পুরনো পাপের ছায়া বেশ লম্বা হয়। আর অতীত কথা বলে। কেবল শুনে নিতে হয়। এবার সেটাই শুনুন। আমি অবনী ঘোষের আত্মাকে আহ্বান করছি।

অন্ধকারের মধ্যেই নীলের গলা ভেসে এল—

—অবনী ঘোষ আপনি এই মুহূর্তে আপনার অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে অশরীরে যেখানে বিচরণ করুন, এখানে আসুন...এখানে আসুন...এখানে আসুন...খুলে দিন আপনার হত্যা রহস্যের জাল। আপনি কী চান না আপনার হত্যাকারী ধরা পড়ুক। ভুলে যাবেন না। আপনার নিরীহ মা, নিরীহ বালকপুত্র কীভাবে মৃত্যুবরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল....অবনী ঘো...ষ অবনী ঘো...ষ... অবনী ঘো..ষ...আপনি আসুন....আসুন...আসুন...।

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। আবার নীলের গলা পাওয়া গেল, —আপনি যদি এসে থাকেন, সামান্য কিছু শব্দ করিয়ে জানিয়ে দিন।

মাত্র দু সেকেণ্ড পরই কট্ করে একটি শব্দ হল। শব্দটা আর কিছুই নয়। টেপ চালানোর আওয়াজ। শুরু হলো ভেন্ট্রিলোকুইজিমের সম্মোহিনী খেলা। বাজতে শুরু করল আগের সন্ধেতে ঘোষ বাড়িতে টেপ করা নীল আর প্রতিমা সাহার কথোপকথন।

একসময় টেপ শেষ হল। আবার কট্ শব্দ! কেউ কিছু কথা বলার আগেই নীল বলল, —অবনীবাবু...আপনি কী চলে গেলেন?

না, এ প্রশ্নের কোন জবাব এল না। নীল বলল, —উনি চলে গেছেন। মানস বাবু আলোটা জ্বালিয়ে দিন।

আলো জ্বালতে দেখা গেল মাথা নীচু করে বসে আছে নৃপেন সাহা। তার দুদিকে মানস আর বিজয়।

মুখে মিটিমিটি শ্লেষের হাসি ফুটিয়ে নৃপেন বললেন —ওহে টিকটিকি, এসব চালাকি আমার অনেক জানা আছে। টেপের শব্দ আমার চেনা। আর অবনীদার গলার আওয়াজও আমার খুব পরিচিত।

—নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। টেপের আওয়াজ যেমন আপনার চেনা, অবনী ঘোষের কণ্ঠস্বরও আপনার চেনা। মাত্র চব্বিশ পঁচিশ বছরের পুরনো কণ্ঠবব যার এমন স্মরণে থাকে, তার পক্ষে নিজের স্ত্রীর কণ্ঠস্বরটাও নিশ্চয় ভুলে যাবার কথা নয়।

—ওতো একটা পাগলি। পাগলিটাকে অনেকদিন আগেই আমার পাগলাগারদে দিয়ে আসা উচিত ছিল।

—শয়তানও মাঝে মাঝে বিরাট ভুল করে ফেলে।

—আমার স্ত্রী কোথায়? কাল থেকে সে বাড়ি নেই। কী প্রমাণ করবে তাকে আর না পাওয়া গেলে।

এবার মানস বললেন, —আপনি নির্ভয়ে থাকুন মিস্টার সাহা। যদিও আপনি চেষ্টা করেছিলেন দোলের পরই আপনার স্ত্রীকে ঘনশ্যামের সাহায্যে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু উপায় নেই। ঘনশ্যাম সে কথাও স্বীকার করে ফেলেছে। আপনার স্ত্রী বহাল তবিয়তে আছেন। সুস্থ আছেন। দিব্বি খাওয়া দাওয়া করছেন। এবং যথা সময় তিনি কোর্টে হাজিরা দেবেন। এবং টেপের কথাগুলো যে তাঁর সেটি তিনি নিজের মুখেই বলবেন। এবং এও বলবেন তিনি পাগল নন। তাকে পাগল সাজিয়ে রেখেছেন। মাঝে মাঝে খুন করারও চেষ্টা

করেছেন। কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জিতো বললেন, শয়তানও মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলেন।

মানস থামতেই নীল বলল, —আর একজনও সেই কথাই বলবেন।

—কে?

—আপনার একমাত্র মেয়ে চন্দ্রা রায়। রাগে, দুঃখে, অভিমানে এবং আপনার প্রতি চরম ঘৃণায় যিনি এ বাড়িতে আর আসেন না।

—রাসকেল। ওই মেয়েটাই হচ্ছে আমার জীবনের শনি।

—আপনার মতে। চলুন, এবার ওঠা যাক। ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট। নিজের হাতে একটাও খুন না করলেও খুনগুলো অপানিই করিয়েছিলেন। খুন যে করে আর খুন যে করায় শাস্তির বহরটা কার বেশি সেটা আদালতই ঠিক করবে। দেখুন এবার বেরিয়ে আসতে পারেন কিনা। মানসবাবু কিন্তু নব্বই দিনের আগেই আদালতে চার্জশীট দাখিল করতে পারবেন। তাহলে মানসবাবু—

মানস এগিয়ে গিয়ে নৃপেন সাহার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

নীল আবার বলল, —সামনে দিয়ে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। যতই হোক নৃপেন সাহা বলে কথা। চলুন খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাই।

চন্দ্রালোকিত মাঠ দিয়ে পুলিস বাহিনী যখন নৃপেন সাহাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে রাস্তাঘাট তখন শুনশান। কেবল কীর্তনীয়াদের তারস্বর ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যেতে লাগল।

নৃপেন সাহার খবরটা কাগজে বেরিয়ে যাবার পরদিন দুপুরে নীল ফোন করল ডাক্তার পলাশকুসুম রায়ের বাড়ি। পলাশকুসুম ছিলেন না। 'শেষ কোথায়' এর শুটিংএ গেছেন। ধরলেন ওঁর স্ত্রী। নীল বলল. —নীল ব্যানার্জি বলছি, আই অ্যাম সরি মিসেস রয়। আপনি কেন সেদিন একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চান নি সেটা আমি বুঝি। কোন মেয়েই কী পারে তার বাবার দুষ্কর্মের কথা কাউকে বলতে? এবার আপনি ফিরতে পারেন। আপনার ছোট ভাই আর তার স্ত্রী একা হয়ে পড়বেন। ওরা কিন্তু আপনার মতোই সম্পূর্ণ নির্দোষ।

নীল ব্যানার্জি। [illegible] নীলাঞ্জন ব্যানার্জি। গোয়েন্দা হবার কোন পরিকল্পনাই তার [illegible] ছিল না। [illegible] জীবনে সে ছিল আর [illegible] বাঙালি ছেলের মতো। তবে সাধারণের থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি [illegible]। তার অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রখর। পৈতৃক একটা ব্যবসা ছিল। জমাটি ব্যবসা। ব্যবসাটা [illegible] চালাতে পারলে তাকে অন্য কিছু করার কথা ভাবতে হত না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। কলেজ জীবনে ওরা তিন বন্ধু ছিল হরিহর আত্মা। নীল ব্যানার্জি, সমুদ্র [illegible] আর অজেয় বসু। সবাই ওদের নাম দিয়েছিল [illegible]।

হঠাৎই সমুদ্রের মৃত্যু তাকে সমূলে নাড়া দিল। সমুদ্রের মৃতদেহ দেখে তার মনে হয়েছিল কোথাও একটা গলদ লুকিয়ে আছে। আর সেই গলদ রহস্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল সত্যটুকু খুঁজে [illegible] জড়িয়ে পড়ল রহস্যভেদী জীবনে। অদ্ভুত উপায়ে [illegible] খুন হয়েছিল। খুনি ধরাও পড়েছিল। সেই শুরু। তারপর থেকে তার জীবনে এসেছে নানা রহস্যের হাতছানি। উপেক্ষা করতে পারেনি। [illegible] থেকে গভীরে ডুবেছে। একে একে অপরাধীর মুখোশ খুলে দিয়েছে। [illegible] অজেয় বসু, পেশাগত কারণে [illegible] জীবন থেকে সরে গেছে। এখন আছে দীপু। ভালবেসেছিল নন্দিনীকে। একটা ভুল। নন্দিনী হারিয়ে গেছে। আর বিয়ে করাও হয়নি। এখন তার একটাই নেশা, রহস্য ভেদ।

আর গোয়েন্দা জীবনের পাঁচটি সফল রহস্য ভেদের কাহিনী নিয়েই রহস্যভেদী নীল ব্যানার্জি-র প্রথম খণ্ড।